বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান

(বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস)

ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এম. এ., ডি. ফিল্.

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৬০

ভারত সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যে এই পুস্তক প্রকাশিত। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারী অর্থানুকূল্যের দরুন যথাসম্ভব স্বল্পমূল্য নির্ধারিত হইল।

মূল্য : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রকাশক : শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

উৎসর্গ

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ও

অধ্যাপক সুকুমার সেন

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

রামমোহন রায় একসময় বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে লিখেছিলেন বাঙ্গালী মনকে প্রাচীনত্বের কুয়াশা থেকে মুক্তি দিতে হবে। বিলেতের মত এদেশেও স্কুল-কলেজে গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, তখন সেই পরামর্শমতই এদেশে শিক্ষার পত্তন হয়েছিল।

আজ প্রায় ১৫০ বৎসর পার হতে চললো। এখন স্কুল-কলেজ সব জায়গায়ই বিজ্ঞানের কথা শোনা যায়। ছেলেরা বেশী করে ঝুঁকেছে শুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের দিকে। ভারতের সর্বত্রই ছড়িয়ে গেছে বিজ্ঞানের সাধনা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবের পর এশিয়ার সর্বত্রই বিজ্ঞানের প্রচার-চেষ্টা চলেছে। শুনে ভাল লাগে, জনকল্যাণের এই কাজে বাঙ্গালী ছেলেদেরও ডাক এসেছে। তাদের মধ্যে এখন এমন লোক পাওয়া যায় যারা বিশ্বের কাজে এগিয়ে দেশবিদেশে বিজ্ঞানের প্রচার করতে পারে।

বাঙ্গালীর মন চিরকালই নতুনকে আপন করতে চায়। ভারতের অন্য প্রদেশের লোক যখন সনাতনী প্রথায় চলতো, সেই পুরানো দিনেও বাঙ্গালী আদর করে ঘরে নতুনকে তুলে নিতো। ফলে সে একরকম একঘরে হয়েই ছিল সনাতনীদের দরবারে।

সেই পুরাকালের ইতিহাস ভাল করে লেখা হয় নি। আমরা শুধু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, ধীমান রত্নাকরশান্তির নামই জানি। যাদুঘরে যা' সংগ্রহ রয়েছে, তার দিকে তাকিয়ে ভাবি, এর পেছনে কত শত বৎসরের সাধনা ছিল, কে জানে।

বাঙ্গালী দেশবিদেশে জলপথে পাড়ি দিত, সে কথা আজ শুনি—কতটা বিজ্ঞানীসুলভ মনোভাব নিয়ে বাঙ্গালী কারুকাজ ক'রে এটা সম্ভব করে তুলেছিল তার ইতিহাস কবে লেখা হবে?

ইংরাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশীদিন টিকলো না। খুব বেশী আগেও এটা সুরু হয় নি। এর মধ্যে এ দেশে নানাভাবে বাংলাভাষাতেই বিজ্ঞান-শিক্ষার যে আয়োজন হয়েছিল, তার ইতিহাস সত্যই কৌতূহল উদ্রেক করবে।

শ্রীমান বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এ বিষয়ের আলোচনা করেছেন কয়েক বছর ধরে। তাঁর সাধনা রূপায়িত কয়েছেন প্রবন্ধে এবং বিশ্ববিদ্যালয় তার তারিফ করেছে।

তাঁর সেই প্রশংসিত প্রবন্ধ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বই-এর আকারে প্রকাশ করেছে। বাংলা সরকারের অর্থ-সাহায্যের জন্যেই এটা সম্ভব হলো। এর জন্যে পরিষদ সরকারের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

বহুদিন থেকে আমি বলে এসেছি—বিদেশী শিল্প ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যদি দেশের মধ্যে তাড়াতাড়ি চালু করতে হয়, তবে এদেশের পণ্ডিতকে কষ্ট করে সহজ ও সরলভাবে লোকে যে ভাষা সহজে বুঝবে, সেই ভাষাই বই-এ লিখতে হবে।

দেশে যাঁরা নতুন জ্ঞানের স্রোত খাত কেটে এনেছিলেন, তাঁরাও যে সেই একই কথা বিশ্বাস করে এই কাজে নেমেছিলেন, শ্রীমান বুদ্ধদেবের বই পড়ে সে কথা জেনে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি।

দেশ চায় বেশী করে বিজ্ঞান চালু হোক। দুর্গাপুর, ভিলাই-এ বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠছে। ছেলেরাও চায় বিজ্ঞান—সরকারও তার বন্দোবস্ত ভালভাবে করতে এগিয়ে এসেছেন।

শতাধিক বৎসরের সাধনার এই ইতিহাস সময়োপযোগী হলো। বুদ্ধদেব যত্ন করে লিখেছেন। তাঁর পাঠকের অভাব হবে না, আশা করছি।

পুরানো যুগের বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস কবে লেখা হবে?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

ভূমিকা

"বিজ্ঞান" শব্দটি আধুনিক অর্থে ঠিক কবে থেকে চালু হ'ল তা জানবার কৌতূহল আমার আছে। শ্রীমান্ বুদ্ধদেবকে বলেছিলুম সে কথা। কিন্তু তিনি তা নির্ণয় করতে পারেন নি। তার কারণ ইংরেজী science ও arts (বা humanities) জ্ঞানবিজ্ঞানের এই কাটছাঁট পার্থক্য উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগেও সর্বস্বীকৃত হয়েছিল বলে মনে হয় না। সেইজন্যে বাংলায় "বিজ্ঞান" শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত ব্যাপক অর্থে উনবিংশ শতাব্দের ষষ্ঠ দশক অবধি চলে এসেছিল। এমন কি কবিতার বইয়ের নামেও "বিজ্ঞান" অচল ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিশিষ্য রসিকচন্দ্র রায় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বিজ্ঞানসাধুরঞ্জন' বার করেছিলেন।

বিজ্ঞানের চর্চা ও বিজ্ঞানের পাঠ্য বই লেখা যে এদেশে ইউরোপীয়রাই আরম্ভ করেছিলেন এবং কিছুকাল পর্যন্ত চালিয়েছিলেন, তা শ্রীমান্ বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন। প্রথমে তাঁরা "বিদ্যা" কথাটি ব্যবহার করতেন। এ রীতির রেশ এখনও রয়ে গেছে "পদার্থবিদ্যা", "উদ্ভিদবিদ্যা" ইত্যাদিতে। তার পরে এল "বিজ্ঞান" কথাটি উনবিংশ শতাব্দের চতুর্থ দশকে—"বিদ্যা"র মতই জ্ঞানবিজ্ঞান এই ব্যাপক অর্থে। সাময়িক-পত্র "বিজ্ঞানসেবধি" নামেই তার সাক্ষ্য (এই গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠা দেখুন)। কিছুকাল পর্যন্ত "বিদ্যা" ও "বিজ্ঞান" দুই-ই চলেছিল, তবে "বিজ্ঞান"এর ব্যবহার বাড়তির মুখে। শেষে "বিজ্ঞান"এর পক্ষে বোধ করি চরম রায় পাওয়া গেল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্কিমচন্দ্র 'বিজ্ঞানরহস্য' বার করলেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মে-র (Robert May) 'অঙ্কপুস্তকং' প্রথম প্রকাশিত হয়। নিতান্ত ক্ষীণকায় পাঠ্যপুস্তিকা। এইটিই বাংলায় প্রথম বিজ্ঞানবিষয়ক ছাপা বই। এতে গণিতশাস্ত্রের যতটুকু আছে সে সবই দেশি মতের। অনুপচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির মত সেকালের গণিতজ্ঞের রচিত অনেকগুলি গাণিতিক সমস্যা ও অঙ্ক সমাধান সমেত শুভঙ্করী আর্যার ছাঁদে দেওয়া আছে। ১৮১৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের যে চর্চা হয়েছে তার বিস্তৃত পরিচয় বুদ্ধদেববাবু দিয়েছেন। সে বিষয়ে ভূমিকায় অতিরিক্ত কিছু বলবার শক্তি ও অধিকার আমার নেই।

দশ ॥

তবে আগেকার কথা সামান্য কিছু বলতে পারি। ইংরেজদের আসার আগে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বলে কিছু ছিল না। থাকবারও কথা নয়। পুরানো পুথির বাজে পাতায় একসময়ে আমি কিছু মশাল তুবড়ি হাউই ইত্যাদি আতশবাজির মশলার কিছু ফর্মুলা পেয়েছিলুম। সেইটুকুই বাংলা দেশে ফলিত রসায়নচর্চার একমাত্র সাক্ষ্য। কিন্তু সে তো বিজ্ঞানচর্চা নয়।

বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্য বিদ্যার পার্থক্যের এক প্রধান লক্ষণ হ'ল বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের বিশেষ মর্যাদা। প্রাকৃতিক ব্যাপারের পর্যবেক্ষণ সাধারণ লোকে সব দেশেই করে থাকে। আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশে বহু বহু কালের পর্যবেক্ষণপ্রসূত অভিজ্ঞতাকে একটু বিশেষ মূল্য দেওয়া হ'ত। সেকালের লোকে স্মরণীয় বিষয়কে স্থায়ী করতে হ'লে কবিতায় রূপ দিত। কবিতা পড়তে ভালো লাগে এবং মনে রাখা সহজ। সহজেই তা পুরুষানুক্রমে গড়িয়ে গড়িয়ে আসে। তাই আমাদের প্রাচীনকালের ভূয়োদর্শনজাত নৈসর্গিক অভিজ্ঞতা "ডাকের বচন" রূপে আধাহেঁয়ালি ছড়ার আকারে চলে এসেছে। এগুলিকে আমাদের জনসাধারণের "বৈজ্ঞানিক" অভিজ্ঞতার রেকর্ড বলতে পারি। "ডাক" (প্রাচীনতর "ডক্ক") মানে মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ গুণী পুরুষ, এখনকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের হাজার-দেড়হাজার বছর আগেকার প্রতিনিধি। ডাকেরা রসায়নেরও চর্চা করতেন, তবে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল দীর্ঘজীবন অথবা চিরজীবন লাভের কিংবা লোহাকে সোনা করার উপায় উদ্ভাবন।

একদা নিরাময় ও দীর্ঘায়ু লাভ যে বিদ্যার বিষয় ছিল তাই বিশেষভাবে "বিদ্যা" সংজ্ঞা পেয়েছিল। তাই এই "বিদ্যা" যাঁরা চর্চা করতেন তাঁরাই নাম পেয়েছিলেন "বৈদ্য"। এই "বিদ্যা"র একটা specialized বিভাগ ছিল সার্জারি বা শল্যশাস্ত্র। পরে সার্জারি বিদ্যা যাঁদের একচেটে হয়েছিল তাঁরা স্বতন্ত্র জাতিরূপে "নরসুন্দর" এই সুভাষিত (euphemistic) বিশেষণটি প্রাপ্ত হন। ("সুন্দর" কথাটির মূল অর্থ কিন্তু মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ গুণী, পরবর্তী কালের "ডক্ক"।) তাই "বৈদ্য" শব্দটির তদ্ভব রূপ "বেজ" এখন এই জাতের লোকেরই পদবীরূপে রয়ে গেছে।

আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের আগে বিজ্ঞানের অনুশীলন অসম্ভব ছিল। তার প্রধান কারণ আমাদের মনের ধারা। এ জগৎ মায়া, এ সংসার মিথ্যা। যদিও গীতায় বলা হয়েছে "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তম-ধ্যানি," তবুও আমরা ভেবে এসেছি যে, এক অব্যক্ত ষ্টেশন হতে আর এক

অব্যক্ত ষ্টেশনের যাত্রী আমাদের গাড়িতে নজর নেই—আমরা যেন প্ল্যাটফর্মে প্রতীক্ষারত। এই প্রতীক্ষাটুকু মানবজীবন মনে করে আশেপাশে কোনো দিকে মন না দিয়ে ডিস্‌টাণ্ট সিগ্‌ন্যালের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমাদের ধর্ম। এই অধ্যাত্মসর্বস্বতার কুজ্মটিকা সর্বদা ঘিরে থাকলে বাস্তবদৃষ্টি প্রসারিত হয় না। বিদেশের হাওয়া এসে সেই কুয়াশা খানিকটা পাতলা করে দিলে পরে তবেই আমাদের বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসা জেগেছে।

আশঙ্কা হচ্ছে, আমার এই কথায় অনেকে আপত্তি তুলবেন। কিন্তু আমি "অধ্যাত্মসর্বস্বতা" বলেছি, "অধ্যাত্মপ্রবণতা" বলি নি,—এটুকু মনে রাখলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকবে না। আমরা ভারতীয়রা অধ্যাত্মপ্রবণ। সে আমাদের দেশের সেই চিরকালের স্বভাবের মধ্যে, যে স্বভাবে আমাদের বেশি ঘাম হয়, রঙ আমাদের ময়লা, এবং আরো অনেক কিছু। যা স্বভাব তা ভালোমন্দ বিচারের বাইরে, তা গৌরবেরও নয় অগৌরবেরও নয়।

আমাদের অধ্যাত্মপরায়ণতার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার কোনো মৌলিক অসঙ্গতি থাকতে পারে না। কালে কালে আমাদের দেশে যে সব সত্যদ্রষ্টা মনীষী জন্মেছেন তাঁরা সাংসারিক সত্যকেও সত্য বলেই স্বীকার করেছেন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে এক জায়গায় আছে,—'যখন কেউ বলবে আমি এ ব্যাপার চোখে দেখেছি, তখনই সেটা ঠিক সত্য বলে গ্রহণ করবে।'

বকতে বকতে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান ছাড়িয়ে অনেকদূর এসেছি। আর নয়। ডকটর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বইয়ের যে উপযুক্ত সমাদর হবে এ বিশ্বাস আমার আছে। শ্রীমান্ বুদ্ধদেব বিজ্ঞান ও সাহিত্য—সত্যের এই দুই মহাপীঠেরই বিদ্যার্থী। বাংলাসাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দু নৌকা একসঙ্গে চালিয়ে যে দক্ষতা দেখিয়ে ইনি উত্তীর্ণ হয়েছেন তাতে আমার প্রশংসা বাহুল্য। আশা করি তাঁর এই দ্বৈনাবিকতার পরিচয় আমরা আরো পাব।

শ্রীসুকুমার সেন

লেখকের নিবেদন

সাহিত্যের মূলতঃ দু'টি দিক ; একটি জ্ঞানাত্মক, অপরটি ভাবাত্মক। গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি ভাবাত্মক সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। আর জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের বিষয়বস্তু হোল দর্শন, ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

ভাবাত্মক সাহিত্যের তুলনায় বাংলা জ্ঞানাত্মক সাহিত্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল। ইংরেজী প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে এই দুর্বলতা বিশেষভাবে নজরে পড়ে। বাংলা জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের এই দুর্বলতা স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা যায়, জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় সাহিত্যের সহযোগিতা বাঙ্গালী পুরোপুরিভাবে এড়িয়ে যায় নি। বাংলায় জ্ঞানাত্মক সাহিত্য-রচনা সুপরিকল্পিতভাবে আরম্ভ হোল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে।

জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের একটি প্রধান শাখা হোল বিজ্ঞান। মাটিকে বাদ দিলে যেমন মানুষের চলে না, বিজ্ঞানকে বাদ দিলেও তেমনি আজকের সভ্যতা অচল। অতএব, সমাজ ও সভ্যতার প্রয়োজনেই বিজ্ঞানালোচনায় সাহিত্যের সহযোগিতা আজ স্বীকার করতে হয়।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যখন সর্বজনবোধ্য ও সরল বর্ণনার মাধ্যমে সাহিত্যিক সত্যের মর্যাদা লাভ করে, তখনই তা' হয়ে ওঠে বিজ্ঞানসাহিত্য। পরিমাণে অল্প হলেও বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য নেহাত নগণ্য নয়। অথচ কিভাবে এই বিজ্ঞানসাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ হোল, তা' নিয়ে সুপরিকল্পিত-ভাবে কোনো আলোচনা আজও পর্যন্ত হয় নি ; এই কথা স্মরণ ক'রে আজ থেকে প্রায় চার বৎসর পূর্বে বিশ্রুত মনীষী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনের অধীনে 'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান'— এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করি। গবেষণার বন্ধুর পথে দুঃসাহসিক কাণ্ডারী তিনি। সমগ্র গবেষণায় জ্ঞানের প্রদীপ হাতে নিয়ে তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।

যতদূর জানি, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার প্রচেষ্টা আজও পর্যন্ত দু'একটি বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যেই সীমিত। 'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান' বিষয়ক আলোচনার বিস্তারিত ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ এই প্রথম।

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার উদ্ভব, বিকাশ ও ক্রমপরিণতি আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে কোন যুগে কি কি ধরনের বিজ্ঞানগ্রন্থ লেখা হয়েছিল এবং বিভিন্ন যুগের সাময়িক-পত্রে কি ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তা' নিয়ে এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার কালে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে গ্রন্থরচনার প্রকাশকাল, পরিবেশ, ভাষা ও সাহিত্যিক মূল্যের উপরেই। সাহিত্যিক মূল্যের উপরে জোর দেওয়া হলেও যায়গায় যায়গায় পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর কারণ, কোনো কোনো যুগে বিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিক নিয়ে লেখা গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক; অথচ বাংলায় বিজ্ঞানালোচনার ইতিহাস থেকে এদের বাদ দেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে উদ্ভব যুগের কিছুসংখ্যক গ্রন্থ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদির নামোল্লেখ করা যায়। প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্রের প্রথম প্রকাশ-কাল উল্লেখ করেছি। অনেকক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশ কথাটি লিখি নি; বন্ধনীর মধ্যে শুধুমাত্র প্রকাশের তারিখটি উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশ বোঝাতেই ঐ বন্ধনী ও তারিখ ব্যবহৃত হয়েছে। আবশ্যকবোধে বিভিন্ন গ্রন্থকারের জীবনী দেওয়া হয়েছে। যে সকল গ্রন্থকারের জীবনী সকলেরই জানা আছে, তাঁদের জীবনকথা এখানে বর্ণিত হয় নি। তবে বিশিষ্ট বিজ্ঞানসাহিত্যিকদের জীবনে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার অনুপ্রেরণা কি ক'রে এল এবং তাঁদের বিজ্ঞানচিন্তার উৎসই বা কোথায়, তা' নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার পত্র-পত্রিকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যেমন সংবাদপত্র, মফঃস্বলপত্র, স্ত্রীপাঠ্য সাময়িক-পত্র, বালকপাঠ্য পত্রিকা, বিজ্ঞান-পত্রিকা ইত্যাদি। যতদূর জানি, সাময়িক-পত্রের এরূপ শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টাও বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম।

সাময়িক-পত্রের বিজ্ঞানসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 'দিগ্‌দর্শন' (এপ্রিল, ১৮১৮) ও 'সমাচার দর্পণ' (মে, ১৮১৮) থেকে সুরু ক'রে 'বঙ্গদর্শন' (বৈশাখ, ১২৭৯) পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার যেগুলো এখনও

পাওয়া যায় তাদের সব কয়টির প্রায় সব সংখ্যাই আমি দেখেছি। বঙ্গদর্শনের পরবর্তী যুগে শুধুমাত্র প্রধান প্রধান পত্র-পত্রিকা নিয়েই আলোচনা করেছি। সাময়িক-পত্র নিয়ে এরূপ বিস্তারিত আলোচনার কারণ, বিভিন্ন যুগের বহু পত্র-পত্রিকায় এমন অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সুযোগ যাদের কোনোদিনই ঘটে নি। তা' ছাড়া বিষয়বস্তু, ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে বিভিন্ন যুগের এক একটি সাময়িক-পত্র জনসাধারণের মনে যে প্রভাব বিস্তার করে, বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের গতি ও প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে তা' সহায়তা করেছিল অনেকখানি। ভবিষ্যতে বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা প্রণয়নের দিক থেকেও এই সকল প্রবন্ধ সবিশেষ মূল্যবান। প্রাচীন যুগের সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিভাষা প্রণয়নের চেষ্টা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী ইতিপূর্বে করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'প্রকৃতি' কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা' শীর্ষক গ্রন্থটির নামোল্লেখ করা যায়।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত হোল। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সুরু ক'রে জগদানন্দ রায় পর্যন্ত শতাধিক বৎসরের বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাস এখানে আলোচিত। আলোচ্য যুগকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার সূচনা ইউরোপীয়েরাই একদিন করেছিলেন এবং গোড়ার দিককার অধিকাংশ বিজ্ঞান-গ্রন্থই ইউরোপীয়দের লেখা, এই বিবেচনায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অক্ষয়কুমার দত্তের পূর্ব পর্যন্ত যুগের নামকরণ করা হয়েছে 'ইউরোপীয় লেখকদের আমল'। এই যুগকেই বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রথম পর্ব বা উদ্ভব-যুগ নামে অভিহিত করা যায়। কিভাবে এবং কি পরিবেশে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত হোল, এই পর্বে তা' নিয়ে যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের পথপ্রদর্শকদের গ্রন্থাবলী, বিভিন্ন গ্রন্থের ভাষা, রচনারীতি ও সেই সকল গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিদেশী গ্রন্থকারদের জীবনকথাও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার সূচনায়

কয়েকটি পত্র-পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানের অবদানও এখানে আলোচিত। প্রসঙ্গতঃ এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চার গোড়াপত্তনের ইতিহাস সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ, বিজ্ঞান-চর্চার অগ্রগতির সঙ্গে বিজ্ঞানসাহিত্যের রয়েছে নিকট সম্পর্ক।

পরবর্তী পর্বকে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের 'গঠন যুগ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে এই যুগের সূচনা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে এই যুগের সমাপ্তি। অক্ষয়কুমারই প্রথম লেখক যিনি ভাষার কৃত্রিমতা দূর ক'রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে দেশীয় সাজে সজ্জিত করলেন। তাঁর সমসাময়িক যুগে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের প্রচেষ্টায় বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রসার ও পরিপুষ্টি সাধিত হোল। বঙ্গ-সাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনায় উল্লিখিত লেখকদের অবদানের কথা স্মরণে রেখে এই পর্বে এঁদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থসংগ্রহ, রহস্য-সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, ভারতী প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সাময়িক-পত্র এবং বিভিন্ন স্ত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিকা, সংবাদপত্র ও মফঃস্বলপত্র, বিজ্ঞানপত্র এবং বিবিধ সাময়িক-পত্র নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া এই যুগে রচিত পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থের কথাও দু'টি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত। অসংখ্য গ্রন্থকার এই পর্বের বিজ্ঞানসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, একথা স্বীকার ক'রেও বলা যায়, অক্ষয়কুমার দত্তই এই পর্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাহিত্যিক। বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানে অক্ষয়কুমারের বিশেষ অবদানের কথা স্মরণ ক'রেই এই পর্বের নামকরণ করা হয়েছে 'অক্ষয়কুমার দত্ত ও তৎকালীন যুগ'।

তৃতীয় বা সর্বশেষ পর্ব হোল বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের 'আধুনিক যুগ'। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'নবজীবন'-এ লেখনী ধারণ করার পর থেকে এই যুগের সূচনা। জগদানন্দ রায়ের সাহিত্য-জীবন পর্যন্ত এই যুগের সীমারেখা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীই বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, এই বিবেচনায় এই পর্বের নামকরণ করা হয়েছে 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও আধুনিক কাল'। এই পর্বের আরম্ভেই বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দরের অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর ভাষা, রচনারীতি

ও দৃষ্টিভঙ্গীর কথাও আলোচিত। এ ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দরের মতে ও পথে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের পরিভাষা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু আধুনিক যুগের বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে বিভিন্ন সাময়িক-পত্রের অবদান। এর পরের দু'টি অধ্যায়ে আধুনিক যুগে রচিত বিভিন্ন বিজ্ঞানগ্রন্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন 'বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য'। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যার পর এই অধ্যায়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বৈজ্ঞানিক সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস বিবৃত। সর্বশেষ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ'। জগদানন্দ রায় ছাড়াও এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের বিজ্ঞানসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শেষোক্ত দু'জন লেখকের অধিকাংশ বিজ্ঞানালোচনাই জগদানন্দের সাহিত্য-জীবনের পরবর্তীকালে রচিত হয়। কিন্তু এই দু'জন লেখক সাহিত্য-জীবন সুরু করেছিলেন জগদানন্দের সমসাময়িক কালে এবং বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার ক্ষেত্রে উভয়েরই উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে, এই বিবেচনায় এঁদের বিজ্ঞানসাহিত্য নিয়েও এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশিষ্টে বাংলা কারিগরী বিজ্ঞান (চিকিৎসা, কৃষি, ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্প) বিষয়ক রচনাদির একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কারিগরী বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন সাময়িক-পত্রের কথাও সংক্ষেপে আলোচিত। কারিগরী বিজ্ঞানের এক একটি দিক বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ; এই কথা স্মরণ ক'রে এক একটি বিজ্ঞানকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন, চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ধাত্রীবিদ্যা, খাদ্য ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, অস্ত্রচিকিৎসা, ঔষধবিজ্ঞান, শুশ্রূষাবিদ্যা বা নার্সিং, শিশুচিকিৎসা, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞানের বিভাগগুলি হোল সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান, কৃষির বিষয়বিশেষকে নিয়ে লেখা কৃষিবিজ্ঞান, পশুপালন ও পশুচিকিৎসা, কৃষিরসায়ন, মৎস্যচাষ ইত্যাদি। ইঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রধান বিভাগগুলো হোল জরিপবিজ্ঞান, বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক বিজ্ঞান। শিল্পবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান বিভাগ হোল ফটোগ্রাফী।

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞান শব্দটিকে এখানে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। সংকীর্ণ অর্থে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের (Theoretical Sciences) প্রাকৃতিক দিক অর্থাৎ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা Natural Sciences এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের (Practical Sciences) কার্যকরী দিক অর্থাৎ, কারিগরী বিজ্ঞান বা Technical Sciences। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে পড়ল পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি। আর চিকিৎসাবিজ্ঞান, খাদ্য ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে হোল কারিগরী বিজ্ঞান।

ইংরেজী Science বোঝাতে বাংলায় 'বিজ্ঞান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই Science বা বিজ্ঞানের সংজ্ঞা-নির্ণয় ও শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা প্লেটোর আমল থেকে দার্শনিকদের মধ্যে চলে আসছে। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ-রীতির ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটেছে। এই সকল শ্রেণীবিভাগের মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার পর Encyclopedia Americana-য় (1951 ed, Vol. xxiv—P. 414) মন্তব্য করা হয়েছে,

> "It is thus hardly possible to sketch a classification of Sciences which would find general agreement and which would be in principle independent of a particular philosophical standpoint."

প্লেটোর (খৃঃ পূঃ ৪২৭—খৃঃ পূঃ ৩৪৭) সময় থেকে বিভিন্ন যুগের বহু শ্রেষ্ঠ মনীষী বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এই প্রসঙ্গে অ্যারিষ্টোট্‌ল (খৃঃ পূঃ ৩৮৪—খৃঃ পূঃ ৩২২), বেকন (১৫৬১ খৃঃ—১৬২৬ খৃঃ), লক (১৬৩২ খৃঃ—১৭০৪ খৃঃ), বেন্থাম (১৭৪৮ খৃঃ—১৮৩২ খৃঃ), এম্পিয়ার (১৭৭৫ খৃঃ—১৮৩৬ খৃঃ) প্রমুখ মনীষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগে যাঁদের শ্রেণীবিভাগ স্বীকৃতি পেয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোম্‌তে (১৭৯৮—১৮৫৭) এবং স্পেন্সারের (১৮২০—১৯০৩)

নাম। কোম্তে বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এই পাঁচটি বিভাগ হোল, (১) জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), (২) পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics), (৩) রসায়নবিজ্ঞান (Chemistry), (৪) শারীর-বিজ্ঞান (Physiology) এবং (৫) সমাজবিজ্ঞান (Sociology)। কোম্তে গণিতকেই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছিলেন। স্পেন্সার মূলতঃ কোম্তের শ্রেণীবিভাগকেই আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। তিনি গণিত নিয়েই শ্রেণীবিভাগ স্বরু করলেন। তারপর একে একে এল যন্ত্রবিজ্ঞান (Mechanics), পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান। সবশেষে তিনি বললেন, বিজ্ঞানের বিশেষ কয়েকটি বিভাগের কথা—যেমন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা এবং জীববিজ্ঞান। তাঁর শ্রেণীবিভাগে মনস্তত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞান জীব-বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ অংশ বলে স্বীকৃতি লাভ করল। স্পেন্সারের এই শ্রেণীবিভাগকে অনেকে মেনে নিলেও সমাজবিজ্ঞানকে জীববিজ্ঞানের অংশ হিসাবে অনেকেই স্বীকার করেন না। Encyclopædia Britannica-য় (Vol. 20, 14th. ed. P. 120) মন্তব্য করা হয়েছে,

> "………No one can say whether the Science of radioactivity is to be classed as Chemistry or Physics, or whether Sociology is properly grouped with Biology or Economics."

সমাজবিজ্ঞান নিয়ে এরূপ বিতর্কের অবকাশ আছে বলেই আলোচ্য বিষয় থেকে একে বাদ দেওয়া হয়েছে।

মনোবিজ্ঞান নিয়েও সমস্যা। একদিকে একে যেমন দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, অপরদিকে তেমনি জীববিজ্ঞানের মধ্যেও ফেলা যায় না। তাই মনোবিজ্ঞানকে ধরা হয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরই একটি বিশেষ শাখারূপে। তা' ছাড়া পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান হিসাবে বর্তমানে স্বীকৃতি পেয়েছে; এই বিবেচনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানকেও মূল আলোচনায় নেওয়া হয়েছে। তবে জড়বিজ্ঞান (পদার্থ, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি) অপেক্ষা জীববিজ্ঞানের সঙ্গেই মনোবিজ্ঞানের যোগসূত্র বেশী, এই কথা স্মরণ ক'রে মনোবিজ্ঞানকে জীববিজ্ঞানের অধ্যায়ে নেওয়া হয়েছে।

আয়ুর্বেদ, ফলিত জ্যোতিষ ও হোমিওপ্যাথি পরীক্ষাসিদ্ধ বিজ্ঞান হিসাবে এখনও স্বীকৃতি পায় নি ; এই যুক্তিতে এদের বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই সকল দিক ছাড়াও জ্ঞানাত্মক সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ আছে, *যাদের বিশেষ কোনো একটি বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা যায় না।* বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে এই সকল গ্রন্থে সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়। এই শ্রেণীর রচনাকে 'সাধারণ বিজ্ঞান' (Sciences in general) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষায় সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা নেহাত নগণ্য নয় ; তা' ছাড়া এই শ্রেণীর গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্যও রয়েছে, এই বিবেচনায় সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি ও সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্যে সাধারণ বিজ্ঞানকে এখানে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা গ্রন্থাদি, বৈজ্ঞানিক-জীবনী, বিজ্ঞান বিষয়ক শিশুসাহিত্য, বিজ্ঞাননির্ভর উপকথা ইত্যাদি।

তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক দিক এবং কার্যকরী বিজ্ঞানের কারিগরী দিক নিয়ে আলোচনা করা হলেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনার উপরেই এখানে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এর কারণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদিরই সাহিত্যিক মূল্য বেশী এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাই হোল প্রকৃত বিজ্ঞান বা Pure Science। তা' ছাড়া বাংলার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাহিত্যিকদের রচনা মূলতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপরেই সীমাবদ্ধ।

এবারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা। গ্রন্থটি প্রকাশের জন্যে অর্থসাহায্য করায় প্রথমেই জাতীয় সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। আচার্য ডক্টর সুকুমার সেনের কাছে আমার ঋণের কথা পূর্বেই স্বীকার করেছি ; কিন্তু জানি, শুধুমাত্র স্বীকৃতি জানিয়ে তাঁর ঋণ পরিশোধ করা যাবে না। তবু ভরসা রাখছি, যে জ্ঞানের শিখা আমার জীবনে তিনি জ্বালিয়েছেন, তারই আলোকে ভবিষ্যতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নতুন বিষয় নিয়ে নতুন বই লিখে আচার্যের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করবো।

জানি, আমার এই প্রতিশ্রুতিতে আর একজন মহামনীষী আনন্দিত হবেন। তিনি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র, ভারতের

জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বাংলাভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারে অধ্যাপক বসুর উৎসাহ ও অনুরাগের কথা সকলেরই বিদিত। মূলতঃ তাঁরই উৎসাহে ও উদ্যোগে গ্রন্থটি এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত করা সম্ভবপর হোল। শুধুমাত্র গ্রন্থ-প্রকাশের ক্ষেত্রেই নয়, গ্রন্থ-রচনার ক্ষেত্রেও তিনি আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। এই মহাবিজ্ঞানীর অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা আমার জীবনপথের অমূল্য পাথেয়। 'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান' লিখবার সময় বিজ্ঞানের বিষয়-বিভাগ নিয়ে যখন চিন্তিত হয়ে পড়েছিলুম, তখন তিনি মূল্যবান নির্দেশ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

বিজ্ঞানের বিষয়-বিভাগ (Classification of Sciences) সম্বন্ধে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্রের নির্দেশের কথাও আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণী। 'বঙ্গ-সাহিত্যে বিজ্ঞান'-এর বিষয়বস্তু ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি আমাকে বহু মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রখ্যাত মনীষী ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও ডক্টর সুশীলকুমার দে-র সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণার কথাও কোনোদিন ভুলবো না। গবেষণার ব্যাপারে যখনই তাঁদের শরণাপন্ন হয়েছি, তখনই তাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন প্রমুখ মনীষীরাও আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। এজন্যে এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

বন্ধুদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণ করছি শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ দাসের কথা। রাসবিহারীরই আগ্রহাতিশয্যে আমি একদিন গবেষণা সুরু করেছিলাম। আর অধ্যাপক ডক্টর দাস আমার সতীর্থ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। গবেষণা চলবার কালে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বহুবার তিনি আমার কাজের খবর নিয়েছেন এবং বহু মূল্যবান নির্দেশ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কথাসাহিত্যিক

অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। এ-ছাড়া হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক-বন্ধুরা গবেষণার কাজে আমাকে বরাবরই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্য-সভ্যা ও কর্মীদের কাছেও আমার ঋণ অপরিসীম। পরিষদ পরিচালিত বিজ্ঞান-পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর যশস্বী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তা' ছাড়া এই প্রবীণ বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিকের উপদেশ না পেলে গ্রন্থটির মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি থেকে যেতো।

প্রুফ-সংশোধনে 'বিজ্ঞান-ভারতী'র বিশ্রুত লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস আমাকে সাহায্য করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে তিনি যে কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন, এজন্যে আমি তাঁর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে পরিষদ-সম্পাদক ডক্টর মৃগাঙ্কশেখর সিংহের কর্মনিষ্ঠার কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। গ্রন্থটির ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদিতে কোনোদিকে যা'তে কোনো ত্রুটি না থাকে, সেদিকে বরাবরই তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল।

প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্ণধার ও কর্মীদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, বিশ্বভারতী লাইব্রেরী, শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরী, রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী ইত্যাদি গ্রন্থাগারের সাহায্য না পেলে 'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান'-এর উপাদান সংগ্রহ কোনোকালেই সম্ভবপর হোত না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনাদিবাবু ও সন্ন্যাসীবাবু বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সরবরাহ ক'রে আমাকে অশেষ সাহায্য করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত শিবদাস চৌধুরী মহাশয় কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্যে কলিকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর সকল কর্মীই আমার ধন্যবাদের পাত্র।

এই গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ কিছুটা পরিবর্তিত আকারে 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', 'যুগান্তর', 'পরিচয়' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এজন্যে এই সকল পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থের প্রুফ-সংশোধনে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীযুক্ত

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মিহির ভট্টাচার্য, ভাই-সাহেব (শ্রীমান অজিত চক্রবর্তী), বন্ধুবর শ্রীঅধীর দে, অরুণ ভট্টাচার্য ও স্বর্গতা ছোট-বৌদি (বুড়ন)।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করে নাভানা প্রেসের বাংলা বিভাগের ব্যবস্থাপক সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায় যে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্যে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা আমার ধন্যবাদের পাত্র। বিরামবাবু শুধুমাত্র গ্রন্থ-প্রকাশেই সাহায্য করেন নি, গ্রন্থটিকে সকল দিক দিয়ে ত্রুটিহীন করার দিকে বরাবরই তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে এই গ্রন্থে অনেক ভুলভ্রান্তি থেকে যেতো।

পরিশেষে বক্তব্য, এই গবেষণার পশ্চাতে 'বাংলার অর্থ নৈতিক ইতিহাস'-এর লেখক অগ্রজ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্যের অবদানও বড় কম নয়। অগ্রজের তাড়া না থাকলে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই গবেষণা কোনোমতেই শেষ হোত না।

গবেষণা শেষ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সেই গবেষণা কতদূর সফল হয়েছে, তা' বিচারের ভার রইল সাহিত্যানুরাগী জনসাধারণ ও বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-চর্চায় অনুরাগী সুধীসমাজের উপর।

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

প্রথম পর্ব (উদ্ভব যুগ)

ইউরোপীয় লেখকদের আমল

(হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অক্ষয়কুমার দত্তের পূর্ব পর্যন্ত)

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সূচনা—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক

এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সুরু হবার পূর্বে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানালোচনা সুরু হয় নি। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এদেশে শিক্ষা-প্রচারের উদ্দেশ্যে বছরে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলেন।[১] পার্লামেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্যে ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিক্ষায় উৎসাহ দান। কিন্তু হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে গভর্ণমেণ্টের এই উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হয় নি। হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সুরু হবার পর থেকে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যেরও সূচনা হোল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়েছিল প্রধানতঃ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। প্রতিষ্ঠান তিনটির নাম শ্রীরামপুর মিশন, হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে শ্রীরামপুর মিশনের উল্লেখযোগ্য অবদান দিগ্‌দর্শন (এপ্রিল, ১৮১৮) পত্রিকা প্রকাশ। বঙ্গভাষায় মুদ্রিত এই প্রথম সাময়িকপত্রে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত। এছাড়া শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বিভিন্ন বিজ্ঞানগ্রন্থের রচনা, প্রকাশন ও ছাপার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তবে এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সুরু হবার পর থেকেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সুপরিকল্পিতভাবে প্রথম আরম্ভ হয় হিন্দু কলেজে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী প্রধানতঃ ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মনে গোড়া থেকেই ছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সুপ্রিম্ কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট (Sir Edward Hyde East)। তিনি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে জে. এইচ. হ্যারিংটনের কাছে লিখিত এক চিঠিতে হিন্দু কলেজে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে তার এক পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। ঐ পরিকল্পনায় বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। ঐ চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, হিন্দু কলেজে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দুস্থানী, পার্শী ইত্যাদি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হবে……"arithmetic (this is one of the Hindu Virtues)

১ Friend of India—May 20th, 1841, P 305.

history, geography, astronomy, mathematics ;"[২] ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, হিন্দু কলেজের নিয়মকানুন প্রণয়নের জন্যে একটি সাবকমিটি গঠিত হয়েছিল ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে। ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে প্রদত্ত তাদের রিপোর্টের প্রথম নিয়মটিই ছিল, "The primary object of this Institution is the tuition of the sons of respectable Hindoos, in the English and Indian languages and in the literature and Science of Europe and Asia."। স্থাপিত হবার অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানচর্চা স্থরু হোল। কয়েক বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপযোগী যন্ত্রপাতি আনাবারও ব্যবস্থা করা হোল। যন্ত্রপাতি পাঠিয়েছিলেন লণ্ডনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। এই সোসাইটির প্রেরিত জ্যোতির্বিজ্ঞান, দৃষ্টিবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রপাতি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় পৌছেছিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিকে অনুরোধ করা হয়েছিল, এ সকল যন্ত্রপাতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞানবিষয়ক বই সরবরাহ করবার জন্যে। এ ব্যাপারে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি হিন্দু কলেজকে বরাবরই সাহায্য করেছে। অবশ্য এই বিদ্যায়তনে বিজ্ঞান-শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল ইংরেজী ভাষা। ১৮১৭ থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য ও গণিত পড়াতেন সুপণ্ডিত টাইটলার, রসায়নবিজ্ঞান পড়াতেন রস সাহেব, আর ডিরোজিও ছিলেন মনস্তত্ত্ব ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক।[৩] পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে ইংরেজীর মাধ্যমে ইউক্লিডের জ্যামিতি ও বীজগণিত পড়ান স্থরু হয়েছিল ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে। ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষাদান চললেও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে এদেশীয় জনসাধারণ ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠল। মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার স্পৃহাও শিক্ষিত জনগণের মধ্যে বাড়তে লাগল। বঙ্গ-সাহিত্যে বিজ্ঞান আলোচনায় হিন্দু কলেজের সবচেয়ে বড় অবদান এখানেই।

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা করবার জন্যে এদেশীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ইংরেজী শিক্ষার সমর্থন

---

২ Modern Review—July, 1955 (Hindu College—Jogesh Ch. Bagal).

৩ হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত (১৭৯৭ শক)—রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ৩৭—৩৯

জানিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা সুরু করবার উদ্দেশ্যে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের কাছে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তার এক জায়গায় ছিল :—

> "I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote. It will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful sciences which may be accomplished * * * * by employing a few gentlemen of talent and learning, educated in Europe and providing colleges furnished with necessary books, instruments and other apparatus * * * * to instruct in those useful sciences in which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above inhabitants of other parts of the world."

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার অল্পকালের মধ্যেই কলিকাতা ও মফঃস্বলে কয়েকটি ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন স্কুলে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করবার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হোল কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭ খৃঃ, ৮ই জুলাই)। এই সোসাইটির উদ্যোগে জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক বই নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষভাগে এবং তৃতীয় দশকে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হোল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি।

এক

বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা প্রথম অঙ্ক বই 'মে-গণিত' কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত

হয়েছিল। গ্রন্থটির লেখক রবার্ট মে ছিলেন চুঁচুড়া অঞ্চলের গভর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহের প্রধান পরিদর্শক। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের উড্ব্রিজ নামক স্থানে মে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন জেলে। মাত্র তিন বৎসর বয়সে রবার্ট মে'র মাতার মৃত্যু হলে তাঁর পিতা পুনরায় বিবাহ করেন। পিতার অবহেলা ও বিমাতার নিষ্ঠুর ব্যবহারে মে'র জীবনে দুঃখ ঘনিয়ে ওঠে। স্কুল-জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম ক'রে নিজের অন্নসংস্থান ও পড়ার ব্যবস্থা মে নিজেই করেছিলেন। এদেশে এসে (১৮১২) মে কিছুকাল কলিকাতায় ছিলেন। এর পরে কিছুদিন ধরে তিনি ছোটদের কাছে ধর্ম ও শিক্ষাপ্রচার করলেন। এদেশে সর্বপ্রথম ইংরেজী স্কুল স্থাপনের কৃতিত্ব রবার্ট মে'র। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় ঐ স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রবার্ট মে'র মৃত্যু হয়।

মে-গণিতের বাংলা নাম "অঙ্কপুস্তকং"। মে এদেশীয় স্কুলে প্রবর্তিত অঙ্ক থেকে গ্রন্থটির উপকরণ সংগ্রহ করেন। গ্রন্থরচনার কাজে তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন হিন্দু কলেজের ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক জে. জে. ডি' আন্সেল্মে (J. J. D Anslme)। মে-গণিত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়েছিল। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। মে-গণিতে কয়েকটি ধাঁধা ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ছিল না। 'পরিভাষা'য় ধাঁধায় ব্যবহৃত সাংকেতিক নামগুলোর অর্থ বলে দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ ধাঁধাই কৌতূহলোদ্দীপক। দু' একটি বেশ দুরূহ। যেমন :—

মহীতে বসেছে পক্ষ আহারের তরে।
শঙ্কর কহিল ভুজ যোড় করি শিরে।
বসুর কাছে বাণ বসেছে কৃষ্ণ বড় সুখী।
ঘোড়ার উপর রাম বসেছে বেদে সমূদ্র দেখি।
রসের কাছে পাখি বসেছে খাবে হেন বাসি।
তার কাছে পঞ্চানন কোলে করি শশী।
অনূপচন্দ্র ভট্ট কহেন শুন কায়স্থের বালা।
সকল চাঁদের মধ্যে রন্ধ্র তবে গাঁথিবে মালা॥

কবিতার মাধ্যমে গণিতকে আকর্ষণীয় করবার চেষ্টা হার্লের 'গণিতাঙ্কে' আরও সুস্পষ্ট। 'গণিতাঙ্ক' কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। জন হার্লে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় ধর্মযাজকের কাজ সুরু করেছিলেন। প্রথমে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে হার্লে লণ্ডন মিশন ত্যাগ করেন। এদেশীয় লোকদের সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রচুর অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার নিদর্শন তাঁর গ্রন্থেও সুস্পষ্ট। শুভংকরের আর্যা থেকে সুরু ক'রে এদেশীয় হিসাব-পদ্ধতির অনেক কিছুই তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তবে গণিতাঙ্কের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল, যায়গায় যায়গায় কবিতার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার অবতারণা এবং কবিতাতেই সেই সমস্যার সমাধান। একটি সমস্যা ও তার সমাধানের নমুনা :—

রাজা বলে শুন পাত্র আমার উত্তর,
স্বর্ণ কিনি চারি ভরি আনহ সত্বর ;
পাইয়া রাজার আজ্ঞা স্বর্ণ আনি দিল,
চারি দরে চারি ভরি খরিদ করিল ;
পঞ্চদশ চতুর্দ্দশ ত্রয়োদশ দরে,
কিনিলেক তিন ভরি করিয়া সাদরে ;
শেষে এক ভরি স্বর্ণ আনি যোগাইল,
দ্বাদশ মুদ্রায় তাহা খরিদ করিল ;
শুনিয়া স্বর্ণের দর নৃপতি রুষিল,
হাপর করিয়া স্বর্ণ জ্বালে চড়াইল ;
চারি ভরি স্বর্ণ গলি মিশ্রিত হইল,
ওজন করিয়া দেখে দুআনা কমিল ;
কোন স্বর্ণের কত গেল লেখা করি আন,
রাজা বলে পাত্র তুমি যদি লেখা জান।

পাত্র কহে শুন নৃপ মোর নিবেদন,
ষোল তঙ্কা দর ভরি জানে জগজ্জন ;
পঞ্চদশের এক মুদ্রা ধরিতে হইবে,
চতুর্দ্দশের দুই মুদ্রা তাহাতে মিশাবে ;

ত্রয়োদশের নেত্র মুদ্রা তাহে যুক্ত করি,
দ্বাদশের চতুর্থ মুদ্রা লইবেক ধরি ;
একুন করিয়া বুঝ দিক মুদ্রা হবে,
দুই আনা কমি স্বর্ণ তাহাতে হরিবে ;
টাকা প্রতি যত পড়ে হরিয়া বুঝিবে,
প্রথম ভরির কমি সেই সে জানিবে ;
এই নিয়মানুসারে বুঝহ রাজন,
পরম পণ্ডিত তুমি সুবুদ্ধি রতন ।

এদেশীয়দের মধ্যে গণিত রচনায় সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন হলধর সেন। তাঁর বাংলা অঙ্কপুস্তকের (প্রঃ প্রঃ ১২৪৬ সাল) বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। গ্রন্থটি বিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছাত্রদের জন্যে এবং সওদাগরদের কাজকর্মের সুবিধার জন্যে রচিত হয়। ইংলণ্ডীয় মুদ্রা ও ওজনের সঙ্গে এদেশীয় মুদ্রা ও ওজনের কি সম্বন্ধ এই গ্রন্থে তা' দেখান হয়েছে। আলোচনার ভঙ্গী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির।

এই সময়েই হিন্দু কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল শিশুসেবধি-গণিতাঙ্ক —১ম ভাগ (প্রঃ প্রঃ ১২৪৬ সাল)। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হার্লে, মে প্রভৃতির অঙ্ক বই থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। তবে উপরোক্ত গ্রন্থগুলোর তুলনায় শিশুসেবধির বিষয়বস্তু একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির।

এই যুগের একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ উইলিয়ম ইয়েট্‌স্‌-অনুবাদিত ফার্গুসনের জ্যোতির্বিদ্যা (An easy introduction to Astronomy for young persons)। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া গেল। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়ে (২য় সংস্করণ—১৮১৯ খৃঃ) এবং পিয়ার্সনের ভূগোল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথনে (প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খৃঃ) জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা নগণ্য। জ্যোতির্বিদ্যা কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সংকলন করেছিলেন জেম্‌স্‌ ফার্গুসন ; সংশোধন করেছিলেন ডেভিড ক্রুষ্টার। জ্যোতির্বিদ্যার সংকলক এবং অনুবাদক ইউরোপীয়। তবে অনুবাদের পরিকল্পনা প্রথমে এদেশীয়রাই করেছিলেন। সমগ্র গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদের একটি

ইতিহাস আছে। প্রথমে ফার্গুসনের 'ইনট্রোডাকসান টু এস্‌ট্রোনমি' বইটি বাংলায় অনুবাদ করতে সুরু করেন বীর্যমোহন দত্ত, মহেশচন্দ্র পালিত ও হরুচন্দ্র পালিত। এই কাজে স্কুল বুক সোসাইটির সহযোগিতা প্রার্থনা ক'রে সোসাইটির ভারতীয় সম্পাদক তারিণীচরণ মিত্রের কাছে এরা এক পত্র লেখেন। পত্রের সঙ্গে অনুবাদের খানিকটা অংশও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্কুল বুক সোসাইটি উপরোক্ত লেখকত্রয়ের অনুবাদ ছাপবার মনস্থ করেন। ছাপার কাজও অচিরেই সুরু হয় (১৮১৯ খৃঃ)। কিন্তু কতকগুলি সাংকেতিক নামের সংশোধন আবশ্যক মনে ক'রে এবং অনুবাদের কিছু অংশ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ছাপার কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। রামমোহন রায় এবং স্কুল বুক সোসাইটির সভ্য মিঃ গর্ডন অনুবাদটি সংশোধনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে ডাঃ ব্রুষ্টার সংশোধনের কাজে হাত দিলেন। রাধাকান্ত দেব এবং উইলিয়ম ইয়েটস্ অনুবাদের কাজে সাহায্য করলেন। অনুবাদের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত নিলেন উইলিয়ম ইয়েট্‌স্। অবশেষে ইয়েট্‌স্ কর্তৃক অনুবাদিত হয়ে ফার্গুসনের জ্যোতির্বিদ্যা ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হোল। যে-সকল ইউরোপীয় লেখক বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইয়েটস্-এর ভাষাই সবচেয়ে বেশী প্রাঞ্জল ও ঝরঝরে। এই লেখকের আর একটি বিজ্ঞানগ্রন্থ 'পদার্থবিদ্যাসার' (প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খৃঃ) তৎকালীন যুগে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বস্তুতঃ, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন যাঁরা তাদের মধ্যে ইয়েটস্ অন্যতম।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের লিসেষ্টারশায়ারে ইয়েটস্-এর জন্ম হয়। বাল্য-কালে তিনি স্থানীয় স্কুলে শিক্ষালাভ করেছিলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রিষ্টল কলেজে অধ্যয়ন সুরু করেন। ইয়েটস্ কলিকাতায় এলেন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে। কলিকাতায় এসে তিনি লোসন, পিয়ার্স প্রভৃতিকে সহকর্মী হিসাবে পেলেন। ইয়েটস্ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখান থেকে ইংল্যাণ্ড হয়ে এদেশে ফিরে আসেন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে। ফিরে আসবার পর তিনি ফার্গুসনের এস্‌ট্রোনমির বঙ্গানুবাদের কাজ আরম্ভ ক'রে আট মাসের মধ্যে তা' শেষ করেন। কিছুকাল পর প্রথমা পত্নী ক্যাথেরিণের মৃত্যু হলে তিনি মিসেস পিয়ার্সের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন (১৮৪১ খৃঃ)। স্বদেশে যাবার সময়

জাহাজে ইয়েটস্‌-এর মৃত্যু হয় (১৮৪৫ খৃঃ)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৫২ বৎসর হয়েছিল।

ইয়েটস্‌-অনুবাদিত জ্যোতির্বিদ্যায় বক্তব্য বিষয় গুরু ও শিষ্যের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বর্ণিত। নাম জ্যোতির্বিদ্যা হলেও গ্রন্থটির অর্ধাংশ জুড়ে প্রাকৃতিক ভূগোল। আলোচ্য গ্রন্থে গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের ভাষা অন্যান্য বিদেশী লেখকদের তুলনায় অনেক প্রাঞ্জল। গ্রন্থটি মোট দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। দশটি কথোপকথন দশ অধ্যায়ে বিবৃত। বিভিন্ন কথোপকথনে শিষ্য প্রশ্নকর্তা এবং গুরু উত্তরদাতা। প্রথম কথোপকথনে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি এবং আকার ও পরিমাণের কথা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় কথোপকথনে আকর্ষণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। এই অধ্যায়ে গ্রহ, ধূমকেতু ও সূর্য সম্বন্ধে আলোচনা যায়গায় যায়গায় অবশ্য অসম্পূর্ণ; অন্যান্য গ্রহেও লোক আছে, এরূপ ইঙ্গিতও করা হয়েছে। কিন্তু এজন্যে তথ্যপ্রমাণের অবতারণা করা হয় নি। বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব বর্ণনায় কেপ্লারকে অনুসরণ করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে গ্রহদের দূরত্ব ও দীপ্তি, সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব নির্ণয়ের বিবরণ, বিষুবরেখা, দিবা-রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি, ঋতুর পরিবর্তন, জোয়ারভাঁটা, ধ্রুবতারা এবং গ্রহণ নির্ণয়ের উপায় আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভাষা প্রাঞ্জল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাহিনীর অবতারণা করায় আলোচ্য বিষয়ের দুরূহতা খানিকটা লাঘব হয়েছে। নানাপ্রকার উপমা দিয়ে বক্তব্য বিষয়কে সহজবোধ্য করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। অনুবাদক খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাসের পরিচয় গ্রন্থটির অনেক যায়গাতেই রয়েছে। এই বিশ্বাস কয়েকটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। তবে যায়গায় যায়গায় আলোচনা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও তথ্যপূর্ণ। কৌতূহল উদ্রিক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে শিষ্যের প্রশ্নের মধ্য দিয়ে। রচনার নিদর্শন :—

শিষ্য। আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, পৃথিবীর সমস্ত পার্শ্বেই লোক বসতি করে, অথচ স্ব ২ স্থান হইতে কেহই পড়ে না; ইহা আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি! এবং ইহাও শুনিয়াছি, যেখানে নগরপত্তন হয় না সেখানে জাহাজ যাইতে পারে; তবে গুরুত্বপ্রযুক্ত কেন অধোভাগের সমুদ্র হইতে জাহাজ নীচে না পড়ে, বরং জাহাজ ও সমুদ্রের জল এই উভই কেন না পড়ে?

গুরু। যাহাকে আমরা ভার বলি তাহা আকর্ষণশক্তির দ্বারা হয়। পৃথিবী আপন মধ্যভাগে চতুর্দ্দিগস্থ সকল বস্তুর পরমাণুকে সমান রূপে আকর্ষণ করে; অতএব যে বস্তুর মধ্যে বহুতর পরমাণু আছে আকর্ষণশক্তিদ্বারা তাহা গুরুতর ও দৃঢ়তর হয়। এই কারণ তাহারা অতিভারী আমরা বলি। পৃথিবীকে লৌহচূর্ণমধ্যে লুণ্ঠিত এক বৃহত্ গোলাকৃতি চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় তুলনা দেওয়া যায়, কেননা চুম্বকপ্রস্তর সকল লৌহচূর্ণকে চারিদিগে সমভাবে এইরূপে আকর্ষণ করে যে, নীচ ভাগ হইতে কিছুই খসিয়া পড়িতে পারে না; বরং সমান স্থান হইতে নিকটস্থ লৌহচূর্ণকে বিশেষ আকর্ষণ করে।

দুই

পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বাংলা ভূগোলগ্রন্থ রচনার সূত্রপাত করেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও উইলিয়ম হপ্‌কিন্স পিয়ার্স। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। গোলাধ্যায়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে তাঁর দান উপেক্ষণীয় নয়। পিতা ডাঃ জশুয়া মার্শম্যানের ন্যায় তিনিও ছিলেন সাহিত্য-সেবক। জন ক্লার্ক মার্শম্যান দিগদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করেন। তা' ছাড়া তিনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। কেরীর মৃত্যুর পর তিনি 'সমাচার-দর্পণ' পরিচালনা করেছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।[৪]

মার্শম্যানের গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা অতি সামান্যই আছে। প্রথম দিকের কিছু অংশ ছাড়া সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে আছে বিভিন্ন মহাদেশের রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা। এই গ্রন্থের প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা প্রাথমিক প্রকৃতির। মার্শম্যানের ভাষা নীরস; রচনাভঙ্গী কৃত্রিম। তবে গ্রন্থটিকে তিনি দেশীয় ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেছেন। সময় বোঝাতে দণ্ড এবং দূরত্ব বোঝাতে ক্রোশ শব্দ ব্যবহৃত

৪ শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস—বসন্তকুমার বসু, পৃঃ ১৯৯।

হয়েছে। প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থাদির সঙ্গে লেখকের পরিচয় ছিল বলে মনে হয়। গ্রন্থটির নামকরণও করা হয়েছে প্রাচীন গ্রন্থাদির নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। প্রাচীন গ্রন্থের মতামতও দু'এক যায়গায় ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন,

পৃথিবীর আকার

> কেহ বলেন যে পৃথিবী চতুষ্কোণা ও কেহ বলেন ত্রিকোণা কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থেতে কহেন যে পৃথিবী কদম্ব পুষ্পের মত গোলাকৃতি। এই প্রকার জ্যোতির্ব্বেত্তাদের কথা আমারদের কথার সহিত মিলে ও প্রমাণসিদ্ধও বটে।

মার্শম্যানের পর বাংলা ভাষায় ভূগোল রচনায় উদ্যোগী হলেন উইলিয়ম হপ্‌কিন্স পিয়ার্স। পিয়ার্সের 'ভূগোলবৃত্তান্ত' কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। যে কয়েকজন ইউরোপীয়কে কেন্দ্র ক'রে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত হয়েছিল, তাদের মধ্যে পিয়ার্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের বার্মিংহামে পিয়ার্সের জন্ম হয়। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষালাভ সমাপ্ত ক'রে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে শ্রীরামপুর মিশনে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেন। ভারতবর্ষে পৌছেই পিয়ার্স শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় মিঃ ওয়ার্ডের সহকারী হিসাবে কাজে যোগদান করেন। Calcutta Christian Observer-এর তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক। এই পত্রিকায় তিনি লিখতেনও। এ ছাড়া কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর ছিল নিবিড় সংযোগ। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির কিছু সংখ্যক বই মুদ্রণে পিয়ার্স সাহায্য করেন। ইয়েট্‌স্ ইংল্যাণ্ড গেলে (১৮২৮—১৮২৯) তিনি সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি সোসাইটির অর্থনৈতিক সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির কাজে তাঁর একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে সমিতির দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপতি স্যার এড্‌ওয়ার্ড রিয়ান (Sir E. Ryan) মন্তব্য করেছিলেন, "Not one moment did he deviate from the rules of the institution; devoutly pious as he was, he never swerved from them, and always opposed any violation

of them."[৫] ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কলেরা রোগে কলিকাতায় পিয়ার্সের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির অর্থনৈতিক সম্পাদক ছিলেন। ভূগোলবৃত্তান্ত ছাড়াও বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে পিয়ার্সের আর একটি স্মরণীয় অবদান পশ্বাবলী—১ম পর্যায়ের বিভিন্ন সংখ্যাগুলোর বঙ্গানুবাদ। এ ছাড়া বিজ্ঞানবিষয়ক বই (Scientific Copy-books) নকল করিয়ে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি এদেশীয় ছাত্রদের অনুরাগ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। ভূগোলবৃত্তান্তের অধিকাংশ অংশই এ ধরণের শিক্ষামূলক কপি-বইয়ের আকারে বেরিয়েছিল।

ভূগোলবৃত্তান্ত মোট ছয় ভাগে বিভক্ত। এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত প্রতিটি ভাগ বারটি ক'রে অধ্যায় বা পাঠে বিভক্ত। ষষ্ঠ ভাগের পাঠসংখ্যা পনের। প্রতিটি পাঠে তিনটি ক'রে অংশ। প্রথমে বলা হয়েছে মূল বক্তব্য। এরপর "বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর" এই শিরোনামা দিয়ে মূল বক্তব্যকে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বশেষে কঠিন শব্দগুলির অর্থ দেওয়া আছে। ভূগোলবৃত্তান্তে জোর দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক ভূগোলের ওপরেই। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা মোটামুটি তথ্যপূর্ণ ও বিস্তারিত। এখানে পৃথিবীর গোলত্ব, পরিমাণ, গতি, মহাদ্বীপ, দ্বীপ, মহাসাগর, হ্রদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভাগের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ রাজনৈতিক ভূগোল। চতুর্থ ভাগে মুখ্যতঃ ইতিহাস। ভূগোলবৃত্তান্ত অবশ্য উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ নয়। গ্রন্থটির ভাষায়ও কৃত্রিমতা রয়েছে।

এই যুগের আর একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞানগ্রন্থ পিয়ার্সনের 'ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন'। গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে। মার্শম্যানের গোলাধ্যায় এবং পিয়ার্সের ভূগোল থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে এ বইটি রচিত হয়। তবে এ বইয়ের নূতনত্ব হোল এই যে, এখানে কথোপকথনের মাধ্যমে বক্তব্য বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৫ Calcutta School Book Society's 12th Report (1840)—P. iv.

গ্রন্থটির লেখক জন পিয়ার্সন ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। লণ্ডন মিশনারীতে যোগ দেবার পর তাঁর এ দেশে আসা স্থির হয়। চুঁচুড়া অঞ্চলের স্কুলসমূহে মিঃ মে'র কাজে সাহায্য করবার জন্যে পিয়ার্সন ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এলেন। তাঁর কর্মস্থল ছিল চুঁচুড়া। সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ধরে তিনি ঐ অঞ্চলে শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচার করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। ঐ বৎসরের ৮ই নবেম্বর কলিকাতায় পিয়ার্সনের মৃত্যু হয়।

পিয়ার্সনের গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা অতি সামান্যই আছে। বস্তুতঃ লেখক রাজনৈতিক ভূগোলের ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থটি মোট ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে পৃথিবীর আকার ও আয়তন এবং জল-স্থল সম্বন্ধে আলোচনা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম ভাগে রাজনৈতিক ভূগোল। চতুর্থ ভাগে ইতিহাস। ষষ্ঠ ভাগের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান। এই ভাগে সৌরজগৎ, ধূমকেতু, গ্রহণ, তারা, জোয়ার-ভাঁটা, উল্কা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা। এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির হলেও তথ্যপূর্ণ।

পিয়ার্সনের রচনাভঙ্গী পরিচ্ছন্ন। ভাষা প্রাঞ্জল। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের পরিচয় গ্রন্থটির অনেক যায়গাতেই সুস্পষ্ট। যায়গায় যায়গায় সুন্দর উদাহরণ গ্রন্থটির আর একটি বৈশিষ্ট্য। রচনার নিদর্শন :—

নিত্যানন্দ। ভাল ; একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সাগরের জল যে লোণা ইহাতে কি উপকার হয় ?

পরমানন্দ। ইহাতে অনেক ২ উপকার দর্শে, যদি সাগরের জল এমন লোণা না হইত তবে অন্ধ পুষ্করিণীর জলের মত সকল জলই পচিয়া দুর্গন্ধ হইত, আর জলের যত মৎস্য তাহা অতি শীঘ্র মরিয়া যাইত। আর লোণা জলে অধিক ভার সহে ; অর্থাৎ লোণা জলেতে একখানি নৌকার ডালি সমান বোঝাই দিলে সে নৌকা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, কিন্তু মিঠানি জলে তেমন করিয়া লইয়া যাইতে হইলে দশ হাত না যাইতে ২ অমনি হঠাৎ ডুবিয়া পড়ে ; কেননা মিঠানি জল তরল এ জন্যে বড় ভার সহিতে পারে না ; ইহার এই একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলি শুন, যে মিঠানি জলে কোন একটা পক্ষীর ডিম্ব ফেলিয়া দেখ, অমনি শীঘ্র

ডুবিয়া যাইবে, আর সেই জলেতে খানিক লবণ মিশাইয়া সেই ডিম্ব ফেলিয়া দেখ, কখন ডুবিবে না, ভাসিবে।

নিত্যানন্দ। ভাল, পৃথিবী মণ্ডলের যে এত ভাগ জল ইহাতেই বা কি উপকার? তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও।

পরমানন্দ। ইহাতে উপকার এই, তাহারি কতক জল সূর্য্যতেজে উর্দ্ধ আকৃষ্ট হইয়া মেঘের সৃষ্টি হয়, সেই মেঘ বায়ুতে চালন করিয়া নিয়া নানা স্থানে ফেলে, তাহাতে সর্ব্ব দেশে বৃষ্টি হয়। আর যখন বাতাসে মেঘ উড়াইয়া লইয়া যায়, তখন পর্ব্বত সকল উচ্চ এই জন্যে মেঘ গিয়া তাহাতে বদ্ধ হয়; সেই নিমিত্তে পর্ব্বতে বৃষ্টি অধিক হয়, ও অধিক শিশির পড়ে। সেই বৃষ্টির জলেতে পর্ব্বত হইতে নদী বাহির হয়, ক্রমেতে নদী সকলের বৃদ্ধি হওয়াতে খাল সকল পূরিয়া উঠে, তাহাতে জীব সকলের উপকারের সীমা নাই। আরও দেখ, সাগরের উপর দিয়া যাতায়াত থাকাতে অশেষ বিশেষে সকল দেশের বৃত্তান্ত জানা যায়, ও তাহাতে নানা বাণিজ্য চলে। এরূপ অনেক প্রকারে লোকদের অনেক ২ উপকার হয়।

পিয়ার্স ও পিয়ার্সনের গ্রন্থদ্বয়ের পরিকল্পনায় সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় গ্রন্থকারই প্রাকৃতিক ভূগোল অপেক্ষা রাজনৈতিক ভূগোলের আলোচনার ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। তবে পিয়ার্সের গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত।

এই যুগে হিন্দু কলেজের উদ্যোগেও ভূগোল রচিত হয়েছিল। 'শিশুসেবধি—ভূগোলসূত্র' হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষদের আদেশে পাঠশালার ছাত্রদের জন্যে রচিত হয়। শিশুসেবধি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৪৭ সালে (১৮৪০ খৃঃ)। সংক্ষিপ্ত হলেও এই গ্রন্থে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। শিশুসেবধির ভাষা বেশ সরল; তথ্যসমাবেশ একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির। এ ছাড়া ক্ষেত্রমোহন দত্ত হিন্দু কলেজ পাঠশালার জন্যে একটি ভূগোল (১৮৪০ খৃঃ) লিখেছিলেন।

প্রাকৃতিক ভূগোল বা ভূ-বিদ্যাকে বিষয়বস্তু ক'রে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ এই যুগে রচিত হয় নি। কোনো কোনো ভূগোলে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক দু'একটি প্রসঙ্গও রয়েছে। তবে এই যুগের সবগুলো ভূগোল-গ্রন্থেই

আলোচিত হয়েছে মুখ্যতঃ রাজনৈতিক ভূগোল। এইভাবে রাজনৈতিক ভূগোল আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূ-বিদ্যা বিষয়ক আলোচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

তিন

বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার প্রথম কৃতিত্ব উইলিয়ম কেরীর পুত্র ফেলিক্স্ কেরীর। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ফেলিক্স্ কেরীর জন্ম হয়। মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে কলিকাতা এসেছিলেন। এদেশে আসবার কিছুকাল পর থেকে ফেলিক্স্ কেরী বাংলা শিখতে লাগলেন রামরাম বসুর কাছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের ছাপখানায় তিনি ওয়াডের সহকারী হিসাবে কাজে যোগদান করেন। ঐ বৎসরেই উইলিয়ম কেরী তাঁকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। কিন্তু ধর্মপ্রচারে কোনোদিনই ফেলিক্স্-এর মন বসে নি। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ধর্মপ্রচার উপলক্ষ্য ক'রে তিনি রেঙ্গুন যাত্রা করলেন। বর্মায় গিয়ে ফেলিক্স্ কেরী প্রধানতঃ ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিছুকাল পর বর্মার রাজা কর্তৃক তিনি রাজদূত নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বর্মার রাজার সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয়। এজন্যে ফেলিক্স্-এর খামখেয়ালীপনা ও অমিতব্যয়িতাই দায়ী। বর্মা ত্যাগ ক'রে তিনি কিছুকাল ধরে ভারতবর্ষের পূর্ব অঞ্চলের অরণ্যবাসীদের মধ্যে যাযাবরের ন্যায় জীবনযাপন করেন। অবশেষে ওয়ার্ডের চেষ্টায় তিনি শ্রীরামপুরে ফিরে এলেন। এবার তিনি পুরাপুরিভাবে সাহিত্য-চচায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। ফেলিক্স্ কেরীর মৃত্যুর পর ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'য় মন্তব্য করা হয়েছিল, "The death of this individual will be considered as a great loss by those who are labouring in the intellectual and moral cultivation of India." উপন্যাসের নায়কচরিত্রের মতো বৈচিত্র্যময় জীবনের অধীশ্বর ফেলিক্স্ কেরী। তাঁর জীবন ছিল গতিময়; চিন্তাধারা ছিল চঞ্চল। এই চাঞ্চল্যই তাঁর জীবনকে এক একবার উদ্দাম ক'রে তুলেছে। কখনও তিনি রাজদূত; আবার কখনও তিনি ধর্মযাজক। কখনও তিনি নিবিষ্টচিত্ত সাহিত্যসেবী; আবার কখনও তিনি গহন

অর্থাৎ

ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদি মূলগ্রন্থাবলী

OR,

BENGALEE ENCYCLOPÆDIA,

BEING

A SERIES OF

Elementary Works on the Arts and Sciences.

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-গ্রন্থ 'বিদ্যাহারাবলী'র নামপত্রের অংশবিশেষ।

দিগ্দর্শন.

নবম ভাগ.

অয়কান্ত অথবা চুম্বকমণি.

চুম্বকমণি এক প্রকার লৌহ; তাহার আশ্চর্য্য যেং গুণ তাহার স্থূল বিবরণ শুন.

যদি চুম্বকমণি কোন লৌহের অথবা ইস্পাতের নিকটবর্ত্তী হয়, তবে সেই লৌহ চুম্বকমণির অভিমুখে আইসে; এবং যদি আর কোন ব্যবধান না থাকে তবে সে মণি ও সে লৌহ কিম্বা সে ইস্পাত উভয়ে একত্র। লাগিয়া, পুনর্ব্বার পৃথক্ করিতে বল অপেক্ষা করে.

চুম্বকমণিতে সৃষ্ট লৌহশিক যদি এমত রাখা যায়, যে সে মধ্য দেশে বদ্ধ থাকে অথচ চতুর্দ্দিকে অবাধে ঘোরে, তবে কতক ক্ষণ পরে সে এই মত স্থির হইয়া থাকিবেক যে এক মুখ উত্তর দিকে ও অন্য মুখ দক্ষিণ দিকে হইবে. এই তাহার যে দুই মুখ তাহার নাম সে চুম্বকলৌহের দুই কেন্দ্র, যেহেতুক সে দুই মুখ পৃথিবীর দুই কেন্দ্রের অভিমুখে থাকে এই চুম্বকমণির উত্তর দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া থাকা যে স্বভাবসিদ্ধ গুণ তাহার নাম কেন্দ্রাভিমুখ্য. মনির যে কেন্দ্রাভিমুখ্য স্বভাব তাহার মধ্যে দুই আশ্চর্য্য বিশেষ গুণ আছে

'দিগদর্শন' পত্রিকার একটি পৃষ্ঠা। এই পত্রিকাতেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত হয়।

অরণ্যচারী চঞ্চল যাযাবর। তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলো এজন্যে কিছুটা দায়ী। প্রথমা স্ত্রী মার্গারেটের মৃত্যু, শিশুপুত্র ও কন্যাসহ নদীগর্ভে দ্বিতীয়া স্ত্রীর সলিলসমাধি এবং বর্মার রাজার সঙ্গে বিরোধ এজন্যে কতক পরিমাণে দায়ী হলেও দুঃসাহসের বীজ ছিল তাঁর রক্তের মধ্যে। 'বিদ্যাহারাবলী' রচনার মধ্যেও সেই দুঃসাহসের প্রয়াসই নিহিত। তখনকার যুগে এরূপ এক বিরাট গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়ে তিনি যে সাহস ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা' ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে (১২২৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাহারাবলীর বিভিন্ন খণ্ড প্রথমে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। পরে বিভিন্ন খণ্ড (১৬ সংখ্যা) একত্র ক'রে প্রকাশ করা হয়। *

বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া লিখবার পরিকল্পনা নিয়েই ফেলিক্‌স্ কেরী বিদ্যাহারাবলী রচনায় হাত দিয়েছিলেন। সংজ্ঞা ও পরিভাষা ব্যবহারের অসুবিধার জন্যে প্রথমে ব্যবচ্ছেদবিদ্যা (Anatomy) রচিত হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থটি বিদ্যাহারাবলীর পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থ। বিদ্যাহারাবলী-ব্যবচ্ছেদবিদ্যার বিষয়বস্তু ফেলিক্‌স্ কেরী কর্তৃক পঞ্চম সংস্করণ 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' থেকে বাংলায় অনুবাদিত হয়েছিল। অনুবাদে সাহায্য করেছিলেন উইলিয়ম কেরী। পরিভাষার ব্যবহারে ও গ্রন্থরচনায় সাহায্য করেছিলেন যথাক্রমে শ্রীকান্ত বিদ্যালংকার ও কবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি। গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে। ফেলিক্‌স্ কেরীর ইচ্ছে ছিল, জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে রসায়নবিদ্যা, ঔষধ-চিকিৎসাবিদ্যা, অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে ক্রমশঃ গ্রন্থ প্রকাশ করবার। বিদ্যাহারাবলীর শেষদিকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে ফেলিক্‌স্ কেরীর একটি পত্র আছে। ঐ পত্রে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,

> "যাহারা বিদ্যাভ্যাসে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা ঐ সাহেবানেরদের এবং এতদ্দেশীয় অন্য ২ ভাগ্যবান এবং বিশিষ্ট লোকেরদিগের আয়োজনদ্বারা এবং গ্রন্থদ্বারা নানা বিদ্যার আদি প্রকরণ জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানেতে পণ্ডিত হইলে অবশ্য তদগ্রন্থের সমস্ত মূলগ্রন্থ জ্ঞানেচ্ছুক হইবেন অতএব তাঁহার-

> দিগের জ্ঞান অধিকরূপে বর্দ্ধিত হয় এতৎপ্রযুক্ত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য-তাবদায়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদি গ্রন্থাবলী ছাপারম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অধিকন্তু যাহারা বহুকালাবধি ইউরোপজাতিরদিগের নানা জ্ঞান এবং বিদ্যা দেখিয়া অতি চমৎকৃত হইয়া সে সকল জ্ঞান এবং সে সকল বিদ্যা কিরূপে এবং কিপ্রকার প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই অথচ স্বদেশীয় সর্ব্বশাস্ত্রেতে বিজ্ঞ হওনান্তর অন্য ২ ইউরোপজাতীয় বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক হইয়াছেন তাঁহারদিগের জ্ঞানবর্দ্ধনার্থে এবং অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদিদেশেতে ইউরোপীয় তাবদায়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদিবর্দ্ধনার্থে এবং তাবদ্বিষয়ের আদ্যোপান্তকারণ-জ্ঞাপনার্থে এই বিদ্যাগ্রন্থ সমস্ত ক্রমেতে তর্জ্জমা হইয়া ছাপা হইবে।"

বিদ্যাহারাবলী-ব্যবচ্ছেদবিদ্যার বিষয়বস্তু দুই অংশে বিভক্ত। এক একটি অংশের নাম কাণ্ড। প্রথম কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। দ্বিতীয় কাণ্ডে বিভিন্ন জন্তুর শারীরবিজ্ঞান ও ব্যবচ্ছেদ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা। এক একটি কাণ্ড কয়েকটি ক'রে খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডে অধ্যায় বিভাগ রয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায় আবার কয়েকটি ক'রে প্রকরণে বিভক্ত। প্রথম কাণ্ডের প্রথম খণ্ডে অস্থিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা তথ্যবহুল। দ্বিতীয় খণ্ডে চর্ম, নখ ও কেশের বর্ণনার পর শরীরের বিভিন্ন মাংসপেশী সম্বন্ধে আলোচনা। প্রথম কাণ্ডের পরবর্তী খণ্ডগুলিতে উদর, প্লীহা, ফুস্‌ফুস, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে সারগর্ভ ও বিস্তৃত আলোচনা। দ্বিতীয় কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় তুলনামূলক ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। এই কাণ্ডের ভূমিকায় বিভিন্ন জীবের মধ্যে তুলনা ক'রে ব্যবচ্ছেদবিদ্যা শিক্ষার উপযোগিতা বর্ণিত হয়েছে। পৃথক পৃথক বর্গের জন্তুদের ব্যবচ্ছেদবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা তথ্যপূর্ণ। এই কাণ্ডের বিভিন্ন খণ্ডে জীবের গঠনবৈচিত্র্য ও স্বভাবের তুলনামূলক আলোচনায় এবং জীবের বর্গবিভাগ সম্বন্ধীয় আলোচনায় সুপরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি খণ্ডে বিভিন্ন জীবের ব্যবচ্ছেদ-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

বিদ্যাহারাবলীতে ব্যবহৃত পরিভাষা ও সংজ্ঞায় সংস্কৃতের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। অস্থি ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ শব্দই বিভিন্ন সংস্কৃত কোষগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। সংজ্ঞার গঠনেও অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি সংস্কৃতের

সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত-প্রভাবিত সংজ্ঞার নমুনা :—উদরের সংজ্ঞা —"ব্যবচ্ছেদকেরা বক্ষোস্থ্যগ্রাবধি গাত্রাংশাধঃ পর্যান্ত স্থানের উদর অর্থাৎ অধউদর সংজ্ঞা করিয়াছেন।"

ফেলিক্স্ কেরীর রচনা তথ্যবহুল। অস্থি ও শারীরবিজ্ঞানে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় গ্রন্থের সর্বত্রই সুপরিস্ফুট। কিন্তু ফেলিক্স্-এর ভাষা দুরূহ ও দুর্বোধ্য। রচনায় তথ্যাদির অভাব নেই। কিন্তু সেই রচনা কোথাও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে নি। সন্ধি ও সমাসবহুল ভাষা এবং জটিল প্রকাশভঙ্গী তাঁর রচনাকে দুর্বোধ্য ক'রে তুলেছে। রচনার নিদর্শন স্বরূপ নাড়ী সম্পর্কে আলোচনার একটি অংশ :—

> প্রত্যেক রক্তপ্রবাহক নাড়ীর গাত্রাংশ সমান হওন পূর্ব্ব স্থানে শলাকাকার অর্থাৎ তদ্গাত্রাংশের তাবদ্দ্রাঘিমাতে সমমান জানিবেন তদ্ব্যবস্থানুসারে রক্তপ্রবাহক নাড়ীর তাবচ্ছাখা এবং উপশাখা ব্যবস্থিতা। কিন্তু সে যাহা হউক ইহা অনুমান হয় যে রক্তপ্রবাহক নাড়ীর প্রত্যেক গাত্রাংশ তত্তদ্গাত্রাংশ হইতে নির্গত পৃথক ২ সম্মিলিত শাখা হইতে ন্যূন রক্ত ধারণ করে এবং সে সমস্ত শাখা তত্তদুপশাখা হইতে নির্গতা অন্য ক্ষুদ্র ২ শাখা হইতেও ন্যূন রক্ত ধারণ করে। রক্তাবাহক নাড়ীরও ঐ ব্যবস্থা জানিবেন যেহেতুক ঐ রক্তাবাহক নাড়ীর শাখা এবং উপশাখা একত্র করিয়া মাপিলে তত্তদ্গাত্রাংশ হইতে অতিবৃহৎ হয়।"

এই যুগে প্রাণীবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক প্রকৃতির আলোচনা পাওয়া যায় লোসন-সংকলিত ও পিয়ার্স-অনুবাদিত 'পশ্বাবলী'তে। গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পশ্বাবলীর প্রথম ছয়টি সংখ্যার সংকলন হোল এই গ্রন্থটি। সংখ্যাগুলি ইতিপূর্বে মাসিক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পশ্বাবলীর সংকলক জন লোসন ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন। এদেশে এসে কিছুকাল নানাবিধ অশান্তিতে কাটাবার পর অবশেষে তিনি ধর্মযাজকের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর অবসর সময়ের অনেকটাই শিক্ষাদানে ও বিজ্ঞানচর্চায় ব্যয়িত হোত। প্রাকৃতিক ইতিহাস (Natural History) ছাড়াও ভূতত্ত্ব এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। উদ্ভিদ-

বিজ্ঞানে তিনি মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ আর্টিষ্ট ও সঙ্গীতজ্ঞ। লোসন কিছু সংখ্যক ইংরেজী কবিতাও লিখেছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

পশ্বাবলী—১ম খণ্ড কয়েকটি সংখ্যা বা ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি বিভাগ কয়েকটি ক'রে অধ্যায়ের সমষ্টি। প্রথম সংখ্যার আলোচ্য বিষয় 'সিংহের বিবরণ ও শৃগালের বৃত্তান্ত'। প্রথম সংখ্যা—প্রথম অধ্যায়ে সিংহের আকারাদি আলোচনা প্রসঙ্গে সিংহের জন্মস্থান ও বাসস্থান সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে সিংহের শক্তি ও কৃতজ্ঞতার কথা কয়েকটি কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণিত; কাহিনীগুলির বর্ণনাভঙ্গী সরল। চতুর্থ অধ্যায়ে সিংহের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গেও কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সিংহ সম্পর্কে নীতিকথামূলক দু'টি উপাখ্যান রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে আছে উপদেশ। শৃগালের বৃত্তান্ত কবিতা দিয়ে সুরু:—

প্রতারণাকারী সেই সর্ব্বদা সত্বর।
ইহাতে বঞ্চক নাম বলে কবিবর॥

ভালুকের বিবরণ দু' ভাগে বিভক্ত। নীললোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ আর শুক্লবর্ণ। উপাখ্যান ও উপদেশ এখানেও রয়েছে। তা' ছাড়া রয়েছে সত্য ঘটনাশ্রিত কয়েকটি কাহিনী। কাহিনীগুলি গল্পের মতো সুখপাঠ্য। পরবর্তী বিভাগগুলিতে হাতী, গণ্ডার ও জলহস্তী এবং বাঘ ও বিড়াল সম্বন্ধে আলোচনা। এখানেও আলোচনার প্রাণকেন্দ্র গল্পরস। বস্তুতঃ সমগ্র গ্রন্থ জুড়েই গল্পরসের প্রাধান্য। সেই তুলনায় বৈজ্ঞানিক তথ্যের একান্ত অভাব। তবে গ্রন্থটির ভাষা আগাগোড়াই প্রাঞ্জল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পশ্বাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ্রন্থটির তত্ত্বাবধান করেন এবং পণ্ডিত তারাশংকর বইটি নতুন ক'রে লেখেন।

চার

গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল ও জীববিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি ছাড়া এ যুগের দু' একটি গ্রন্থে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা

পাওয়া গেল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একাধিক দিক নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় নামক গ্রন্থে এবং পিয়ার্সনের ভূগোল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথনে। কিন্তু এই প্রয়াস ইয়েটস্-এর পদার্থবিদ্যাসার-এ আরও বিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত। তা' ছাড়া এই যুগের দু' একটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থে অপরাপর প্রসঙ্গের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনাও পাওয়া যায়।

রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থে অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে গণিত ও ভূগোল বিষয়ক আলোচনাও কিছু কিছু রয়েছে। গণিতের প্রসঙ্গ অকিঞ্চিৎকর। ভূগোল নিয়ে আলোচনাও যৎসামান্য এবং তা' পুরাণ-নির্ভর। এই আলোচনায় রয়েছে রাধাকান্তের জীবন-সংস্কৃতিরই ছাপ। ভূগোলের আলোচনায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির একান্ত অভাব। রাধাকান্তের গদ্যে ছেদচিহ্নের ব্যবহার যথাযথ নয়; কমার ব্যবহার একেবারেই নেই। রাধাকান্তের রচনারীতিও প্রাঞ্জল নয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে রাধাকান্তের অবদান প্রধানতঃ কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিকে কেন্দ্র ক'রে। তিনি ছিলেন স্কুল বুক সোসাইটির সভ্য; তা' ছাড়া নানাভাবে সোসাইটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বই তিনি অনুবাদ এবং সংশোধন করেছিলেন। Easy Introduction to Astronomy-বইটির বঙ্গানুবাদ তিনি সংশোধন করেন। স্কুল বুক সোসাইটির বইগুলি এক সময়ে তাঁর বাড়ী থেকেই বিলি করা হোত। সোসাইটির বইগুলি জনসাধারণ ও শিক্ষকদের মধ্যে যথোপযুক্তভাবে বিলির ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রাঞ্জল ও সর্বজনবোধ্য আলোচনা পাওয়া গেল উইলিয়ম্ ইয়েট্স্-এর পদার্থবিদ্যাসার-এ (প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খৃঃ)। "পদার্থবিদ্যাসার, অর্থাৎ বালকদিগের জন্য পদার্থবিদ্যাবিষয়ক কথোপকথন Elements of Natural Philosophy and Natural History." গ্রন্থটির প্রকাশক কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। পদার্থবিদ্যাসারের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে। নাম পদার্থবিদ্যাসার হলেও একে পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত করা যায় না। কারণ, এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়-বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রধানতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল ও ভূ-বিজ্ঞান এবং জীব,

শারীর ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক প্রসঙ্গ। বরং আজকের দিনে পদার্থবিজ্ঞান বলতে যা' বুঝায়, অর্থাৎ জড়ের বিভিন্ন ধর্ম বা তাপ, আলো, শব্দ, বিদ্যুৎ ও তড়িতের প্রসঙ্গ, তা' নিয়ে আলোচনা এই গ্রন্থে প্রায় নেই বললেই হয়। সমগ্র গ্রন্থটি গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে রচিত। মোট চৌদ্দটি কথোপকথন এতে আছে। বিভিন্ন কথোপকথনের আলোচ্য বিষয় গ্রহ, বায়ু, বাষ্প, বৃষ্টি, পৃথিবী, মানুষ, পশুপক্ষী, পতঙ্গ, কৃমি, বৃক্ষ ও পুষ্প, খনিজদ্রব্য ও বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন দ্রব্য। দু' একটি কথোপকথনে শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। যেমন, ৫ম কথোপকথন ; এতে তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে মানব-শরীরের বহিরঙ্গ নিয়ে আলোচনা, দ্বিতীয় ভাগে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি। তৃতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয়-দর্শন (আত্মা)। এই শ্রেণীবিভাগে একটি পরিকল্পনার ইঙ্গিত রয়েছে। তা' হোল এই যে, লেখক দৃশ্য থেকে ধীরে ধীরে অদৃশ্য জগতের আলোচনায় এগিয়েছেন। জীববিজ্ঞান (৫ম—১০ম কথোপকথন) বিষয়ক আলোচনায়ও সুপরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ নিয়ে এই আলোচনা সুরু ; আর নিকৃষ্ট প্রাণী কৃমি নিয়ে এই আলোচনার সমাপ্তি। গ্রন্থটিতে তথ্যসমাবেশ উচ্চাঙ্গের নয়। আবার তৎকালীন যুগের বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অগ্রগতির দিক থেকে বিচার করলে একেবারে প্রাথমিক প্রকৃতির পর্যায়েও একে ফেলা যায় না। ইয়েটস্-এর রচনায় ভগবৎবিশ্বাস বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে দু'এক যায়গায় আচ্ছন্ন করেছে। তথ্যসমাবেশেও যায়গায় যায়গায় ভুলভ্রান্তি এসে গেছে। ইয়েটস্ বিজ্ঞানবিষয়ক বিদেশী শব্দগুলি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তা' ছাড়া দূরত্ব, সময় ইত্যাদি বোঝান হয়েছে এদেশীয় রীতিতে (ক্রোশ, দণ্ড)। গ্রন্থটির ভাষা প্রাঞ্জল ও জড়ত্বহীন। রচনার নিদর্শন : পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনা—

শিষ্য। পৃথিবীর সৃষ্টি হইল কেন ?

গুরু। প্রাণিবর্গের বসতির নিমিত্তে। পৃথিবীর অন্তরে ও উপরে লক্ষ ২ প্রাণী বসতি করিয়া সুখী হইবে এই জন্যে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল।

শিষ্য। পৃথিবী কিসের উপরে স্থাপিত আছে ?

গুরু। কোন বস্তুর উপরে পৃথিবী স্থাপিত নয়, কেননা তাহা হইলে পৃথিবীর গমন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? এই জন্যে প্রাচীন লোকেরা বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর পৃথিবীকে শূন্যভাগে রাখিয়াছেন।

শিষ্য। তবে আমাদের বসতিস্থান যে পৃথিবী সে কি শূন্যে ভ্রমণ করে?

গুরু। হাঁ, কেবল পৃথিবী নয়, গ্রহগণও শূন্যে ভ্রমণ করে।

শিষ্য। আঃ মহাশয়, যে শক্তিদ্বারা এই সমস্ত সৃষ্ট হইয়া প্রথমাবধি প্রচলিত হইয়া এই কাল পর্য্যন্ত স্ব ২ পথে রক্ষিত আছে সে শক্তি কি আশ্চর্য্য!

গুরু। পরমেশ্বর নিজশক্তিদ্বারা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া আপন বুদ্ধির কৌশলে আকাশ বিস্তার করিয়া তন্মধ্যে তাহাকে স্থাপিত করিলেন।

শিষ্য। এই পৃথিবীর কত ভাগ আছে?

গুরু। জলময় ও ভূমিময় এই দুই ভাগ আছে।

শিষ্য। ভাল মহাশয়, এই পৃথিবী পর্ব্বত উপপর্ব্বতাদিবিহীন হইয়া যদি বিস্তারিত হইত তবে কি দেখিতে অধিক সুন্দর হইত না? এখন এই সমস্ত পর্ব্বতাদিদ্বারা তাহার কি সৌন্দর্য্যের অল্পতা হয় নাই?

গুরু। না, কেননা কৃত্রিমভূগোলের উপর যেমন ধূলিকণিকা থাকে, কিম্বা নারঙ্গ লেবুর উপরে যেমন উচুনীচ স্থান থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীর উপরে ঐ পর্ব্বতাদি আছে। অতএব এই সমস্ত ক্ষুদ্রবস্তুদ্বারা কি পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের হানি হইতে পারে? তোমরা এমন জ্ঞান কর? পর্ব্বত না থাকিলে উন্থই বা নদনদী হইত না, কেননা বাষ্প ও বৃষ্টি ও বরফ ইত্যাদি পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করাতে নদনদী জন্মে; এবং পর্ব্বত হইতে সর্ব্ব ধাতু ও শ্বেতপ্রস্তর ও মণিমাণিক্যাদি জন্মে; বিশেষতঃ পর্ব্বতের এমন গুণ আছে, যে মেঘসমস্তকে আকর্ষণ করে, এবং নিকটস্থ নিম্নভূমি সমস্তকে হিমবাতাস হইতে রক্ষা করে।

শিষ্য। বালুকাময় পর্ব্বতে কোন বস্তুই জন্মে না তবে তাহাতে ফল কি?

গুরু। ফল আছে, তাহাদ্বারা সমুদ্রের ঢেউ নিম্নভূমিতে উঠিতে পারে না। একথা আমাদের বিবেচনার যোগ্য বটে, কেননা দেখ যে বালুকা ফুংকারদ্বারা উড়িয়া যায় এমন ক্ষুদ্র বস্তু একত্র হইয়া এমত দৃঢ় পর্ব্বত হয় যে তাহাতে সমুদ্রের ঢেউ বেগে লাগিলেও তাহার কিছু হানি হয় না, এবং সমুদ্র উথলিলেও তাহা লঙ্ঘন করিয়া জল যাইতে পারে না।

শিষ্য। পৃথিবীর মধ্যভাগ ও অন্তভাগ দুই কি এক প্রকার ?

গুরু। না, একপ্রকার নয়, কেননা পৃথিবীর মধ্যে স্বুবর্ণ, রজত, তাম্র, দস্তা, সীসক, লৌহ প্রভৃতি অনেক ধাতু আছে।

শিষ্য। ধাতু সমস্ত মৃত্তিকার মধ্যে থাকে কেন ?

গুরু। তাহা হইতে যেন কৃষিকর্ম্মের কোন বাধা না জন্মে এই জন্যে মৃত্তিকা মধ্যে থাকে।

শিষ্য। ধাতু ব্যতিরেক আর কোন বহুমূল্য বস্তু পৃথিবীতে আছে কি না ?

গুরু। হাঁ, পারা, ও খড়ি, ও গন্ধক, ও চূর্ণ, ও লবণ, ও ইট, ও কাচমৃত্তিকা, ইত্যাদি বস্তু তদ্ভিন্ন প্রস্তর ও শ্বেতপ্রস্তর, ও স্ফটিক, ও হীরক, এবং যাহা দ্বারা সমুদ্রগমনের পরম উপকার হয় এমন চুম্বক প্রস্তর ইত্যাদি আছে।

পাঁচ

গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান ইত্যাদির ন্যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম রসায়নবিজ্ঞান রচনার কৃতিত্বও ইউরোপীয়দের প্রাপ্য। বাংলায় রসায়নবিজ্ঞানের প্রথম বই জন ম্যাকের 'Principles of Chemistry' বা 'কিমিয়াবিদ্যার সার' ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুর প্রেসে। গ্রন্থকার জন ম্যাক শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ স্কটল্যাণ্ডে জন ম্যাকের জন্ম হয়। শৈশবেই তিনি পিতাকে হারান। তাঁর মায়ের ইচ্ছে ছিল, পুত্রকে ধর্মযাজক করবার। কৈশোরের পাঠ শেষ ক'রে ম্যাক এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করবার সময়েই তাঁর মনে স্বাধীন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার উদয় হয়েছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মিঃ ওয়ার্ড শ্রীরামপুর কলেজের জন্যে একজন সুযোগ্য অধ্যাপকের সন্ধানে ইংল্যাণ্ড গেলেন। মিঃ ম্যাককে এই পদের জন্যে মনোনীত করা হোল। ম্যাক ১৮২১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষে এলেন। এদেশে এসেই তিনি শ্রীরামপুর কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরম নিষ্ঠাসহকারে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ধরে তিনি এই দায়িত্ব-ভার পালন করেছিলেন। ভারতবর্ষে পদার্পণের অল্পকালের মধ্যেই ডাঃ

ELEMENTS

OF

NATURAL PHILOSOPHY

AND

NATURAL HISTORY,

IN

A Series of Familiar Dialogues.

DESIGNED FOR THE INSTRUCTION OF INDIAN YOUTH.

BY

WILLIAM YATES.

SECOND EDITION.

পদার্থবিদ্যাসার।

অর্থাৎ

বালকদিগের পদার্থশিক্ষার্থে কথোপকথন।

Calcutta:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS, AND SOLD AT THE DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD

1834

আদিপর্বের একটি উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান-গ্রন্থ, ইয়েট্স্‌ লিখিত 'পদার্থবিদ্যাসার' এর নামপত্র।

PRINCIPLES OF CHEMISTRY.

BY

JOHN MACK,

OF SERAMPORE COLLEGE.

VOL. I.

কিমিয়া বিদ্যার সার।

শ্রীযুত জান মাক সাহেব কর্ত্তৃক।

রচিত হইয়া

গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইল।

প্রথম খণ্ড।

FROM THE SERAMPORE PRESS.

1834.

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম রসায়নবিজ্ঞান, ম্যাকের
'কিমিয়া বিদ্যার সার'-এর নামপত্র

কেরী ও তাঁর অনুচরদের সঙ্গে ম্যাকের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। নানাবিষয়ে কেরী ও তাঁর অনুচরদের তিনি সাহায্য করেছেন। ম্যাকের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে উইলিয়ম কেরী লিখেছেন, He was a well read classic, and an able mathematician, and there were few branches of natural science in which he was not at home, and in which he did not succeed in keeping himself up to the level of modern discoveries.[৬] ডাঃ কেরী রসায়নবিদ্যায় জন ম্যাকের বিশেষ পাণ্ডিত্যের কথা বলেছেন, He was especially attached to the sciences of Chemistry, which he had cultivated with success under the most eminent professors in London. ধর্মপুস্তক পাঠে এবং ধর্মপ্রচারে তাঁর নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। তাঁর অবসর সময়ের অধিকাংশই ধর্মচিন্তায় অতিবাহিত হোত। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' সাপ্তাহিক পত্র হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। ম্যাক এই পত্রিকার সম্পাদনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল শ্রীরামপুরে কলেরা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

'কিমিয়াবিদ্যার সার' ছাড়া ম্যাক আর কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। এ গ্রন্থটি রচনার সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস আছে। মিঃ মার্শম্যান ভারতীয় যুবকদের জন্যে কতকগুলি ইতিহাস ও বিজ্ঞানবিষয়ক বই রচনার প্রস্তাব করেছিলেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী জন ম্যাকের 'কিমিয়াবিদ্যার সার, ১ম খণ্ড' প্রকাশিত হয়। এ বইটি হোল ম্যাকের কতকগুলি রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতার পরিশোধিত সংকলন। ম্যাক এই বক্তৃতাগুলি বাংলা এবং ইংরেজীতে শ্রীরামপুর কলেজ ও কলিকাতায় দিয়েছিলেন।

'কিমিয়াবিদ্যার সার' ইংরেজী ও বাংলায় লেখা। বাঁ পৃষ্ঠায় ইংরেজী, ডান পৃষ্ঠায় বাংলা। এই গ্রন্থের অনুবাদক সম্বন্ধে মতভেদ[৭] আছে। বেঙ্গল

৬ Oriental Christian Biography—W. Carey. P. 284.

৭ সাহিত্য সাধক চরিতমালার ৯৬ নম্বর গ্রন্থে জন ম্যাক সম্বন্ধে আলোচনায় অনুবাদক সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা হয় নি। কিন্তু চরিতমালার ৮৮ নং গ্রন্থে অনুবাদে ফেলিক্স্ কেরীর হাত ছিল বলে অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু এই অনুমান সমর্থন করা যায় না।

ওবিচুয়ারী,(*Bengal Obituary*) গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, ইংরেজীতে জন ম্যাকের রচনা ফেলিক্স্ কেরী (Felix Carey) বাংলায় অনুবাদ করেন।[৮] কিন্তু এই মত নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। তার কারণ, গ্রন্থের ভূমিকায় জন ম্যাক স্পষ্টই বলেছেন, "In composing this volume, my primary object has been to introduce Chemistry into the range of Bengali literature, and domesticate its terms and ideas in this language." তা' ছাড়া উইলিয়ম কেরীর 'ওরিয়েণ্টাল ক্রিশ্চিয়ান বায়োগ্রাফি'তে (Oriental Christian Biography) উল্লিখিত আছে, "Soon after his arrival in India, he gave a series of chemical lectures in Calcutta, the first ever delivered in the city; and at a later period, prepared an elementary treatise on this science, and translated it into the Bengalee language for the use of native pupils."[৯] অতএব জন ম্যাক যে তাঁর ইংরেজী বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তা'তে সন্দেহ নেই।

কিন্তু বাংলায় রসায়নশাস্ত্র লিখতে গিয়ে লেখককে এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হোল। রসায়নশাস্ত্রের অধিকাংশ বস্তুর নামই ছিল বাংলা সাহিত্যে একেবারে নবাগত। এই বস্তুগুলোর ইউরোপীয় নামকরণ ব্যবহার করবেন, না তাদের সংস্কৃতে অনুবাদ করবেন, এই নিয়ে লেখককে এক সমস্যায় পড়তে হোল। জন ম্যাক শেষ পর্যন্ত প্রথমোক্ত ধারাই অনুসরণ করলেন; অর্থাৎ, ইউরোপীয় নামগুলোকে বাংলায় লিখলেন। শুধুমাত্র নামগুলোর আদিতে এবং তাদের পরিভাষায় কিছুটা পরিবর্তন করা হোল। এই সম্বন্ধে জন ম্যাক দু'টি কারণ দেখিয়ে ভূমিকায় বলেছেন,······ First, that our European terms have been taken from our ancient languages for the very purpose of preventing the confusion which must arise from as many different names being applied to the same thing as there are languages in which it is spoken of; secondly, that it is a mistake to

৮ Bengal Obituary—P. 350.

৯ Oriental Christian Biography—P. 285.

suppose, that any good will be done by accurate translations of scientific names, since so many of them, as far as their derivative import is concerned, are totally misapplied, and the translation of them therefore would only be giving currency to error." এরপর বলেছেন, "I have preferred, therefore, expressing the European terms in Bengalee characters, and merely changing the prefixes and terminology so as decently to incorporate the new words into the language." ইউরোপীয় শব্দগুলোকে যথাসম্ভব অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় ব্যবহার করবার জন্যে লেখকের যে ইচ্ছে ছিল, তার প্রমাণ বইটির সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, Oxygen-এর বাংলা করা হয়েছে অক্সিজান, Fluorine-এর বাংলা ফ্লুওরিণ এবং Chlorine-এর স্থলে লেখা হয়েছে ক্লোরিণ, Iodine-এর স্থলে ঐয়োদিন, Nitrogen-এর বাংলা নৈত্রজান, Hydrogen-এর হৈদ্রজান। যৌগিক পদার্থের নামগুলো বাংলায় ব্যবহার করবার সময় যাতে এই নামগুলো বাংলা ভাষার সঙ্গে খাপ খায়, সেদিকে লেখক লক্ষ্য রেখেছেন। এরূপ করার ফলে যৌগিক পদার্থের অধিকাংশ নাম অর্ধেক অনুবাদিত হয়েছে। যেমন, Hydro-bromic acid-এর বাংলা করা হয়েছে হৈদ্রব্রোমিকাম্ল, Nitric Acid-এর বাংলা নৈত্রিকাম্ল, Sulphuric Acid-এর গান্ধকিকাম্ল। কতকগুলো যৌগিক পদার্থের নামে পরিবর্তন প্রায় নেই; যেমন Nitrate of Ammonia-র স্থলে লেখা হয়েছে আম্মোনিয়ার নৈত্রায়িত। আবার কয়েকটি স্থলে অনুবাদের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়; যেমন, Muriate of Ammonia-র স্থলে লেখা হয়েছে আম্মোনিয়ার সমুদ্রায়িত লবণ।

গ্রন্থটি দু' ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আলোচনা করা হয়েছে "Chemical forces" বা "কিমিয়া প্রভাব" সম্বন্ধে। দ্বিতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় "Chemical Substances" বা "কিমিয়া বস্তু"। প্রথম ভাগ চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিভিন্ন অধ্যায়ে আকর্ষণ, তাপ, আলো ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা। দ্বিতীয় ভাগে দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় "Electro-negative Substances" বা "বিদ্যুৎসম্পর্কীয় অভাবরূপ বস্তু"। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে "Unmetallic electro-positive Substances" বা "ধাতুভিন্ন বিদ্যুৎসম্পর্কীয় স্বভাবরূপ

বস্তু” সম্বন্ধে। প্রায় প্রতিটি অধ্যায় আবার কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ১ম ভাগে রসায়নবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা উচ্চাঙ্গের না হলেও এখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল, লেখক এই আলোচনা করেছেন রসায়নবিজ্ঞানের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা একেবারেই করেন নি। দ্বিতীয় ভাগে non-metals নিয়ে আলোচনা। লেখক বিদ্যুতের প্রতি বিভিন্ন পদার্থের ব্যবহার অনুযায়ী অধ্যায়বিভাগ করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন পদার্থের প্রস্তুতপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা সংক্ষিপ্ত। আলোচ্য পদার্থগুলোর যৌগিক পদার্থ নিয়ে আলোচনাও সংক্ষেপে করা হয়েছে। বিভিন্ন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আণবিক ওজনও (Atomic weight) দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্ট বা ক্রোড়পত্রে “বাষ্পীয় কল” শীর্ষক যে আলোচনাটি রয়েছে তা' ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখের ‘সমাচার দর্পণ’-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

গ্রন্থটি তথ্যবহুল; কিন্তু টেক্‌নিক্যাল নয়। প্রস্তুতপ্রণালী বোঝাতে গিয়ে কোথাও ফর্মূলার অবতারণা করা হয় নি। তবে স্বল্পপরিসরের মধ্যে অধিক তথ্যের সমাবেশের ফলে বিষয়বস্তু অনেকক্ষেত্রেই দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। যেমন, অক্সিজেনের প্রস্তুতপ্রণালীর কয়েকটি পদ্ধতি, যা' বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা উচিত ছিল তা' শুধুমাত্র এক প্যারাগ্রাফের কয়েক লাইনে সারা হয়েছে :—

“সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত অক্সিজান এই ২ রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ লৌহা কিম্বা মৃত্তিকার রিটোর্টের মধ্যে মাঙ্গানেসের কালা অক্সিদ অগ্নিময় করণেতে কিম্বা কাঁচের রিটোর্টের মধ্যে সেই অক্সিদের অর্দ্ধ পরিমিত শক্ত গান্ধকিকাম্ল তাহাতে দিয়া বাটীর উপর তাহা উত্তপ্ত করণেতে কিম্বা লোহা বা মৃত্তিকার রিটোর্টের মধ্যে সোরা লবণ অগ্নিময় করণেতে। কিন্তু অতি নির্ভাঁজ অক্সিজান যদি চাহা যায় তবে কাঁচের রিটোর্টের মধ্যে পতাষের খ্লোরায়িত উত্তপ্ত করণেতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং সেই কার্য্যেতে পতাষ এবং খ্লোরিক অম্লের মধ্যে যত অক্সিজান লীন হইয়া থাকে তাহা সকল পৃথক হইয়া রিটোর্টের মধ্যে কেবল পতাষিয়মের খ্লোরিদ অবশিষ্ট থাকে।”

গ্রন্থটি রচনায় মুরে (Murray), হেনরী (Henry), ব্র্যাণ্ডে (Brande),

উর (Ure), এবং টারনারের (Turner) বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।[১০] ম্যাকের ইচ্ছে ছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে ধাতু ও জৈব রসায়নবিজ্ঞান (Metals and Organic chemistry) সম্বন্ধে আলোচনা করবার। একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও একটি মেকানিক্‌স্ বই লিখবার ইচ্ছেও লেখকের ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড কিমিয়াবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মেকানিক্‌স্ প্রকাশিত হয় নি।

'কিমিয়াবিদ্যার সার'-এ ছেদচিহ্নের ব্যবহার যথাযথ নয়। কমার ব্যবহার একেবারেই নেই। রচনা দুরূহ ও দুর্বোধ্য প্রকৃতির। ভাষায় অনেক যায়গাতেই ইউরোপীয় উচ্চারণের ছাপ রয়েছে। যেমন, তের্মোমেতের, বারোমেতের, সোদা ইত্যাদি। বাক্য অযথা দীর্ঘ ; তা' ছাড়া প্রকাশভঙ্গীতে রয়েছে জড়তা। ভাষায় বিদেশী হাতের ছাপ সর্বত্রই রয়েছে। যায়গায় যায়গায় অযথা ক্রিয়ার ব্যবহার ; যেমন, 'অক্সিজান সামান্য আকাশ হইতে ভারী আছে'।

এইরূপে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রধানতঃ ইউরোপীয় লেখকদের প্রচেষ্টায় বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

১০ কিমিয়াবিদ্যার সার—Preface. P. V.

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি

(প্রথম পর্ব : ১৮১৭—১৮৪৩)

বাংলায় বিজ্ঞানালোচনার গোড়াপত্তন করলেন ইউরোপীয়েরা। ইউরোপীয়দের লেখা বিভিন্ন বিজ্ঞানগ্রন্থের প্রকাশে বিশেষভাবে উদ্যোগী হলেন কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। বস্তুতঃ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার অন্যতম উদ্যোক্তা এই প্রতিষ্ঠানটি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে এদেশে প্রচার করবার জন্যে সর্বপ্রথম কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিই উদ্যোগী হয়। দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি বহু উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ শুধু প্রকাশই করে নি, প্রকাশিত গ্রন্থগুলি প্রচারেরও ব্যবস্থা করেছিল। এই কারণেই বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত।

এক

এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে। 'স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন কাউণ্টেস্ অব্ লওডওন এবং ময়রা (Countess of Loudoun and Moira)। তাঁর ইচ্ছে ছিল, এদেশীয় যুবকদের জন্যে এমন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার, যা' থেকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হতে পারে। এ অভিপ্রায় তিনি ব্যক্ত করেন ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে। এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে ডাঃ কেরী ও মিঃ টম্‌সনকেও তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ডাঃ কেরী প্রস্তাবটিকে সমর্থন করলেন। এরপর প্রধানতঃ কেরীরই উৎসাহে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই এক সভা আহ্বান করা হোল। সেই সভায় চব্বিশ জন সভ্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভ্যদের মধ্যে আট জন ছিলেন এদেশীয়। এদেশীয় সভ্যদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্রের নাম। সোসাইটির অষ্টম অধিবেশনে (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ) দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সোসাইটির সভ্য মনোনীত করা হয়।

দ্বারকানাথ দীর্ঘ ষোল বৎসর ধরে সোসাইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ ছাড়া সোসাইটির কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন রামমোহন রায় ও গৌরমোহন পণ্ডিত। এই যুগের ইউরোপীয় সভ্যদের মধ্যে ই. এইচ. ইষ্ট, জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডাঃ কেরী, আরভিন, ই এস. মণ্টেগু, ইয়েট্‌স্ ও পিয়ার্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম অধিবেশনে সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ডব্লিউ. বি. বেইলী (W. B. Bayley)। ইউরোপীয় সম্পাদক নিযুক্ত হলেন ক্যাপ্টেন আর্‌ভিন (Captain Irvine)। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে ই. এস. মণ্টেগু (E. S. Montagu) সমিতির অতিরিক্ত সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। গোড়া থেকেই সোসাইটির সঙ্গে মারকুইস্ অব্ হেষ্টিংস্-এর (Marquis of Hastings) সংযোগ ছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত স্কুল বুক সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি বেইলী মারকুইস্ অব্ হেষ্টিংস্‌কে সমিতির পৃষ্ঠপোষক বলে সরকারীভাবে ঘোষণা করলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায়, উচ্চতম সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ইংরেজদের সহযোগিতাও সোসাইটি লাভ করেছিল।

ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ নয়, এদেশীয় স্কুলসমূহের জন্যে জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষা-মূলক গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং সেই গ্রন্থগুলি সস্তা দরে প্রচার করাই এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ২, ৩ ও ৪ নম্বর নিয়ম উল্লেখযোগ্য :—

2. That the objects of this Society be the preparation, publication and cheap or gratuitous supply of works useful in schools and seminaries of learning.
3. That it forms no part of the design of the Institution, to furnish religious books—a restriction, however, very far from being meant be preclude the supply of moral tracts, or books of a moral tendency, which without interfering with the religious sentiments

of any person, may be calculated to enlarge the understanding, and improve the character.

4. That the attention of the society be directed, in the first instance, to the providing of suitable books of instruction for the use of native schools, in the several languages, (English as well as Asiatic,) which are, or may be taught in the provinces subject to the presidency of Fort William.

দুই

অল্পকালের মধ্যেই অনেকটা কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। 'কলিকাতা ডিয়োসেসান কমিটি' (Calcutta Diocesan Committee) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল, এদেশে অধিক সংখ্যায় স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঐ স্কুলগুলোর মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করা।

'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। স্কুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারে 'স্কুল বুক সোসাইটি'কে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যেই কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সৃষ্টি। এই প্রতিষ্ঠান গড়ার মূলেও ছিলেন কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সভ্যরা। এদেশীয় স্কুলগুলির উন্নতি করা এবং তাদের মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার করা স্কুল সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই সোসাইটি চেয়েছিলেন একদল জ্ঞানী শিক্ষক ও সুদক্ষ অনুবাদক গড়ে তুলতে; যাতে ভবিষ্যতে এদেশে জ্ঞানগর্ভ শিক্ষাবিস্তারের কাজে তাঁরা সহায়ক হতে পারেন। স্কুল বুক সোসাইটির মতো কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সভ্যসংখ্যাও ছিল মোট চব্বিশ জন। ইউরোপীয় ষোল জন; আর বাকী আট জন ভারতীয়। ডাঃ কেরী, উইলিয়ম ইয়েট্স্, ডেভিড হেয়ার, জেম্স্ গর্ডন, ফ্রান্সিস আরভিন, ই. এস. মণ্টেগু প্রভৃতি এই সোসাইটির সভ্য ছিলেন।

'ঢাকা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত বই 'ঢাকা স্কুল সোসাইটি' ক্রয় করতো। 'মুর্শিদাবাদ স্কুল সোসাইটি' ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির নিয়মকানুনের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ স্কুল সোসাইটির মিল আছে। স্কুল বুক সোসাইটির মতো এই প্রতিষ্ঠানটিরও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, এদেশে জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষামূলক গ্রন্থ প্রচার করা। স্কুল বুক সোসাইটির মতো এরাও ঠিক করলেন, ধর্মসংক্রান্ত বইয়ের ব্যাপারে কোনোরূপ প্রচার চালানো হবে না। মুর্শিদাবাদ সোসাইটির অন্তর্গত স্কুলগুলোতে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত বই সর্বাগ্রে অনুমোদন করা হোত।

অতএব, নিজেরা গ্রন্থ প্রকাশ না করলেও এই সোসাইটিগুলো কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলি প্রচারে সাহায্য করেছিল।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির অনুকরণে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও মাদ্রাজ স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি বই জনপ্রিয়তা অর্জন করায় সোসাইটির সম্পাদক মণ্টেগু মাদ্রাজ স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদকের কাছে লিখেছিলেন, "Our most useful works are in Bengalee ; and it would be desirable to get translations of them for the Madras Committee to be put into the garb of the local dialects."[১] এ থেকে মনে হয়, আঞ্চলিক ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশই অগ্রণী ছিল।

লণ্ডনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে। এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয় জনসাধারণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি করা এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির মতো জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে অর্থ, বই ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা। পরে এই প্রতিষ্ঠান বই, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পাঠিয়ে স্কুল বুক সোসাইটিকে সাহায্য করেছিল।

তিন

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশের সূত্রপাত করলেন কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা প্রথম অঙ্ক

---

১ Society's 3rd Report (11th Oct., 1820)—Appendix No. 111.

বই 'মে-গণিত' (১৮১৭) এই সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। হার্লের 'গণিতাঙ্ক' (১৮১৯) এবং পিয়ার্সের ভূগোলবৃত্তান্তের (১৮১৯) প্রকাশকও এই সোসাইটি। এ ছাড়া কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি বাংলা সাহিত্যে শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থপ্রকাশেরও সূত্রপাত করলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বাংলা ভাষায় শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ফেলিক্স্ কেরীর বিদ্যাহারাবলী (১৮২০), পিয়ার্সনের ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন (১৮২৪), লোসনের পশ্বাবলী (১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) এবং ইয়েটস্-এর জ্যোতির্বিদ্যা (১৮৩৩)। একই গ্রন্থে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সর্বজনবোধ্য গ্রন্থপ্রকাশের প্রথম কৃতিত্ব এই সোসাইটির। এই ধরনের গ্রন্থ ইয়েটস্-এর পদার্থবিদ্যাসার (১৮২৪)।[২]

স্কুল বুক সোসাইটি শুধু পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশই করলেন না, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি এদেশীয় জনসাধারণের কৌতূহল সৃষ্টিতেও সাহায্য করলেন। ভূগোল সম্বন্ধে প্রামাণ্য বই বের করবার জন্যে সোসাইটি গোড়া থেকেই তৎপর হয়েছিলেন। ভূগোলে এদেশীয়দের ধারণা সম্বন্ধে সোসাইটির রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিল,……"the ideas they contain of the Geography of their own country, and still more of the world, being always vague and often erroneous." স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, কমিটির সভ্য মিঃ জি, জে, গর্ডন (G. J. Gordon) একজন ভারতীয়কে দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভূগোল বইয়ের অনুবাদ করিয়েছিলেন। বইটিতে ইংরেজীর পাশেই বাংলা অনুবাদ দেওয়া ছিল। কিন্তু গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না; কারণ, সোসাইটির অপর কোনো রিপোর্টে গ্রন্থটির উল্লেখ নেই।

নির্ভরযোগ্য উপাদান থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলার সংক্ষিপ্ত ভূগোল প্রকাশ করবার ইচ্ছেও সোসাইটির ছিল। ই, এস্, মণ্টেগুর ইচ্ছে ছিল, স্থানীয় লোকদের সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর ক'রে একটি ভূগোল

২ "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক" শীর্ষক অধ্যায়ে এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বই রচনা করবার। বিভিন্ন লোকের অভিজ্ঞতাসঞ্চিত তথ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে লেখা এই ভূগোল কালক্রমে একটি মূল্যবান গ্রন্থে পরিণত হবে, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় আকৃতি ও প্রকৃতি, মাটী, হ্রদ, জলবায়ু ও আবহাওয়া সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছিলেন। প্রশ্নগুলি স্কুল বুক সোসাইটির প্রথম বাৎসরিক রিপোর্টের পরিশিষ্টে ছাপা হয়েছিল। স্থির হয়েছিল, পরে এই প্রশ্নগুলি সুবিধে ও প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় লোকদের কাছে পাঠান হবে। জলবায়ু ও আবহাওয়া সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা :—

Qu. 1. Is Spring dry or moist ? early or late, generally ?
2. Duration of the seasons respectively ? and how distinguished by natives ?
3. Estimated quantity of rain, at particular seasons.
4. Atmosphere often clouded ?
5. What winds are prevalent at each season respectively ; their nature and influence on the country ? and are they very variable ?
6. Hot winds at what period ; their force, effects, and duration : and by what circumstances tempered ?
7. Dews when and in what quantity ; and their effects when very great ?

এই সকল প্রশ্ন প্রচার করবার ফলে মিঃ মণ্টেগুর ভূগোল সংকলনের কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেল। এই সম্বন্ধে সোসাইটির দ্বিতীয় বাৎসরিক রিপোর্টের পরিশিষ্টে তিনি লিখেছেন, "Though not many months have elasped since the publication of the extensive queries I drew up on chorography and statistics adapted to this country, (printed in Calcutta School Book Society's 1st. Report,) I am desirous to 'report progress' to you ;"[৩]

---

৩ ক্যাপ্টেন আরভিনের কাছে মিঃ ই. এস. মণ্টেগু যে পত্র লিখেছিলেন তারই উদ্ধৃতি হোল পরিশিষ্টের এই রিপোর্টটি।

মণ্টেগু এবার স্থির করলেন, প্রাপ্ত তথ্যগুলোর ওপর নির্ভর ক'রে সমগ্র বা'লা প্রেসিডেন্সীর ভূগোল রচনার কাজে হাত দেবেন। মণ্টেগুর ধারণা ছিল, বিভিন্ন জেলার ভূগোল রচিত হলে দু'দিক দিয়ে সুবিধে। প্রথম সুবিধে, জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের। সমগ্র জেলার একটি চিত্র হাতের কাছে পেলে শাসনকার্যের সুবিধে। দ্বিতীয় সুবিধে, এদেশীয় জনসাধারণের শিক্ষার দিক দিয়ে। মিঃ মণ্টেগু এবার ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত প্রতিটি জেলার ভূগোল-রচনার এক পরিকল্পনা পেশ করলেন। ঐ পরিকল্পনায় তিনি জানালেন, প্রতিটি জেলা-ভূগোলে থাকবে ঐ জেলার মানচিত্র, নদনদী, জলবায়ু ও আবহাওয়া এবং ঐ জেলা সম্বন্ধে অন্যান্য যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়। জেলার মানচিত্র প্রকাশ করা সম্বন্ধেও মিঃ মণ্টেগু কয়েকটি প্রস্তাব করেছিলেন। মণ্টেগুর পরিকল্পনায় মানচিত্রকে নিখুঁত ও তথ্যবহুল করবার প্রচেষ্টা ছিল। এ ছাড়া পিয়ার্সের ভূগোলবৃত্তান্তের মানচিত্রগুলো আঁকবার দায়িত্ব মিঃ মণ্টেগু নিয়েছিলেন। সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্ট (১৮২০ খৃঃ, ১১ই অক্টোবর) থেকে জানা যায়, এই কাজ ক্রমশঃ এগিয়ে চলছে। বাংলা ভাষায় মানচিত্র প্রকাশের জন্যে মিঃ মণ্টেগুর প্রচেষ্টা কিছুকালের মধ্যেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। স্কুল বুক সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮২৫) বাংলায় রচিত পৃথিবীর মানচিত্র ছাপা হয়ে গেছে। এই হোল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মানচিত্র। এই মানচিত্রের জন্যে সোসাইটির ষষ্ঠ অধিবেশনে সভ্যরা মণ্টেগুর প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছিলেন। এই মানচিত্রের নকল পিয়ার্স ও পিয়ার্সনের ভূগোলে আছে। ছোটদের দিয়ে শিক্ষামূলক বই (Instructive Copybook) নকল করিয়ে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী হলেন। এ ব্যাপারে সোসাইটি শ্রীরামপুরের মিশনারীদের অনুকরণ করেছিলেন। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা শ্রীরামপুরের আশেপাশের স্কুলগুলিতে ছাত্রদের দিয়ে বিজ্ঞান-বিষয়ক বই নকল করিয়ে জ্ঞানের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছিলেন। সেই সব বইয়ের মুদ্রিত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ছাত্ররা বারবার যা'তে নকল করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রসঙ্গগুলোর পাশেই শূন্য যায়গা রাখা হোত। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি এই ধরনের বই প্রচারে উদ্যোগী হলেন। মিঃ পিয়ার্স রেভাঃ আস্‌টেস্‌ কেরীর (Rev. Eustace Carey) সহায়তায় ধারাবাহিকভাবে এই ধরনের বই লিখবার মনস্থ করলেন। স্থির

হোল, ভূগোলবৃত্তান্ত আঠার থেকে কুড়িটি কপি-বইয়ের আকারে প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। প্রতিটি কপি-বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা হবে চব্বিশ। প্রথমে এসিয়ার ভূগোল নিয়ে আলোচনা সুরু হয়েছিল। আলোচনার পাশে রুলটানা শূন্য স্থান রাখা হোত বইয়ের বিষয়বস্তু নকল করবার জন্যে। এই শিক্ষামূলক কপি-বইয়ের প্রতিটি পাঠের প্রথমেই মূল বক্তব্য একটি বাক্যের মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা হোত। এই মূল বক্তব্য বড় হরফে লেখা থাকতো। তারপর এই বক্তব্যকে উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করা হোত। এই ব্যাখ্যা ছোট হরফে লেখা। এরপর বক্তব্য বিষয়বস্তু প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে বর্ণনা ক'রে প্রতি পাঠের শেষে কঠিন শব্দগুলোর অর্থ দেওয়া হোত। শিক্ষামূলক এই বইগুলো ছাপবার সময় তৎকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই দিকে নজর রেখেই ভূগোলবৃত্তান্তে পৃথিবীকে চার ভাগে ভাগ না ক'রে ভাগ করা হয়েছিল ছয় ভাগে। স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পিয়ার্সের ভূগোলবৃত্তান্তের প্রথম চার ভাগ শিক্ষামূলক কপি-বইয়ের আকারে বেরিয়েছিল।[৪]

রামমোহন রায়ের ভূগোল (জ্যাগ্রাফী) কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্ট (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮২০) থেকে জানা যায়, ইংরেজী ও বাংলায় রামমোহন রায়ের ভূগোল রচনার কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং বইটির পাণ্ডুলিপি ছাপাবার উদ্দেশ্যে সোসাইটির কাছে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু সোসাইটির পরবর্তী রিপোর্টগুলির কোনোটিতেই রামমোহন রায়ের ভূগোলের আর কোন উল্লেখ নেই।

এ ছাড়া বেকনের কতকগুলো বিজ্ঞানগ্রন্থ অনুবাদের ব্যাপারে মণ্টেগুর সম্মতি ছিল।[৫] কিন্তু এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি।

৪ No. 1. The Earth Considered as a planet.
No. 2. An Explanation of the terms used in Geography.
No. 3. Introduction to the Geography of Asia.
No. 4. Introduction to the Geography of Hindoostan, with a summary of its history.

৫ সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্টে প্রকাশিত মণ্টেগুর আবেদনে আছে, (Appendix 11. P. 48) "It has been suggested to me by a friend, that a translation of some

পুরস্কার দেবার উপযোগী কতকগুলি শিক্ষামূলক বই বাংলাভাষায় রচনার পরিকল্পনা কমিটির তরফ থেকে করা হয়েছিল।[৬] এই প্রাইজ-বইগুলি কি ধরনের হবে সে সম্পর্কে সোসাইটির সম্পাদক কলিকাতার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাছে যে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছিলেন (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ) তা'তে অপরাপর প্রসঙ্গের সঙ্গে গাছপালা, জীবজন্তু, পাখী ও পোকা-মাকড় নিয়ে গ্রন্থরচনার পরিকল্পনাও ছিল। এই প্রস্তাবকে সমর্থন ক'রে ব্যাপ্টিষ্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটির সভাপতি রেভাঃ জি, পিয়ার্স লিখেছিলেন,......"I consider natural science as highly calculated to raise their character and condition." কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সম্পাদক ডেভিড হেয়ারও এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে সোসাইটির উদ্যোগে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রাইজ-বই প্রকাশিত হোল। লোসনের Animal Biography বা পশ্বাবলীর ছয়টি সংখ্যা একত্র ক'রে প্রকাশ করা হোল, যা'তে ছবিগুলি সহ গ্রন্থটি একটি উৎকৃষ্ট প্রাইজ-বই বলে বিবেচিত হতে পারে।

স্কুল বুক সোসাইটি শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত কোনো কোনো গ্রন্থও যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত দিগ্‌দর্শন পত্রিকা সোসাইটি নিয়মিতভাবে ক্রয় করতো। এ ছাড়া শ্রীরামপুর মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত জন ক্লার্ক মার্শম্যানের গোলাধ্যায় নামক বইটিরও কয়েক শত কপি সোসাইটি ক্রয় করেছিল।

স্কুল বুক সোসাইটির কল্যাণে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার উন্নতি হয়েছিল। সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্টে (১১ই অক্টোবর, ১৮২০ খৃষ্টাব্দ) ১৮ জন ব্রাহ্মণ ও ১১ জন কায়স্থের সই করা একটি বিবৃতির যে প্রতিলিপি ছাপান হয়েছে, তা'তে এর স্বীকৃতি রয়েছে। বিবৃতির শেষাংশ নিম্নরূপ :—

of Lord Bacon's works (as his Novum Organum & etc.) which has been the groundwork of much of the Science cultivated in England would offer much interesting matter for publication ; and I should be glad if my friend's proposition (when it comes forward), or any similar one, should meet the society's approbation and encouragement."

৬ Calcutta School Book Society's 7th Report (5th March, 1828)—P. 4.

"এইক্ষণে লোকনিকরাশেষ হিতার্থি শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয় ও বাঙ্গালি লোক কর্ত্তৃক বঙ্গ দেশস্ত দূস্থ বালকেরদিগের জ্ঞানোদয়ার্থে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক জনমনোমহান্ধকার নিকরোৎসারণ কারণাখণ্ড প্রতাপান্বিত মার্ত্তণ্ড প্রতিবিম্ব স্কুল বুক সোসাইটি নামক এক সমাজোচিত হইয়াছেন তাহার প্রখরতর করনিকরস্বরূপ যে ভূগোল-বৃত্তান্ত ও দিগ্দর্শন ও অভিধান ইত্যাদি নানাবিধ মহোপকার জনক শুঙ্গ পুস্তক তদ্দ্বারা লোকসমূহের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইয়া ক্রমে ২ জ্ঞানোদয়ের উপক্রম হইতেছে অতএব বঙ্গদেশস্থ লোকেরা স্কুল বুক সোসাইটির উপকার বার ২ স্বীকার করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন যে স্কুল বুক সোসাইটি এইরূপে আমারদিগের জ্ঞান প্রদান করুন।"[৭]

এই সময়ে (১৮১৯-১৮২০) স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত বইগুলোর চাহিদা খুব বেড়ে গিয়েছিল।[৮] কিন্তু এদেশীয় জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় তখনও কোনো সাড়া পড়ে নি। অষ্টম অধিবেশনে (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ) স্যার ই, রিয়ান সোসাইটির সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতার অভাবের কথা উল্লেখ ক'রে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। এদেশীয় জনসাধারণের আর্থিক সাহায্য থেকেও সোসাইটি বঞ্চিত হচ্ছিল। অবশ্য গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা সোসাইটি পেয়েছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কমিটি গভর্ণমেণ্টের নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্যে আবেদন করলে গভর্ণমেণ্ট তা' মঞ্জুর করেন। এ ছাড়া গভর্ণমেণ্ট তখন এদেশে ইউরোপীয় বিজ্ঞান প্রচারের জন্যেও সচেষ্ট হয়েছিলেন।[৯]

দেশীয় ভাষায় লেখা জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদিকে কেন্দ্র ক'রে ইংরেজী ভাষাকে এদেশে জনপ্রিয় করবার পরিকল্পনা সোসাইটির ছিল। ১৮৩৪

৭ Society's 3rd Report—Appendix No. II. P. 50.

৮ মাদ্রাজ স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদকের কাছে ই, এস, মণ্টেগু লিখেছিলেন,
"Works on Arithmetic and the elements of languages, with vocabularies, have always a rapid and regular demand. Books on Geography are in great request, if simple and easy of style ;" (Society's 3rd Report—Appendix No. III. P. 62).

৯ Society's 5th Report (Sept, 1823)—Appendix P. 25.

খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে এশিয়াটিক সোসাইটির ঘরে অনুষ্ঠিত কমিটির দশম অধিবেশনে মিঃ মেকেঞ্জী বলেছিলেন, "It was by works in the local dialects, conveying the elements of European knowledge, that the road was paved for the introduction of our language, literature and science." কমিটি এবার ইংরেজী ভাষার ওপর জোর দিলেন। স্থির হোল, ইংরেজী যখন কিছু সংখ্যক লোক রপ্ত ক'রে নেবে তখন আবার আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক বই রচনা করা হবে। অবশ্য ইংরেজীর প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ সৃষ্টি করা হবে অনুবাদিত বিজ্ঞানগ্রন্থগুলিকে কেন্দ্র ক'রে। সোসাইটির এই পরিকল্পনা কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিল। দ্বাদশ রিপোর্ট (১৩ই জুন, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ) থেকে জানা যায়, বাংলা বইয়ের চাহিদা ক্রমশঃ কমছে, আর ইংরেজীর চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষাকে জনপ্রিয় করতে গিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় নতুন নতুন গ্রন্থ প্রকাশের কাজে কিছুদিন ভাঁটা পড়ল। সোসাইটি নতুন গ্রন্থ প্রকাশ না ক'রে একই গ্রন্থ বার বার প্রকাশ করতে লাগলেন।

সাময়িক-পত্র ঃ দিগ্‌দর্শন থেকে বিদ্যাদর্শন

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যখন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশিত হতে লাগল, তখন কোনো কোনো বাংলা সাময়িক-পত্রেও বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হতে দেখা গেল। বস্তুতঃ, বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার ক্রমবিকাশের পথে সাময়িক-পত্রের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এক একটি যুগে বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে এমন অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সুযোগ যাদের কোনোদিনই ঘটে নি ; অথচ বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও ক্রমবিকাশের পথে এদের অবদান উপেক্ষণীয় নয়। বিভিন্ন যুগে এক একটি সাময়িক-পত্র ভাষায় ও ভাবে, দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাভঙ্গীতে এমন এক একটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছে যা' বিজ্ঞান-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেছে অনেকখানি। এদিক থেকে বিচার করলে, বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সাময়িক-পত্রকে বাদ দেওয়া বোধ হয় কোনোমতেই চলে না।

বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের দু'টি ধারা। গ্রন্থকে কেন্দ্র ক'রে একটি ধারা। অপর ধারাটি সাময়িক-পত্রকে কেন্দ্র করে। দু'টি ধারারই উদ্ভব একই যুগে। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ ফেলিক্‌স্‌ কেরীর বিদ্যাহারাবলী ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর প্রথম প্রকাশিত হয়। আর বাংলায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িক-পত্র দিগ্‌দর্শনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে।

এক

দিগ্‌দর্শন পত্রিকায় পদার্থবিদ্যা, ভূগোল ও ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং জীব ও রসায়নবিদ্যা বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে এই পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় (অক্টোবর, ১৮১৮ খৃঃ) বলা হয়েছিল, "যেমত এই পুস্তকের নাম সেই মত তাহার বিবরণ বর্ণনের জন্যে তাহার নানা বিষয় ও বক্তব্য যদি আকাশ পৃথিবী জল এই তিন লোকবাসিরদের বিবরণ না কহি, তবে ইহার দিগ্‌দর্শন নাম ব্যাহত হয়……।" দিগ্‌দর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনাগুলো উচ্চাঙ্গের নয়। এমন কি এদের বৈজ্ঞানিক

প্রবন্ধও বলা যায় না। কিন্তু বাংলায় মুদ্রিত এই প্রথম সাময়িক-পত্রেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে দিগ্‌দর্শনের সবচেয়ে বড় অবদান এখানেই। পদার্থবিজ্ঞান এবং ভূগোল-বিষয়ক রচনা দিগ্‌দর্শন পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত চুম্বক পাথর ও কম্পাস সম্পর্কে আলোচনাটির ভাষা দুর্বোধ্য প্রকৃতির। তবে এখানে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। যেমন,

> "অনুমান হয় পাঁচ শত বৎসর গত হইল চুম্বক পাথরের গুণ প্রথম জানা গেল তাহার গুণ এই যে তাহাকে কোন লৌহে ঘষিলে সে লৌহের ঘৃষ্ট দিগ্ সর্ব্বদা উত্তর কেন্দ্রে অর্থাৎ উত্তরভাগে থাকে সেই লৌহ কোম্পাসের মধ্যে দিলে সেই কোম্পাসের দ্বারা কোন ব্যক্তি ভূমির উপরে কিম্বা সমুদ্রের উপরে থাকিলে পৃথিবীর সকল দিগ্ জানিতে পারে। কোম্পাসের গঠন এই মত কাগজের উপরে মণ্ডলাকৃতি করিয়া বত্রিশ সমানাংশ করিয়া চতুর্দ্দিগে সকল দিগ্ ও বিদিগ্ ও উপদিগ্ লেখা থাকে সেই কাগজের মধ্যস্থানে প্রেকের ন্যায় ক্ষুদ্র লৌহ বদ্ধ থাকে তাহার মস্তকের উপরে একটা সুঁই রাখা যায় সে বদ্ধ অথচ চতুর্দ্দিগে ঘোরে এবং তাহার এক দিগে চুম্বক পাথর ঘষা যায় সে কোম্পাস কোন দিগে রাখিলে সে সুঁই ঘুরিয়া উত্তর দিগে মুখ করিয়া সর্ব্বদা থাকে তাহাতে অনায়াসে পৃথিবীর চতুর্দ্দিগ্ জানা যায়।"

নবম সংখ্যায় (ডিসেম্বর, ১৮১৮ খৃঃ) প্রকাশিত চুম্বক সম্বন্ধে আলোচনাটি আরও বেশী তথ্যপূর্ণ। এখানে চুম্বকের গুণ, প্রকৃতি ও চুম্বক ব্যবহারের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। দিগ্‌দর্শন পত্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক কয়েকটি আলোচনা কথোপকথনের মাধ্যমে বর্ণিত। এই প্রসঙ্গে চতুর্থ সংখ্যায় (জুলাই, ১৮১৮ খৃঃ) "পৃথিবীর আকর্ষণের বিবরণ", ষষ্ঠ সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খৃঃ) "পদার্থের অসংখ্যভাগ বিষয়ে" এবং সপ্তম সংখ্যায় (অক্টোবর, ১৮১৮ খৃঃ) "প্রতিধ্বনি বিষয়ে" আলোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত রচনায় মাধ্যাকর্ষণের কথা প্রাঞ্জল ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে বোঝান হয়েছে। কথোপকথনের শেষাংশ উদ্ধৃত করা হোল—

কালিদাস। পৃথিবী ছাড়া যে বস্তু আছে তাহারা যদি আপনি চলিতে না পারে তবে পৃথিবীর উপরে পতনের কারণ এই পৃথিবী তাহাকে টানিয়া লয়।

গোপাল। কিন্তু পৃথিবীতো অজীবন সে কিরূপে টানিতে পারে।

কালিদাস। নিউটন অনেকক্ষণ ভাবিয়া এই স্থির করিলেন সকল পদার্থের এই স্বভাব স্থির আছে যে সকল বস্তু ছোট বড় অনুসারে পরস্পর আকর্ষিত হয়। এই পৃথিবী অতিশয় বড় এক বস্তু তাহার নিকটে এমত বড় আর কোন বস্তু নাই অতএব পৃথিবী চতুর্দ্দিকস্থ ছোট ২ বস্তুকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে। যখন পৃথিবী হইতে কোন বস্তু উঠান যায় তাহাকে আকর্ষণের বিপরীতে উঠাইতে হয় এই কারণ উঠাইতে ভারি বোধ হয়। সে বস্তু যদি অতি বৃহৎ হয় তবে পৃথিবীর আকর্ষণে অধিকত্ব প্রযুক্ত অধিক ভার বোধ হয়।

পদার্থের অসংখ্যভাগ বিষয়ে আলোচনাটি বিস্তারিত। প্রতিধ্বনি সম্পর্কে আলোচনাটিও তথ্যপূর্ণ। এতে প্রতিধ্বনি কিভাবে উৎপন্ন হয়, কোথায় এবং কিভাবে শোনা যায়, তা' নিয়ে কথোপকথনের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার ভাষা দুরূহ প্রকৃতির। পরবর্তীকালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানগ্রন্থে কথোপকথনের মাধ্যমে বক্তব্য বিষয় বোঝান হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ইয়েটস্-এর পদার্থবিদ্যাসার (১৮২৫), জ্যোতির্বিদ্যা (১৮৩৩) ইত্যাদি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। দিগ্দর্শন পত্রিকার কোনো কোনো রচনায় বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। "বেলুনে সাদ্লার সাহেবের আকাশ গমন" (১ম সংখ্যা, এপ্রিল, ১৮১৮ খৃঃ) শীর্ষক নিবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখানে লেখক বেলুনের দিকপরিবর্তন সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, তা' উড়োজাহাজের আবিষ্কর্তাদেরও ভাবিয়ে তুলেছিল। চতুর্দশ সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারী, ১৮২০) বেলুন সম্বন্ধে আর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচনাটি উচ্চাঙ্গের নয়; তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় এখানেও সুস্পষ্ট। দিগ্দর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো কোনো আলোচনা ইতিহাস-ঘেঁষা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ২য় সংখ্যার (মে, ১৮১৮ খৃঃ) "বাষ্পের দ্বারা নৌকা চালানর বিষয়ে" নামক রচনাটি। আলোচ্য বিষয়বস্তু

এখানে ষ্টীমার। পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবহাওয়া-বিজ্ঞানের কোনো কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা দিগদর্শন পত্রিকায় রয়েছে। যেমন, ষষ্ঠ সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খৃঃ) "বিদ্যুৎ ও বজ্র বিষয়ে" শীর্ষক রচনাটি। এখানে আলোচনা উদাহরণ সহযোগে করার ফলে বক্তব্য বিষয়ের দুরূহতা কিছুটা লাঘব হয়েছে। চতুর্দশ সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারী, ১৮২০ খৃঃ) প্রকাশিত মেঘ সম্পর্কে আলোচনাটি সারগর্ভ।

দিগদর্শনে প্রকাশিত ভূবিদ্যা ও ভূগোলবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, প্রথম সংখ্যায় "পৃথিবীর বিভাগের কথা", "বিসুবিয়স পর্বত বিষয়ে", ২য় সংখ্যায় (মে, ১৮১৮ খৃঃ) "ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ" এবং নবম সংখ্যায় (ডিসেম্বর, ১৮১৮ খৃঃ) "ইংলণ্ডে কয়লার আকর" শীর্ষক রচনা। প্রথম সংখ্যার বিসুভিয়স পর্বত সম্বন্ধে আলোচনাটি তথ্যপূর্ণ; তবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। "ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ" নামক রচনাটির মূল আলোচ্য বিষয় বাণিজ্যিক ভূগোল। তবে "ইংলণ্ডে কয়লার আকর" নামক রচনাটিতে ভূবিদ্যা-বিষয়ক তথ্যাদি কিছু কিছু রয়েছে। নবম সংখ্যায় "পোলণ্ডে লবণের আকর" শীর্ষক রচনাটির ভাষা দুর্বোধ্য প্রকৃতির হলেও খনির অভ্যন্তরের দৃশ্য নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা এখানে রয়েছে। যেমন ঃ—

> "সেইখানে পঁহুছিবামাত্র এমত এক সুদর্শনীয় পূর্ব্বে অদৃষ্ট স্থান তাহার দৃষ্টিতে আইসে যে তাহার মনে চমৎকার লাগে, ও সে সেখানে একটি বৃহৎ মাঠ দেখে ও তাহার মধ্যে এক পাতালীয় নগর ও তন্মধ্যে ঘর ও গাড়ী ও রাজপথ প্রভৃতি সকল বড় এক লবণের পর্ব্বতের মধ্যে খনিত ও স্ফটিকের মত দেদীপ্যমান যে ২ প্রদীপ সাধারণ উপকারের নিমিত্ত সর্ব্বদা জ্বলন্ত থাকে তাহার আলোক সেই স্থানের লবণের খিলানের স্তম্ভের উপর পড়িলে ইন্দ্র-ধনুকের মত সহস্র ২ বর্ণ হয়, এবং মণির মত ও জাজ্বল্যমান হয়; এমত শোভার ঐশ্বর্য্য হয় যে পৃথিবীর উপরে কোন স্থানে এমত দর্শন হয় না।"

দিগদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাণীবিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলি একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির। এ সকল রচনায় বৈজ্ঞানিক তথ্যেরও একান্ত অভাব। দু' এক যায়গায় আলোচ্য জীবের শুধুমাত্র প্রকৃতি বর্ণনা ক'রে নিবন্ধ সমাপ্ত

করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তৃতীয় সংখ্যায় (জুন, ১৮১৮ খৃঃ) "হস্তির বিবরণ" এবং সপ্তম সংখ্যায় (অক্টোবর, ১৮১৮ খৃঃ) "বীবর পশুর বিষয়ে" আলোচনা উল্লেখযোগ্য। দশম সংখ্যার (জানুয়ারী ১৮১৯ খৃঃ) "মকর মৎস্যের বিবরণ" শীর্ষক রচনাটিও প্রাথমিক প্রকৃতির।

জ্যোতিবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা দিগ্দর্শনে কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। ষষ্ঠ সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খৃঃ) 'তারা' সম্বন্ধে আলোচনাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। রসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক নিবন্ধ কেবলমাত্র অষ্টম সংখ্যায় (নবেম্বর, ১৮১৮ খৃঃ) পাওয়া যায়। এই সংখ্যায় প্রকাশিত ধাতু সম্বন্ধীয় আলোচনাটি বিস্তারিত। এখানে ধাতু কি তা' বুঝিয়ে প্লাটিনাম, সোনা, রূপা, পারদ, তামা ইত্যাদি ধাতু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রচনাটি নীরস। এতে বিভিন্ন ধাতুর বর্ণ, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও প্রধান ধর্মগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এইরূপে প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র দিগ্দর্শনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হোল। আলোচনাগুলি উচ্চাঙ্গের না হলেও তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণে'র তুলনায় উৎকৃষ্টতর।

দুই

প্রাণীবিজ্ঞানকে সহজ ও সরস ক'রে সর্বসাধারণের কাছে প্রচারে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত "পশ্বাবলী" নামক গ্রন্থটির বিভিন্ন সংখ্যা মাসিক-গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। জন লোসন বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে পশ্বাবলীর বিষয়বস্তু সংকলন করেছিলেন। সংকলিত বিষয়বস্তু বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন ডবলিউ, এইচ্, পিয়ার্স। ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর লসনের মৃত্যুতে পশ্বাবলীর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।[১] প্রথম ছয়টি সংখ্যায় সিংহ, ভল্লুক, হাতী, গণ্ডার ও হিপোপটেমাস্, বাঘ এবং বিড়াল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। আলোচনাগুলিতে বৈজ্ঞানিক তথ্য তত নেই, যত রয়েছে গল্পরস। প্রায় সর্বত্রই উপাখ্যানকে কেন্দ্র ক'রে আলোচ্য জীবের প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই সত্যঘটনামূলক কাহিনী বর্ণনা ক'রে বিষয়বস্তু

১ Society's 7th Report—P. 4.

আকর্ষণীয় করবার চেষ্টা দেখা যায়। কয়েকটি কাহিনী বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক। কোথাও বা নীতিকথামূলক উপাখ্যানের বর্ণনা ক'রে সোজা-সুজি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ, রচনাগুলিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের একান্ত অভাব। তবে প্রতিটি আলোচনারই বৈশিষ্ট্য, প্রাঞ্জল ভাষা ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী। রচনার নিদর্শন :—

সিংহের আকারাদি

সিংহের জন্মস্থান আফ্রিকা ও আশিয়া। এই এই দেশের মধ্যস্থলেই সিংহ জন্মিয়া থাকে। উষ্ণতা প্রযুক্ত যেখানে মনুষ্যেরা বাস করিতে পারে না সিংহ সেখানে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করে ; শীতপ্রধান দেশে কখন থাকিতে পারে না। উষ্ণ দেশে উৎপন্ন এ প্রযুক্ত সিংহ স্বভাবতঃ অতিশয় রোষপরবশ ও বলশালী হয়। পূর্ব্বে আফ্রিকা ও আশিয়ার মধ্যবর্ত্তি অরণ্যে অনেক সিংহ জন্মিত, এক্ষণে তথায় আর তত দেখিতে পাওয়া যায় না।

বনে থাকিলে সিংহের যেরূপ বল ও পরাক্রম থাকে গ্রামে অধিক দিন থাকিলে তাহার অনেক হ্রাস হইয়া যায়। মানব-জাতির সহবাসে সিংহের স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্ত হয় ; অর্থাৎ ইহারা পূর্ব্বতন উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে মৃদুভাব অবলম্বন করে।

কোন ব্যক্তি অনেক দিন এক সিংহের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিয়াছিল। সিংহ ক্রমে ক্রমে তাহার অত্যন্ত বশতাপন্ন হইল। সিংহপালক নির্ভয়চিত্তে কখন কখন উহার দন্ত ও জিহ্বা টানিয়া খেলা ও নানা কৌতুক করিত, তথাপি সিংহ বিরক্ত হইত না। ঐ ব্যক্তি সময়ে সময়ে প্রতিপালিত সিংহকে সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরের পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিত। লোকদিগকে কৌতুক দেখাইবার জন্যে উহার মুখের ভিতর আপন মস্তক দিত। সমাগত দর্শক-দিগকে কহিয়া রাখিত সিংহ লাঙ্গুল সঞ্চালন করিলে আমাকে কহিবে। যাবৎ সিংহের লাঙ্গুল না নড়িত ততক্ষণ তাহার মুখের ভিতর নির্ভয়ে মস্তক রাখিত, লাঙ্গুল চালনের উপক্রমেই বাহির

করিয়া লইত। লোকেরা এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সিংহপালককে কিছু কিছু পুরস্কার দিত।

সিংহ লম্বে প্রায় ছয় হাত, উচ্চ প্রায় তিন হাত, ইহার লাঙ্গূল প্রায় তিন হাত লম্বা। সিংহের স্কন্ধে কোঁকড়া কোঁকড়া ঘন ঘন অনেক লোম আছে তাহার নাম কেশর। কেশর আছে বলিয়া সিংহকে অতি সুন্দর দেখায়। যখন সিংহ রাগে তখন কেশর সকল কণ্টকের ন্যায় উন্নত হইয়া উঠে, ও দুই চক্ষু অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতে থাকে। বৃদ্ধ হইলে সিংহের কেশর ঝুলিয়া পড়ে। স্কন্ধ ভিন্ন আর আর অঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিঙ্গলবর্ণ কোমল লোম আছে; কিন্তু তল-পেটের লোম ঈষৎ শুক্লবর্ণ। সিংহের অপরিমিত বল, বড় বড় ষাড় মুখে করিয়া লম্ফ দিয়া বৃহৎ বৃহৎ নালা পার হইয়া যায়। সিংহের শব্দ অতিশয় ভয়ঙ্কর; রাত্রিকালে শব্দ করিলে মেঘগর্জ্জন বোধ হয়। সিংহী পাচ মাস গর্ভধারণ করিয়া এক বারে তিন চারিটী সন্তান প্রসব করে। শাবকেরা এক বৎসর পর্য্যন্ত স্তন্য পান করে। যৌবনাবস্থায় শরীরের অতিশয় সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য হয়। এই কালে তাহাদের তাদৃশ রাগ থাকে না। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম হইলে সিংহ পূর্ণ পরাক্রম প্রাপ্ত হয়।

পশ্বাবলী নবপর্যায়ে রামচন্দ্র মিত্রের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছিল। নবপর্যায় পশ্বাবলীর প্রথম সংখ্যা "কুক্কুরের বৃত্তান্ত" ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। রামচন্দ্র মিত্রের তত্ত্বাবধানে পশ্বাবলী নবপর্যায়ের মোট ষোলটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। এক একটি সংখ্যায় এক একটি জীব নিয়ে আলোচনা করা হোত। আলোচনা ইংরেজী ও বাংলায় লেখা। বাম পৃষ্ঠায় ইংরেজী; ডান পৃষ্ঠায় বাংলা। আলোচনাগুলির পরিকল্পনা প্রথম পর্যায় পশ্বাবলীরই মতো। এখানেও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি অপেক্ষা গল্পরসেরই প্রাধান্য।

তিন

এই যুগের 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১), 'জ্ঞানোদয়' (১৮৩১), 'বিজ্ঞানসেবধি' (১৮৩২) 'বিজ্ঞানসার সংগ্রহ' (১৮৩৩) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচনা

প্রকাশিত হোত। বিজ্ঞানসেবধি নামক মাসিক পত্রিকাটির প্রকাশক Society for Translating European Sciences বা ইয়োরোপীয় বিদ্যাগ্রন্থের অনুবাদকারী সোসাইটি। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি ক্রমশঃ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করাই এই পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল।[২] বিজ্ঞানসেবধির প্রথম সংখ্যায় ব্রোহেমের গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় অনুবাদিত হয়েছিল। ডাঃ উইলসনের উৎসাহে ও আনুকূল্যে অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই অনুবাদ করেন। অনুবাদিত বিষয় "অঙ্ক ও রেখাগণিত এবং রেখাগণিত বিদ্যার সহিত বস্তুবিষয়ক বিদ্যার বৈলক্ষণ্য।" অনুবাদ সম্পর্কে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে'র সমাচার দর্পণে মন্তব্য করা হয়েছিল, "মূলগ্রন্থের সঙ্গে ভাষান্তরিতের কিয়দংশের ঐক্য করিয়া দেখা গেল যে এই ভাষান্তরকরণ অত্যুৎকৃষ্ট অর্থাৎ মূলগ্রন্থে যেমন আছে অবিকল তেমনি অনুবাদ হইয়াছে এবং তাহা প্রকৃত বাঙ্গলা ভাষার রীত্যনুযায়ী অর্থাৎ ইঙ্গরেজীর ভাবার্থ লইয়া স্বদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় ভাষিত হইয়াছে।" বিজ্ঞান-সেবধির দ্বিতীয় সংখ্যায় ব্রোহেমের গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় আলোচিত হয়েছিল।[৩] দ্বিতীয় সংখ্যার আলোচ্য বিষয় পদার্থবিদ্যা বা পরীক্ষেয় পদার্থবিদ্যা। এতে বায়ু, ইলেক্ট্রিসিটি, অপটিক্স্ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল।[৪]

চার

বাংলা সাময়িক-পত্রে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আলোচনা সর্বপ্রথম পাওয়া গেল বিদ্যাদর্শনে। এই মাসিক পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত এই পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ছিলেন। বিদ্যাদর্শনের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই অক্ষয়কুমারের রচনা বলে মনে হয়। বিদ্যাদর্শনের প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশভঙ্গীর স্বচ্ছতায়। যথাযথ তথ্যসমাবেশও এই পত্রিকার রচনাগুলির

২ বিজ্ঞানসেবধি সম্পর্কে ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত সংবাদের সারমর্ম ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে'র সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল।

৩ সমাচার দর্পণ ; ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩২ খৃঃ।

৪ সমাচার দর্পণ ; ৩রা অক্টোবর, ১৮৩২ খৃঃ।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্ব্বেকার কোনো কোনো পত্র-পত্রিকায় তথ্য-সমাবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক প্রকৃতির। যেমন, দিগ্‌দর্শন ও পশ্বাবলীর রচনাগুলি। আবার রচনা কোথাও বা টেক্‌নিক্যাল। যেমন, সমাচার দর্পণের "বিদ্যাবিষয়" শিরোণামায় প্রকাশিত দু' একটি নিবন্ধ। বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির পরিমিত সমাবেশ বিদ্যাদর্শনে পাওয়া গেল। একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র ক'রে প্রবন্ধকে ধীরে ধীরে উপসংহারের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই পত্রিকাতেই প্রথম দেখা যায়। তা' ছাড়া পরবর্তীকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে যে সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসকল প্রকাশিত হয়েছিল তার ভিত্তি স্থাপিত হয় এই পত্রিকাতেই। এই প্রসঙ্গে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ সংখ্যা অবধি বিদ্যাদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "প্রাণীবর্গের বৃত্তান্ত" শীর্ষক রচনাটি উল্লেখযোগ্য। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে জন্তু ও বৃক্ষাদির তুলনামূলক আলোচনা, বিভিন্ন প্রাণীর প্রকৃতি, বৃক্ষাদির দ্বারা প্রাণীর উপকার, জন্তুর দ্বারা জন্তুর বিনাশ এবং অণ্ডজ, জরায়ুজ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর জন্মবৃত্তান্ত ও 'মানুষের শৈশবকাল' সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। জন্তু ও বৃক্ষের তুলনামূলক আলোচনার একাংশ রচনাভঙ্গীর নিদর্শন হিসাবে উদ্ধৃত করা হোল :—

> "যদিও বনৌষধিবর্গ হইতে প্রাণিবর্গের প্রভেদ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। তথাচ কোন ২ বৃক্ষ এবং পশুর পরস্পর এরূপ সদৃশ স্বভাব যে তাহারা কোন্ বর্গভুক্ত ইহা নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। সচেতন নামক এক প্রকার বৃক্ষ স্পর্শমাত্রই শরীর স্পন্দন এবং গমন করে এবং অনেক ২ বৃক্ষলতাদি অপেক্ষা বহুতর চেতনের কার্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। লজ্জাবতী নামে এক লতা স্পর্শমাত্র সজীবের ন্যায় সঙ্কোচিত হয়। আবার পলিপস নামক এক প্রকার পতঙ্গ সচেতন বৃক্ষ হইতেও ধীরগামী বোধ হয়, আর ছেদন করিলে কলমের বৃক্ষসম খণ্ড ২ হইয়া ও পৃথক্ ২ জীবন ধারণ করে, যাহা সচেতন নামক বৃক্ষে কদাচও প্রত্যক্ষ হয় না। এস্থলে প্রাণিবর্গ অপেক্ষা বনৌষধিবর্গ শ্রেষ্ঠতর বোধ করা যাইতে পারে, কিন্তু পলিপসের স্থান পরিবর্ত্তন, আহার অন্বেষণ, ও বিপদ মোচনের

> উপায়চেষ্টা প্রভৃতি যে বিশেষ ২ শক্তি আছে তাহাতে সে প্রাণিবর্গ ব্যতীত কদাচ অন্য বর্গভুক্ত হইতে পারে না, অতএব অতি অধম প্রাণীও অতি উত্তম বৃক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট।"

ভূগোল ও ভূবিদ্যা-বিষয়ক প্রবন্ধও বিদ্যাদর্শনে প্রকাশিত হোত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হিমালয় পর্বত সম্বন্ধে আলোচনাটি সুলিখিত। পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত সমুদ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভূবিদ্যা বিষয়ে সর্বজনবোধ্য আলোচনা "পঞ্জাবের লবণাকর" ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা বিদ্যাদর্শনে প্রকাশিত হয়।

এই পত্রিকায় রসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক একমাত্র আলোচনা "বস্তুর রচনা বিচার" (কার্ত্তিক, ১৮৪২ খৃঃ)। এতে যৌগিক ও মিশ্র পদার্থের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনাটি বিস্তারিত।

বিদ্যাদর্শনে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হোত বটে ; কিন্তু অতি অল্পকাল (মাত্র ছয় মাস) স্থায়ী হবার ফলে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে কোনো স্থায়ী অবদান এই পত্রিকার নেই।

প্রাচীন সংবাদপত্রে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ

দিগ্‌দর্শন, বিদ্যাদর্শন প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে বিজ্ঞানালোচনা প্রায় নিয়মিত-ভাবে প্রকাশিত হোত বটে ; কিন্তু সে যুগের অধিকাংশ সংবাদপত্রেই বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার স্থান ছিল নগণ্য। আধুনিক যুগে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞানালোচনার বিশেষ একটি স্থান আছে। সংবাদপত্রের সাহিত্য বিভাগ গুলোতেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রায় নিয়মিতভাবেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অত্যধিক চাহিদার জন্যে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি ও জন-মানসের অদম্য কৌতূহলই যে দায়ী তা' অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞানের যে অত্যাশ্চর্য অগ্রগতি সুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে, তা'ই বিংশ শতাব্দীতে আরও পল্লবিত ও বিকশিত হয়ে উঠল। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রতি জনসাধারণের কৌতূহলের মাত্রাও গেল বেড়ে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ছিল মন্থর। তা' ছাড়া তখনও পর্যন্ত পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি এদেশীয় জনসাধারণের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় নি। তাই সেকালের সংবাদপত্রে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের সংখ্যা অত্যল্প। একমাত্র সমাচার দর্পণকে বাদ দিলে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রের যে সকল সংখ্যা এখনও পাওয়া যায়, তাদের কোনোটিতেই বিজ্ঞানালোচনা নেই ; এমন কি তখনকার অনেক প্রখ্যাত সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গও নেই। এই প্রসঙ্গে সমাচার চন্দ্রিকা[১] (প্রঃ প্রঃ মার্চ, ১৮২২), বঙ্গদূত[২] (প্রঃ প্রঃ মে, ১৮২৯ খৃঃ), সংবাদ ভাস্কর[৩] (প্রঃ প্রঃ মার্চ, ১৮৩৯ খৃঃ) ইত্যাদি পত্রিকার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংবাদ প্রভাকরের (প্রঃ প্রঃ ১৮৩১ খৃঃ) গোড়ার দিককার সংখ্যাগুলোতে[৪] ও কোনো বিজ্ঞানা-লোচনা নেই। তবে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সমাচার দর্পণে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ এবং বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (প্রঃ প্রঃ জুন, ১৮৩৫ খৃঃ) পত্রিকার ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তীকালে সংবাদ প্রভাকর ও সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় উভয়

১-৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলিকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে সমাচার চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত ও সংবাদ ভাস্করের যে সংখ্যাগুলো রক্ষিত আছে তাদের কোনোটিতেই কোনো বিজ্ঞানালোচনা নেই।

৪ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী।

পত্রিকাতেই বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হোত। সমাচার দর্পণ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে। এই পত্রিকায় প্রাকৃতিক ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা ও সংবাদাদি প্রকাশিত হোত। তবে ভূগোল-বিষয়ক আলোচনার অধিকাংশই ছিল বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ভূগোল নিয়ে। বাণিজ্যিক ভূগোল নিয়ে আলোচনা সমাচার দর্পণের প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বাণিজ্যিক ভূগোল-বিষয়ক প্রসঙ্গের অধিকাংশই বিজ্ঞান-সংবাদ। রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক আলোচনায় যায়গায় যায়গায় শাস্ত্রীয় তথ্যাদি এসে গেছে। যেমন, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে প্রকাশিত "হিন্দুস্থানের সীমা" সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনাটি। কোনো কোনো স্থলে আলোচনা হয়ে পড়েছে শাস্ত্রনির্ভর। যেমন, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত "পৃথিবীর পরিমাণ" শীর্ষক রচনাটি। ইতিহাসমিশ্রিত ভূগোল-বিষয়ক রচনা সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারীর "লণ্ডন নগরের বিবরণ" শীর্ষক রচনাটি উল্লেখযোগ্য। এতে লণ্ডন নগরের ইতিহাস বর্ণনা ক'রে লণ্ডনের ভৌগোলিক অবস্থানের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সমাচার দর্পণে ভূ-বিবরণও কদাচিৎ প্রকাশিত হোত; তবে তা' অসম্পূর্ণ এবং খুবই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। উদাহরণস্বরূপ ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারীর সমাচার দর্পণে প্রকাশিত ব্রহ্মদেশের অসম্পূর্ণ ভূ-বিবরণটি উল্লেখযোগ্য।

সমাচার দর্পণে বিজ্ঞান-বিষয়ক সংবাদাদি প্রকাশিত হোত। কোনো কোনো বিজ্ঞান-সংবাদকে নিবন্ধের আকৃতি দিয়ে জনপ্রিয় ক'রে তোলবার প্রচেষ্টাও রয়েছে। যেমন, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত টর্পেডো সম্বন্ধে আলোচনাটি। এতে সংবাদ পরিবেশন প্রসঙ্গে টর্পেডো কি তা' বুঝিয়ে, কিভাবে টর্পেডো কাজ করে, তা'ও বোঝান হয়েছে। আলোচনাটি বৈজ্ঞানিক তথ্যসমন্বিত। কিন্তু জনপ্রিয় বিজ্ঞান পর্যায়ের অধিকাংশ বিজ্ঞান-সংবাদই নীরস। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় নি।

বিজ্ঞান-সংবাদের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক প্রসঙ্গও কিছু কিছু আছে। তবে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আলোচ্য বস্তুর তথ্যমূলক বর্ণনা না ক'রে সেই বস্তুটির অত্যাশ্চর্য গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন, ১৮২০ খৃষ্টাব্দের

২২শে জানুয়ারীর সমাচার দর্পণে "কালিদিস্কোপ"-এর বর্ণনা এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত "পেরিসকোপের" বর্ণনা। পেরিসকোপের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা হোল :—

> "কথিত আছে যে নিউ সৌথ উয়েল্সের সিদনি নগরের একজন সাহেব এক নূতন প্রকার ডুবিন সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্দ্বারা জলমধ্যে অতিস্পষ্ট দৃষ্টি হয় এই নবসৃষ্ট যন্ত্রের দ্বারা অতিভারি উপকারের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তদ্দ্বারা জলমগ্ন ব্যক্তিরদিগকে মৃত্যু হওনের পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে এবং জলমধ্যে অপচিত বস্তুও অনায়াসে মিলিতে পারে এবং মৎস্যাদি জলজন্তুর কিরূপ আচরণাদি তাহার তত্ত্বাবধারণ হইতে পারিবে।"

কোনো কোনো স্থলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বর্ণনা অতি সংক্ষেপে করা হয়েছে। যেমন ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বরের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত "আশ্চর্য্য আলোক" শীর্ষক রচনাটি।

"বিদ্যাবিষয়" এই শিরোনামায় সমাচার দর্পণে পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। তবে অধিকাংশ রচনার ভাষাই ছিল দুরূহ প্রকৃতির। এই প্রসঙ্গে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারীর সমাচার দর্পণে প্রকাশিত তাপ সম্বন্ধে আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। এখানে বাংলা আলোচনার পাশেই ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া আছে। তাপ কিভাবে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থে ব্যাপ্ত হয় তা' নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। রচনাভঙ্গী দুর্বোধ্য। এই আলোচনার অবশিষ্টাংশ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়। এখানে তাপের কাজ ও কিরণ এবং শিশির-পতনের কারণ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রসঙ্গের লেখক সম্ভবতঃ জন ম্যাক। সমাচার দর্পণে পদার্থবিদ্যা-বিষয়ক টেক্‌নিক্যাল প্রকৃতির রচনাও কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত বাষ্পের কল (The Steam Engine) বিষয়ক আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। এর লেখক জন ম্যাক। পরে এই নিবন্ধটি ম্যাকের 'কিমিয়াবিদ্যার সার' (১৮৩৫) নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত হয়। এতে প্রথমে বাষ্পের কলের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর ওয়াটস্ ডবল অ্যাক্‌টিং ষ্টিম এঞ্জিন (Watt's Double

Acting Steam Engine) সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা। বাংলা আলোচনার পাশেই ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া আছে। বয়লার, সিলিণ্ডার এবং বীম সম্বন্ধে আলোচনা বিস্তারিত এবং সারগর্ভ। ইংরেজী বিজ্ঞানবিষয়ক শব্দগুলি চলিত বাংলায় অনুবাদের প্রচেষ্টা রয়েছে। যেমন, বয়লারের বাংলা করা হয়েছে 'হাঁড়ি', সিলিণ্ডারের বাংলা 'চুঙ্গী'। রচনাটি যায়গায় যায়গায় অত্যন্ত টেক্‌নিক্যাল। তবে ভাষা "বিদ্যাবিষয়" এই শিরোনামায় প্রকাশিত পূর্ববর্তী আলোচনাগুলো অপেক্ষা কিছুটা প্রাঞ্জল।

"বিদ্যাবিষয়" এই শিরোনামায় রসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনাও প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারীর সমাচার দর্পণে প্রকাশিত "আকষণ" শীর্ষক রচনাটি উল্লেখযোগ্য। এখানেও বাংলার পাশেই ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া আছে। রচনাটির লেখক সম্ভবতঃ জন ম্যাক। এতে পরমাণু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে দুই প্রকার আকর্ষণ "সংলাগাকর্ষণ" ও "কিমিয়াকর্ষণ" সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কি কি অনুপাতে থাকলে বিভিন্ন বস্তু পরস্পর মিলিত হয়, এখানে তা' বোঝান হয়েছে। রচনাভঙ্গী নীরস। ভাষা দুরূহ প্রকৃতির। রচনার নিদর্শন : কিমিয়াকর্ষণের কাজ (effect of chemical attraction) সম্বন্ধে লেখক বলেছেন,

> "কিমিয়াকর্ষণের কার্য্য পূর্ব্বোক্ত কার্য্য হইতে অনেক রূপান্তর। দুই তিন প্রকার ভিন্ন বস্তুর পরমাণু ইহাতে সংযুক্ত কিম্বা পরস্পর লীন হয় এবং তাহাতে নূতন বস্তু জন্মে। তাহার মূলবস্তুর প্রধান গুণ সেই নূতন বস্তুতে লুপ্ত হইতে পারে এ নূতন বস্তুতে যে গুণান্তরোৎপত্তি হয় সেই গুণ তাহার মূল বস্তুর নয়। কতক ২ বস্তু কিমিয়াকর্ষণের দ্বারা কখন পরস্পর লীন হয় না এবং যে বস্তু লীন হইতে পারে সেই বস্তুর পরস্পরাকর্ষণ শক্তিরও অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য হয়। অতএব কতক বস্তু যদি একত্র রাখা যায় তবে যে বস্তুর মধ্যে পরাস্পরাকর্ষণ শক্তি বৃহৎ সেই বস্তু কেবল লীন হইবে এবং দুই বস্তু পরস্পর লীন হইলে তাহার একের প্রতি অধিকার্ষণ শক্তি তৃতীয় বস্তু যদি নিকটবর্ত্তি হয় তবে পূর্ব্ব লীন বস্তুর লয় নষ্ট হইয়া অধিকাকর্ষণবিশিষ্ট বস্তু ঐ তৃতীয় বস্তুর সহিত লীন হইয়া একপ্রকার নূতন বস্তু উৎপন্ন হয়। এই এক প্রমাণেতে

কিমিয়াবিদ্যার তাবৎ কার্য্যের অধিকাংশ সম্পন্ন হয়। যেহেতুক এই প্রকারে তাবদ্বস্তু লীন ও বিলীনকরণের দ্বারা আমরা জ্ঞাত হইতে পারি যে সে বস্তু কি ও তাহার গুণ কি।"

প্রাণীবিজ্ঞান-বিষয়ক ছোট ছোট আলোচনাও সমাচার দর্পণে পাওয়া যায়। যেমন, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে প্রকাশিত "তূত পোকা" (silk worm) শীর্ষক রচনাটি। এখানে তূঁত পোকার জন্ম, তূঁত কীটের দ্রুত বৃদ্ধি, তূঁত পোকার আকৃতি, প্রকৃতি ও গুটিবাঁধার পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। আলোচনাটি সর্বসাধারণের বোঝবার উপযোগী ক'রে লেখা। জাতিতত্ত্ব-বিষয়ক প্রাথমিক প্রকৃতির নিবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও তাদের আবাসস্থলের বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য।

অতএব দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হোত। প্রথম দিকে প্রকাশিত বিজ্ঞানালোচনাগুলো অসম্পূর্ণ এবং একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির। এদের অধিকাংশই বিজ্ঞান-সংবাদ। কিন্তু পরবর্তীকালে তথ্যপূর্ণ ও সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক রচনাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাবিষয় পর্যায়ের রচনাগুলোই এর নিদর্শন। তবে সমাচার দর্পণের যে সংখ্যাগুলো এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাদের কোনোটিতেই সর্বজনবোধ্য ও সরস বৈজ্ঞানিক রচনা নেই।

সমাচার দর্পণ ছাড়া রামমোহন রায়ের স্মৃতিবিজড়িত "সম্বাদ কৌমুদী" (ডিসেম্বর, ১৮২১) পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত।

দ্বিতীয় পর্ব (গঠন যুগ)

অক্ষয়কুমার দত্ত ও তৎকালীন যুগ

(অক্ষয়কুমার থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পূর্ব পর্যন্ত)

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানালোচনার গোড়াপত্তন করেছিলেন ইউরোপীয়েরা। কিন্তু অধিকাংশ ইউরোপীয় লেখকের ভাষা ছিল কৃত্রিম ও জটিল। ভাষার কৃত্রিমতা দূর ক'রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে দেশীয় সাজে সজ্জিত করলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে অক্ষয়কুমারের অবদান নির্ণয় করতে গেলে এই লেখকের পূর্ববর্তী বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিচার করতে হয়। অক্ষয়কুমারের প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই হিসাবে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দকে পূর্ববর্তী বিজ্ঞান-সাহিত্যের সীমারেখা ধরা চলে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার পথ দেখিয়েছিলেন ইউরোপীয়েরা। গোড়ার দিককার প্রায় সবগুলো বিজ্ঞানগ্রন্থই ইউরোপীয়দের লেখা। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা প্রথম বাংলা অঙ্ক বই মে-গণিতের (১৮১৭) লেখক রবার্ট মে ইউরোপীয়। বাংলা ভাষায় প্রথম অস্থি ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বিদ্যাহারাবলীর (১৮২০) লেখক ফেলিক্স্ কেরী এবং প্রথম রসায়নবিজ্ঞান কিমিয়াবিদ্যার সারের (১৮৩৪) লেখক জন ম্যাক্ও ইউরোপীয়। এ ছাড়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানগ্রন্থের প্রায় সবগুলোই ইউরোপীয়েরা লিখেছিলেন। যেমন, পিয়ার্সের ভূগোলবৃত্তান্ত (১৮১৯), মার্শম্যানের জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায় (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮১৯), হার্লের গণিতাঙ্ক (প্রঃ প্রঃ ১৮১৯ খৃঃ), লোসনের পশ্বাবলী (১ম সংখ্যা—১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে[১]), পিয়ার্সনের ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন (১৮২৪), ইয়েট্স্-এর পদার্থবিদ্যাসার (১৮২৪) এবং জ্যোতির্বিদ্যা (১৮৩৩)। এদেশীয়দের রচিত প্রথম অঙ্ক বই হলধর সেনের বাঙ্গলা অঙ্ক-পুস্তক (১২৪৬ বঙ্গাব্দ) একটি অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ। শিশুসেবধি-গণিতাঙ্ক, ১ম ভাগ (১২৪৬) সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এদেশীয়দের মধ্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন রামমোহন রায়। তিনি ইংরেজী ও বাংলায় একটি ভূগোল লেখেন। গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'জ্যাগ্রাহী'।

১ কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর তৃতীয় রিপোর্টে পশ্বাবলীর প্রশংসা করা হয়। এই তৃতীয় রিপোর্ট পাঠ করা হয় ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর।

এ ছাড়া তিনি জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক একখানি বই (খগোল) ও একটি জ্যামিতিও লিখেছিলেন।[২] উপরোক্ত তিনটি গ্রন্থের মধ্যে একটিও পাওয়া যায় না। এদেশে ইউরোপীয় বিজ্ঞানপ্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে রামমোহন রায় লর্ড আমহার্ষ্টের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, এই প্রসঙ্গে তা'ও উল্লেখযোগ্য। রাধাকান্ত দেবের শিশুপাঠ্য বই বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থেও (১৮২১) ভূগোল এবং গণিত বিষয়ক কিছু কিছু আলোচনা রয়েছে। তবে তা' একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির। অতএব, দেখা যাচ্ছে, বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার পথ দেখিয়েছিলেন প্রধানতঃ ইউরোপীয়েরাই। কিন্তু ইউরোপীয় গ্রন্থকারদের মধ্যে একমাত্র ইয়েট্স্ ছাড়া অপরাপর লেখকদের প্রায় সকলের ভাষাই ছিল কৃত্রিম ও দুর্বোধ্য। উদাহরণস্বরূপ ফেলিক্স্ কেরী ও ম্যাকের দুর্বোধ্য ভাষার কথা উল্লেখ করা যায়। অক্ষয়কুমার দত্তই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দেশীয় সাজে সজ্জিত করেন। শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথম বাঙ্গালী যিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিলেন। অক্ষয়কুমারের প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ ভূগোল। তত্ত্ববোধিনী সভার অনুমতিক্রমে ১৭৬৩ শকাব্দে (১৮৪১ খৃঃ) এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছিল ক্লিফ্টের ভূগোলসূত্র, হেমিল্টনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেট, মিচেলের ভূগোল প্রভৃতি ইংরেজী গ্রন্থ থেকে। অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে পৃথিবীর আকৃতি, পরিমাণ, গোলত্ব, জলস্থলের বিবরণ, বিভিন্ন মহাদেশের প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক বিবরণ এবং অধিবাসীদের ধর্ম ও ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হলেও পৃথিবীর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল নিয়ে সামগ্রিক আলোচনার প্রয়াস ইতিপূর্বে প্রকাশিত শিশুসেবধি (প্রঃ প্রঃ ১২৪৭ সাল) নামক গ্রন্থেও অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল। অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে এই প্রয়াস আরও বিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত। তা' ছাড়া শিশুসেবধির তুলনায় তাঁর রচনা অনেক বেশী তথ্যসমৃদ্ধ। পিয়ার্সের ভূগোলবৃত্তান্তে এরূপ সামগ্রিক আলোচনার কোনো প্রয়াস নেই। পিয়ার্সনের 'ভূগোল এবং

২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত (পঞ্চম সংস্করণ)—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪০৭। প্রথম সংস্করণেও (১২৮৭) নগেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থগুলোর কথা বলেছেন এবং কোনো গ্রন্থই পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করেছেন।

জ্যোতিষ'-এ এর ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল মাত্র। তবে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থের সর্বপ্রধান ত্রুটি স্বল্পপরিসরের মধ্যে অধিক তথ্যের সমাবেশ। ফলে রচনা যায়গায় যায়গায় তথ্যভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। রচনার নিদর্শন :—

> "জলের বিবরণ। মহাসাগর পঞ্চ অংশে বিভক্ত যথা আটলান্টিক মহাসাগর, পাসিফিক মহাসাগর, হিন্দী মহাসাগর, এবং উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর।
>
> আট্‌লান্টিক মহাসাগরের পূর্ব্ব সীমা ইউরোপ এবং পশ্চিম সীমা আমেরিকা। তাহার পরিমাণ প্রায় ৪২৫০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ১০০০ হইতে ২৫০০ ক্রোশ প্রস্থ।
>
> পাসিফিক মহাসাগরের পশ্চিম সীমা আসিয়া এবং পূর্ব্ব সীমা আমেরিকা। তাহার পরিমাণ প্রায় ৫৫০০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৩৫০০ ক্রোশ প্রস্থ।
>
> হিন্দী মহাসাগরের পশ্চিম সীমা আফ্রিকা, পূর্ব্ব সীমা নব হলণ্ড, উত্তর সীমা ভারতবর্ষ, দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ মহাসাগর। তাহার পরিমাণ ২৫০০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ২০০০ ক্রোশ প্রস্থ।
>
> উত্তর মহাসাগরের উত্তর সীমা উত্তর কেন্দ্র দক্ষিণ সীমা উত্তর কেন্দ্রীয় মণ্ডল।
>
> দক্ষিণ মহাসাগরের দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ কেন্দ্র উত্তর সীমা উত্তমাশা অন্তরীপ, হর্ণ অন্তরীপ এবং নবজীলণ্ডের উত্তর অংশ।"

অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক গ্রন্থটিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলা যায় না। তবে এর যায়গায় যায়গায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি রয়েছে। এই গ্রন্থরচনার মূলে ছিল ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনে লেখকের পাণ্ডিত্য এবং ব্রাহ্ম-ধর্মের মধ্য দিয়ে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্মভাবের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা। গ্রন্থটি দু' ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৭৭৩ শকাব্দের পৌষ মাসে (১৮৫১ খৃঃ) ; আর ২য় ভাগের প্রকাশকাল মাঘ, ১৭৭৪ শকাব্দ (১৮৫৩ খৃঃ)। ১৭৭০ শকাব্দের মাঘ সংখ্যা থেকে গ্রন্থটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। জর্জ কুম্বের 'Constitution of Man' অবলম্বনে এ বইটি লেখা। কুম্ব তাঁর গ্রন্থে

প্রাকৃতিক নিয়মের মূলে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে বোঝাতে চেয়েছেন, কিভাবে জীবনযাপন করলে উপকার হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে কি কি অপকার হয়। অক্ষয়কুমার কুম্বের এই চিন্তাধারাটি অনুসরণ করেছেন; কিন্তু তাঁর গ্রন্থের হুবহু অনুবাদ করেন নি। অক্ষয়কুমার এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন এদেশীয় জনসাধারণের রুচি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থটি সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু তৎকালীন বাঙ্গালী, বিশেষতঃ যুবক সম্প্রদায়ের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। অক্ষয়কুমার যখন অসুস্থ তখন এই গ্রন্থের 'নিরামিষ আহার' সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল,

"ছিঁড়ে ফেল বাহ্যবস্তু টেনে মার কূম,
পেট পূরে মাছ খেয়ে কসে মার ঘুম।"

মন্তব্যটি সম্ভবতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের।

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'কে বিজ্ঞানবিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলা না গেলেও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ এর যায়গায় যায়গায় রয়েছে। অল্প কথায় ও প্রাঞ্জল ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় বোঝাবার চেষ্টা সেখানে সুস্পষ্ট। যেমন,

> "মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু ভূতলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই সাধারণ নিয়মের অনুগত থাকাতে, মানবদেহও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য বেলুন যন্ত্র সহকারে ঊর্দ্ধগামী হইতে পারেন বলিয়া, লোকে জ্ঞান করিতে পারে, যে তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া যান। বস্তুতঃ, আকর্ষণ অতিক্রম করা দূরে থাকুক, ইহা ঐ আকর্ষণ শক্তিরই কার্য্য। যেমন শোলা ও তৈল জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ বেলুন যন্ত্র বায়ুর মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। পৃথিবী বায়ুকেও যেমন আকর্ষণ করে, বেলুন যন্ত্রকেও তেমনি আকর্ষণ করে। কিন্তু বেলুন যন্ত্রে যে বাষ্প থাকে, তাহা এরূপ লঘু, যে সমুদায় বেলুন তাহার

> আয়তন-প্রমাণ বায়ু রাশি অপেক্ষায় লঘুতর হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। অতএব, এস্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ-ক্রিয়ার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না।"

সরল ও সরস বালকপাঠ্য রচনার মধ্য দিয়ে অক্ষয়কুমার বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যকে জনপ্রিয় ক'রে তুললেন। চারুপাঠের বৈজ্ঞানিক রচনাগুলোই এর নিদর্শন। চারুপাঠে প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি তিন ভাগে প্রকাশিত হয়। ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৭৭৫ শক (১৮৫৩ খৃঃ), ১৭৭৬ শক (১৮৫৪ খৃঃ) ও ১৭৮১ শক (১৮৫৯ খৃঃ)। চারুপাঠের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। গ্রন্থটির তিনটি ভাগই কয়েকটি ক'রে পরিচ্ছেদে বিভক্ত। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উপদেশ ও নীতিকথামূলক প্রবন্ধের ফাঁকে ফাঁকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রয়েছে। এভাবে রচনা-সন্নিবেশের কারণ সম্পর্কে লেখক ১ম ভাগের বিজ্ঞাপনে বলেছেন, "এক বিষয়ের অনেক প্রস্তাব উপর্য্যুপরি অধ্যয়ন করিতে হইলে, বিরক্তি জন্মে ও ক্লেশ বোধ হয়, এ নিমিত্ত প্রত্যেক পরিচ্ছেদে নানাবিধ প্রস্তাব একত্র স্থাপিত হইয়াছে।" তিন ভাগ মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার সংখ্যাই চারুপাঠে অধিক। চারুপাঠে প্রাণী ও উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক রচনা রয়েছে। প্রাণীবিজ্ঞান-বিষয়ক রচনারই প্রাধান্য। চারুপাঠের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলোতে অক্ষয়কুমার তথ্যসন্নিবেশ অপেক্ষা রচনাকে মনোরম ক'রে তোলবার দিকেই বেশী জোর দিয়েছেন। তথ্যসমাবেশের দিক থেকে বিচার করলে অনেক প্রবন্ধই দুর্বল, সন্দেহ নেই; কিন্তু সরল ভাষা ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী অধিকাংশ রচনাকে গল্পের মতো সুখপাঠ্য ক'রে তুলেছে। এখানেই চারুপাঠের বৈজ্ঞানিক রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্য। রচনার একটি নিদর্শন: 'পুরুভুজ প্রাণী' সম্পর্কে আলোচনার একাংশ :—

> "এই অসাধারণ জন্তুকে দুই খণ্ড করিলে, যে খণ্ডে মস্তক থাকে তাহা হইতে এক নূতন পুচ্ছ নির্গত হয়, এবং যে খণ্ডে পুচ্ছ থাকে তাহা হইতে এক নূতন মস্তক উৎপন্ন হয়। এইরূপে উভয় খণ্ডের সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয়া এক এক খণ্ড এক একটি জন্তু হইয়া উঠে। অন্যান্য জন্তুর সন্তানোৎপাদনের রীতি যে প্রকার, পুরুভুজের সে

> প্রকার নহে। তাহার সন্তানেরা প্রথমে তাহার শরীরোপরি ব্রণের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, এবং ন্যূনাধিক দুই দিবসে সম্পূর্ণ সমুদায় অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার গাত্র হইতে স্খলিত ও পতিত হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! ঐ দ্বিতীয় পুরুভুজ উক্ত প্রকারে পতিত হইবার পূর্ব্বেই উহার শরীরে আর একটা পুরুভুজও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এইরূপে চারি পুরুষ পরস্পর একত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে।"

অক্ষয়কুমারের সর্বশেষ বিজ্ঞানগ্রন্থ 'পদার্থবিদ্যা' ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলায় সুপরিকল্পিতভাবে পদার্থবিজ্ঞান লিখবার সার্থক প্রয়াস এই গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া গেল। তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনস্থ পাঠশালার জন্যে একখানি পদার্থবিদ্যা লেখা হয়েছিল। এ গ্রন্থখানি তারই পরিবর্ধিত সংস্করণ।[৩] ইতিপূর্বে পদার্থবিদ্যাসার নাম দিয়ে দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থ দু'টি হোল ইয়েট্স্-এর 'পদার্থবিদ্যাসার' (প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খৃঃ) এবং পূর্ণচন্দ্র মিত্রের 'পদার্থবিদ্যাসারঃ' (প্রঃ প্রঃ ১৮৪৭ খৃঃ)। কিন্তু এদের কোনোটিকেই ঠিক পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ বলা যায় না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ (জ্যোতির্বিদ্যা, ভূ ও ভূগোলবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি) উভয় গ্রন্থেরই আলোচ্য বিষয়। পদার্থবিদ্যা নিয়ে বাংলায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করলেন অক্ষয়কুমার। অক্ষয়কুমারের পদার্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হোল জড় ও জড়ের গুণ (Matter and its general properties)। পদার্থবিজ্ঞানের এই একটি মাত্র বিভাগ নিয়ে আলোচনা করলেও পদার্থবিদ্যার এই প্রথম ও প্রধান বিভাগটি আলোচনার জন্যে বেছে নিয়ে অক্ষয়কুমার সুযুক্তি ও দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। কারণ, ইতি-পূর্বে ঠিক পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে কোনো গ্রন্থই বঙ্গসাহিত্যে রচিত হয় নি। অবশ্য, ইতিপূর্বে শ্রীরামপুর নিবাসী হরিশ্চন্দ্র দে চতুর্ধুরীণ এবং শ্রীনাথ দে চতুর্ধুরীণ পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে বাংলায় গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ডেস্ কোর্স (Day's Course) নামে একটি পুস্তক সিরিজ প্রকাশের সংকল্প করেছিলেন। কালিদাস মৈত্র লিখিত 'বাষ্পীয় কল ও

৩ অক্ষয়-চরিত—নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। পৃঃ ৩২।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১৮৫৫) এবং 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ' (১৮৫৫) এই সিরিজের বই। এ ছাড়া এ সিরিজের আর কোনো বই প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। এ দু'টি বইতে পদার্থবিজ্ঞানের মূল বিষয় অপেক্ষা এর ব্যবহারিক দিকের ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অক্ষয়কুমার পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে সর্বাগ্রে জ্ঞাতব্য জড় ও জড়ের গুণ নিয়ে আলোচনা ক'রে বঙ্গসাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগ নিয়ে আলোচনার উৎস-মুখও খুলে দিয়েছিলেন। পদার্থবিদ্যার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত ও অনুবাদিত হয়েছিল।[৪] এ গ্রন্থটির অধিকাংশই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[৫]

পদার্থবিদ্যায় অক্ষয়কুমার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলোর বাংলা নাম ব্যবহার করেছেন। অনেকক্ষেত্রেই তাঁকে নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে হয়েছে। পরবর্তী পদার্থবিজ্ঞান-লেখকগণ বহুক্ষেত্রেই বাংলা বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারে অক্ষয়কুমারকে অনুসরণ করেছেন। যেমন Electricity-র বাংলা অক্ষয়কুমার করলেন তাড়িত। পরবর্তী পদার্থবিজ্ঞান-লেখক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র রায় ও সূর্যকুমার অধিকারী এই তাড়িত শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। Inertia-র বাংলা অক্ষয়কুমার লিখলেন জড়ত্ব। মহেন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র ও সূর্যকুমারও Inertia অর্থে জড়ত্ব শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া আরও কতকগুলো বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারে এদের মধ্যে হুবহু মিল রয়েছে। যেমন, Non-conductor—অপরিচালক ; Ductility—তান্তবতা ; Degree—তাপাংশ ; Thermometer—তাপমান ; Centre of gravity—ভারকেন্দ্র। অবশ্য সূর্যকুমার অধিকারী অক্ষয়কুমার অপেক্ষা মহেন্দ্রনাথকেই বেশী অনুসরণ করেছিলেন।

অক্ষয়কুমারের পদার্থবিদ্যায় পরমাণু ও জড়ের বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে মোটামুটিভাবে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—১ম ভাগের পরিকল্পনার সঙ্গে এর কিছুটা মিল দেখা যায়। তবে ভূদেবের রচনা অক্ষয়কুমারের তুলনায় টেকনিক্যাল। রচনাভঙ্গীও অক্ষয়কুমারেরই বেশী সরল। গতি ও বেগ সম্বন্ধে আলোচনা ভূদেববাবুর গ্রন্থেই বিস্তৃততর।

৪ পদার্থবিদ্যা—অক্ষয়কুমার দত্ত। বিজ্ঞাপন।

৫ ১৭৭৩ শকাব্দের আষাঢ় সংখ্যা (৯৫ সংখ্যা) থেকে।

পদার্থবিদ্যায় বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনা না থাকলেও অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য বিষয় বোঝাবার ফলে রচনার উৎকর্ষতা বেড়েছে। তা' ছাড়া এই গ্রন্থটির বিভিন্ন যায়গায় যে সব তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে, বর্ণনাভঙ্গীর সরসতার জন্যে তা' উল্লেখযোগ্য। যেমন, যোগাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণের তুলনামূলক আলোচনা, অথবা বিভিন্ন বস্তুর স্থিতিস্থাপকতার তুলনামূলক আলোচনা। এইরূপে অক্ষয়কুমার 'বাহ্যবস্তুর······বিচার' ও চারুপাঠের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যকে সরস ও জনপ্রিয় ক'রে তুললেন, অপরদিকে তেমনি 'ভূগোল' ও 'পদার্থবিদ্যা'য় পথ দেখালেন প্রাঞ্জল, সুপরিকল্পিত ও তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার।

উপরোক্ত বইগুলি ছাড়া অক্ষয়কুমার একটি জ্যামিতি লিখেছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নি।[৬] দৃষ্টিবিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান প্রভৃতি নিয়েও তাঁর গ্রন্থ রচনার ইচ্ছে ছিল।[৭] কিন্তু এগুলির মধ্যে একমাত্র বারিবিজ্ঞান সম্বন্ধেই তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা অক্ষয়কুমারের জীবনে মোটেই আকস্মিক নয়। বিজ্ঞানস্পৃহা শিশুকাল থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল। কৈশোরে পিয়ার্সনের ভূগোল তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল।[৮] ইংরেজী গ্রন্থের প্রতি তাঁর অনুরাগ সৃষ্টি হবার মূলে এই ভূগোল গ্রন্থখানার যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলে মনে হয়।[৯] গল্প-উপন্যাস অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রতিই তাঁর টান ছিল বেশী। গণিত, শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি গ্রন্থ তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। এককালে অবসর সময়ে তিনি কবিতাও লিখতেন। তবে বিজ্ঞানের আকর্ষণ অক্ষয়কুমারের জীবনে গভীর ও ব্যাপক ছিল। এমনকি তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক থাকাকালীনও তিনি মেডিকেল কলেজে গিয়ে উদ্ভিদ ও রসায়নবিদ্যার ক্লাশ করতেন।

সাময়িক-পত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের এই বিজ্ঞানানুরাগ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ, সাময়িক-পত্রের সম্পাদক হিসেবেও বাংলা

৬ অক্ষয়কুমার দত্ত—অক্ষয়কুমার রায় প্রণীত। ২য় সংস্করণ—পৃঃ ৩৬।

৭ অক্ষয়-চরিত—নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। পৃঃ ৩৩।

৮ ভারত-শ্রমজীবী—বৈঃ ও জ্যৈঃ, ১২৯২, অক্ষয়কুমার দত্ত—১০-৫২ পৃঃ।

৯ নব্যভারত—১৩১৫, পৌষ সংখ্যা ; জ্ঞানবীর অক্ষয়কুমার দত্ত।

বিজ্ঞানসাহিত্যে তথা বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কুমারের বিরাট অবদান রয়েছে। তিনি বিদ্যাদর্শনের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। বিদ্যাদর্শন—এই মাসিক পত্রিকাটি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিদ্যাদর্শনের প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রকাশের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছিল, তার একাংশে ছিল,"……যত্নপূর্ব্বক নীতি ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানাপ্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক…।" বাংলা সাময়িক-পত্রে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিদ্যাদর্শনেই প্রথম পাওয়া গেল। ইতিপূর্বে প্রকাশিত দিগ্দর্শন (প্রঃ প্রঃ এপ্রিল ১৮১৮ খৃঃ) সমাচার দর্পণ (প্রঃ প্রঃ ২৩শে মে, ১৮১৮ খৃঃ), বঙ্গদূত (প্রঃ প্রঃ ১০ই মে, ১৮২৯ খৃঃ), সংবাদ-প্রভাকর (প্রঃ প্রঃ ২৮শে জানুঃ, ১৮৩১ খৃঃ), সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় (প্রঃ প্রঃ জুন, ১৮৩৫ খৃঃ) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়ও বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত বটে ; কিন্তু এই সকল পত্র-পত্রিকার বৈজ্ঞানিক রচনাগুলির তুলনায় বিদ্যাদর্শনের বৈজ্ঞানিক আলোচনাগুলি অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের। বিদ্যাদর্শনে প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা ও ভূগোল এবং রসায়নবিদ্যা বিষয়ক আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক অক্ষয়কুমার স্বয়ং। বিদ্যাদর্শন অল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল। জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাদর্শন দীর্ঘকাল স্থায়ী না হবার কারণ, তখনও জনসাধারণের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয় নি। এ সম্পর্কে ১২৯২ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারত-শ্রমজীবী পত্রিকায় "অক্ষয়কুমার দত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল, "অক্ষয়বাবু উৎসাহের সহিত জ্ঞান বিতরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ……টাকীর মৃত মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঘোষের সাহায্যে 'বিদ্যাদর্শন' নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। সর্ব্বপ্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার দূর করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু সে সময় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য লোক ছিল না। 'মহানবমী', 'রসরাজ' প্রভৃতি অশ্লীলতাপূর্ণ পত্রপত্রিকাই সেই সময়ে সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইত। এখন সাধারণের বিজ্ঞানাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য যে ঘোর আগ্রহ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন সেরূপ ছিল না। বিদ্যাদর্শন ছয় মাস ব্যতীত জীবিত রহিল না।" বিদ্যাদর্শনের প্রথম প্রকাশকাল এবং ভারত-শ্রমজীবী পত্রিকায় এই মন্তব্য প্রকাশের তারিখের মধ্যে কালের ব্যবধান ৪৩ বৎসর। ৪৩ বৎসরের মধ্যে বাংলার জনসাধারণের এই যে রুচির পরিবর্তন, এর মূলে তত্ত্ববোধিনী

পত্রিকার অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ, যে পরিকল্পনা নিয়ে অক্ষয়কুমার বিদ্যাদর্শন পত্রিকার পরিচালনা আরম্ভ করেছিলেন, তা' পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল তত্ত্ববোধিনীতে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ বার বৎসর ধরে অক্ষয়কুমার এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম ২৫টি সংখ্যায় অবশ্য কোনো বিজ্ঞানালোচনা নেই। ২৫ থেকে ৪৬ সংখ্যার মধ্যেও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রাথমিক প্রকৃতির আলোচনা ছাড়া উচ্চাঙ্গের কোনো রচনা নেই। ৪৭ সংখ্যা (আষাঢ়, ১৭৬৯ শক) থেকেই তত্ত্ববোধিনীতে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক রচনাদি প্রকাশিত হতে লাগল। বস্তুতঃ, এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত। আর এই নবযুগের উদ্গাতা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমারের বাহ্যবস্তুর······বিচার, পদার্থবিদ্যা, চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থের অধিকাংশই এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনীতেই সর্বপ্রথম এক একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার মর্যাদা পেল। এ ছাড়া তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হোল জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত, পদার্থবিদ্যা, এবং ভূতত্ত্ব, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ক সারগর্ভ প্রবন্ধাদি। প্রবন্ধগুলি আকৃতিতেও হোল বিস্তৃততর। টেক্‌নিক্যালিটি বাদ দিয়ে সরল ও সর্বজনবোধ্য ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে রীতি তত্ত্ববোধিনীতে দেখা গেল, তা' সে যুগের ও পরবর্তী যুগের সাময়িক পত্রিকাগুলোতেও অনুসৃত হোল। তা' ছাড়া সে যুগে বাংলাভাষার প্রতি জনসাধারণের অবজ্ঞা দূরীকরণেও তত্ত্ববোধিনী যথেষ্ট সাহায্য করল।

অতএব দেখা যাচ্ছে, পত্রিকা-সম্পাদক হিসেবেও বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে অক্ষয়কুমারের দান অপরিসীম। অসুস্থতার জন্যে অক্ষয়কুমার যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা বন্ধ করলেন তখন এই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা সাত শত থেকে দু'শতে এসে দাঁড়িয়েছিল। অতএব, প্রথম বার বৎসরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাফল্য যে অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিগত, তা' বোধ করি অস্বীকার করা চলে না। সে যুগের কোনো কোনো পত্রিকা অক্ষয়কুমারের নাম ভাঙ্গিয়ে পত্রিকার প্রচার বাড়াতে চেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 'উপহার' পত্রিকার নাম করা যেতে পারে। "বঙ্গীয় লেখক চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু

অক্ষয়কুমার দত্ত" এই পত্রিকায় লিখে থাকেন বলে উপহারের বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করা হয়। এই প্রসঙ্গে ১২৮৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাহে' মন্তব্য করা হয়, "বঙ্গীয় লেখক চূড়ামণি অক্ষয়কুমার দত্ত বলিলে 'বাহ্যবস্তু', 'চারুপাঠ' প্রভৃতি প্রণেতা অধুনা বালী নিবাসী পণ্ডিতবর অক্ষয়কুমার দত্তই লক্ষিত হন। কিন্তু আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি যে, উক্ত অক্ষয়বাবু উপহার নামক কোন সাময়িকপত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহেন ; লিখিতে স্বীকৃত হওয়া ত দূরের কথা।"

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে অক্ষয়কুমার বাংলা গদ্যসাহিত্যের বলিষ্ঠতা ও প্রকাশক্ষমতা অনেকখানি বাড়িয়ে দিলেন। উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানসাহিত্য রচনায় প্রয়োজন সংযত দৃষ্টিভঙ্গী, যথাযথ তথ্যসন্নিবেশ ও প্রাঞ্জল ভাষা। অক্ষয়কুমারের রচনায় এই তিনটি গুণই বিদ্যমান। ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা জন্মভূমিতে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে ললিতচন্দ্র মিত্র কবিতা লিখেছিলেন,

"বিজ্ঞান-সাহিত্য শোভে তোমার লেখায়,
অক্ষয় অক্ষয় কীর্ত্তি পুণ্য বাঙ্গালায়।"

এই উক্তিকে সমর্থন ক'রে আমরাও বলতে পারি, অক্ষয়কুমার শুধু উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানসাহিত্যই রচনা করলেন না, বিজ্ঞানের তথ্য ও ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষারও সৃষ্টি ক'রে গেলেন। অক্ষয়কুমারের প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। তাঁর রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোল, ভাষার বলিষ্ঠ বাঁধুনি ও সংযমবোধ।

এইরূপে বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রধান রূপকার অক্ষয়কুমার বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের কাঠামোতেও একটি পরিণত রূপ দিয়ে গেলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমারের এই কৃতিত্বের মূলে রয়েছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্থান অতি উচ্চে। দীর্ঘকাল জীবিত থেকে এই পত্রিকা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে নানাভাবে পুষ্ট করেছে। এই পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে প্রকাশিত বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু অত্যন্ত ক্ষণজীবী হওয়ায় এই পত্রিকা বিজ্ঞান-প্রবন্ধ রচনার কোনো আদর্শ স্থাপন করে যেতে পারে নি। এই আদর্শ স্থাপনের কৃতিত্ব তত্ত্ববোধিনীর। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধের ভাষা হিসাবে বাংলার ওজস্বিতা অনেকখানি বেড়ে গেল। ভাষায় ও ভাবধারায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যে নবযুগের সূচনা হোল তার মূলে অক্ষয়কুমার দত্তের দান সর্বাধিক। তাঁরই সম্পাদনায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। জোড়াসাঁকোর তত্ত্ববোধিনী কার্যালয় থেকে এই পত্রিকা প্রতি মাসে প্রকাশিত হোত।

এক

অক্ষয়কুমার দত্ত দীর্ঘ বার বৎসর (১৮৪৩-১৮৫৫) কাল তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনা করেছিলেন। এই বার বৎসরের মধ্যে পক্ষির বিবরণ (প্রঃ প্রঃ ১৮৪৪ খৃঃ), সত্য প্রদীপ (প্রঃ প্রঃ মে, ১৮৫০ খৃঃ), সত্যার্ণব (প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৮৫০ খৃঃ), বিবিধার্থসংগ্রহ (প্রঃ প্রঃ অক্টোবর, ১৮৫১ খৃঃ), সুলভ পত্রিকা (প্রঃ প্রঃ জুলাই. ১৮৫৩ খৃঃ), বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা (প্রঃ প্রঃ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫ খৃঃ) ইত্যাদি বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে একমাত্র বিবিধার্থসংগ্রহকে বাদ দিলে অপরাপর পত্রপত্রিকার তুলনায় তত্ত্ববোধিনীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের। পূর্ববর্তী সাময়িকপত্র দিগ্দর্শন ও সমাচার দর্পণের বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গগুলির সঙ্গেও তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধের কোনো তুলনাই চলে না। দিগ্দর্শনের অধিকাংশ রচনায়ই তথ্যের অভাব। সমাচার দর্পণের

বিজ্ঞানালোচনার অধিকাংশই ছিল বিজ্ঞান-সংবাদ ; কোনো কোনোটি ছিল বিজ্ঞান-প্রস্তাব। এদের ভাষা প্রায় সর্বত্রই ছিল জটিল ও কৃত্রিম। তা'ছাড়া এদের অধিকাংশই ছিল প্রাথমিক প্রকৃতির রচনা। ভাষার কৃত্রিমতা ঘুচিয়ে পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত হয়েছিল বিদ্যাদর্শনে। যে আদর্শের সূত্রপাত হয়েছিল বিদ্যাদর্শনে, তা'ই অপেক্ষাকৃত বিকশিত ও পরিণত আকারে দেখা গেল তত্ত্ববোধিনীতে। তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধগুলির ভাষা প্রাঞ্জল ও জড়ত্বহীন। তা'ছাড়া অধিকাংশ রচনাই সারগর্ভ। তত্ত্ববোধিনীর অপর বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনবত্বে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই পত্রিকায় সর্বজনবোধ্য প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে লাগল। তা'ছাড়া তত্ত্ববোধিনীতে দীর্ঘদিন ধরে এক-একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা হওয়ায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের প্রতি জনসাধারণের কৌতূহলও বেড়ে গেল।

তত্ত্ববোধিনীতে বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত হয়েছিল অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত 'সিন্ধুঘোটক' (১লা আশ্বিন, ১৭৬৭ শকাব্দ) শীর্ষক প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনা দিয়ে। এতে সিন্ধুঘোটকের আকৃতি ও প্রকৃতি প্রাঞ্জল ভাষায় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনাটি পরে অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ—১ম ভাগে সংকলিত হয়েছিল। ১৭৬৭ শকাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত "বনমানুষ" শীর্ষক রচনাটির লেখকও অক্ষয়কুমার দত্ত। এর পর দীর্ঘদিন প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় ভাঁটা পড়ে। প্রায় সাত বৎসর পর ১৭৭৪ শকাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে "ধীবর" শীর্ষক যে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনাটি প্রকাশিত হয়, তা'ও পরে অক্ষয়কুমারের চারুপাঠ—১ম ভাগে সংকলিত হয়েছিল। এই যুগে (১৮৪৩-১৮৫৫) প্রকাশিত প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর আলোচনা দীপমক্ষিকা (চৈত্র, ১৭৭৪ শক), বল্মীক (পৌষ, ১৭৭৫ শক), প্রবাল কীট (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৭৬ শক), কীটাণু (ভাদ্র, ১৭৭৬ শক), বিহঙ্গম-দেহ (আশ্বিন, ১৭৭৭ শক) পরে অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠে সংকলিত হয়েছিল। উপরোক্ত আলোচনাগুলি সরল ও সুখপাঠ্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্যসমাবেশের দিক থেকে বিচার করলে রচনাগুলি কিছুটা দুর্বল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচ্য জীবের গঠনপ্রকৃতির বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা। এই যুগে প্রকাশিত উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ আলোচনাও প্রাথমিক প্রকৃতির। তবে দু' একটি বেশ

তথ্যপূর্ণ। যেমন, ১৭৭৪ শকাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম" শীর্ষক প্রবন্ধটি। এ যুগের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলিরও লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। এই শ্রেণীর রচনার অধিকাংশই পরে চারুপাঠে সংকলিত হয়েছিল। তথ্যসমাবেশের দিক থেকে যায়গায় যায়গায় অসম্পূর্ণ হলেও প্রাণী ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির ভাষা সরল ও সরস। বস্তুতঃ, এইখানেই এই সকল রচনার বৈশিষ্ট্য। প্রাণিবিজ্ঞানকে এতখানি মনোরম ও সরস ক'রে ইতিপূর্ব্বেকার কোনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় নি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এই যুগে প্রকাশিত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা-সমূহও সরল ও সুখপাঠ্য। সবগুলো প্রবন্ধেরই লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৭৬৯ শকাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনীতে (৪৭ সংখ্যা) জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রথম পাওয়া গেল। এই সংখ্যায় সৌরজগৎ সম্পর্কে রচনাটিতে সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব, গ্রহাদির সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবার সময়, ধূমকেতু, পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যপূর্ণ। এই সংখ্যার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ, পাদটীকায় ভারতের প্রাচীন গণিত, বীজগণিত ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা। এতে গণিত, বীজগণিত ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থানে স্থানে উদ্ধৃতি সহকারে বোঝান হয়েছে। লেখক গণিত ও বীজগণিতে ভারতের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিক থেকেও আলোচনাটির যথেষ্ট মূল্য আছে। এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিকে আধুনিক প্রতিপন্ন করবার জন্যে বেণ্টলি সাহেব যে মতবাদ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, লেখক যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে তা' খণ্ডন করেছেন। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যাদির পাশাপাশি সমাবেশ এই যুগের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো আলোচনার বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে ১৭৭০ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনাটিও উল্লেখযোগ্য। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো রচনায় উচ্ছ্বাস বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। যেমন, ১৭৬৯ শকাব্দের মাঘ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত চন্দ্র সম্পর্কে আলোচনাটি। রচনার নিদর্শন :—

পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রলোকে বায়ু ও মেঘ থাকিবার কোন চিহ্ন প্রতীত হয় নাই, ও তাহার কোন সম্ভাবনাও জ্ঞাত হয় নাই

অতএব তাহাতে শীতগ্রীষ্মের পরিবর্ত্তন কি আশ্চর্য্য! আমারদিগের গ্রীষ্ম ঋতুর প্রখরতম মধ্যাহ্নকাল অপেক্ষা ভূরিগুণ প্রচণ্ডতর গ্রীষ্ম ক্রমাগত এক পক্ষ সমস্তকাল দাহন করে, অপর এক পক্ষ হিমালয় শিখরস্থিত তুষার অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর শীত প্রবল থাকে। এমত কঠিন স্থানে মানব দেহ কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে! কিন্তু যিনি এই মর্ত্ত্য লোকেই ভূচরকে ভূমির যোগ্য ও জলচরকে জলের যোগ্য করিয়াছেন, এবং বিষগুণান্বিত গলিত পদার্থ মধ্যেও কত অসংখ্য জীবগণকে সুখরসে সিক্ত করিতেছেন, তিনি যে চন্দ্রলোকে তাহার উপযোগ্য দিব্য পুরুষ সকল সৃষ্টি করিয়া আনন্দে নিমগ্ন রাখিবেন ইহার আশ্চর্য্য কি?

১৭৭৬ শকাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত "ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার" শীর্ষক প্রবন্ধটির যায়গায় যায়গায় উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে ভূমণ্ডলের বৈচিত্র্য ও বিরাটত্ব ব্যাখ্যা ক'রে ধূমকেতু, উল্কা, সৌরজগৎ, গ্রহ-উপগ্রহ, সূর্য এবং নক্ষত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে এত বড় প্রবন্ধ ইতিপূর্বে আর কোনো পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় নি। প্রবন্ধটি প্রাঞ্জল ও তথ্যবহুল। এই যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি পরে অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠে সংকলিত হয়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা সাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায়ও নবযুগের সূচনা হোল। ১৭৭৩ শকাব্দের আষাঢ় সংখ্যা থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে এ ধরনের সারগর্ভ ও উৎকৃষ্ট রচনা ইতিপূর্বেকার আর কোনো পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায় না। পদার্থ-বিজ্ঞানের কতকগুলো মূল তত্ত্ব নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সংযত প্রকাশভঙ্গী ও বলিষ্ঠ ভাষা রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্য। এ সকল আলোচনার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে গেল। এই কৃতিত্বের মূলে পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত। এই যুগের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক সবগুলো প্রবন্ধই তিনি লিখেছিলেন। 'পদার্থবিদ্যা' এই শিরোনামায় তত্ত্ববোধিনীতে ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছিল জড় ও জড়ের গুণ, শক্তি,

বেগ, গতি, ভারকেন্দ্র, পেণ্ডুলাম ও বারিবিজ্ঞান। এদের মধ্যে বারিবিজ্ঞান ছাড়া অপরাপর আলোচনাগুলোর অধিকাংশই খানিকটা সংশোধিত আকারে অক্ষয়কুমার দত্তের 'পদার্থবিদ্যা' নামক গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। যায়গায় যায়গায় সহজ উপমা অধিকাংশ রচনারই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উপমার সাহায্যে বক্তব্য বিষয়ের দুরূহতা লাঘব করার প্রচেষ্টা বারিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাতেও দেখা যায়। এই পর্যায়ের আলোচনা ১৭৭৬ শকাব্দের ভাদ্র সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘ প্রবন্ধে তরল ও বায়বীয় পদার্থের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে 'স্পিরিট লেভেল', 'জলের সমপৃষ্ঠ হবার ধর্ম,' 'তরল পদার্থের নীচগামিত্ব', 'চাপ' ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনাটি তথ্যবহুল।

ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক উচ্চাঙ্গের রচনা এই যুগের তত্ত্ববোধিনীতে পাওয়া যায় না। তবে এই শ্রেণীর রচনার অধিকাংশই সরল ও সর্বজন-বোধ্য। এই পত্রিকায় ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হয় ১৭৬৯ শকাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যা (৫১ সংখ্যা) থেকে। এখানে নিরক্ষবৃত্ত, কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি, দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি, শীতগ্রীষ্মের তারতম্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। ভূগোল বিষয়ক নামগুলোর নির্বাচনে সংস্কৃত জ্যোতিষের প্রভাব পড়েছে। এই যুগের ভূগোল বিষয়ক কোনো কোনো আলোচনায় প্রত্যক্ষ দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ১৭৭৪ শকাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত "বিসুবিয়স নামক আগ্নেয়গিরি" এবং ১৭৭৪ শকাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় "জলপ্রপাত" শীর্ষক রচনা উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো রচনায় কবিত্বের পরিচয় রয়েছে। যেমন, ১৭৭৫ শকাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত জলস্তম্ভ সম্পর্কে প্রবন্ধটি। জলস্তম্ভের শোভা বর্ণনায় লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রচনার নিদর্শন :—

> জলস্তম্ভ দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। নভোমণ্ডলস্থ মেঘাবলি যেন বিশ্বাধিপতির পৃথ্বীরূপ প্রাসাদের পরম রমণীয় ছাদ স্বরূপ প্রতীয়মান হয় এবং জলস্তম্ভ যেন প্রকৃত স্তম্ভ হইয়া তাহা ধারণ করিয়া থাকে।

এই যুগের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত অন্যান্য প্রবন্ধগুলোও সুলিখিত। এই প্রসঙ্গে ১৭৭৫ শকাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত "জোয়ারভাঁটা" এবং ১৭৭৫

শকাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হিমশিলা সম্পর্কে আলোচনা উল্লেখযোগ্য। ভূগোল বিষয়ক অধিকাংশ রচনাই পরে চারুপাঠে সংকলিত হয়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মাঝে মাঝে বিজ্ঞানবিষয়ক সংবাদাদি প্রকাশিত হোত। ১৭৭৭ শকাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে "বিজ্ঞানবার্ত্তা" এই শিরোনামা দিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। বিজ্ঞান-বার্তায় প্রাণিবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ক নূতন নূতন সংবাদাদি প্রকাশিত হোত। তবে মধ্যে মধ্যে এ সকল সংবাদের সঙ্গে মন্তব্য যোগ করা হোত। বিজ্ঞানবার্তায় প্রকাশিত সংবাদগুলো Literary Gazette, Museum of Science and Art, Chamber's Journal, American Journal of Science and Arts ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলিত হোত। ১৭৭৭ শকাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে তত্ত্ববোধিনীতে "ঈশ্বরের মহিমা" এই শিরোনামা দিয়ে প্রাণিবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে নানাবিধ আলোচনা প্রকাশিত হ'তে থাকে। আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র্য ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা ক'রে পরমেশ্বরের মহিমা-কীর্তনই এই শ্রেণীর রচনার উদ্দেশ্য ছিল।

এই যুগের তত্ত্ববোধিনীতে অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" প্রভৃতি গ্রন্থের বিষয়বস্তুও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনা ত্যাগ করেন। তাঁর পরিচালনায় তত্ত্ববোধিনী বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র হিসাবে সমাদৃত হয়। উচ্চাঙ্গের জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ ক'রে এই পত্রিকা যে নবযুগের সূচনা করল, তা' কঠিন ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ক্ষমতাও অনেকখানি বাড়িয়ে দিল। আর বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রায় সবটুকু কৃতিত্বই অক্ষয়কুমার দত্তের। তার কারণ, এই যুগের তত্ত্ব-বোধিনীতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রায় সবগুলোই তিনি লিখেছিলেন। অবশ্য, এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধ নির্বাচনী সভার অবদানও উল্লেখযোগ্য।

দুই

অক্ষয়কুমার সম্পাদনা ত্যাগ করায় তত্ত্ববোধিনীর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেল। তবে পত্রিকা-সম্পাদনা ত্যাগ করার পরেও কিছুকাল ধরে তিনি এই পত্রিকায়

লিখেছিলেন। তা' সত্ত্বেও তত্ত্ববোধিনীতে পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় কিছুকাল রীতিমত ভাঁটা পড়ল। এই যুগের (১৮৫৫-১৮৮৪) তত্ত্ববোধিনীতে সুদীর্ঘ ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল, বিজ্ঞানের এক-একটি নিয়মিত বিভাগ (Feature)। "ঈশ্বরের মহিমা" এই শিরোনামায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে আলোচনা যথারীতি প্রকাশিত হতে লাগল। ১৭৭৭ শকাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে "বিজ্ঞান" এই শিরোনামায় রসায়নবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে। এই যুগের তত্ত্ববোধিনীতে নূতনত্বের মধ্যে পাওয়া গেল, শারীরবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব (Anthropology) এবং উচ্চাঙ্গের ভূবিদ্যা বিষয়ক আলোচনা। তা'ছাড়া বিজ্ঞানের ইতিহাস ও ধর্মবিজ্ঞান নিয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ এই যুগের তত্ত্ববোধিনীর বৈশিষ্ট্য।

"ঈশ্বরের মহিমা"—এই পর্যায়ে প্রকাশিত শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ-সমূহের অধিকাংশই প্রাথমিক প্রকৃতির। তবে উচ্চাঙ্গের শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধও এই যুগের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন, ১৭৯৫ শকাব্দের আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "মানবদেহে তাপ সমীকরণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি। এতে কি কি উপায়ে মানবশরীরে তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে তা' আলোচনা ক'রে কিভাবে শারীরিক তাপের হ্রাসবৃদ্ধি নিবারিত হয় তা' বোঝান হয়েছে। প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ ও সুলিখিত।

এই যুগের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো আলোচনায় উচ্চাঙ্গের রচনাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ১৭৮৪ শকাব্দের মাঘ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'জন্তুবিজ্ঞান' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এই যুগের তত্ত্ববোধিনীতে নেই। নৃতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ১৭৯৫ শকাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "আদিম মনুষ্য" এবং ১৮০০ শকাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত "মানবজাতির প্রাচীনত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ। শেষোক্ত প্রবন্ধে স্যার চার্লস্ লায়েলের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আদিম মানুষদের সম্পর্কে আলোচনা। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দু'টি বিরাট বিষয়বস্তুর অবতারণা করার ফলে প্রবন্ধটি কোথাও দানা বেঁধে ওঠে নি।

এই যুগের তত্ত্ববোধিনীতে ভূতত্ত্ব বিষয়ক উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ পাওয়া গেল।

"ভূতত্ত্ববিদ্যা" শীর্ষক বিরাট ও বিস্তৃত প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য প্রবন্ধটি ১৭৮৪ শকাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে এরূপ তথ্যপূর্ণ বিরাট প্রবন্ধ ইতিপূর্বেকার আর কোনো পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায় না। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে ভূত্বকের স্তরবিভাগ, পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থা, ভূত্বকের বিবর্তন, পৃথিবীর স্তরের দু'টি প্রধান শ্রেণীবিভাগ—অস্তরীভূত ও স্তরীভূত, বিভিন্ন স্তরের গঠনপ্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ, স্তরের অন্তর্গত প্রাণী ও উদ্ভিদ, স্তর-বিন্যাসের নিয়ম ও ফসিল ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটি সারগর্ভ; তবে প্রকাশভঙ্গী নীরস। তা' ছাড়া ভাষায় কৃত্রিমতা রয়েছে। স্তরীভূত মৃত জীব ও উদ্ভিদের সম্পর্কে আলোচনার একাংশ:—

> স্তরান্তর্গত মৃতজীবদিগের দেহ ও উদ্‌ভিজ্জের অংশ সকল কি প্রকার অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং কি প্রকার চিহ্নের দ্বারা সেই সকল জীব ও উদ্‌ভিদ নিরূপিত হয়, তাহা জানা আবশ্যক। জন্তুদিগের শরীরের মাংস ও অন্যান্য কোমল অংশ অবশ্যই শীঘ্র গলিত ও নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদের কেবল অস্থি ও দন্ত সকলই স্তর মধ্যে অবশিষ্ট থাকে। কোন কোন স্থলে মৎস্যের সমুদায় কণ্টকাবলী পাওয়া যায়, অপর কোথাও বা কেবল তাহাদের গাত্রের অংশুক মাত্র দৃষ্ট হয়, এবং শম্বুক ও প্রবালাদির কেবল উপরকার কঠিন আবরণমাত্র থাকে। কিন্তু প্রাণীদিগের শরীরের সমুদায় অঙ্গের এ প্রকার একটি পরস্পর সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য আছে যে কেবল একটি মাত্র অঙ্গ পরীক্ষা দ্বারা তাহা কি প্রকার জীবের তাহা অভ্রান্তরূপে বলা যাইতে পারে। এইরূপে শরীর ব্যবচ্ছেদবিদ্যা দ্বারা স্তরনিহিত অস্থি বা দন্তপাতি পরীক্ষাতেই মৃত প্রাণীদিগের জাতি ও অবস্থা অবধারিত হইতে পারে।
>
> স্তরমধ্যস্থ উদ্‌ভিদের নিরূপণ সামান্যতে তিন প্রকারে হইয়া থাকে। হয় বৃক্ষের স্কন্ধ বা পত্র পুষ্প বা ফল প্রস্তর সমুদয়ের অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ বিকৃত ও অঙ্গারভূত হইয়া সংরক্ষিত থাকে। অথবা কেবল বৃক্ষ ও লতার ত্বক ও পত্রের প্রতিকৃতি মাত্র চাপেতে প্রস্তরের উপর অঙ্কিত থাকে। অপর কোথাও বা বৃক্ষ সকলের

> স্কন্ধ বা শাখা ধাতু দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত ও প্রস্তরভূত হইতে দেখা যায়। অদ্যাবধি স্তরান্তর্গত প্রায় ৩০০০০ ত্রিংশৎ সহস্র জাতীয় মৃত জীব ও উদ্ভিদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বর্ত্তমান জীব ও উদ্ভিদের ন্যায় আকৃতি ও প্রকৃতি, কিন্তু স্থানে স্থানে স্তর সকল হইতে অনেক অদ্ভুত ও বিকটাকার জন্তুর কঙ্কাল উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সকলের সমান এক্ষণে কোন জীবই দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই যুগের তত্ত্ববোধিনীতে রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ পাওয়া গেল। তবে এদের অধিকাংশই গতানুগতিক প্রকৃতির আলোচনা। নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল ১৭৯৬ শকাব্দের আশ্বিন সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে রসায়নশাস্ত্রের উদ্ভব সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতবাদ আলোচনা ক'রে লেখক ভারতবর্ষকে রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তিস্থল হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। প্রবন্ধটির লেখক সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক সীতানাথ ঘোষ। আলোচ্য প্রবন্ধের যায়গায় যায়গায় লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

এই যুগের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার অধিকাংশই বিভিন্ন গ্রহ নিয়ে। তবে এই পর্যায়ের কোনো কোনো প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচনে অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, ১৮০৫ শকাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত "বুধের গতি-ব্যতিক্রম" শীর্ষক প্রবন্ধটি। আলোচ্য প্রবন্ধে লেভেরিয়ে, লেকারবোণ্ট, ভলক্যান প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ আলোচনায় লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় রয়েছে। ১৭৮৮ শকাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে অন্যান্য গ্রহে জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে যে আলোচনাটি প্রকাশিত হয়, প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গী ও উচ্চাঙ্গের তথ্য-সমাবেশের দিক থেকে তা'ও সবিশেষ মূল্যবান। অপরাপর গ্রহের জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এ ধরনের সারগর্ভ ও বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বে বা সমসাময়িক যুগে প্রকাশিত আর কোনো পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায় না।

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার অধিকাংশই তড়িৎ ও বিদ্যুৎ নিয়ে। তবে অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া গেল শাস্ত্রীয় তথ্যাদির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে।

১৭৯৪ শকাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "আর্য্য ঋষিদিগের তড়িৎ-বিষয়ক জ্ঞান ও বিবিধ কার্য্যে তাহার প্রয়োগ" শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রচনাটির লেখক সীতানাথ ঘোষ। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর গবেষণা ও বিশ্লেষণ-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে রচনাটির ভাষায় আড়ষ্টতা রয়েছে। মন্দিরস্থ ত্রিশূল ও চক্রের সাহায্যে কিরূপে বজ্র নিবারিত হয়, রচনার নিদর্শন হিসাবে তার একাংশ উদ্ধৃত করা হোল।

> "......যদি সেরূপ কোন মেঘ মন্দিরাদির উপরিতন আকাশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তদন্তর্গত মুক্ত তড়িতের বিয়োজনী শক্তি প্রভাবে মন্দিরের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থ তড়িৎদ্বয় পরস্পর বিযুক্ত হওয়াতে, উক্ত মুক্ত তড়িতের অসমানবর্ণটি উপরিস্থিত ত্রিশূল বা চক্রের অগ্রভাগ অভিমুখে আকৃষ্ট ও সমানবর্ণটি নিম্নস্থ ভূভাগের অভ্যন্তরাভিমুখে প্রক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ বিয়োগের পর, শুষ্ক বায়ুর মধ্যবর্ত্তিতা নিবন্ধন আকাশের তড়িৎ ও ত্রিশূলাগ্রস্থিত আকৃষ্ট তড়িৎ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ে, ত্রিশূলাদির অগ্রভাগ, মেঘের নিম্ন ভাগ অপেক্ষা অধিকতর পরিচালক ও সূক্ষ্মতর বলিয়া মেঘস্থ তড়িৎ আপন অবস্থান-প্রান্ত হইতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, মন্দিরস্থ তড়িৎ সহজেই ত্রিশূলাদির অগ্রভাগ হইতে ঊর্দ্ধগামী হইয়া উক্ত তড়িতের সহিত মিলিত হয়। মেঘ-তড়িৎ এইরূপে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় কোন প্রকার অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা থাকে না।"

এ ছাড়া ধর্মবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধও এ যুগের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এ পর্যায়ের কোনো কোনো প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। তবে দু' একটি প্রবন্ধ বেশ সুলিখিত। যেমন, ১৭৯৩ শকাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত "ধর্ম্ম ও পদার্থবিদ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধটি। এখানে ধর্মের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের সম্পর্ক বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে। সুলিখিত বৈজ্ঞানিক-জীবনীও এই যুগের তত্ত্ববোধিনীতে পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে ১৭৯৭ শকাব্দের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত পীথাগোরাসের জীবনচরিত সম্বন্ধে আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য।

এই প্রবন্ধে পীথাগোরাসের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

এইরূপে দীর্ঘদিন ধরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে যে বিজ্ঞানালোচনা চলল, তা' বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের বিকাশ ও পরিপুষ্টিতে সহায়তা করল অনেকখানি।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়

অক্ষয়কুমার দত্তের সমসাময়িক যুগে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মুষ্টিমেয় যে কয়েক জন বাঙ্গালী উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম। অক্ষয়কুমার বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন, উপরোক্ত লেখকত্রয় তাতে সার-সংযোজন করলেন।

এক

বাংলাভাষায় জ্যামিতি রচনার অন্যতম পথপ্রদর্শক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫)। ইতিপূর্বে রামমোহন রায় একটি জ্যামিতি লিখেছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী জ্যামিতিকারগণ কৃষ্ণমোহনকেই অনুসরণ করেছেন। কৃষ্ণমোহনের বিজ্ঞান-সাহিত্য বিজ্ঞানের দু'টি বিভাগ নিয়ে, একটি জ্যামিতি, অপরটি ভূগোল। উভয় বিষয় নিয়ে আলোচনাই তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ বিদ্যাকল্পদ্রুমের অন্তর্গত। তের কাণ্ডে বিভক্ত বিদ্যাকল্পদ্রুমের বিভিন্ন খণ্ডগুলি ১৮৪৬ থেকে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদের বাসনা কৃষ্ণমোহনের মনে বহুদিন থেকেই ছিল। কিন্তু অনুবাদের কাজ দুরূহ ভেবে তিনি অনেকদিন অবধি এ কাজে বিরত ছিলেন। পরে বাংলা গভর্ণমেণ্টের উৎসাহে তিনি এই কাজে এগিয়ে এলেন। বিদ্যাকল্পদ্রুমের পরিকল্পনা সম্পর্কে কৃষ্ণমোহন বাংলার শিক্ষা পরিষদের তৎকালীন সভাপতি সি. এইচ. ক্যামেরণের (C. H. Cameron) কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, (২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৬) তার এক যায়গায় আছে,

> "In order to produce a series of works adapted to the present state of the Hindu mind, and with the special object of drawing the attention of the native community to the History and Science of Europe, my proposal has been, you are aware, to draw as largely and as freely, as may appear

> requisite, from all sources that may be deemed suitable,—only cosistently with the acknowledged rules of literary courtesy, and with justice to the authors whose works may be handled.

গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি ঐ চিঠিরই অপর এক জায়গায় লিখেছেন,

> "My Encyclopædia is, as you are aware, intended especially for Bengali readers, and therefore my attention is first and principally directed to the Bengali..........
>
> My effort has been and shall continue to be, to present the history and science of Europe in as attractive and simple a dress as the subjects and the state of the Bengali language will allow."

বিদ্যাকল্পদ্রুমে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি কৃষ্ণমোহন যথাসম্ভব সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন। যেখানে উপযুক্ত সংস্কৃত প্রতিশব্দ পাওয়া যায় নি সেখানে তিনি ইংরেজী ভাষার দ্বারস্থ হয়েছেন। তবে ক্ষেত্রতত্ত্বে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির অধিকাংশই লীলাবতী, গোলাধ্যায় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিদ্যাকল্পদ্রুম সিরিজের ২য় কাণ্ড (১৮৪৬) ও নবম কাণ্ড (১৮৪৮) যথাক্রমে ক্ষেত্রতত্ত্ব ১ম ও ২য় খণ্ড[১] নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ক্ষেত্রতত্ত্ব ইংরেজী ও বাংলায় লেখা। বাঁ পৃষ্ঠায় ইংরেজী এবং ডান পৃষ্ঠায় তার বাংলা দেওয়া আছে। তিন অধ্যায়ে বিভক্ত ক্ষেত্রতত্ত্ব—১ম খণ্ডের আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন সম্পাদ্য ও উপপাদ্য। প্রতিজ্ঞাগুলির সমাধানের ভাষা প্রাঞ্জল। ক্ষেত্রতত্ত্ব রচনায় কৃষ্ণমোহন রেখাগণিত, কোলব্রুকের এলজাব্রা প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন। কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বাপুদেব গণিত ও রেখাগণিত বিষয়ক কিছু সংখ্যক সংস্কৃত শব্দ চয়ন করেছিলেন। সেই শব্দগুলো সংস্কৃত

১ ক্ষেত্রতত্ত্ব (২য় খণ্ড)—৯ম কাণ্ড পাওয়া যায় না।

কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক কৃষ্ণমোহনের কাছে প্রেরিত হয়। ক্ষেত্রতত্ত্ব রচনায় কৃষ্ণমোহন ঐ শব্দগুলোর সাহায্য নেন। তা' ছাড়া গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি তিনি দেশীয় পণ্ডিতদের দেখিয়ে নিয়েছিলেন।

বিদ্যাকল্পদ্রুম ১ম কাণ্ডের মঙ্গলাচরণে কৃষ্ণমোহন লিখেছিলেন, "যে যে গ্রন্থ আমি রচনা করিতে প্রবৃত্ত আছি তাহা উক্ত বিষয়ক কোন বিশেষ পুস্তক হইতে অনুবাদ না করিয়া নানা মূল হইতে সংগ্রহ করিতে কল্পনা করিতেছি…।" কিন্তু ক্ষেত্রতত্ত্বে সংগ্রহ অপেক্ষা অনুবাদের ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। জন প্লেফেয়ারের (John Playfair) ব্যাখ্যা অনুযায়ী এবং উইলিয়ম্ ওয়ালেসের (William Wallace) সংযোজন অনুযায়ী ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম তিন অধ্যায় এই গ্রন্থে অনুবাদিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকা সারগর্ভ এবং সুদীর্ঘ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, বিস্তৃত ও সুচিন্তিত ভূমিকা কৃষ্ণমোহনের গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ক্ষেত্রতত্ত্বের ভূমিকায় বিজ্ঞানশাস্ত্র-পাঠের উপযোগিতা ও বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান বিভাগ আলোচনা ক'রে গণিত, বীজগণিত ও ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বীজগণিত ও ক্ষেত্রতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা বিস্তারিত ও তথ্যপূর্ণ। বীজগণিতের প্রয়োগ ও চিহ্ন-নিরূপণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাও সারগর্ভ। ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে ত্রিভুজ, বৃত্ত, প্যারাবোলা, বক্ররেখা ইত্যাদি। কৃষ্ণমোহনের প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। তবে তাঁর বাক্য যায়গায় যায়গায় অস্বাভাবিক দীর্ঘ। রচনার নিদর্শন—

> "অপিচ যাদৃশ সরলরেখার লক্ষণ আছে তাদৃশ কুটিল রেখারও সূত্র আছে এবং ক্ষেত্রবিদ্যাতে ইহার গুণও প্রকাশ করে। বক্রাকৃতি রেখার মধ্যে বৃত্ত সর্ব্বতোভাবে প্রসিদ্ধ, সূত্র লইয়া একাগ্র স্থির রাখিয়া অন্য অগ্র ঘুরাইলে চিহ্নিত স্থলে বৃত্ত রেখা জন্মে এবং এই রেখার সর্ব্বাংশ ঐ স্থির অর্থাৎ মধ্যবিন্দু হইতে সমদূর। বৃত্তের এই মূল লক্ষণ হইতে নানা প্রকার ন্যায় দ্বারা অসংখ্য গুণ সিদ্ধ হয় যে সমস্ত গুণ পরস্পর হেতু সাধ্য ভাবে থাকে, তাহার এক উদাহরণ শুন—যদি কোন বৃত্তের অন্তরে ব্যাসের দুই প্রান্ত দিয়া পরিধির দুই রেখা পরিধির কোন বিন্দুতে সংলগ্ন করা যায় তবে সে ঐ দুই রেখা পরস্পর লম্বভাবে থাকিবে ইহা ক্ষেত্রবিদ্যার ন্যায়েতে সিদ্ধ হইয়াছে।

বৃত্তের আর এক ধর্ম্ম এই যে অতি বৃহৎ হউক কিম্বা অতি ক্ষুদ্র হউক প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডলস্বরূপ হউক কিম্বা এক সামান্য ঘটিকা চক্রস্বরূপ হউক পরস্পর তুলনা করিতে হইলে আপন ২ ব্যাসার্দ্ধের বর্গানুসারে অন্তরস্থ ক্ষেত্রফলের নিষ্পত্তি হইবে অর্থাৎ যে ২ সূত্র ঘুরাইয়া বৃত্ত অঙ্কিত হইয়াছে তত্তৎ বর্গের নিষ্পত্তির ন্যায় অন্তর ক্ষেত্রফলের নিষ্পত্তি জানিবা। অতএব যদি একটা বৃত্ত ৫ ফুট সূত্র দিয়া আর একটা ১০ ফুট দিয়া আঁকা যায় তবে বৃহৎ বৃত্তের ক্ষেত্রফল ক্ষুদ্রের চারিগুণ অধিক হইবে কেননা দশের বর্গ ১০০ পঞ্চের বর্গ ২৫ হইতে চারিগুণ অতিরিক্ত কিন্তু দুই বৃত্তের পরিধি কেবল সূত্রানুসারে পরস্পর নিষ্পন্ন হইবে অতএব এস্থলে বৃহৎ বৃত্তের পরিধি ক্ষুদ্র বৃত্তের দ্বিগুণ হইবে কেনন। ১০ ফুট সূত্র ৫ ফুট সূত্রের দ্বিগুণ।"

পরবর্তী অনেক জ্যামিতিকার কৃষ্ণমোহনের ক্ষেত্রতত্ত্ব অনুসরণ ক'রে জ্যামিতি রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' (১৮৬২)। পরবর্তী যুগের অনেক প্রখ্যাত জ্যামিতিকারও কৃষ্ণমোহন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্যামিতি রচনা করতে পারেন নি। এমনকি রামকমল ভট্টাচার্যের জ্যামিতির তুলনায়ও কৃষ্ণমোহনের গ্রন্থটিই শ্রেষ্ঠতর।

ভূগোল সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহনের আলোচনা রয়েছে বিদ্যাকল্পদ্রুমের তৃতীয় ও অষ্টম কাণ্ডে। বিদ্যাকল্পদ্রুম—৩য় কাণ্ড (বিবিধবিষয়ক পাঠ—১ম খণ্ড) ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ৩য় কাণ্ডের ১ম অধ্যায়ে প্রাকৃতিক ভূগোল নিয়ে আলোচনা রয়েছে। আলোচ্য বিষয় পৃথিবীর আকার, পরিমাণ ইত্যাদি। এই আলোচনায় পৃথিবীর আকৃতি, পরিমাণ ইত্যাদি কয়েকটি প্রশ্নের বিচার করা হয়েছে। বিচারপ্রণালীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সুস্পষ্ট। বিদ্যাকল্পদ্রুম—৮ম কাণ্ড (ভূগোলবৃত্তান্ত ১ম ভাগ) ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু মুরের 'এন্‌সাইক্লোপেডিয়া অব জিওগ্রাফি' (Murray's Encyclopaedia of Geography), মাল্টে ব্রানের ভূগোল (Malte Brun's Geography) ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে সংকলিত। রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত হোল এই গ্রন্থে।

গ্রন্থটির প্রারম্ভে ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণের ক্রমবিকাশ নিয়ে যে আলোচনা আছে, তাতে ভূগোলবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক তথ্যাদি স্থান পেয়েছে। সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির হলেও এই আলোচনায় লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'পরিভাষা' শীর্ষক অধ্যায়ে ভূগোলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞাগুলো নিয়ে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করা হয়েছে। তবে ইংরেজী ও বাংলায় লেখা এই ভূগোলের প্রায় সর্বত্রই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যাদি এসে গেছে। প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান কৃষ্ণমোহনের নেই। তবে তাঁর ক্ষেত্রতত্ত্ব ও ভূগোলে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি তৎকালীন যুগে সমাদৃত হয়েছিল।[২]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাবরই অনুরাগ ছিল। কৃষ্ণমোহন-সম্পাদিত 'সংবাদ সুধাংশু' পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত। তা' ছাড়া বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিকট সংযোগ ছিল। সে সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (Society for the acquisition of general knowledge), বেথুন সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন 'ইণ্ডিয়ান লিগের' সভাপতি মনোনীত হন। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হবার পর কৃষ্ণমোহন এদেশে বিজ্ঞানমূলক শিল্পচর্চার প্রসারের জন্যে সচেষ্ট হলেন। এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হোল ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভা। শিল্প-শিক্ষার উদ্যোক্তারা দু'দলে বিভক্ত হলেন। একদল মহেন্দ্রলালকে সমর্থন জানালেন। অপর দল সমর্থন করলেন কৃষ্ণমোহনকে। গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সমবেত সহযোগিতার ফলে মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞান-সভাই শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্ব অর্জন করে।[৩]

ক্ষেত্রতত্ত্বকে বাদ দিলে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান কৃষ্ণমোহনের নেই। কিন্তু বিদ্যাকল্পদ্রুমে তিনি ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি বাংলাভাষায় প্রকাশের যে সুবৃহৎ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করলেন, তা' বাংলায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচয়িতাদের মনে এক নতুন শক্তি সঞ্চারিত করল।

---

২ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—শিবরতন মিত্র (মানসী—বৈশাখ, ১৩১৬, পৃঃ ১৩৬)।

৩ মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—দুর্গাদাস লাহিড়ী (শিল্পপুষ্পাঞ্জলি—১ম খণ্ড, ১২৯২ সাল, পৃঃ ১১১)।

দুই

পরবর্তী লেখক রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের অন্যতম রূপকার। বিবিধার্থসংগ্রহ, রহস্য-সন্দর্ভ প্রভৃতি সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র ক'রে বিজ্ঞানের ভাষার সরসতা সম্পাদন বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তাঁর সম্পাদনা-গুণে উল্লিখিত দু'টি পত্রিকাই তৎকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাময়িক-পত্র বলে পরিগণিত হয়েছিল। তা ছাড়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর নিকট-সংযোগ ছিল। তিনি তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান ভূগোল-বিজ্ঞানে। বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম প্রাকৃতিক ভূগোল রচনা করেন। সতর্কতাপূর্বক পরিভাষার[৪] ব্যবহার সর্বপ্রথম রাজেন্দ্রলালের ভূগোলেই দেখা গেল। বস্তুতঃ, ভৌগোলিক পরিভাষার ক্ষেত্রে তিনি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। ভূগোলে যে-সকল শব্দ অর্থজ্ঞাপনের জন্যে সৃষ্ট, তাঁর মতে সেগুলো অনুবাদের যোগ্য। প্রয়োজন অনুযায়ী অনুবাদের প্রচেষ্টা তাঁর প্রাকৃত ভূগোলেও দেখা যায়। গ্রন্থটির শেষে ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের একটি নির্ঘণ্ট দেওয়া আছে। একটি নির্দিষ্ট রীতি অনুসৃত হলেও অনুবাদিত শব্দগুলোর কয়েকটি বেশ দুরূহ। রাজেন্দ্রলালের 'প্রাকৃত-ভূগোল অর্থাৎ ভূমণ্ডলের নৈসর্গিকাবস্থা বর্ণনাবিষয়ক গ্রন্থ' ১৭৭৬ শকাব্দে (১৮৫৪ খৃঃ) প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থারম্ভে লেখক ভূগোলবিদ্যাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—'ব্যাবহারিক ভূগোল, গণিত ভূগোল ও প্রাকৃত ভূগোল'। শেষোক্ত বিভাগ বা প্রাকৃত ভূগোল এই গ্রন্থের উপজীব্য। বাংলা ভাষায় প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থের অভাবই এই গ্রন্থটি রচনার প্রধান কারণ। অবশ্য ইতিপূর্বে প্রকাশিত পিয়ার্সের ভূগোল-বৃত্তান্তে ও অক্ষয়কুমার দত্তের ভূগোলে রাজনৈতিক ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা রয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের আলোচনা অনেক বেশী বিস্তৃত ও উচ্চাঙ্গের। বঙ্গসাহিত্যে প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক আলোচনার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ

৪ এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলালের ইংরেজী রচনা, "A scheme for the rendering of European Scientific Terms into the vernaculars of India (1877)" উল্লেখযোগ্য।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থে পৃথিবীর জলস্থলবিভাগ, পর্বত সৃষ্টির বিবরণ, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, ভূপৃষ্ঠ, সমুদ্রজল ও সমুদ্রস্রোত, নদী, বায়ু, বৃষ্টি ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। তা' ছাড়া এই গ্রন্থে রয়েছে জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রসঙ্গ 'দেশভেদে উদ্ভিজ্জভেদ ও জীবভেদ' এবং নৃতত্ত্ব-বিষয়ক প্রসঙ্গ 'দেশভেদে মনুষ্য-ভেদ'। রাজেন্দ্রলালের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের। রচনাও তথ্যসমৃদ্ধ। তবে এখানে তাঁর ভাষা প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলোর মতো সরস নয়। প্রাকৃত ভূগোলের ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা। তা' ছাড়া যায়গায় যায়গায় সন্ধি কিছুটা শ্রুতিকটু। ব্যাকরণে সংস্কৃতানুগত্য ও দুরূহ শব্দের প্রয়োগ গ্রন্থটির প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। রচনার নিদর্শন—

> "সমুদ্রই জলের আকর। সূর্য্য-কিরণে ঐ জল সর্ব্বদাই বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া অন্তরীক্ষে উৎক্ষেপিত হয়; ও তথায় কিয়ৎকাল থাকিয়া পরে বায়ুর ক্রমে এবং পৃথিবী ও সূর্য্যের পরস্পর অন্তরতার হ্রাস-বৃদ্ধ্যনুসারে কোয়াশা শিশির হিমানী বা বৃষ্টিরূপে পৃথিব্যুপরি বর্ষিত হইয়া থাকে। ঐ বর্ষিত বারির কিয়দংশ মৃত্তিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, ও অপরাংশ নদীরূপে পরিণত হয়। যে জল ভূমিসাৎ হয়, তদ্দ্বারা মৃত্তিকা সিক্ত থাকিয়া পৃথিবীকে ফলবতী ও প্রাণীর বাসোপযুক্তা করে। অপর পুষ্করিণ্যাদির খনন করিলে ঐ জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া পূর্ণ করিয়া থাকে।
>
> তরল পদার্থের এক প্রধান ধর্ম্ম এই যে, তাহার সর্ব্বত্র সমোচ্চ থাকে, কদাপি তাহার কোন অংশ উচ্চ ও অপরাংশ নিম্ন হয় না; কোন কারণ বশতঃ সমোচ্চতার হানি হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ জল আন্দোলিত হইয়া সমোচ্চতা রক্ষার চেষ্টা করে। এই কারণবশতঃ উচ্চ স্থানের কোন ছিদ্র বা ফাটালে বৃষ্টির জল প্রবিষ্ট হইলে ঐ ছিদ্র বা ফাটালের তল দিয়া তাহা নিম্ন স্থানে আসিয়া তথাকার কোন ছিদ্র দ্বারা অতি বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ঐ জলোৎক্ষেপণের নাম 'উৎস' বা 'ফোয়ারা'; এবং পৃথিবীর অনেক স্থানে তাহা বর্ত্তমান আছে। অনুভূত হইয়াছে যে সমুদ্র-জলও কোন ২ স্থানে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উৎসরূপে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; অপর ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে পৃথিবীর অন্তর্ভাগে স্বভাবসিদ্ধ

জল আছে, সেই স্থান স্ফটিত করিয়া দিলে তাহা সমবেগে ক্রমাগত উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, বৃষ্টি-জলজাত উৎসের ন্যায় কদাপি তাহার বেগের হ্রাসবৃদ্ধি বা মধ্যে ২ বিশ্রাম হয় না। এই উৎসের নাম 'অন্তর্জলোৎস'।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'শিল্পিক দর্শন' বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের উদ্যোগে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটি হোল বিবিধার্থসংগ্রহে প্রকাশিত কতকগুলো শিল্পবিষয়ক প্রস্তাবের সংকলন। এই গ্রন্থে রাসায়নিক, খনিজ ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্পবিষয়ক প্রস্তাব স্থান পেয়েছে। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ একে বলা যায় না। তবে প্রস্তাবগুলো সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী ক'রে লেখা।

এ ছাড়া রাজেন্দ্রলালের উদ্যোগে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে বাংলায় কয়েকটি মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলায় মানচিত্র প্রকাশ নতুন নয়। ইতিপূর্বে মণ্টেগুর উদ্যোগে স্কুল বুক সোসাইটি থেকে বাংলা ভাষায় পৃথিবীর মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মাতৃভাষায় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলার মানচিত্র প্রস্তুত করলেন।

সারস্বত সমাজকে কেন্দ্র ক'রে বাংলায় ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়নের প্রচেষ্টা রাজেন্দ্রলালের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলা পরিভাষা প্রণয়ন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল। রাজেন্দ্রলাল এই প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সারস্বত সমাজ অল্পকাল স্থায়ী হলেও ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়নের ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠান কিছুটা অগ্রসর হয়েছিল। পরিভাষার খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এ ছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রভৃতি গুণগ্রাহী ও দেশহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নিকট যোগাযোগ ছিল।

তিন

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) যখন বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হলেন তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থসংগ্রহ প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ভূদেব বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার জন্যে এগিয়ে এলেন না; বিজ্ঞানের ভাষাকে যুক্তিনিষ্ঠ ও বিচারক্ষম ক'রে

তুললেন। এরই নিদর্শন হোল তাঁর 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—১ম ও ২য় ভাগ।' এই গ্রন্থ রচনার মূলে ছিল বিজ্ঞানের প্রতি ভূদেবের অনুরাগ। ডারউইন, ইন্টারন্যাশানাল সাইন্টিফিক সিরিজ, কন্টেম্পোরারি সাইন্স সিরিজ প্রভৃতি গ্রন্থ শেষ বয়স পর্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে পড়তেন।[৫] প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখিত ভূদেবের নোট-বই থেকে সংগৃহীত। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভূদেববাবু হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঐ সময় তাঁকে প্রাণিতত্ত্ব, আলোকতত্ত্ব, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয় মুখে মুখে ছাত্রদের পড়াতে হোত। ঐ সকল বিষয়ের কিছু কিছু অংশ পুস্তকাকারে প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের খাতায় লিখে রাখতেন।[৬] তা' থেকে মাত্র কিছু অংশ নিয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ভাগের সঠিক প্রকাশকাল জানা যায় না।[৭] তবে ১ম ভাগের ২য় সংস্করণ যে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ২য় ভাগ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। ১ম ও ২য় ভাগ একত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। লেখকের প্রথমে ইচ্ছে ছিল, সমগ্র গ্রন্থটি এক খণ্ডে প্রকাশ করবার। কিন্তু দু'টি কারণে তা' সম্ভব হয় নি। প্রথম কারণ, এক খণ্ডের মধ্যে সংক্ষেপে অধিক তথ্যাদির সমাবেশে গ্রন্থটি কঠিন হয়ে পড়বার আশঙ্কা। দ্বিতীয় কারণ অর্থনৈতিক। মূলতঃ এ দু'টি কারণেই 'জড়ের গুণ', 'গতির নিয়ম' ও 'ভার-মধ্য' এই তিনটি প্রসঙ্গ নিয়ে প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। ১ম ভাগ সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন লেখকের বন্ধু রামগতি ন্যায়রত্ন। ১ম ভাগে টেক্‌নিক্যালিটি এড়াবার উদ্দেশ্যে পদার্থ-বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গাণিতিক আলোচনা করা হয়েছে পাদটীকায়। কিন্তু ২য় ভাগে গাণিতিক প্রসঙ্গ মূল আলোচনাতেই স্থান পেয়েছে। ২য় ভাগের আলোচ্য বিষয় 'যন্ত্র-বিজ্ঞান' ও 'বাষ্পীয় যন্ত্র'। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য, এই গ্রন্থের সর্বত্রই বিজ্ঞানবিষয়ক বাংলা নাম ব্যবহৃত। পাদটীকা

৫ ভূদেবচরিত—১ম ভাগ, অবতরণিকা পৃঃ ৵০।

৬ ভূদেবচরিত—১ম ভাগ, পৃঃ ১৮২।

৭ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, (২য় সংস্করণ)—পৃঃ ২৬।

ছাড়া অন্য কোথাও ইংরেজী নামের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। গ্রন্থটির আর একটি বৈশিষ্ট্য, এতে লেখক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো শুধুমাত্র বর্ণনাই করেন নি ; সেই তত্ত্বগুলো বিচারও করেছেন। তা' ছাড়া যায়গায় যায়গায় সরস উপমা প্রয়োগের ফলে আলোচ্য বিষয়ের দুরূহতা কিছুটা লাঘব হয়েছে। দু'এক যায়গায় প্রাচীন মতও আলোচিত হয়েছে। তবে ২য় ভাগের কোনো কোনো অংশ টেক্‌নিক্যাল প্রকৃতির।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতি অনুযায়ী কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ইউক্লিডের জ্যামিতিকে অবলম্বন ক'রে রচিত হয়েছিল। কৃষ্ণমোহন ও ভূদেবের ক্ষেত্রতত্ত্বের পরিকল্পনা ও রচনারীতি প্রায় একই প্রকৃতির। ভাষাও অনেক স্থলেই প্রায় একরূপ। যেমন, কৃষ্ণমোহন লিখেছেন,

> ৪ যাহার কেবল দৈর্ঘ্য ও বিস্তার আছে তাহাকে ধরাতল কহে। অনুমান। ধরাতলের সীমা রেখা, এবং এক ধরাতল অন্য ধরাতলকে অবচ্ছিন্ন করিলে সে অবচ্ছেদনেতেও রেখার উৎপত্তি হয়।
>
> ৫ যে ধরাতলে দুই বিন্দু লইলে তাহাদের যোজক সরলরেখা সর্ব্বাংশে ঐ ধরাতলে সংলগ্ন থাকে তাহাকে সমধরাতল কহা যায়।
>
> ৬ দুই সরলরেখা ভিন্ন ২ দিকে আসিয়া সংস্পর্শ করিলে তাহাদের পরস্পর অবনতিকে সরল রৈখিক কোণ কহা যায়।
>
> [বিদ্যাকল্পদ্রুম, ২য় কাণ্ড, ক্ষেত্রতত্ত্ব—পৃঃ ২৩]

আর ভূদেববাবু লিখেছেন,

> ৪ যাহার কেবল দৈর্ঘ্য ও বিস্তার আছে, তাহাকে 'ধরাতল' কহে। অনুমান। ধরাতলের সীমারেখা, এবং এক ধরাতল অন্য ধরাতলকে অবচ্ছিন্ন করিলে সে অবচ্ছেদনেতেও রেখার উৎপত্তি হয়।
>
> ৫ যে ধরাতলে দুই বিন্দু লইলে তাহাদের যোজক সরলরেখা সর্ব্বাংশে ঐ ধরাতলে সংলগ্ন হইয়া থাকে, তাহাকে 'সম-ধরাতল' কহা যায়।

৬ দুই সরলরেখা ভিন্ন ভিন্ন দিকে আসিয়া সংস্পর্শ করিলে, তাহাদের পরস্পর অবনতিকে 'সরল রৈখিক কোণ' কহা যায়।

[ক্ষেত্রতত্ত্ব—১ম সংস্করণ, পৃঃ ২]

বিভিন্ন প্রতিজ্ঞার সমাধান ও অঙ্কনের সময় উভয় গ্রন্থে একই অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। তবে জ্যামিতিক নামের ব্যবহারে যায়গায় যায়গায় পার্থক্য দেখা যায়। ভূদেববাবুর গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনী হিসাবে অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা দেওয়া আছে। কৃষ্ণমোহনের গ্রন্থে তা' নেই। এ ছাড়া, নূতনত্বের মধ্যে ভূদেববাবুর গ্রন্থে যায়গায় যায়গায় বিকল্প প্রমাণ দেওয়া আছে।

রাধানাথ রায়কে দিয়ে ইউরোপীয় আবিষ্কর্তাদের জীবনচরিত লেখাবার ইচ্ছে ভূদেবের ছিল।[৮] কিন্তু তাঁর এই ইচ্ছে কার্যকরী হয় নি। ভূগোলেও ভূদেবের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি কালিদাস মৈত্রের ভূগোল সংশোধন ক'রে ছাত্রদের পড়াতেন। তা' ছাড়া প্রত্যেক জেলার যথাযথ ভূগোল লেখাবার জন্যেও তিনি চেষ্টা করেছিলেন।[৯] হিন্দীতে তিনি একটি ভূগোল লেখেন। গ্রন্থটির নাম 'গয়া কি ভূগোল'।[১০]

এইরূপে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের প্রচেষ্টায় বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধিত হোল।

৮ ভূদেবচরিত—২য় ভাগ, পৃঃ ১৯৫।

৯-১০ ভূদেব-জীবনী (কাশীনাথ ভট্টাচার্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত) ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৯।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', রহস্য-সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন ও ভারতী

অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ লেখকদের সমসাময়িক যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে দেশীয় সাজে সাজিয়ে সর্বজনবোধ্য বিজ্ঞানসাহিত্য রচনার ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। এই ক্ষেত্র আরও সরস হোল বিবিধার্থ-সংগ্রহ (অক্টোবর, ১৮৫১) ও রহস্য-সন্দর্ভে (মার্চ, ১৮৬৩)। আর বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের উর্বরতা সাধিত হোল বঙ্গদর্শন (বৈশাখ, ১২৭৯), আর্যদর্শন (বৈশাখ, ১২৮১), ভারতী (শ্রাবণ, ১২৮৪) ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র ক'রে। তথ্যসমাবেশের দিক থেকে বিচার করলে একমাত্র প্রাণিবিজ্ঞান ছাড়া সমসাময়িক যুগের তত্ত্ববোধিনীর তুলনায় বিবিধার্থ-সংগ্রহ ও রহস্য-সন্দর্ভের অধিকাংশ বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাই উচ্চাঙ্গের নয়। কিন্তু স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী, ভাষার লালিত্য এবং সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে আলোচ্য বিষয়বস্তুর বিন্যাস, উভয় পত্রিকার বৈজ্ঞানিক রচনাগুলোকেই সাহিত্যিক উৎকর্ষতা দান করেছে। এখানেই পত্রিকা-দু'টির বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ, সাহিত্যিক মূল্যের দিক থেকে বিচার করলে, বিজ্ঞানসাহিত্যে তত্ত্ববোধিনীর উন্নততর সংস্করণ হোল বিবিধার্থ-সংগ্রহ এবং রহস্য-সন্দর্ভ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ন্যায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচিত্র প্রকৃতির আলোচনা এ দু'টি পত্রিকায় নেই। তা' ছাড়া বিবিধার্থ-সংগ্রহের প্রাকৃত ভূগোল নামক আলোচনাটিকে বাদ দিলে সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেরও এখানে অভাব। কিন্তু সুন্দর ও সরস প্রবন্ধের অভাব নেই। ভাষায় এই সৌন্দর্য ও সরসতার আরোপ বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে এ দু'টি পত্রিকার উল্লেখযোগ্য অবদান।

এক

ইংরেজী 'পেনি ম্যাগাজিন'এর অনুকরণে বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকাটি কলিকাতার 'ভার্ণাকিউলার লিটারেচার কমিটি' বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে। বাংলাভাষায় সারগর্ভ এবং প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য গ্রন্থ প্রকাশ করা এদের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যেরই সাফল্যমণ্ডিত নিদর্শন বিবিধার্থ-সংগ্রহ।

পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব পড়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উপর। তিনি বিবিধার্থ-সংগ্রহের প্রথম ছয়টি পর্বের (১৭৭৩-১৭৮১ শক) সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদনা-কৃতিত্বে পত্রিকাটি অচিরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই পত্রিকায় তিনি নিজেও নিয়মিতভাবে লিখতেন। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের বহু মূল্যবান রচনা বিবিধার্থ-সংগ্রহ ও রহস্য-সন্দর্ভে ছড়িয়ে আছে। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের অবদান নির্ণয় করতে গেলে এ সকল রচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বিচার করতে হয়।

বিবিধার্থ-সংগ্রহে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত। তন্মধ্যে জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ক আলোচনাই অধিক। নানাপ্রকার পাখী ও জন্তু সম্বন্ধে বহু মনোজ্ঞ আলোচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিবিধার্থ-সংগ্রহের প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনাতে বিশ্বজগৎ ও জীবজগতের নানাবিধ বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ ক'রে পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, "আমরা যে কেবল জ্যোতির্বিদ্যায় ও জীবসংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত থাকিব এমত নহে। পদার্থবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, সাহিত্যালঙ্কারাদি সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম আমাদিগের সমরূপে উদ্দেশ্য।"

বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার ছড়াছড়ি। অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য, প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ আলোচনায়। সমসাময়িক যুগের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় এই ধরনের বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ নেই। তা' ছাড়া ভাষার লালিত্যের দিক থেকেও বিবিধার্থ-সংগ্রহের রচনাগুলিরই শ্রেষ্ঠত্ব। প্রথম দিকে এই পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায়ই দু'টি ক'রে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। যেমন, ১৭৭৩ শকাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় 'হোমা' ও 'জিব্রাশ্রেণীস্থ পশুর বিবরণ', অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'টৌকন্ পক্ষি-জাতির বিবরণ' ও 'গণ্ডার', পৌষ সংখ্যায় 'দুর্গন্ধ-নকুল' ও 'মনৌয়র পক্ষিজাতির বিবরণ', মাঘ সংখ্যায় 'প্রজাপতি' ও 'শৌকেয় শ্রেণিস্থ পক্ষিগণের বিবরণ' এবং ফাল্গুন সংখ্যায় 'কাস্সোয়ারী পক্ষী' ও 'শিশুক'। উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য, ভাষার সরসতা এবং আলোচ্য জীবের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ। কোনো কোনো প্রবন্ধে শাস্ত্রীয় তথ্যাদি এসে

গেছে। এই প্রসঙ্গে 'গণ্ডার' ও 'মনৌয়র পক্ষিজাতির বিবরণ' শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টি উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো প্রবন্ধে উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি। 'প্রজাপতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'ওয়ালরস্ বা সিন্ধুঘোটক' এবং 'হাপিবাজ' (বৈশাখ, ১৭৭৪ শক), 'বাইসন' (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৭৫ শক) 'বিড়ালাদি পশুর বিবরণ' (ভাদ্র, ১৭৭৫ শক), 'জিরাফার বিবরণ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৭৬ শক), 'সর্পের বিবরণ' (আষাঢ়, ১৭৭৬ শক), 'কাঠ্‌বিড়াল' (শ্রাবণ, ১৭৭৬ শক), 'সিয়াকোষ' (ভাদ্র, ১৭৭৬ শক), 'নর্বাল বা দীর্ঘহস্ত তিমি' (আশ্বিন, ১৭৭৯ শক) ইত্যাদি। উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির প্রায় সব কয়টিতেই আলোচ্য পশুর আকৃতি, প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ নিয়ে সুখপাঠ্য আলোচনা করা হয়েছে। রচনার নিদর্শন :—

বিড়ালাদি পশুর বিবরণ।

"সম-ধর্ম্মাবলম্বি পশু-সকল এক শ্রেণিমধ্যে নির্ণীত হইয়া থাকে। বিড়াল, ব্যাঘ্র, সিংহাদি পশু-সকলের আকৃতি ও স্বভাব-গত কোন প্রভেদ নাই, সুতরাং তাহারা এক শ্রেণিমধ্যে সঙ্কলিত হয়। সেই শ্রেণির নাম 'বিড়ালাদি শ্রেণী'। বিহঙ্গম-বৃহ-মধ্যে বাজ-পক্ষির (বাজাদি) শ্রেণী যাদৃশ, স্তন্যজীবী মধ্যে বিড়ালাদি পশুও তাদৃশ ; ইহারা উভয়েই জীবহিংসাদ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, ও তদর্থে তাহারা উভয়েই অতি ভয়ঙ্কর নখ প্রাপ্ত হইয়াছে ; এবং পাছে ভ্রমণ-সময়ে মৃত্তিকা-স্পর্শে তাহার তীক্ষ্ণতার হানি হয় এই অমঙ্গল নিবারণার্থে জগৎস্রষ্টা ঐ নখ অঙ্গুলির ন্যায় নমনশীল করিয়া দিয়াছেন। বিড়ালাদি পশু ইতস্ততঃ করণ সময়ে তাহাদের নখ অঙ্গুলির ত্বগ্-মধ্যে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে ; এবং কেবল জীব-হিংসা-করণ সময়ে নখ নিঃসারণ করত আপন ২ খাদ্য পশুর দেহ ভেদ করে। বাজ পক্ষির নখেও এই কৌশল স্পষ্ট প্রতীত হয়। বিড়ালাদি হিংস্র পশুর দন্ত সূচ্যাগ্র ও অতীব তীক্ষ্ণ, এবং মাংস ভেদকরণার্থে সুপ্রশস্ত ; কিন্তু তদ্দ্বারা চর্ব্বণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না ; পরন্তু প্রস্তাবিত পশুদিগের খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ করিবারও কদাপি আবশ্যক নাই। তাহাদিগের জিহ্বা অতি আশ্চর্য্য। তদুপরি এক

প্রকার অতি তীক্ষ্ণ কণ্টক হইয়া থাকে। উখা নামক লৌহাস্ত্র যাদৃশ, ব্যাঘ্রাদি পশুর জিহ্বাও তদ্রূপ বোধ হয়। অস্থি সংলগ্ন মাংস-কণিকা যাহা দন্তদ্বারা ছিন্ন করা যায় না, তাহা বিমুক্ত করিয়া লইবার নিমিত্ত এই জিহ্বা অতি প্রয়োজনীয়। অস্থির উপর তাহা দুই একবার ঘর্ষণ করিলেই তৎসংলগ্ন সমস্ত মাংস-কণিকা অনায়াসে বিমুক্ত হয়। ইহাদিগের নয়নেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণতার উপমাস্বরূপে বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ আছে; তাহাদিগের বল বিষয়েও বাক্যব্যয় করা বিফল; ব্যাঘ্র-সিংহাদি পশু অত্যন্ত বলবান এ কথা পাঠকবর্গ কি অজ্ঞাত আছেন?

প্রস্তাবিত পশু-সকল দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদিগের দেহের প্রধান বর্ণ পীত শুক্ল ও কৃষ্ণ; অনেকের দেহ পীত বর্ণোপরি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের বিন্দু বা রেখাদ্বারা চিত্রিত। ইহারা কেহ ইচ্ছাবশতঃ উদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণ করে না; সকলেই মাংসাশী, এবং স্বয়ং জীব-সংহার করিয়া ঐ মাংসের উৎপাদন করে। ঐ জীব-সংহার-সময়ে তাহারা হন্তব্য পশুর পশ্চাৎ বেগে অধিক দূর ধাবমান হয় না। অতি ধীরভাবে গোপনে তাহার নিকটে আসিয়া, পরে এক লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে বিনাশ করে। দূর হইতে লম্ফ দিবার প্রয়োজন হইলে প্রথমতঃ ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া লম্ফদ্বারা উৎক্রাম্য ভূমির দূরতা নিরূপণ করণানন্তর লম্ফ প্রদান করে।"

বিবিধার্থ-সংগ্রহের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য, উদ্ভিদজগতের বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনায়। তবে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক রচনা এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই পর্যায়ের যে দু' একটি প্রবন্ধ পাওয়া যায় তা' সুলিখিত। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 'উদ্ভিজ্জ মাহাত্ম্য প্রতি কটাক্ষ-বে বৃক্ষ' (ফাল্গুন, ১৭৭৩ শক) নামক প্রবন্ধটি। ইউরোপের বে বৃক্ষ সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই এই প্রবন্ধে আছে। উদ্ভিদজগতের বৈচিত্র্যই এই আলোচনার প্রধান উপজীব্য। আলোচনার ভঙ্গী কৌতূহলোদ্দীপক। ১৭৭৬ শকাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "উদ্ভিজ্জের চৈতন্য উষ্ণতা প্রভৃতি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম' একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। এতে উদাহরণ সহযোগে উদ্ভিদের

জীবনধারণ প্রণালী, গতিশক্তি, চৈতন্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ সহজ ভাষায় আলোচিত হয়েছে।

শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক রচনা বিবিধার্থ-সংগ্রহে পাওয়া যায় না। তবে ১৭৭৬ শকাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত "কম্পজনক বাইন-মৎস্য' শীর্ষক রচনাটিতে আমেরিকার বাইনমৎস্যের দেহস্থ তড়িৎ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জীবদেহে তড়িৎ-শক্তির বিকাশ আলোচনা করা হয়েছে।

ভূগোল সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের আলোচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আলোচনা। রচনাটি ১৭৭৫ শকাব্দের আষাঢ় সংখ্যা থেকে 'প্রাকৃত ভূগোল' শিরোনামায় ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই রচনাটিতেই বাংলা সাহিত্যে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধীয় আলোচনার যথার্থ সূত্রপাত। আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'প্রাকৃত ভূগোল' (১৭৭৬ শক) নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। এ ছাড়া বিবিধার্থ-সংগ্রহে বিভিন্ন দেশের কয়েকটি ভূ-বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এদের কোনোটিকেই পূর্ণাঙ্গ ভৌগোলিক প্রবন্ধ বলা চলে না। ভূবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় নেই বললেই হয়। এই পর্যায়ের কোনো কোনো রচনায় ভূবিজ্ঞান আলোচনা প্রসঙ্গে রাসায়নিক তথ্যাদির সমাবেশে কিছুটা বাড়াবাড়ি দেখা যায়। ১৭৭৬ শকাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'সুবর্ণের ভারতবর্ষীয় খনী' শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভূবিদ্যা বিষয়ক একমাত্র সুলিখিত প্রবন্ধ 'পাথুরিয়া কয়লা' ১৭৮০ শকাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বিবিধার্থ-সংগ্রহের রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাগুলি করা হয়েছে আলোচ্য বস্তুর ব্যবহারিক উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে। এই পর্যায়ের আলোচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'পারদ' (অগ্রহায়ণ, ১৭৭৬ শক), 'লৌহ' (মাঘ, ১৭৭৬ শক), 'শোরা প্রস্তুতকরণের প্রথা' (ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক) ইত্যাদি। উল্লিখিত সবগুলি প্রবন্ধেরই ভাষা প্রাঞ্জল এবং তথ্যসমাবেশ সর্বসাধারণের উপযোগী। তবে দু'একটি প্রবন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যাদি এসে গেছে। এই প্রসঙ্গে 'পারদ' প্রবন্ধটির নাম করা যেতে পারে।

এই পত্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা 'ইলেক্‌ট্রিক্ টেলিগ্রাফ অর্থাৎ তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্র' ১৭৭৬ শকাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তড়িতের মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে তার অবস্থিতি

ও গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। এর পর টেলিগ্রাফ যন্ত্রের বর্ণনা দিয়ে টেলিগ্রাফ-পদ্ধতির বর্ণনা। রচনাটি সুলিখিত।

বিবিধার্থ-সংগ্রহের প্রথম দিককার সংখ্যাগুলোতে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ একেবারেই নেই। এই পর্যায়ের দু'টি মাত্র প্রবন্ধ শেষ দিককার দু'টি সংখ্যায় পাওয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই আলোচ্য প্রসঙ্গ ধূমকেতু। ১৭৭৯ শকাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত ধূমকেতু বিষয়ক প্রবন্ধটিতে ধূমকেতুর শ্রেণীবিভাগ ক'রে তার উদয়কাল, ভ্রমণপথ, পুচ্ছ ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। গণিত বিষয়ক একমাত্র প্রবন্ধ 'বৎসর' ১৭৮০ শকাব্দের মাঘ সংখ্যা বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে বৎসর গুণবার প্রাচীন ও আধুনিক কয়েকটি পদ্ধতি সহজ ভাষায় আলোচিত হয়েছে।

বিবিধার্থ-সংগ্রহের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তার মূলে রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্বই সর্বাধিক। বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের সরস বিজ্ঞানালোচনাগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের উল্লেখযোগ্য অবদান এখানেই। বিবিধার্থ-সংগ্রহে জীবরহস্যের লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়েরও কিছু কিছু রচনা ছড়িয়ে আছে বলে মনে হয়। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কিছুকাল এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তবে প্রথম দিককার সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত কোনো কোনো রচনার সঙ্গে জীবরহস্যের (২য় ভাগ) রচনাগুলির সাদৃশ্য থাকলেও বিবিধার্থ-সংগ্রহের প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যথার্থই মধুসূদন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, ১৭৮৩ শকাব্দের আষাঢ় সংখ্যা বিবিধার্থ-সংগ্রহে জীবরহস্য-২য় ভাগের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিল, "আমরা ইহার সমালোচনা করণার্থ আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, প্রস্তাব সমুদায়ে মধুসূদন বাবুর লেখা নহে; বিবিধার্থ-সংগ্রহের পুরাতন পর্ব্ব হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে অথচ বিজ্ঞাপনে তাহা কিছুমাত্র নির্দ্দেশিত হয় নাই।" তবে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম দিককার প্রবন্ধগুলির রচয়িতা যিনিই হোন না কেন, শুরু থেকেই পত্রিকাটির সরস ও পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনার অন্তরালে যে কৃতিত্ব তা' রাজেন্দ্র-লালেরই প্রাপ্য।

দুই

রাজেন্দ্রলালের অপর কৃতিত্ব 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকার সম্পাদনা। রহস্য-সন্দর্ভের প্রথম সম্পাদক তিনিই। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ভার্ণাকিউলার লিটারেচার ডিপার্টমেণ্ট থেকে। রহস্য-সন্দর্ভে বিবিধার্থ-সংগ্রহের রচনাদর্শ অনুসৃত হয়েছিল। বস্তুতঃ, শেষোক্ত পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই রহস্য-সন্দর্ভের প্রকাশ। একের অভাব দূর করবার জন্যই একই আদর্শ নিয়ে অপরের আবির্ভাব। রহস্য-সন্দর্ভ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা সম্বন্ধে সোমপ্রকাশে মন্তব্য করা হয়েছিল,..."আমরা ইহার প্রশংসাস্থলে এই মাত্র বলিতে পারি, লেখকেরা যদি অধ্যবসায় সম্পন্ন হন, ক্রমে ইহা বিবিধার্থ-সংগ্রহের পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে।"[১] অল্পকালের মধ্যেই এই পত্রিকা বিবিধার্থ-সংগ্রহকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্টে[২] মন্তব্য করা হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রে একমাত্র পদার্থবিদ্যা ছাড়া বিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগগুলি সম্বন্ধে একথা মেনে নেওয়া যায় না।

বিবিধার্থ-সংগ্রহের মতো রহস্য-সন্দর্ভেও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার প্রাধান্য। কিন্তু বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে যেরূপ বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া গিয়েছিল, এই পত্রিকায় সেরূপ নেই। প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেই রচনার সরসতার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে বেশী। ফলে তথ্যসমাবেশের দিক থেকে প্রবন্ধগুলি হয়ে পড়েছে দুর্বল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ২য় পর্বের (১৯২১ সংবৎ) 'রেকুন পশু' (১৮ খণ্ড) ও 'ওসিলট্ পশু' (২০ খণ্ড), ৪র্থ পর্বের (১৯২৩ সংবৎ) 'বেলবাড' (৪৩ খণ্ড), ৫ম পর্বের (১৯২৭ সংবৎ) 'দোদাপক্ষী' (৫৬ খণ্ড) ও 'গগনভেড়' (৫৭ খণ্ড), ৬ষ্ঠ পর্বের (১৯২৮ সংবৎ) 'বাবুই পক্ষী' (৬১ খণ্ড) ইত্যাদি রচনা। প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক সারগর্ভ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই জাতীয় প্রবন্ধের নিদর্শন, ৩য় পর্বের (১৯২২ সংবৎ) 'কোয়াটিমুণ্ডী' (২৮ খণ্ড) ও ৭ম পর্বের (১৯২৯ সংবৎ) 'পঙ্গপাল' (৭৭ খণ্ড)। রহস্য-সন্দর্ভে প্রকাশিত প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ

---

১ সোমপ্রকাশ, ৯ই মার্চ, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ।

২ Calcutta School Book Society's 23rd Report (1862-63)—P. 25.

প্রবন্ধেই বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অভাব। তথ্যসমাবেশের দিক থেকে বিচার করলে কোনো কোনো রচনা বালকপাঠ্য রচনার মতো। তবে ভাষা সর্বত্রই সরস ও সহজবোধ্য। রচনাভঙ্গীর এই লালিত্যের জন্যই প্রবন্ধগুলির সাহিত্যিক মূল্য বেড়েছে। অধিকাংশ রচনারই লেখক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত।

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট রচনা এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, ২য় পর্বে (২২ খণ্ডে) প্রকাশিত 'প্রতিধ্বনি' শীর্ষক প্রবন্ধটি। তথ্যসমাবেশের সঙ্গে ভাষার লালিত্য যুক্ত হওয়ায় রচনাটি মনোরম হয়ে উঠেছে। তবে কোনো কোনো রচনায় ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দ বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে অসতর্কতা পরিলক্ষিত হয়। প্রশ্ন ও উত্তরের আকারে বর্ণিত ৩য় পর্ব—৩৪ খণ্ডের 'বিদ্যুৎ' নামক রচনাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক সারগভ ও সুদীর্ঘ প্রবন্ধও এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। 'নৈস্বর্গীক বিজ্ঞান' শীর্ষক রচনাটি ১২৭০ সালের ২য় খণ্ড থেকে (রহস্য-সন্দর্ভ—নব পর্যায়) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে বিভিন্নপ্রকার 'স্বাভাবিক শক্তি' সম্বন্ধে আলোচনার পর 'আকর্ষণ শক্তি', 'কিমিয় সম্পর্ক,' 'ইলেকট্রিসিটি' ও 'চৌম্বকাকর্ষণ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। রচনাটির বর্ণনাভঙ্গী সহজ। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অপর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ পরিচালক দণ্ডে' (১২৮০ সাল, নব পর্যায়, ১ম পর্ব, ৭ম খণ্ড) বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তা' থেকে আত্মরক্ষার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। রচনাটির প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। প্রকাশভঙ্গীর এই স্বচ্ছতা ও ভাষার লালিত্য এই পত্রিকার পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রচনার নিদর্শন :—

প্রতিধ্বনি সম্পর্কে আলোচনার একাংশ—

> "ইদানীন্তন দার্শনিক পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে শব্দ একপ্রকার উর্ম্মিমাত্র। জলে লোষ্ট্র নিঃক্ষেপ করিলে জলের কম্পনে যে প্রকার উর্ম্মি উৎপন্ন হয়, বায়ুতে কোন পদার্থ আন্দোলিত হইলে সেইরূপে বায়ুর কম্পনে উর্ম্মি উৎপন্ন হয়, এবং সেই উর্ম্মি কর্ণমধ্যে গিয়া কোন বিশেষ ত্বচে আহত হইলে শব্দ জ্ঞান হয়। ইহার প্রমাণার্থে পণ্ডিতেরা বায়ুবিহীন স্থানে ঘণ্টা বাজাইয়া

দেখিয়াছেন যে তথায় শব্দ উৎপন্ন হয় না, এবং বর্ণবিশিষ্ট বায়ুতে শব্দ করিলে ঐ উর্ম্মি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। অপর ইহাও প্রমাণিত আছে যে বায়ু অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক, স্মৃতরাং কোন দৃঢ় পদার্থে আহত হইলে তথা হইতে তাহা প্রতিক্ষিপ্ত হয়, স্মৃতরাং গৃহমধ্যে শব্দ করিলে সেই শব্দের উর্ম্মি প্রথম গৃহস্থ মনুষ্যের কর্ণে লাগিয়া একবার শব্দ জ্ঞান করায়, পরে নিকটস্থ দেয়ালের গাত্রে লাগিয়া তথা হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া ঐ মনুষ্যকর্ণে পুনঃ আসিয়া আর একটী শব্দ উৎপন্ন করে; তাহা পূর্ব্ব শব্দের প্রত্যাভাসমাত্র; এবং তাহাই প্রতিধ্বনি বোধ হয়। তির্য্যগ্‌ গতিবিশিষ্ট শব্দ দিয়াল হইতে কর্ণে না আসিয়া অন্যত্র যায়, স্মৃতরাং প্রতিধ্বনি হয় না। এই কারণে সামান্য গৃহ অপেক্ষা গুম্বজবিশিষ্ট মসজিদ্‌ বা দেবালয়ে স্মদীর্ঘ প্রতিধ্বনি হয়, যেহেতু ঐ মন্দিরের উর্দ্ধভাগ বর্ত্তুলাকার। তন্মধ্যে একত্রে যথেষ্ট বায়ু সঙ্কীর্ণভাবে জমা হইয়া থাকে। সেই স্থানে শব্দ আসিলে তাহা ঐ বায়ুদ্বারা সবেগে প্রতিক্ষিপ্ত হয় এবং তদ্দ্বারা প্রতিধ্বনি উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

উপরে যে কারণ নির্দ্দিষ্ট করা হইল, তন্নিয়মানুসারে বোধ হইতে পারে যে স্থানভেদে প্রতিধ্বনির ভিন্নতা হইবে, অর্থাৎ যে স্থানে একটী গুম্বজের পরিবর্ত্তে চারি পাঁচটী গুম্বজ বা দেয়াল পর পর সংস্থাপিত আছে, সে স্থানে একবার শব্দ করিলে সকল দেয়ালেই তাহা আহত হইবার সম্ভাবনা, এবং তাহার প্রত্যেক হইতে তাহা প্রতিক্ষিপ্ত হইবে; স্মৃতরাং সে স্থানে যে কএকটী দেয়াল থাকিবে ততবার প্রতিধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে। ঢোল, তবলা, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের একটী উদর; তন্নিধায় তাহাতে একবার আঘাত করিলে দুইবার প্রতিধ্বনি হয় না। কিন্তু কোন কোন মস্‌জিদের তিন, চারিটী বা ততোধিক চূড়া থাকে। তন্নিমিত্ত সে স্থানে প্রতিধ্বনিরও আধিক্য হইবার সম্ভাবনা। অপর, গৃহের দ্বার রুদ্ধ রাখিলে যে রূপ প্রতিধ্বনি হয়, দ্বার বিমুক্ত থাকিলে তদ্রূপ হয় না, কারণ দিয়াল হইতে প্রতিক্ষিপ্ত বায়ূর্ম্মি দ্বার দিয়া বাহিরে চলিয়া যায়, গৃহস্থ মনুষ্যের কর্ণে পুনরায় আইসে না। যে প্রকার প্রাচীর

হইতে শব্দোর্মি প্রতিক্ষিপ্ত হয়, সেই প্রকার কূপ তড়াগ নদী সমুদ্রাদির জল হইতেও প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সুতরা ঐ সকল স্থানেও প্রতিধ্বনির আধিক্য আছে।"

রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সুলিখিত। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ৪র্থ পর্বের 'গন্ধক' এবং 'প্লাটিনা ধাতু'। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে গন্ধকের কয়েকটি গুণ ও আকরস্থ গন্ধক ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। রচনাটি সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে লেখা। দ্বিতীয় রচনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আরও সুস্পষ্ট। এতে প্লাটিনামের গুণাবলী, সংশোধন-প্রণালী (extraction) এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। রসায়নবিদ্যা বিষয়ে এটি একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ।

রহস্য-সন্দর্ভে জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক দু'একটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়, তবে এদের কোনোটিই উচ্চাঙ্গের নয়। তথ্যের অভাব এবং অবাস্তর কথার অবতারণা প্রবন্ধগুলির উৎকর্ষ নষ্ট করেছে। যেমন, 'সূর্য্য' (৫ম পর্ব – ৫৮ খণ্ড, ১৯২৭ সংবৎ)।

প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক কোনো সরস বা উচ্চাঙ্গের আলোচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। এই পর্যায়ের একমাত্র রচনা 'ঝড়বৃষ্টির পূর্ব্বলক্ষণ' (৫ম পর্ব-৫৯ খণ্ড) একটি নীরস প্রবন্ধ।

রহস্য-সন্দর্ভে কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক-জীবনী প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ২য় পর্বের 'স্যর আইসাক্ ন্যুটনের বাল্যাবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধটি। এতে নিউটনের বাল্যজীবনের এমন কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর ভাবী প্রতিভা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছিল। রচনাটি সরস ও সুলিখিত। পরবর্তী খণ্ডে নিউটনের যৌবনকালের বিবরণ প্রকাশিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তা' আর প্রকাশিত হয় নি।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, রহস্য-সন্দর্ভে প্রাণিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ রচনাই তথ্যসমাবেশের দিক থেকে প্রাথমিক প্রকৃতির। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই পত্রিকায় নেই। এ পর্যায়ের আলোচনার অর্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে

ইতিহাস। বস্তুতঃ, বিজ্ঞান নিয়ে কোনো সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা এই পত্রিকায় পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের ভাষার সরসতা সম্পাদনই বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে এই পত্রিকার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান।

তিন

সরস অথচ বলিষ্ঠ ভাষায় সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তামূলক বিজ্ঞানালোচনা পাওয়া গেল বঙ্গদর্শনে। এ পর্যায়ের অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম দু' বৎসরে কয়েকটি উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এর মূলে কৃতিত্ব পত্রিকা-সম্পাদক (১২৭৯-১২৮২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। ১২৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বিজ্ঞানকৌতুক' নাম দিয়ে বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত তিনিই করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদকতা ত্যাগ করবার পর এই পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা হ্রাস পেল। ১২৮২ সাল থেকে ১২৯১ সালের মধ্যে বঙ্গদর্শনের যে সংখ্যাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা অত্যল্প।

বঙ্গদর্শনের রচনাগুলির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এদের ভাষায়। উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সমালোচনাকে কেন্দ্র ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাভাষার যে সংস্কার সাধন করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া গেল বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞানালোচনাগুলোতেও। শুধুমাত্র লালিত্যই নয়, ভাষার যে বলিষ্ঠতা ও বাঁধুনি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক, তা এই পত্রিকায় পাওয়া গেল। এই বলিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন ভাষা বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করল। এই পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির অপর বৈশিষ্ট্য রচনাভঙ্গীর পারিপাট্যে ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনবত্বে। রচনাপারিপাট্যের মূলে রয়েছে লেখকের সাহিত্য-রসিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনবত্ব প্রাণী ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধেই সমধিক পরিস্ফুট।

এই যুগের অন্যান্য পত্র-পত্রিকার ন্যায় প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক গতানুগতিক প্রকৃতির আলোচনা বঙ্গদর্শনে নেই। এই পত্রিকার প্রাণী ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলোতে কোনো একটি জীবকে কেন্দ্র ক'রে তার আকৃতি ও প্রকৃতি বর্ণিত হয় নি। জীবনই এখানে আলোচনার প্রধান উপাদান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'সর উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা'

(জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯) ও 'জৈবনিক' (কার্ত্তিক, ১২৮০)। উভয় প্রবন্ধেরই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র। দু'টি প্রবন্ধই পরে বিজ্ঞানরহস্যে সংকলিত হয়। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি এক বিরাট জিজ্ঞাসা দিয়ে পরিসমাপ্ত। দ্বিতীয় প্রবন্ধে জীব-শরীরের ভৌতিক তত্ত্ব, জৈবনিকের উপাদান ও উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। লেখকের পাণ্ডিত্য, যুক্তিজাল ও সরস বর্ণনাভঙ্গী রচনাটিকে উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। বঙ্গদর্শনের প্রাণি-বিজ্ঞান বিষয়ক অপর আলোচনা 'বৈজিক তত্ত্ব' ১২৮৪ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'হেরিডিটি' সম্বন্ধে এটি একটি সারগর্ভ ও উৎকৃষ্ট রচনা। এখানে জনক-জননীর সঙ্গে সন্তানের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আলোচনা করা হয়েছে প্রধানতঃ ডারউইন ও হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থের উপর নির্ভর ক'রে। লেখকের বিশ্লেষণ-কুশলতার পরিচয় প্রবন্ধটির সর্বত্রই সুপরিস্ফুট। এই প্রবন্ধটিরও লেখক সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্গদর্শনে জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই সর্বাধিক। এ জাতীয় অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সরস বর্ণনাভঙ্গী ও পরিমিত তথ্যসমাবেশ অধিকাংশ প্রবন্ধকেই আশ্চর্য রমণীয়তা দান করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দু'জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ --উভয়কেই আকর্ষণ করেছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে। আর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বিশ্বপরিচয়' (১৩৪৪)। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি কবি ও সাহিত্যিকদের এই আকর্ষণের মূলে একটি মাত্রই কারণ রয়েছে বলে মনে হয়; জ্যোতিবিজ্ঞানের বিরাট ও উদার ক্ষেত্রে কল্পনার অনায়াসবিহারের যে অবকাশ রয়েছে, বিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগে তা' নেই। বিশ্বজগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের কল্পনার খোরাক খুঁজে পান। বঙ্গদর্শনের প্রায় সবগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর লিখিত 'আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯), 'আকাশে কত তারা আছে?' (অগ্রহায়ণ, ১২৭৯), 'চঞ্চল জগৎ' (ভাদ্র, ১২৮০), 'গগন পর্য্যটন' (পৌষ, ১২৮০) এবং 'পরিমাণ রহস্য' (চৈত্র, ১২৮০ ও আষাঢ়, ১২৮১) পরে বিজ্ঞানরহস্যে সংকলিত হয়েছিল। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে সূর্যে বিস্ফোরণের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে সূর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দু'একটি সহজ উদাহরণ

এবং প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণিত সৌরোৎপাতের বর্ণনা দেবার ফলে রচনাটির সরসতা বেড়েছে। পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে বিশ্বজগতের বৈচিত্র্য রহস্যঘন হয়ে উঠেছে। 'আকাশে কত তারা আছে' নামক প্রবন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর তারকা ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের প্রদত্ত তারকার হিসাব মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত। 'চঞ্চল জগৎ'-এ লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, ক্ষুদ্রতম পরমাণু থেকে শুরু করে গাছপালা, পৃথিবী, সূর্য, সৌরজগৎ, নক্ষত্র প্রভৃতি সব কিছুই গতিবিশিষ্ট। প্রবন্ধটি ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে 'climax'-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু, উপসংহারে চাঞ্চল্যের উপযোগিতা বোঝাবার ফলে তা' কিছুটা নষ্ট হয়েছে। শেষাংশ নিম্নরূপ—

> "যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইখানে চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী! যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল, বরং সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে।"

'গগন পর্য্যটন' ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যরসের ত্রিবেণী-সঙ্গম। শেষোক্ত প্রবন্ধ 'পরিমাণ রহস্যে' পৃথিবীর ওজন, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, নীহারিকা ও তারকাদির দূরত্ব চিত্তাকর্ষক উপমার সাহায্যে বোঝান হয়েছে। বঙ্গদর্শনের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধ হোল, 'সূর্য্যমণ্ডল' (আশ্বিন, ১২৮২), 'চন্দ্রের বৃত্তান্ত' (চৈত্র, ১২৮৫) এবং 'ধূমকেতু ও উল্কাপাত' (অগ্রহায়ণ, ১২৯০)। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে সূর্যের দূরত্ব, উপাদান, সৌরকলঙ্ক ইত্যাদি আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতামত উদ্ধৃত। রচনাটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। শেষোক্ত রচনা দু'টিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সঙ্গে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে।

পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধেও সুস্পষ্ট। ১২৮৯ সালের পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'পঞ্চভূত' শীর্ষক রচনাটির বৈশিষ্ট্য, শাস্ত্রীয় তথ্যের প্রতি লেখকের নিষ্ঠা। লেখক এখানে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, আর্য পণ্ডিতগণ যে পাঁচ ভূতে বিশ্বাস করতেন, সেই ভূতেরা মৌলিক পদার্থ নয়—'স্থূল পদার্থের রূপান্তর মাত্র।' এই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যে যুক্তিজাল ও তথ্যাদির অবতারণা করা হয়েছে, তা'তে রচয়িতার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে নেই। ১২৮৭ সালের মাঘ সংখ্যার 'জল' নামক প্রবন্ধটি না পুরোপুরি শারীরবিদ্যা বিষয়ক না রসায়নবিদ্যা সম্পর্কীয়। এখানে মানুষের শরীরে ও রক্তে জলের পরিমাণ, তৃষ্ণার কারণ এবং জলে মিশ্রিত বিভিন্ন পদার্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি জল সম্বন্ধে সর্বজনবোধ্য একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত গণিত বিষয়ক একমাত্র প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা ভগ্নাংশ' ১২৭৯ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটিতে লেখকের মৌলিক চিন্তা-শক্তির ছাপ রয়েছে। গণিত সম্বন্ধে এ ধরনের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তৎকালীন বাংলা সাময়িক-পত্রে অতি অল্পই পাওয়া যায়। এতে দুই প্রকার সংখ্যা, অবচ্ছিন্ন (যখন কোনো বিশেষ পদার্থের সংখ্যাকে বোঝায়) ও নিরবচ্ছিন্ন (যখন কোনো পদার্থ বোঝায় না) নিয়ে আলোচনার পর অবচ্ছিন্ন সংখ্যার শ্রেণী-বিভাগ এবং অনবচ্ছিন্ন রাশির ভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে। তা' ছাড়া এখানে ভগ্নাংশ ব্যবহারের কতকগুলি ত্রুটি মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে আলোচিত।

ভূতত্ত্ব বিষয়ক কোনো কোনো প্রবন্ধে গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৮০ সালের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'অতলস্পর্শ' শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখানে বাংলার দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্রের বিরাট একটি গহ্বরের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে স্রোত-বাহিত পলিমাটি দ্বারা বাংলার উৎপত্তি সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। ১২৮০ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কত কাল মনুষ্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি পরে বিজ্ঞানরহস্যে সংকলিত হয়েছিল। তথ্যের অভাব থাকলেও রচনাটি সরস।

১২৭৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত 'ধূলা' নামক প্রবন্ধের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র। প্রবন্ধটি পরে বিজ্ঞানরহস্যে সংকলিত হয়। রচনাটির মূলে ধূলা সম্বন্ধে টিণ্ডালের একটি দীর্ঘ প্রস্তাব। ভূমিকায় অবান্তর কথার অবতারণা থাকলেও ধূলা সম্বন্ধে বক্তব্য এখানে অল্প কথায় সুপরিকল্পিতভাবে অভিব্যক্ত।

এইরূপে বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র ক'রে ভাষায় ও রচনাভঙ্গীতে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হোল।

চার

এই অগ্রগতির নিদর্শন পাওয়া গেল আর্যদর্শনেও (প্রঃ প্রঃ—বৈশাখ, ১২৮১ সাল)। বঙ্গদর্শনের ঠিক সমগোত্রীয় না হলেও আর্যদর্শনের অধিকাংশ

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই সুলিখিত। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধই এই পত্রিকায় বেশী প্রকাশিত হোত। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, প্রাণী ও রসায়ন-বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধও এতে পাওয়া যায়।

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলির সর্বপ্রধান ত্রুটি, বিষয়বস্তু নির্বাচনের একঘেয়েমিতা। এই পর্যায়ের অধিকাংশ রচনাই তড়িৎ নিয়ে। তড়িৎবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'তড়িৎ ও বিদ্যুৎ' (কার্ত্তিক, ১২৮২), 'বিদ্যুৎ, বজ্র ও বিদ্যুদ্দণ্ড' (অগ্রহায়ণ, ১২৮২)। এ ছাড়া ১২৮২ সালের চৈত্র সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'তড়িৎবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত' এবং ১২৮৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'তাড়িত-বিজ্ঞান' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে (তড়িৎ ও বিদ্যুৎ) বিদ্যুৎ ও তড়িতের প্রকৃতিগত ঐক্য মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত। পরবর্তী প্রবন্ধটি অপেক্ষাকৃত তথ্যবহুল। তড়িৎবিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে তড়িতের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। মূল্যবান ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য-সমন্বিত এই প্রবন্ধটিতে রচয়িতার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো প্রবন্ধে উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। ১২৮৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র ও জ্যোতিষ' শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে দু' একটি প্রবন্ধে সরস ভাষায় যে তর্কজাল বিস্তার করা হয়েছে, তা' বেশ উপভোগ্য। এই প্রসঙ্গে ১২৮৪ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক পদার্থবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধটির নাম করা যেতে পারে।

জ্যোতিবিজ্ঞান নিয়ে বঙ্গদর্শনের ন্যায় উচ্চাঙ্গের আলোচনা আর্যদর্শনে নেই। এই পর্যায়ের যে দু' একটি আলোচনা এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত তা' তথ্যবহুল, বিস্তৃত ও সুলিখিত হওয়া সত্ত্বেও গতানুগতিক প্রকৃতির। যেমন, ১২৮১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সৌরজগৎ'।

প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলিতে তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ১২৮২ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'ডারউইনের মত' এবং ১২৮৪ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'অধ্যাপক হক্‌সলির দার্শনিক মত' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক সারগর্ভ ও সুবৃহৎ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। যেমন, ১২৯১ সালের আশ্বিন সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'শরীর-তাপ' শীর্ষক প্রবন্ধটি।

ভূবিদ্যা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গের আলোচনা এই পত্রিকায় না থাকলেও কোনো কোনো প্রবন্ধে প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক কিছু কিছু তথ্যাদি রয়েছে। যেমন, 'চট্টগ্রাম-প্রাকৃতিক বিবরণ' (কার্ত্তিক, ১২৮২), 'কাবুলের ভৌগোলিক বিবরণ' (পৌষ, ১২৮৯) ইত্যাদি।

রসায়নবিজ্ঞান সম্পর্কীয় একমাত্র প্রবন্ধ কানাইলাল দে লিখিত 'রসায়ন-শাস্ত্রের আবশ্যকতা ও ইতিবৃত্ত' ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বল্পপরিসরের মধ্যে অধিক তথ্যের সমাবেশে রচনাটির সাহিত্যিক মূল্য নষ্ট হয়েছে।

বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই পর্যায়ের একটি সুলিখিত প্রবন্ধ 'বিজ্ঞান ও ঈশ্বর' ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটিতে লেখকের গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সুস্পষ্ট। গণিত সম্বন্ধীয় কোনো প্রবন্ধ এই পত্রিকায় নেই।

পাঁচ

গণিত নিয়ে উচ্চাঙ্গের আলোচনা পাওয়া গেল ভারতীতে। পত্রিকাটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে ভারতী বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। ১২৯৩ সালে এই পত্রিকাটি 'বালক'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'ভারতী ও বালক' (১২৯৩-১২৯৯) নামে প্রকাশিত হতে থাকে। বালক যুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীর প্রথম যুগ। বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই যুগের ভারতীর সর্ব-প্রধান অবদান গণিত বিষয়ক প্রবন্ধে। এই পর্যায়ের রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও গণিতের ইতিহাস আলোচনার প্রয়াস। গণিতের ইতিহাস বিষয়ক সবগুলি প্রবন্ধই কালীবর বেদান্তবাগীশ লিখেছিলেন। কালীবর লিখিত 'গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার আবির্ভাবকাল' (আশ্বিন, ১২৮৫) শাস্ত্রীয় তথ্য-নির্ভর একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ। ইতিপূর্বে প্রকাশিত (কার্ত্তিক, ১২৮৪) 'প্রাচীন ভারতের শিল্প' নামক প্রবন্ধে শাস্ত্রীয় তথ্যপ্রমাণাদির মাধ্যমে প্রাচীন ভারতবাসীর সময়জ্ঞান (যাম, অর্ধযাম, মুহূর্ত ইত্যাদি) সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। ১২৮৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতীতে কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রাচীন ভারতের কয়েকটি কালনির্ণয়ক যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। উল্লিখিত প্রতিটি রচনাই সারগর্ভ। তবে রচনাভঙ্গী

কোনোটিরই সরস নয়। গণিত সম্বন্ধীয় কোনো কোনো আলোচনায় মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১২৮৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'জ্যামিতির নূতন সংস্করণ' ও ১২৯০ সালের পৌষ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত 'স্থানমান'। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে ইউক্লিডের জ্যামিতির কতকগুলি ত্রুটি দেখাবার চেষ্টা দেখা যায়। শেষোক্ত প্রবন্ধে ইউক্লিডের ন্যায় শুধুমাত্র শূন্য আকাশকেই আলোচনায় স্থান না দিয়ে শূন্য আকাশের সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় বস্তুকেও আলোচনায় নেওয়া হয়েছে। দু'টি প্রবন্ধেই সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৮৭ সালের মাঘ সংখ্যা ভারতীতে 'ভৌতিক বিজ্ঞানের মূল-পত্তন' নামক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা' শেষোক্ত রচনার মতবাদের উপর নির্ভর ক'রে লেখা।

এই যুগের ভারতীতে প্রকাশিত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে কোনোরূপ নূতনত্ব নেই। রচনাভঙ্গী ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক থেকে এই জাতীয় সবগুলি প্রবন্ধই গতানুগতিক প্রকৃতির। কোনো কোনো প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক তথ্যাদিই বেশী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'প্রলয়ের ধূমকেতু' (আষাঢ়, ১২৮৯) ও স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিত 'প্রলয়' (আশ্বিন, ১২৮৯)। এই যুগের ভারতীতে প্রকাশিত গ্রহ-সম্বন্ধীয় রচনাগুলিতে তথ্য ও যুক্তির সম্মিলন ঘটেছে। যেমন, স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিত 'অন্যান্য গ্রহগণ জীবের নিবাসভূমি কিনা' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১) ও 'মঙ্গলে জীব থাকিতে পারে কি না' (বৈশাখ ১২৯২)।

এই পর্বের ভারতীর উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধই নীরস। কদাচিৎ দু' একটি প্রবন্ধে স্বল্পপরিসরের মধ্যে সরস ও সারগর্ভ আলোচনা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'উদ্ভিদ' (চৈত্র, ১২৮৪), 'উদ্ভিদ ও জন্তু' (কার্ত্তিক, ১২৯০)। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক সুদীর্ঘ প্রবন্ধও এই যুগের ভারতীতে পাওয়া যায়। যেমন, ১২৯২ সালের ভাদ্র সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শ্রীপতিচরণ রায়ের লেখা 'মাংসাদ উদ্ভিদ' শীর্ষক প্রবন্ধটি। এখানে রচনা কিছুটা ইতিহাস-ঘেঁষা। রচনাভঙ্গীও আড়ষ্ট। তা' ছাড়া দু'একটি প্রবন্ধের প্রধান ত্রুটি, যায়গায় যায়গায় গুরুচণ্ডালী দোষ। এই প্রসঙ্গে ১২৯০ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত 'পুষ্পতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধটির নাম করা যেতে পারে। দীর্ঘ বাক্য ও দুরূহ শব্দের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগের

ফলে কোনো কোনো প্রবন্ধ নীরস ও দুর্বোধ্য। যেমন, শ্রীপতিচরণ রায় লিখিত 'ক্রমোত্থান-পুষ্প' (চৈত্র, ১২৯১)।

জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তাশীল প্রবন্ধ এই যুগের ভারতীতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১২৮৫ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'জীবজগতের ক্রমাভিব্যক্তি'। এ ছাড়া শ্রীপতিচরণ রায় জীববিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যেমন, 'পিপীলিকা-ধেনু' (বৈশাখ, ১২৯০), 'চার্লস্ ডারউইন ও ঊনবিংশ শতাব্দী' (আশ্বিন, ১২৯০)। অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র প্রবন্ধ কালীবর বেদান্তবাগীশ রচিত 'শব-চ্ছেদ' (মাঘ, ১২৮৫) শাস্ত্রীয় তথ্যপ্রমাণাদির উপর নির্ভর ক'রে লেখা।

ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ এই যুগের ভারতীতে পাওয়া গেলেও এই জাতীয় অধিকাংশ প্রবন্ধই নীরস। যেমন, 'গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও কলিকাতার ভূতত্ত্ব' (চৈত্র, ১২৮৬), 'ভূগর্ভ' (আশ্বিন, ১২৮৭)।

এই যুগের ভারতীতে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ নেই বললেই হয়। পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একমাত্র রচনা স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিত 'পদার্থের চতুর্থ অবস্থা ও কিরণ পদার্থ' (শ্রাবণ, ১২৯১) একটি চিন্তাশীল ও সরস প্রবন্ধ। রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'পরমাণবিক সিদ্ধান্ত' (আষাঢ়, ১২৯১) একটি সুলিখিত প্রবন্ধ।

দার্শনিক চিন্তামূলক কয়েকটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ এই যুগের ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'দেশ, কাল এবং তাহার অতীত প্রদেশ' (শ্রাবণ, ১২৮৭) ও 'পৃথিবীর পরিণাম' (ভাদ্র, ১২৮৭)।

এইভাবে বিবিধার্থ-সংগ্রহ, রহস্য-সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, ভারতী প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সাময়িক-পত্রকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ভাষা ও রচনারীতিতে উন্নতি সাধিত হোল।

স্ত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিকা ঃ সংবাদপত্র ও মফঃস্বল পত্রিকা

বিবিধার্থ-সংগ্রহ, রহস্য-সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সাময়িক-পত্র ছাড়াও এই যুগের বিভিন্ন স্ত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিকায় এবং কয়েকটি সংবাদপত্র ও মফঃস্বলপত্রে বিজ্ঞানালোচনা পাওয়া গেল।

এদেশে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ও স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকার প্রবর্তন হয়েছিল একই যুগে। বস্তুতঃ, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্ত্রীশিক্ষা-আন্দোলন যখন পূর্ণাঙ্গ রূপ নিল, তখনই স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকার প্রথমপ্রকাশ। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রচেষ্টা অনেকদিন থেকেই চলছিল। কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (১৮১৭) এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন। এরপর 'ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটি' (Female Juvenile Society), মিস্ কুক (Miss Cooke), 'বেঙ্গল লেডিজ্ সোসাইটি' (Bengal Ladies' Society) প্রভৃতির সহায়তায় কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[১] কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করাই এই সকল বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাই এদেশীয় জনসাধারণের সঙ্গে এদের কোনো সংযোগ ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষ প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের কৃতিত্ব ড্রিংকওয়াটার বেথুনের। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালংকার প্রভৃতির সহায়তায় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকেই বাংলা দেশে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে স্ত্রীশিক্ষার যথার্থ সূত্রপাত। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা এই যুগের বাংলা সাময়িক-পত্রেও দেখা গেল। সর্বশুভকরী পত্রিকার (প্রঃ প্রঃ আগস্ট, ১৮৫০) দ্বিতীয় সংখ্যায় মদনমোহন তর্কালংকার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখলেন।[২] অল্পকালের মধ্যেই "সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে" প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত "মাসিক পত্রিকা" (আগস্ট, ১৮৫৪) প্রকাশিত হোল। স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত প্রথম সাময়িক-পত্র সম্ভবতঃ এটিই। কিন্তু এই পত্রিকাটিতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত না। স্ত্রীপাঠ্য সাময়িক-পত্রে বিজ্ঞানালোচনা নিয়মিতভাবে শুরু হোল "বামাবোধিনী পত্রিকা" (প্রঃ প্রঃ আগস্ট, ১৮৬৩) থেকে। স্ত্রীশিক্ষার

১ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (৩য় সংস্করণ)—শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃঃ ১৮৬-১৮৯

২ বাংলা সাময়িক-পত্র, ১ম খণ্ড (নূতন সংস্করণ)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ১১৫।

উন্নতিবিধানই যে বামাবোধিনীর জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল, পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য থেকে তা' জানা যায়। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা করা হয় ঃ—

> "ঈশ্বর প্রসাদে এক্ষণে এদেশের অবলাগণের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পুরুষদের ন্যায় তাহাদের শিক্ষা বিধান যে নিতান্ত আবশ্যক, তদ্ভিন্ন তাহাদের দুরবস্থার অবসান হইবে না, দেশের সম্যক্ মঙ্গল ও উন্নতিরও সম্ভাবনা নাই ; ইহাও অনেকে বুঝিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই এই উদ্দেশে দেশহিতৈষি মহোদয়গণ স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিতেছেন, দয়াশীল গভর্ণমেণ্টও তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু এ উপায়ে অতি অল্প সংখ্যক বালিকারই কিছুদিনের উপকার হয়। অন্তঃপুর মধ্যে বিদ্যালোক প্রবেশের পথ করিতে না পারিলে সর্ব্বসাধারণের হিত সাধন হইতে পারে না।……
>
> এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক সমুদায় বিষয় লিখিত হইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়, এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল লাভ হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।"

এইরূপে স্ত্রীশিক্ষাকে কেন্দ্র ক'রে স্ত্রীপাঠ্য সাময়িক-পত্রে বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত।

এক

বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রাণিবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান এবং ভূগোল ও ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম কয়েক বৎসর শারীরবিজ্ঞান এবং ভূবিদ্যা ও ভূগোল বিষয়ক আলোচনার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়। ভূগোল বিষয়ক প্রবন্ধ প্রথম দিককার প্রায় প্রতি সংখ্যায়ই প্রকাশিত হোত। যেমন, 'পৃথিবীর আকার' (ভাদ্র, ১২৭০), 'পৃথিবীর পরিমাণ ও স্থিতির

বিষয়' (আশ্বিন, ১২৭০), 'পৃথিবীর গতি' (কার্ত্তিক, ১২৭০), 'গোলকের বিষয়' (মাঘ, ১২৭০) ইত্যাদি। উল্লিখিত রচনাগুলির প্রতিটিতেই ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাসের পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রচলিত বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ভাষা সহজবোধ্য হলেও যায়গায় যায়গায় নীরস ও একঘেয়ে। তবে সুপ্রচলিত দ্রব্যের সাহায্যে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করার ফলে রচনাগুলির সারল্য কিছুটা বেড়েছে। এই যুগের বামাবোধিনীতে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে কয়েকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৭২ সালের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'জোয়ার ভাঁটা' এবং ১২৭৭ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'পর্ব্বত' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও বিবিধার্থ-সংগ্রহকে বাদ দিলে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত আলোচনা সমসাময়িক আর কোনো পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায় না।

পত্রিকা-প্রকাশের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে বামাবোধিনীতে প্রাণি-বিজ্ঞান বিষয়ক সুবিস্তৃত আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১২৭১ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় 'মাকড়সা' এবং ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'প্রাণীবিদ্যা'। শেষোক্ত প্রবন্ধে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ, রক্তসঞ্চলন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা। প্রবন্ধটির রচনাভঙ্গী মোটেই সরস নয়। তবে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর শারীরবিজ্ঞান নিয়ে এরূপ সারগর্ভ ও সুপরিকল্পিত আলোচনা তৎকালীন যুগের সাময়িক-পত্রে অল্পই পাওয়া যায়। আলোচ্য জীবের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর জীবদের শারীরবিজ্ঞান নিয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা এই পত্রিকার প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে ১২৭৮ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত "সরীসৃপ জাতি" শীর্ষক রচনাটি উল্লেখযোগ্য। তবে প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক এমন বহু রচনাও এই পত্রিকায় বেরিয়েছিল, যাদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ না বলে প্রাণিজগতের বিচিত্র বিবরণ বলা চলে। ১২৮০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সারঙ্গ পুচ্ছ' এই ধরনের একটি রচনা।

বামাবোধিনীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে। এই পর্যায়ের অধিকাংশ প্রবন্ধই সারগর্ভ। শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক এরূপ সারগর্ভ প্রবন্ধ তৎকালীন যুগের অপরাপর সাময়িক-পত্রে কদাচিৎ পাওয়া

যায়। তবে এদের ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রুতিকটু। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'পরিপাক ক্রিয়া' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৮), 'বাগযন্ত্র' (আষাঢ়, ১২৭৮), 'রক্তসঞ্চালন' (মাঘ, ১২৭৯) ইত্যাদি। কোনো কোনো প্রবন্ধে বক্তব্য বিষয় কবিতার মাধ্যমে বোঝান হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য, স্থলভ সমাচার পত্র থেকে উদ্ধৃত 'পরিপাক ক্রিয়া'। রচনাটিতে কবিতার সাহায্যে পরিপাক-পদ্ধতির বর্ণনা কৌতূহলোদ্দীপক। কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হোল—

"চর্ব্বণ লেহন করি গিলিলে আহার,
কোথা গেল বলিতে কি পাব সমাচার ?
উদর শীতল হল জানিল উদর,
আপন কার্য্যেতে আছে সতত তৎপর।
কণ্ঠনালী পার যাহা হয় একবার,
উদর পেটক মধ্যে প্রবেশ তাহার,
করিতে তণ্ডুল পাক যত আয়োজন।
আগুন সলিল কাষ্ঠ যত প্রয়োজন!
উদরে খাদ্যের পাক অদ্ভুত কৌশল,
শিল্পকর বসি তথা ঘুরাইছে কল।
আহার উদর যত করয় পেষণ,
অনর্গল রস তাহে হয় উদ্গীরণ,
রসাক্ত আহার পরে বহির্দ্বার দিয়া
ক্লোম পিণ্ডরস সহ যায় মিশাইয়া,
জারক পাচক রস আপনি যোগায়,
নূতন পাকের যন্ত্রে খাদ্য লয়ে যায়।
উদর গর্ভের মধ্যে বিগত প্রমাণ,
তিরিশ চল্লিশ হাত নলের সংস্থান।
অর্দ্ধচন্দ্রাকার তার মাঝে থাক থাক,
চাপিয়া চাপিয়া অন্ন করে পরিপাক।
অধোতে নামিল যাহা চলে অধোদেশে,
উপরের পথ রুদ্ধ যেন রাজাদেশে।

পুনঃ পুনঃ পুনঃ পুনঃ পেষণে পেষণে,
সুজীর্ণ হইল অন্ন জঠর ঘর্ষণে,
অসার যে সব ভাগ মোটা নাড়ী দিয়া,
মলরূপে দেহ হতে যায় বাহিরিয়া।
সারভাগ দুগ্ধবৎ হইয়া তরল,
রক্ত প্রবাহের সহ মিশে অবিরল।
মেদ মাংস অস্থি চর্ম্ম যতেক প্রকার,
আশ্চর্য্য কৌশলে হয় তাহাতে তৈয়ার।
ধন্য জগদীশ ধন্য তোমার করুণা,
এত যত্নে পালিতেছ কিছুই জানি না।"

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় নেই বললেই হয়। প্রথম বিশ বৎসরের মধ্যে (১২৭০-১২৯০) উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'উদ্ভিদবিদ্যা' ১২৭২ সালের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এতে পাতা, ফুল, ফল, বীজ ইত্যাদি নিয়ে সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে।

বামাবোধিনীর জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধ গতানুগতিক প্রকৃতির। অধিকাংশ প্রবন্ধেরই আলোচ্য বিষয় সৌরজগৎ। কদাচিৎ দু' একটি প্রবন্ধে নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, 'ব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্ব' (অগ্রহায়ণ, ১২৮৯)।

পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে সারগর্ভ ও সুবিস্তৃত আলোচনা এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। ১২৭৮ সালের পৌষ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'শব্দবিজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে ভূগোল, শারীর-বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধের ন্যায় পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও নীরস। যেমন, 'বায়ুনির্যান যন্ত্র' (শ্রাবণ, ১২৮২), 'বাষ্পযন্ত্র' (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪)। রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও একই দোষে দুষ্ট। যেমন, ১২৭৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'রসায়নবিদ্যা' এবং অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'দীপশিখা' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯)।

বৈজ্ঞানিক-জীবনী এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই

প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ ধর লিখিত 'চালস্ রবট ডারুইন্' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯) শীর্ষক রচনাটি উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানের নিয়মিত বিভাগ বামাবোধিনীতে পাওয়া যায়। "বিজ্ঞান-বিষয়ক কথোপকথন" এই শিরোনামায় কথোপকথনের আকারে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা এই পত্রিকায় বহুদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছিল।

বামাবোধিনীতে বিজ্ঞানালোচনা নিয়মিতভাবে বেরিয়েছিল। অধিকাংশ প্রবন্ধই সারগভ। কিন্তু ভাষায় শ্রুতিমধুরতার অভাব অধিকাংশ প্রবন্ধেরই প্রধান ত্রুটি।

ডাঃ ভুবনমোহন সরকার সম্পাদিত 'বঙ্গমহিলা' (বৈশাখ, ১২৮২) পত্রিকায় মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। বঙ্গমহিলায় স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনাই অধিক। তবে কদাচিৎ মনোবিজ্ঞান ও জ্যোতিবিজ্ঞান নিয়ে সুলিখিত প্রবন্ধও পাওয়া যায়। ১২৮৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্বাভাবিক সংস্কার' মনস্তত্ব বিষয়ক একটি সুলিখিত প্রবন্ধ। জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 'সূর্য্য' ১২৮৩ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'পরিচারিকা'য় (প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত। পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় বলা হয়েছিল, "পরিচারিকা জ্ঞান, নীতি, সভ্যতা বিষয়ে কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।" পরিচারিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এতে স্ত্রীলোকেরা নিয়মিতভাবে লিখতেন। স্ত্রীলোকদের লিখিত প্রবন্ধগুলো সূচীপত্রে আলাদা ক'রে উল্লেখ করা হোত। তবে লেখিকার নাম দেওয়া হোত না। প্রথম বৎসরে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সবগুলিই স্ত্রীলোকদের লেখা। পরিচারিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এবং ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। তবে অধিকাংশ প্রবন্ধই উচ্চাঙ্গের নয়। বস্তুতঃ, উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পরিচারিকায় নেই বললেই হয়।

এই পত্রিকার জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধই ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ। পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এদের বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ 'সূর্য্যমণ্ডল' (শ্রাবণ, ১২৮৫) 'চন্দ্রমণ্ডল' (কার্ত্তিক, ১২৮৪), 'জগতের উৎপত্তি' (পৌষ, ১২৮৫), 'ছায়াপথ' (চৈত্র, ১২৮৫), 'সৌরজগৎ' (বৈশাখ, ১২৮৬) ইত্যাদি

উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির সবই স্ত্রী-লিখিত। কোনো কোনো প্রবন্ধের ভাষায় গ্রাম্যতার ছাপ রয়েছে। যেমন, 'ধূমকেতু' (শ্রাবণ, ১২৮৮)।

শারীর ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিরও অধিকাংশই ক্ষুদ্র, নীরস ও অসম্পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে 'দেহতত্ত্ব' (আষাঢ়, ১২৮৬), 'চক্ষু' (আশ্বিন, ১২৮৬), 'প্রজাপতি' (শ্রাবণ, ১২৯১), ইত্যাদি রচনাসমূহের নামোল্লেখ করা যায়। প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ পাওয়া যায়। 'বিজ্ঞান' এই শিরোনামায় প্রকাশিত 'প্রাণ' (ভাদ্র, ১২৯৩) নামক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পরিচারিকার পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি প্রাথমিক প্রকৃতির। যেমন, 'টেলিফোন যন্ত্র' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫), 'বাষ্পের ক্ষমতা' (কার্তিক, ১২৮৬), 'মেঘ কি ?' (বৈশাখ, ১২৯০) ইত্যাদি।

ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় নেই। এই জাতীয় কোনো কোনো প্রবন্ধে কবিত্বের ছাপ রয়েছে। যেমন, 'পর্ব্বত' (অগ্রহায়ণ, ১২৯৫)।

দুই

এই যুগে বালক ও স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'অবোধবন্ধু' ও 'জ্যোতিরিঙ্গণ'। প্রধানতঃ বালক ও স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত অবোধবন্ধু (এপ্রিল, ১৮৬৩) পত্রিকায় রসায়নবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। এই পত্রিকার কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উৎকর্ষতার দাবী রাখে। প্রাঞ্জল ভাষা ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী অধিকাংশ বিজ্ঞানালোচনার বৈশিষ্ট্য। এই পত্রিকার উৎকৃষ্ট রচনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'বায়ু' (ফাল্গুন, ১২৭৩), 'পিপীলিকা' (বৈশাখ, ১২৭৪), 'বিদ্যুৎ ও বজ্র' (আষাঢ়, ১২৭৪), 'পৃথিবীর গতি' (শ্রাবণ, ১২৭৪)। তা' ছাড়া এই যুগের প্রায় সবগুলো উৎকৃষ্ট বালকপাঠ্য পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত। বালকপাঠ্য পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচনা এই যুগে নূতন নয়। ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'পশ্বাবলী'কে বালকপাঠ্য পত্রিকার পর্যায়ে ফেলা যায়। তা' ছাড়া রামচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত "পক্ষির বিবরণ। Ornithology No. 1" (১৮৪৪) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বালক ও স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত 'জ্যোতিরিঙ্গণ' (প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৮৬৯ খৃঃ) পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধই অধিক। তবে এদের অধিকাংশই পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নয়। অবশ্য অধিকাংশ আলোচনারই ভাষা সরল ; বালকদের উপযোগী। তা' ছাড়া অনেক আলোচনাতেই রয়েছে উপাখ্যান। ফলে রচনাগুলো বালকদের কাছে চিত্তাকর্ষক হবার সুযোগ পেয়েছে। প্রাণি-বিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ রচনাই ক্ষুদ্র। ভগবৎবিশ্বাস অনেক যায়গাতেই প্রকট। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'সিংহ' (জুলাই, ১৮৬৯), 'প্রজাপতি' (আগস্ট, ১৮৬৯), 'সিন্ধুঘোটক' (নবেম্বর, ১৮৭০) ইত্যাদি।

প্রাণিবিজ্ঞানের তুলনায় ভূগোল ও ভূবিদ্যা, রসায়নবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সংখ্যা এতে নগণ্য। ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক রচনা 'চন্দ্রগ্রহণ' (ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৯) এবং 'খনি' (ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০)। প্রথমোক্ত রচনাটি সাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে রচিত। সহজ দৃষ্টান্ত দিয়ে এখানে বক্তব্য বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় রচনাটি একেবারেই অসম্পূর্ণ। রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনা 'বায়ু' ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে রাসায়নিক তথ্যাদি কিছু কিছু আছে। পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো রচনা কথোপকথনের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'মজ্জন-যন্ত্র'। ভাষায় গ্রাম্যতা দোষ রচনাটির প্রধান ত্রুটি।

বিজ্ঞানের নিয়মিত বিভাগগুলো 'জ্যোতিরিঙ্গণ' ও 'সখা'র বৈশিষ্ট্য। জ্যোতিরিঙ্গণে ১৮৭০ সালের জুলাই সংখ্যা থেকে 'বৈজ্ঞানিক কথা' এই শিরোনামায় বিজ্ঞানবিষয়ক বিবিধ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এই আলোচনা হোত কথোপকথনের আকারে। ১৮৭৩ সালের নবেম্বর সংখ্যা থেকে জ্যোতিরিঙ্গণের 'বিজ্ঞানতত্ত্ব' এই শিরোনামায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ সহজ ভাষায় আলোচিত হোত।

'বালকবন্ধু'র (প্রঃ প্রঃ ১৮০০ শক) বিজ্ঞানপ্রস্তাব ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি বেশ সরল ও সরস। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'প্রতিধ্বনি' (৭ম সংখ্যা, ১৮০০ শক)। সরস গল্পের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক প্রকৃতির বিজ্ঞানালোচনা এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের আলোচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'মেঘের গল্প' (১৪ সংখ্যা, ১৮০০ শক)। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের

বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচিত্র প্রকৃতির আলোচনা পাওয়া গেল "সখা" পত্রিকায়। সখা প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানালোচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে এতখানি অভিনবত্ব ইতিপূর্বেকার আর কোনো বালকপাঠ্য পত্রিকায় পাওয়া যায় না। তা' ছাড়া ভাষার শ্রুতিমধুরতা ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনাভঙ্গী সখার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ভুবনমোহন রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি। তা'ছাড়া শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ মনীষীরাও সখায় মাঝে মাঝে লিখতেন।

সখার উদ্ভিদ, প্রাণী ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই বৈশিষ্ট্য, ভাষার লালিত্যগুণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী লিখিত 'মশা' (অক্টোবর, ১৮৮৬), মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রবালকীট' (মে, ১৮৮৬), ভুবনমোহন রায়ের 'উদ্ভিদের আহার' (জুলাই, ১৮৮৮) ও 'চক্ষু' (অক্টোবর, ১৮৮৯ থেকে ধারাবাহিক), দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর 'প্রকৃতির ছদ্মবেশ' (ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯) এবং যোগেশচন্দ্র রায়ের 'বজ্রকবচ বা পুত্তিকভূক' (নবেম্বর, ১৮৮৯)।

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলির ভাষাও খুবই সরল। কোথাও বা কথোপকথনের মধ্যে সহজ পরীক্ষার অবতারণা, আবার কোথাও বা গল্পরস রচনাগুলিকে রমণীয়তা দান করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'রামধনু' (ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪), উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী লিখিত 'মূলবর্ণ' (আগস্ট, ১৮৮৫ থেকে ধারাবাহিক) এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর 'আলোক পরীক্ষা' (মে, ১৮৮৮) ও 'আলোক-বিজ্ঞান' (জুলাই, ১৮৮৮)। কোনো কোনো প্রবন্ধ সাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে লিখিত। যেমন শিবনাথ শাস্ত্রীর 'বায়ুমণ্ডল' (জুন, ১৮৮৭)।

সখায় প্রকাশিত ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও ভুবনমোহন রায়। প্রথমোক্ত লেখকের রচনা তথ্যপূর্ণ অথচ সরল। যায়গায় যায়গায় অতি সাধারণ উদাহরণের অবতারণা তাঁর রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য। যেমন, 'পৃথিবীর গোলত্ব' (আগস্ট, ১৮৮৬)। ভুবনমোহন রায়ের কোনো কোনো রচনা বালকদের পক্ষে কিছুটা দুরূহ। যেমন, 'টর্নেডো বা ঘূর্ণবায়ু' (এপ্রিল, ১৮৮৮)।

রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো প্রবন্ধে লেখকের আন্তরিকতার পরিচয় রয়েছে। যেমন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত 'দীপশিখা' (ডিসেম্বর, ১৮৮৬ থেকে ধারাবাহিক)।

জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একটি সরস প্রবন্ধ 'পূর্ণিমা ও অমাবস্যা' ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় বেরিয়েছিল। প্রবন্ধটির লেখক মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। বিপিনচন্দ্র পাল লিখিত 'ছায়াপথ' (সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯) জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক একটি ক্ষুদ্র রচনা।

বৈজ্ঞানিক-জীবনী এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ভুবনমোহন রায় লিখিত 'মাইকেল ফ্যারাডে' (নবেম্বর, ১৮৮৫)। প্রবন্ধটির যায়গায় যায়গায় উপদেশ ও নীতিকথা রয়েছে।

বিজ্ঞানের নিয়মিত বিভাগ সখার একটি বৈশিষ্ট্য। 'ঠাকুরদাদার গল্প' এই শিরোনামায় বিজ্ঞানালোচনা করতেন মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। 'নানা প্রসঙ্গ' এই শিরোনামাতেও বিজ্ঞানালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত। এই বিভাগে লিখতেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

আলোচ্য সাময়িক-পত্রগুলি ছাড়া 'বিশ্বদর্পণ'[৩] (মাঘ, ১২৭৮) পত্রিকাতেও বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত।

তিন

এই যুগের সংবাদপত্রে উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায় না। কোনো কোনো সংবাদপত্র ও মফঃস্বলপত্রে বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ একেবারেই নেই। এমনকি এডুকেশন গেজেট'[৪] (প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৮৫৬), 'সোমপ্রকাশ' (প্রঃ প্রঃ নবেম্বর, ১৮৫৮) প্রভৃতি অনেক প্রখ্যাত সংবাদপত্রেও উল্লেখযোগ্য কোনো বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ নেই। তবে কোনো কোনো সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত। যেমন, 'সত্যপ্রদীপ' (প্রঃ প্রঃ মে, ১৮৫০), 'সুলভ সমাচার' (প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১২৭৭) প্রভৃতি। 'সমাচার সুধাবর্ষণ-এ' (প্রঃ প্রঃ জুন, ১৮৫৪) কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবাদি

৩ বাংলা সাময়িক-পত্র (দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃঃ ৭।

৪ ভূদেব চরিত (১ম ভাগ ৩৪৩ পৃঃ) থেকে জানা যায়, 'বৈজ্ঞানিক বিবরণ' এই নাম দিয়ে এডুকেশন গেজেটে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পাওয়া যায়। মফঃস্বল পত্রিকার মধ্যে একমাত্র 'বান্ধব' (প্রঃ প্রঃ আষাঢ়, ১২৮১) ছাড়া আর কোনোটিতেই প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায় না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক রচনাসমূহের অধিকাংশই প্রাথমিক প্রকৃতির। এই যুগের সংবাদ প্রভাকর ও সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়ে মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি প্রকাশিত হোত।

সংবাদ প্রভাকরে কদাচিৎ ভূ-বিবরণ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধাদি স্থান পেত। তবে এদের অধিকাংশই অসম্পূর্ণ ও প্রাথমিক প্রকৃতির রচনা। সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত ভূ-বিবরণগুলির সর্বপ্রধান ত্রুটি, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভৌগোলিক আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ঐতিহাসিক তথ্যাদির অবতারণা। এই প্রসঙ্গে ভ্রমণকারী বন্ধুর লিখিত 'জিলা ভুলুয়ার পুরাতন ও বর্ত্তমান বিবরণ' (২৯শে মাঘ ১২৬১ সাল), 'জিলা বাখরগঞ্জের বিবরণ' (১২ই চৈত্র, ১২৬১ সাল) প্রভৃতি রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। কিছু কিছু ভৌগোলিক তথ্যাদি উপরোক্ত নিবন্ধগুলিতে রয়েছে ; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভূ-বিবরণ একটিও হয় নি। কোথাও বা ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে ভৌগোলিক তথ্যাদির অবতারণা করা হয়েছে। যেমন, ১২৫৯ সালের ৪ঠা ও ২৭শে আশ্বিন তারিখে প্রকাশিত "ঢাকার ইতিহাস" শীর্ষক রচনাটি। ভূ-বিবরণগুলির অধিকাংশই 'ভারতবর্ষের ভূগোলবৃত্তান্ত' গ্রন্থের লেখক শ্যামাচরণ বসুর রচনা বলে মনে হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে "ব্রহ্মাণ্ডের বৃহত্ত্ব" (১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৬ সাল) শীর্ষক আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু কিছু তথ্য এতে থাকলেও যায়গায় যায়গায় বিশ্বাস যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। কোনো কোনো তথ্য ভুল। যেমন, একাদশ গ্রহের উল্লেখ। রচনাটির একাংশ—

> "পৃথিবী অতি বৃহৎ বটে, কিন্তু সৌরজগতের মধ্যে ইহা তৃতীয় গ্রহ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সৌরজগতে একাদশ গ্রহ আছে। তাহারা পরস্পর অন্তর থাকিয়া যথাকালে মধ্যস্থিত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই পৃথিবীর ন্যায় সেই সকল গ্রহেও জীবজন্তু, এবং তাহাদের জীবনধারণোপযোগী বিবিধ খাদ্য দ্রব্য আছে।

চন্দ্র এক উপগ্রহ। গ্রহগণ যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, এই চন্দ্রও তদ্রূপ এই পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহেরও চন্দ্র আছে। পৃথিবীর চন্দ্রের ন্যায় সেই সেই চন্দ্রও সেই সেই গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

এই যে আলোক ও উত্তাপের আকর স্বরূপ জগল্লোচন বিরোচন ইনি পৃথিবী অপেক্ষা ১৪,০০০০০ গুণ বৃহৎ। গ্রহগণ স্বভাবতঃ আলোকপূর্ণ ও তেজোময় নহে, সূর্য্য হইতে আলো ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা সংবাদ প্রভাকরে অল্পই পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ১২৬৬ সালের ১৯শে ভাদ্র তারিখে প্রকাশিত 'সিংহ' শীর্ষক রচনাটির নামোল্লেখ করা যায়। এতে সিংহের আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। রচনাভঙ্গী সরল। তবে তথ্যসমাবেশ প্রাথমিক প্রকৃতির। শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির তথ্যসমাবেশ কিছুটা উচ্চাঙ্গের হলেও রচনাভঙ্গী অত্যন্ত নীরস। উদাহরণস্বরূপ ১২৬৬ সালের ৯ই কার্ত্তিক তারিখে প্রকাশিত "শারীরিক তত্ত্বের সংক্ষেপ বিবরণ" শীর্ষক রচনাটির নাম করা যেতে পারে। প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো রচনার লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক যে দু' একটি নিবন্ধ সংবাদ প্রভাকরে পাওয়া যায়, তা'তে বক্তব্য বিষয় অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে ১২৬৬ সালের ২৬শে পৌষ তারিখে প্রকাশিত "আকাশমণ্ডলকে কেন নীলবর্ণ দেখায়" শীর্ষক রচনাটি উল্লেখযোগ্য।

সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়ে পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, শারীরবিদ্যা ও ভূগোল বিষয়ক আলোচনা কখনো কখনো প্রকাশিত হোত।

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো নিবন্ধের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। যেমন, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তারিখের সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রকাশিত সংযোগাকর্ষণ সম্বন্ধে আলোচনাটি। এতে আকর্ষণশক্তি, বিশেষতঃ সংযোগাকর্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা সুপরিকল্পিত।

এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে অপরাপর পত্রপত্রিকা থেকে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ও সংবাদাদি সংকলিত হোত। এই প্রসঙ্গে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মের সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রকাশিত লিংকস্ নামক এক বন্য পশুর আকৃতি ও

প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। রচনাটি সত্যার্ণব পত্রিকা থেকে সংকলিত হয়। এ ছাড়া সত্যপ্রদীপে প্রকাশিত কোনো কোনো বিজ্ঞানসংবাদ এই পত্রিকায় সংকলিত হোত।

সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রকাশিত নৃতত্ত্ব বিষয়ক কোনো কোনো আলোচনা সুলিখিত। যেমন, 'মনুষ্যের প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত' (১৮৫২) শীর্ষক ধারাবাহিক রচনাটি। এখানে মানুষের কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা ও পরমায়ু সম্পর্কে আলোচনা ক'রে বিভিন্ন আকৃতির মানুষের কথা বর্ণিত হয়েছে।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি দুরূহ ও দুর্বোধ্য প্রকৃতির। উদাহরণস্বরূপ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বরের সংবাদপূর্ণ-চন্দ্রোদয়ে প্রকাশিত 'বিদ্যাহারাবলী' শীর্ষক রচনাটি উল্লেখযোগ্য। এখানে আলোচ্য বিষয়বস্তু শারীরবিদ্যা। রচনাটির ভাষা শ্রুতিকটু। রচনার নিদর্শন—

> "নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের কারণ দেওন অদ্যাবধি অতি দুঃসাধ্য হইয়াছে এবং পূর্ব্বে ব্যবচ্ছেদকেরা কেবল ইহা জ্ঞাত ছিলেন যে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য সিদ্ধ না হইলে জীবনধারণ হয় না। কিন্তু সে সকল যাহা হউক যখন ব্যবচ্ছেদকেরা দেখিতে পাইলেন যে শরীরের অন্য ২ সমস্ত অংশের এবং তাহারদের কার্য্যের কারণ সমস্ত প্রণালী-ভূত হইয়াছে এবং ঐ অংশসকল স্ব ২ কার্য্যসিদ্ধার্থে অতি সুনিম্মিত তখন তাহারা মনেতে……ইহাও স্থির করিলেন যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কারণও তদ্রূপ প্রমাণীভূত হইতে পারিবে অতএব প্রিস্তি নামে পণ্ডিত যে ২ পরীক্ষা করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেন্দ্রিয় বিষয়ে অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে।"

এই সংখ্যারই তৃতীয় অধ্যায়ে এদেশীয় পণ্ডিতদের রচিত প্রাচীন ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এদের রচনাভঙ্গী অত্যন্ত দুরূহ।

প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক উৎকৃষ্ট কোনো আলোচনা এই পত্রিকায় পাওয়া যায় না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে থেকে উত্তর আমেরিকার যে ভৌগোলিক বিবরণটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, তাতে প্রাকৃতিক ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক ভূগোল বিষয়ক তথ্যাদিও এসে গেছে।

সংবাদ দ্বিজরাজ (প্রঃ প্রঃ ডিসেম্বর, ১৮৪৭) ও সমাচার সুধাবর্ষণ (প্রঃ প্রঃ জুন, ১৮৫৪) পত্রিকার যে সংখ্যাগুলো এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ নেই বললেই হয়। তবে সমাচার সুধাবর্ষণে কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হোত। যেমন, ১২৬২ সালের ২২শে পৌষ তারিখে প্রকাশিত 'উদ্ভিজ্জবিদ্যা' শীর্ষক রচনাটি। একে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানালোচনা বলা না গেলেও উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে। রচনাটির ভাষা নীরস।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রকাশিত সত্যপ্রদীপ পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (৪ঠা মে, ১৮৫০) পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল, "এতদ্দেশীয় লোকেরদের সংজ্ঞান ও গুণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় এমত উপায় করা সত্যপ্রদীপের প্রধান অভিপ্রায়।" 'বিজ্ঞানকাণ্ড' এই শিরোনামায় সত্যপ্রদীপে অনেকগুলি বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হয়। তবে এদের মধ্যে সর্বজনবোধ্য প্রাঞ্জল আলোচনা অতি অল্পই আছে। অধিকাংশ রচনার ভাষায়ই জড়ত্ব বিদ্যমান। তা' ছাড়া কোনো কোনো রচনা কিছুটা টেক্‌নিক্যাল প্রকৃতির। সত্যপ্রদীপের অধিকাংশ বিজ্ঞানালোচনাই পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক। তবে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র ও তত্ত্ব নিয়ে এখানে আলোচনা নেই ; প্রায় সর্বত্রই আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন যন্ত্র নিয়ে। যেমন, বায়ুর ভার পরিমাপক যন্ত্র (১লা জুন, ১৮৫০), বিদ্যুৎজনক যন্ত্র (৮ই জুন, ১৮৫০), তাপমাপক যন্ত্র (২৯শে জুন, ১৮৫০) ইত্যাদি। আলোচনাগুলির অধিকাংশই অতি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এগুলো একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির। যেমন, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ তারিখের সত্যপ্রদীপে প্রকাশিত কয়েক জাতীয় বীজ সম্পর্কে আলোচনাটি।

এই যুগের জনপ্রিয় পত্রিকা এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ এবং সোমপ্রকাশে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি প্রকাশিত হোত না ; অবশ্য সোমপ্রকাশে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাদির সমালোচনা নিয়মিতভাবে স্থান পেত। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদ সুধাংশু (প্রঃ প্রঃ সেপ্টেম্বর, ১৮৫০) পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিধ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

সুলভ সমাচার পত্রিকায় বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ যথেষ্ট আছে ; কিন্তু কোনোটিই উৎকৃষ্ট নয়। ১২৭৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত সুলভ সমাচারের ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যায় পত্রিকার আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে ঘোষণা করা হয়েছিল, তার শেষাংশে ছিল,......"বিজ্ঞানের মূল সত্য সকল যতদূর সহজ কথায় লেখা যাইতে পারে ইহাতে সেইরূপ লিখিতে আমরা ত্রুটি করিব না।" পত্রিকা প্রকাশের পর প্রথম তু' বৎসর এতে বিজ্ঞানালোচনা প্রায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। ১২৭৯ সাল থেকে বিজ্ঞানালোচনায় ভাঁটা পড়ে। কথোপকথনের আকারে এই পত্রিকায় অনেক বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাগুলির প্রধান ত্রুটি, ভাষায় গ্রাম্যতা এবং গুরুচণ্ডালী দোষ। সুলভ সমাচারে ভূগোল ও ভূবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান এবং শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি পাওয়া যায়। ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক রচনাগুলির অধিকাংশই কথোপকথনের আকারে। যেমন, বৃষ্টি (১লা অগ্রহায়ণ, ১২৭৭), নদী (৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৭), ভূমিকম্প (১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৭) ইত্যাদি। রচনাগুলির ভাষা সরল। তবে গুরুচণ্ডালী দোষ ও প্রকাশভঙ্গীতে গ্রাম্যতা অধিকাংশ রচনার মাধুর্য নষ্ট করেছে। যেমন, 'ভূমিকম্প' শীর্ষক রচনাটির একাংশ—

> রাম। পণ্ডিত মশায়, প্যাঞ্জাবের দক্ষিণে সমুদ্রের পারে না কি সিন্ধু বলে একটি দেশ আছে, সেখানে না কি মাসখানেক হইল একটা বড় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে ? তারিণীবাবু বলছিলেন যে সেখানকার গাছ বাড়ী সব কেঁপে উঠেছিল, দোকানদারদের সাজান হাঁড়ি কুঁড়ি সব পড়ে গিয়েছিল, দেয়াল পড়িয়া একটা ছেলে মারা গিয়েছে, আর কামানের মত দুম্ দুম্ করে শব্দ হয়েছিল। না কি প্রায় এক দণ্ড ধরে ভুঁইকম্প হয় ?

আলোচনা কিছুটা এগোবার পর পণ্ডিতমশাই ভূমিকম্পের কারণ বুঝিয়ে দিচ্ছেন,

> ......"পৃথিবীর ভিতরে এমন সকল বস্তু আছে যাহা সহজে জ্বলিয়া উঠে। চুণে জল দিলে ফুটিয়া উঠে ইহা তোমরা কতবার দেখিয়াছ। ঐরূপ যদি গন্ধক আর লোহার গুঁড় মিশাইয়া তাহাতে জল দেও তাহা গরম হইয়া ফুটিয়া উঠিবে এবং গলিয়া

চারিদিকে গড়িয়া পড়িবে। পৃথিবীর ভিতরেও গন্ধক টঙ্কক আছে, তাহাতে জল আসিলে অথবা অন্য কোন কারণে তাহা গরম……এবং গলিয়া ফাঁপিয়া উঠে।

'বিজ্ঞান' এই শিরোনামায় সুলভ সমাচারে কিছুকাল ধরে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হয়। আলোচনাগুলির অধিকাংশই অসম্পূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ 'পরমাণু' (২৯শে অগ্রহায়ণ, ১২৭৭) শীর্ষক রচনাটির উল্লেখ করা যায়। এখানে পরমাণু কি তা' বোঝাবার জন্যে লেখক আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তা' সত্বেও তথ্যের অভাবে রচনাটি ব্যর্থ হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর রচনাগুলিও নিকৃষ্ট ধরনের। এই প্রসঙ্গে ১২৭৭ সালের ২৬শে মাঘ তারিখের সুলভ সমাচারে প্রকাশিত "তারের খবর" শীর্ষক রচনাটি উল্লেখযোগ্য। এখানে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে আলোচনায় লেখকের অজ্ঞতা যায়গায় যায়গায় হাস্যকর হয়ে উঠেছে। আলোচনার উপসংহারে এর চরম পরিণতি। ১২৭৮ সালের ৭ই আষাঢ় থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'বাজপড়া' শীর্ষক রচনাটিতেও লেখকের অজ্ঞতা যায়গায় যায়গায় প্রকট।

এই পত্রিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। এই শ্রেণীর যে দু'একটি রচনা পাওয়া যায় তা'ও অসম্পূর্ণ। যেমন, ১২৭৭ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে প্রকাশিত চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনাটি।

সুলভ সমাচারের শারীর ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি প্রাথমিক প্রকৃতির এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যেমন, 'রক্তসঞ্চালন' (২৭শে বৈশাখ, ১২৭৮), 'সারঙ্গপুচ্ছ' (১০ই আষাঢ়, ১২৮১) ইত্যাদি।

অতএব, বৈজ্ঞানিক রচনা কোনো কোনো সংবাদপত্রে থাকলেও বিজ্ঞান-বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এ যুগের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি।

চার

ঢাকা থেকে প্রকাশিত দু'একটি পত্রিকাকে বাদ দিলে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এ যুগের অনেক মফঃস্বলপত্রেও পাওয়া যায় না। এলাহাবাদ-মৌসিমগঞ্জ থেকে প্রচারিত 'প্রয়াগদূত' (১২৭৫), 'হালিসহর পত্রিকা' (১২৭৮),

চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত 'সাধারণী' (১২৮০), 'কাঁচড়াপাড়া প্রকাশিকা' (১২৮০), ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'বাঙ্গালী' (১২৮১), বহরমপুর থেকে প্রকাশিত 'মাসিক সমালোচক' (১২৮৬), শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত 'পরিদর্শক' (১৮৮০) ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার যে সকল সংখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিষয়ক কোনো রচনা নেই। তবে 'মজিলপুর পত্রিকা' (১৮৫৬), ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'মনোরঞ্জিকা'[৫] (১৮৬০) বালী থেকে প্রকাশিত 'শুভকরী' (১৮৬২), যশোহর থেকে প্রকাশিত অমৃত-প্রবাহিনী' (১৮৬২) ইত্যাদি পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক রচনাদি প্রকাশিত হোত বলে মনে হয়।

তমোলুক পত্রিকায় (১২৮০) বৈজ্ঞানিক রচনাদি পাওয়া যায়। নাম তমোলুক পত্রিকা হলেও পত্রিকাটি প্রকাশিত হোত কলিকাতা থেকে। তা' ছাড়া তমোলুকের সংবাদ ও তথ্যাদি এতে অল্পই প্রকাশিত হোত। অতএব পূর্ণাঙ্গ মফঃস্বল পত্রিকা একে বলা যায় না। তমোলুক পত্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি রয়েছে। ভাষায় গ্রাম্যতা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের স্বল্পতা অধিকাংশ রচনারই প্রধান ত্রুটি।

মফঃস্বল পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঢাকা থেকে প্রকাশিত বান্ধব পত্রিকা। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮১ সালের আষাঢ় মাসে। সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ। বান্ধব পত্রিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান এবং ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। কোনো কোনো রচনা বেশ উচ্চাঙ্গের। তবে এই পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন সংখ্যায় কয়েকটি বিজ্ঞান-বিষয়ক কবিতার পরিবেশন। বান্ধব ও বামাবোধিনী পত্রিকা ছাড়া কবিতার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রকাশের প্রচেষ্টা আর কোনো সাময়িক-পত্রে দেখা যায় না। বান্ধব পত্রিকার বিজ্ঞান-বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, ১২৮১ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিজ্ঞান-উৎসব' শীর্ষক কবিতাটি। বিজ্ঞানে পাশ্চাত্য জাতিদের উন্নতি এবং ভারতের

৫ পূর্ববঙ্গের প্রথম সাময়িক-পত্র 'মাসিক মনোরঞ্জিকা'। মনোরঞ্জিকার পরিচালকদের উদ্যোগে 'ঢাকা প্রকাশ' (ফা, ১২৬৭) প্রকাশিত হয়। ঢাকা প্রকাশের যে সকল সংখ্যা পাওয়া যায়, তাতে উল্লেখযোগ্য কোন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই।

অধঃপতনের কথা এই কবিতার উপজীব্য। ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় কবিতার মাধ্যমে 'বৈজ্ঞানিক' ও 'ভট্টাচার্য্যের' যে কথোপকথনটি প্রকাশিত হয়, তা'ও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ১৩০৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় 'বিজ্ঞান-গায়ত্রী' অথবা 'সৌরজগতের স্তুতিগীত' নামক যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের ক্রমান্বয়ে অবস্থান অনুযায়ী বর্ণনা। কবিতাটিতে লেখকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সুস্পষ্ট। দু'এক যায়গায় পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং কবিত্ব ও উচ্ছ্বাস রয়েছে। রচনাটির লেখক সম্ভবতঃ কালীবর বেদান্তবাগীশ। রচনার নিদর্শন ঃ—

সূর্য্যের প্রধান ভক্ত,
সে প্রেমের অনুরক্ত,
প্রেমাঞ্জলি দেয় বুধ সন্নিকটে থাকিয়া ;
রূপে গুণে মনোহর,
ভেনাচ্ তাহার পর,
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য আছে ব্যোম যুড়িয়া !
শুক্র ও বুধেতে নাই,
জীব যোগ্য বাস ঠাঁই,
তরল গোলক তারা, জ্যোতির্ব্বিদ বলিছে !
সামান্য বালুকা মাঝে,
যাঁর সৃষ্ট প্রাণী রাজে,
তাঁরি সৃষ্ট দুটা গ্রহ প্রাণ-শূন্য ভ্রমিছে !
পণ্ডিতেরা যা বলুন, মনে ত না মানিছে !
ধন, ধান্য, প্রাণী ভরা,
আমাদের বসুন্ধরা,
ঘুরিছে আপন কক্ষে এক চন্দ্র লইয়া ;
শুক্র ও বুধের দেশে,
চন্দ্রমা কভু না হাসে,
বিহনে এ সুধাধারা আছে তারা মরিয়া

"ধরণীগর্ভসম্ভূত
মহাবীর মহোদ্ধত,"
মঙ্গল তাহার পর রক্তরাগ রঞ্জনে ;
"ডিম্‌স্", "ফোবস্" নামে,
দু'টি চন্দ্র ডা'নে বামে,
শশী সম সুধাময় নহে তারা কিরণে !

* * *

পরে গুরু বৃহস্পতি ;
চারিটি চাঁদের পতি,
সূর্য্য ছাড়া বড় তার নাহি সৌর-জগতে ;
পাইয়া একটি চন্দ্র,
আমাদের মহানন্দ,
হয় না সে সুখাস্বাদ কল্পনা এ মরতে !

কবিতাটির দু'এক যায়গায় পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে। যেমন,

তার পরে শনৈশ্চর,
আট চন্দ্র-অধীশ্বর,
উড়িল গণেশ-মাথা যার দৃষ্টি পতনে !
আজো যারে ক'রে ভয়,
পূজে গৃহী সমুদয়,
যাহার দশার ভোগ ভয়াবহ ভুবনে !

কবিত্ব ও উচ্ছ্বাসের পরিচয়ও দু' এক যায়গায় সুস্পষ্ট। যেমন, শনিগ্রহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

সে দেশ নিবাসী যারা,
অমর নিশ্চয় তারা,
অত সুধা পানে কভু জরা মৃত্যু রয় না !
সে দেশের গাছপালা,
রজত কিরণে আলা,
চকোর চকোরী তথা নিশিতে ঘুমায় না !

বান্ধবে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কোনো কোনো প্রবন্ধে বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দ বাংলায় প্রায় অবিকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, ১২৮৭ সালের ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'সূর্য্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি। অধিকাংশ প্রবন্ধই বিস্তৃত ও তথ্যবহুল। ১২৯৩ সালের দশম সংখ্যায় সূর্য সম্বন্ধে যে রচনাটি প্রকাশিত হয়, এই প্রসঙ্গে তা' উল্লেখযোগ্য। এই বৎসরের একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "পৃথিবী" একটি সুলিখিত প্রবন্ধ। শাস্ত্রীয় তথ্য-নির্ভর জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধও এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। কালীবর বেদান্তবাগীশ "জীর্ণোদ্ধার" এই শিরোনামায় সূর্যমণ্ডল (৫ম সংখ্যা, ১২৮৯) এবং চন্দ্রমণ্ডল (৭ম সংখ্যা, ১২৮৯) সম্বন্ধে যে দু'টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এই প্রসঙ্গে তা' উল্লেখযোগ্য।

বিদেশী বিজ্ঞান বিষয়ক শব্দ হুবহু বাংলায় ব্যবহারের প্রচেষ্টা পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো রচনায় দেখা যায়। যেমন, "প্রকৃতিবিজ্ঞান" এই শিরোনামায় প্রকাশিত মেঘ (৭ম সংখ্যা, ১২৮৮) সম্বন্ধে আলোচনায়।

অনুবাদের চেষ্টা দেখা যায় শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায়। ১২৮৭ সালের ১২শ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "শারীরক্রিয়া তত্ত্ব" এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ ও তথ্যবহুল। যায়গায় যায়গায় অনুবাদের চেষ্টা রয়েছে। যেমন, Colloidal—শাঙ্গরসিক ; Salts of lime- চৌণিক লবণ ইত্যাদি।

প্রাণী ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এদের অধিকাংশই গতানুগতিক পদ্ধতিতে লেখা।

নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক আলোচনায়। এই প্রসঙ্গে "হিন্দুভূগোল" (৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১২৮৫) শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। এখানে পুরাণে বর্ণিত ভূগোল আলোচ্য বিষয় হলেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে লেখক সচেতন। এই পর্যায়ের পরবর্তী আলোচনা ১২৮৮ সালের ৫ম, ৮ম ও ১০ম সংখ্যা বান্ধবে প্রকাশিত হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক-জীবনীও বান্ধব পত্রিকায় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য, ১৩১০ সালের আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "অধ্যাপক স্যার্ উইলিয়াম্ ক্রূক্স্" শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির লেখক জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখানে প্রখ্যাত রাসায়নিক ক্রূক্সের প্রধান আবিষ্কার ও তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা আলোচিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হলেও

রচনাটি সারগর্ভ। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য বিজ্ঞান-প্রবন্ধের মতো সরস নয়।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'রামধনু' (১৮৮২) পত্রিকায়ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত।

এইরূপে স্ত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের দু' একটি মফঃস্বল পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রেও বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য জনপ্রিয়তা লাভ করল।

বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিকা

মূলতঃ ধর্মসভার মুখপত্র হলেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রেই বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত। কিন্তু 'সত্যার্ণব'কে বাদ দিলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত ধর্মসংক্রান্ত অনেক উল্লেখযোগ্য সাময়িক-পত্রে বিজ্ঞানালোচনার কোনো স্থান ছিল না। প্রসঙ্গতঃ 'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র' (১৮৪৩), 'দুর্জ্জনদমনমহানবমী' (১৮৪৭) ইত্যাদি সাময়িক-পত্রের নাম করা যায়।

এক

পাদরী লঙ্ সম্পাদিত সত্যার্ণব পত্রিকায় (১৮৫০) প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। অধিকাংশ রচনায়ই তথ্যের একান্ত অভাব। দু'একটি রচনাকে বাদ দিলে এদের কোনোটিকেই পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বলা যায় না। তবে এরা বিজ্ঞানঘেঁষা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'জিরাফ্ অথবা উষ্ট্র ব্যাঘ্র' (জুলাই, ১৮৫১), 'বন্যবরাহ' (অক্টোবর, ১৮৫১), 'টেপর' (ডিসেম্বর, ১৮৫১), 'গাণ্ডার' (জানুয়ারী, ১৮৫২) ইত্যাদি। সর্বত্রই আলোচ্য জীবের আকৃতি, প্রকৃতি ও প্রাপ্তিস্থান নিয়ে আলোচনা। ভাষায় সংস্কৃতানুগত্য প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক সারগর্ভ ও মনোজ্ঞ আলোচনা সত্যার্ণবে কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রজাপতি' শীর্ষক রচনাটির নাম করা যায়।

এ ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত দু'টি উল্লেখযোগ্য সাময়িক-পত্র 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' (১৮৫০) ও 'দূরবীক্ষণিকা' (১৮৫০)। উভয় পত্রিকাতেই ভূগোল ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশকে প্রকাশিত 'সুলভ পত্রিকা' (১৮৫৩), 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা' (১৮৫৫) ও 'সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা'য় (১৮৫৭) বিজ্ঞানালোচনা পাওয়া যায়। তবে এদের অধিকাংশই পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নয়। সুলভ পত্রিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। ১২৬১ সালের পৌষ সংখ্যা সুলভ পত্রিকায় প্রকাশিত 'ধূমকেতু' একটি ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানালোচনা।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা 'পেলিকান পক্ষী'। বিবিধার্থসংগ্রহের প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সঙ্গে আলোচ্য রচনার পরিকল্পনায় কিছুটা মিল দেখা যায়। তবে বিবিধার্থসংগ্রহের ভাষা অনেক বেশী সরস। সুলভ পত্রিকার পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কীয় আলোচনার নিদর্শন 'রামধনুক' এবং 'অনুবীক্ষণ যন্ত্র' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৬২)। উভয় রচনায়ই বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অভাব। বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকার বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তা' ছাড়া এদের ভাষা অত্যন্ত নীরস। পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় একটিও নেই। কতকগুলি রচনা লেখকের অক্ষমতার পরিচয় বহন করে। যেমন, 'উদ্ভিজ্জবিদ্যা' (অগ্রহায়ণ, ১২৬২), 'ভূতত্ত্ববিদ্যা' (২০ সংখ্যা, ১২৬৩)। শেষোক্ত রচনাটিকে বিজ্ঞান-সংবাদ বলা চলে। 'সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা পত্রিকা'য় 'প্রাকৃতিক আলোচনা কি মনোহর' এই শিরোনামায় প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হোত। ভাষার আড়ষ্টতা, অযথা দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার এবং তথ্যের স্বল্পতা রচনাগুলির প্রধান ত্রুটি। এই জাতীয় রচনার নিদর্শন 'হায়না' (শ্রাবণ, ১৭৭৯ শক), 'আরমেডিলো' (আশ্বিন, ১৭৭৯ শক) এবং 'অপোজম্' (পৌষ, ১৭৭৯ শক)।

এ ছাড়া কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা'য় (১৮৫৬) ভূতত্ত্ব, ভূগোল ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত বলে মনে হয়।[১] বিজ্ঞানমিহিরোদয়ে (১৮৫৭) মনোবিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।[২]

রহস্য-সন্দর্ভের অনুকরণে 'সর্ব্বার্থসংগ্রহ' (১৮৬৬) ও 'নবপ্রবন্ধ' (১৮৬৬) নামক দু'টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সর্ব্বার্থসংগ্রহ সম্বন্ধে রহস্য-সন্দর্ভে[৩] মন্তব্য করা হয় :—

> "ইহা একটী মাসিক পত্র, এবং রমণীয় উপন্যাস সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব বিজ্ঞান ও নীতি সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যান এবং শিল্পশাস্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করাই ইহার উদ্দেশ্য ; ফলে রহস্য-সন্দর্ভের যে সঙ্কল্প, ইহারও সেই সঙ্কল্প।"

১ বাংলা সাময়িক-পত্র (১ম খণ্ড)—নূতন সংস্করণ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪৬-১

২ ঐ পৃঃ ১৫১।

৩ রহস্য-সন্দর্ভ—৩য় পর্ব (৩১ খণ্ড) পৃঃ ১১১।

নবপ্রবন্ধ সম্পর্কে রহস্য-সন্দর্ভের[৪] মন্তব্যটি নিম্নরূপ :—

> "আমাদিগের বিবেচনায় সর্ব্বার্থসঙ্গ্রহ ও রহস্য-সন্দর্ভ নাম পত্রদ্বয় যে অভিপ্রায়ে প্রকটিত হইয়া থাকে প্রস্তাবিত পত্রিকা সেই অভিসন্ধিতে প্রকাশিত হইয়াছে।... সম্পাদক প্রাচীন হিন্দুদিগের শাস্ত্রানুসারে কি নব্য ইউরোপীয় শাস্ত্রের মতানুসারে, কি যখন যে রূপ ইচ্ছা হইবে তদনুসারে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ দিবেন, তাহারও স্থির হইতেছে না।"

এভাবে উৎকৃষ্ট সাময়িক-পত্রকে অনুসরণ ক'রে বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হলেও উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম দশকে প্রকাশিত বহু সাময়িক-পত্রেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'সর্ব্বার্থপূর্ণচন্দ্র' (১৮৫৫), 'পূর্ণিমা' (১৮৫৯), 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' (১৮৬০), 'হিতসাধক' (১৮৬৮), 'বিদূষক' (১২৭৭), 'মাসিক প্রকাশিকা' (১২৭৭), 'সাহিত্যাঙ্কুর' (১৮৭১), 'মধ্যস্থ' (১২৭৯), 'বঙ্গসুহৃদ' (১২৭৯), 'বঙ্গমিহির' (১২৮০), 'সমদর্শী' (১২৮১), 'সুদর্শন' (১২৮১), 'হুতম!' (১২৮২) ইত্যাদি। উল্লিখিত পত্রিকাগুলোর যে সকল সংখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাদের কোনোটিতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো প্রবন্ধ নেই।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে বঙ্গদর্শনের পর কয়েকটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল 'জ্ঞানাঙ্কুর'-এ (১২৭৯)। তবে জ্ঞানাঙ্কুরে বিজ্ঞানালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নি। তা' ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ নিয়েও এই পত্রিকায় আলোচনা নেই। জ্ঞানাঙ্কুরের বৈশিষ্ট্য, ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক আলোচনায়। ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'সূর্য্যঘড়ি' নামক টেক্‌নিক্যাল প্রকৃতির রচনাটিকে বাদ দিলে ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক অন্যান্য রচনাগুলোর অভিনবত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, ১২৮১ সালের মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভূগোলের ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটির লেখক সম্ভবতঃ কালীবর বেদান্তবাগীশ। এখানে লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সুস্পষ্ট। ভূগোলের ইতিহাসকে

৪ রহস্য-সন্দর্ভ—৩য় পর্ব (৩৫ খণ্ড) পৃঃ ১৭৩-৭৪।

গতানুগতিক তিনটি ভাগে (১ প্রাচীন ২ মধ্যম ও ৩ আধুনিক) ভাগ না ক'রে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে সুপরিকল্পিত ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় মেলে। প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। প্রথম দু'টি কাল—১ 'কাল্পনিক' ও ২ 'সঙ্কলন' নিয়ে আলোচনা জ্ঞানাঙ্কুরের সংখ্যাগুলোতে পাওয়া যায়। কাল্পনিক কাল নিয়ে আলোচনা প্রধানতঃ হোমারের গ্রন্থে প্রাপ্ত ভৌগোলিক তথ্যাদির উপর ভিত্তি ক'রে। 'সঙ্কলন' কালের বিবরণ হানো, স্কাইলাক্স, আরিষ্টটল প্রমুখের তথ্য থেকে গৃহীত। বাংলা সাহিত্যে ভূগোলের ইতিহাস লিখবার প্রথম সার্থক প্রয়াস এই প্রবন্ধে দেখা গেল। ভূবিদ্যা বিষয়ক কোনো কোনো প্রবন্ধে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'আর্য্যদিগের ভূবৃত্তান্ত' শীর্ষক প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটির লেখক কালীবর বেদান্তবাগীশ। এতে লেখক বিবিধ শাস্ত্র ও পুরাণাদি থেকে বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণ উদ্ধৃত ক'রে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, আধুনিক যুগে ভূবিদ্যা সম্বন্ধে যা' জানা যায়, অনেক আগেই আর্যেরা তা' জানতেন। আলোচ্য প্রবন্ধে শাস্ত্রে লেখকের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুরূহ শব্দ, দীর্ঘ বাক্য ও নীরস বর্ণনাভঙ্গী প্রবন্ধটির মাধুর্য নষ্ট করেছে। ভূবিদ্যা বিষয়ক কোনো কোনো প্রবন্ধে কবিত্বের পরিচয় সুস্পষ্ট। ১২৮২ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভূতত্ত্ব-রহস্য' নামক প্রবন্ধটির অর্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে কবিত্বময় বর্ণনা। যেমন :—

> "পূর্ব্বে পৃথিবীতে মনুষ্য ছিল না। সেই নক্ষত্রপুঞ্জ সম্বেষ্টিত শশধর পূর্ব্বেও সুস্নিগ্ধ কর বর্ষণ করিয়া জাগতিক জীবগণের সন্তোষ বিধান করিত; সেই দিবাকর খরতর কিরণে পৃথিবী দগ্ধ করিত; সেই জলধরগণ অযাচিত হইয়াও বারিবর্ষণ করিয়া জগতের শীতলতা সম্পাদন করিত; সেই সৌদামিনী মেঘমধ্য হইতে দেখা দিয়া মেঘান্তরালে লুকাইত; সেই সুস্নিগ্ধ মলয়মারুত জীব দেহে বায়ু ব্যজন করিত;"

জ্ঞানাঙ্কুরের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি তথ্যসমৃদ্ধ এবং মনোজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'অনন্ত আকাশে অসংখ্য সৌরমণ্ডল' (চৈত্র, ১২৮০), এবং 'প্রলীয়মান নক্ষত্র' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১)।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভ্রমর' (১২৮১) পত্রিকায় প্রাণি-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'নূতন জীবের সৃষ্টি' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১) ও 'চন্দ্রলোক' (চৈত্র, ১২৮১)। উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এদের একটিও নয়

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত অধিকাংশ ধর্মবিষয়ক পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচনাও স্থান পেত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'হিন্দু প্রদর্শক' (১৭৯১ শক), 'আর্যাদর্শন' (১২৮১), 'আর্য্যপ্রদীপ' (১২৮৫) ইত্যাদি। শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত সমদর্শীতে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ না থাকলেও তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'তে (১৮০০ শক) ধর্ম-বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 'ধূমকেতু' (১লা পৌষ, ১৮০৪ শক), 'বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম' (১৬ই বৈশাখ, ১৮১২ শক) এবং 'বিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি' (১লা আষাঢ়, ১৮১৩) শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটির নাম ধূমকেতু হলেও ধূমকেতু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এখানে নগণ্য। রচনাটির বৈশিষ্ট্য, বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয় স্থাপনের প্রচেষ্টায়। 'বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম' নামক প্রবন্ধটি হোল ছাত্রদের কাছে প্রদত্ত বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতার সারাংশ। ওয়াল্টার বেজহটের 'Physics and Politics' নামক গ্রন্থের অনুকরণে বিপিনবাবু এই বক্তৃতাটির নামকরণ করেছিলেন Physics and Piety বা জড়বিজ্ঞান ও ধর্ম। বিজ্ঞানালোচনার ফলে মানুষের চিন্তাধারায় কিভাবে পরিবর্তন ঘটছে, তা' এখানে যুক্তি ও বিচার সহযোগে আলোচনা করা হয়েছে। সমগ্র প্রবন্ধটির মূল সুর হোল ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। এই সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী 'বিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি' নামক প্রবন্ধেও সুস্পষ্ট। এই প্রবন্ধটি হোল ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ইংরেজী প্রবন্ধের সার-সংগ্রহ।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'কল্পদ্রুম' (১২৮৫) পত্রিকায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে উৎকৃষ্ট আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় এই পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্যের মধ্যেই সুস্পষ্ট। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি কিভাবে সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, পত্র-প্রচারের ঘোষণায় তারও নিদর্শন মেলে। ঘোষণার একাংশ নিম্নরূপ :—

"বিজ্ঞানপ্রভাবে জগতের যে কত অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্তনীয় মহোপকার লাভ হইয়াছে, গণনা করিয়া তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা রেল, তার, অর্ণবযান, কামান, বারুদ প্রভৃতি অদ্ভুত পদার্থ সকল অনুক্ষণ অবলোকন করিতেছি, সে সমুদয়ই বিজ্ঞান চর্চ্চার ফল। সেই বিজ্ঞান কল্পদ্রুমের একটী প্রধান আলোচনীয় বিষয়। কল্পদ্রুম পাঠকেরা বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া কোন কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়ায় সমর্থ হন, এই আমাদিগের মনের বাঞ্ছা।"

কল্পদ্রুমে প্রকাশিত অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। রঙ্গলালের রচনাগুলি তথ্যপূর্ণ। তা' ছাড়া তাঁর বর্ণনাভঙ্গী সরস। যেমন, ১ম খণ্ডের 'মানব দেহতত্ত্ব' ও ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত 'পক্ষি-জাতির পক্ষবল', 'সৌর তেজ ও সৌর কলঙ্ক,' 'অদ্ভুত ভৌতিক তত্ত্ব', 'সমুদ্র-মন্থন ও চন্দ্রের উৎপত্তি' এবং 'প্রাচীন অঙ্কপাত পদ্ধতি'। শেষোক্ত প্রবন্ধে গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে। কল্পদ্রুমের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য এদের বলিষ্ঠ ভাষায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১ম খণ্ডে প্রকাশিত 'বৈদ্যুতিক প্রভাব' ও ৪র্থ খণ্ডের 'পরমাণু ও দ্ব্যণুক তত্ত্ব'। শেষোক্ত প্রবন্ধটির লেখক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটিও সম্ভবতঃ তাঁরই লেখা।

কল্পদ্রুমের পর উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল 'কল্পনা' (১২৮৭) পত্রিকায়। কল্পনার বৈশিষ্ট্য পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে। সরস ভাষা ও সর্বজনবোধ্য প্রকাশভঙ্গী রচনাগুলির সাহিত্যিক মূল্য বাড়িয়েছে। এ পর্যায়ের অধিকাংশ প্রবন্ধের লেখক কল্পনার সম্পাদক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিদাসবাবুর রচনার বৈশিষ্ট্য, তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে একসঙ্গে না বলে ধীরে ধীরে তা' উদ্ঘাটিত করেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, কল্পনার ২য় বৎসরে (১২৮৮-১২৮৯) প্রকাশিত 'জলে কেন?' শীর্ষক রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধটি। হরিদাসবাবুর অপরাপর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ কল্পনার ১ম বৎসরে (১২৮৭-১২৮৮) প্রকাশিত 'চুম্বক রহস্য' এবং 'শিশির কি পড়ে?' শীর্ষক রচনাদ্বয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ কল্পনায় পাওয়া যায় না। এই পর্যায়ের একমাত্র প্রবন্ধ

'ব্রহ্মাণ্ড কত বড় ?' কল্পনার ২য় বৎসরে (১২৮৮-১২৮৯) প্রকাশিত হয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে এটি একটি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর রচনা। লেখক কল্পনার প্রকাশক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কল্পনার প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ৩য় বৎসরে (১২৮৯-১২৯০) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'ডারুইন ও জীবরহস্য', ৪র্থ বৎসরে (১২৯০-১২৯১) প্রকাশিত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ডারউইনের মতের সমালোচনা' ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিরোমিতিবিদ্যা'। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি ডারউইনের 'Origin of species' নামক গ্রন্থ অবলম্বন ক'রে লেখা। 'ডারুইন ও জীবরহস্য' নামক প্রবন্ধে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় থাকলেও যুক্তি ও তথ্যের অভাবে তা' দানা বেঁধে ওঠে নি। শেষোক্ত প্রবন্ধটি সারগর্ভ। কিন্তু তথ্যসমাবেশের প্রতি বেশী জোর দেওয়ায় এর সরসতা নষ্ট হয়েছে।

মনোবিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাওয়া গেল দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাহ' (বৈশাখ, ১২৮৯) পত্রিকায়। প্রবাহের প্রথম সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছিল, "বিজ্ঞান মানবোন্নতির প্রধান মূল বোধে প্রবাহ বিজ্ঞানশাস্ত্রকে সর্ব্বজনরঞ্জন করিয়া প্রকাশিত করিতে নিয়ত চেষ্টাশীল থাকিবে।" অথচ এই পত্রিকার যে সকল সংখ্যা এখনও পযন্ত পাওয়া যায়, তাতে খাদ্য ও মনোবিজ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগ নিয়ে কোনো আলোচনা নেই।

পূর্ণাঙ্গ না হলেও 'বঙ্গবন্ধু'তে (১৮৮২) পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। যেমন, 'বৈদ্যুতিক আলোক' (নবেম্বর, ১৮৮২), 'দ্রব্যের অবিনাশিতা' (নবেম্বর, ১৮৮২)।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'নব্যভারত' ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই উচ্চাঙ্গের সাময়িক-পত্রে দীর্ঘকাল ধ'রে বহু উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সরস আলোচনা এই পত্রিকার সুরু থেকেই পাওয়া গেল। ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা নব্যভারতে প্রকাশিত সূর্যকুমার অধিকারীর 'সূর্য্য' শীর্ষক রচনাটি দার্শনিক চিন্তামূলক একটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিজ্ঞানেই লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জীববিজ্ঞান বিষয়ক দু'টি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'জীবন বিজ্ঞান' (মাঘ, ১২৯০) ও ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখিত 'বিবর্ত্তনবাদ'

(বৈশাখ, ১২৯১)। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে জীবিত ও জীবনবিহীন পদার্থের পার্থক্য, জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের কথা ও জীববিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতি বর্ণিত। সহজবোধ্য ভাষায় লেখকের যুক্তিজাল ও বিচার-পদ্ধতি চমৎকার। পরবর্তী প্রবন্ধে লেখকের মৌলিক চিন্তাভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ভূবিদ্যা বিষয়ক সারগর্ভ আলোচনা নব্যভারতে পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, নীলরতন সরকার লিখিত 'ভূপৃষ্ঠে পরিবর্ত্তন' (মাঘ, ১২৯১)। ধর্মবিজ্ঞান বিষয়ক সুলিখিত প্রবন্ধ আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম' (শ্রাবণ, ১২৯০) এবং প্রভাতচন্দ্র সেনের 'জড় পদার্থের বল' (আশ্বিন, ১২৯১)। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে এরূপ বিচিত্র প্রকৃতির আলোচনা এই পত্রিকায় গোড়া থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল।

আলোচ্য পত্রিকাগুলো ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম, অষ্টম ও নবম দশকে প্রকাশিত আরও কয়েকটি সাময়িক-পত্রে বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'অবকাশবন্ধু' (১৮৬৭), 'ভারত পরিদর্শক' (১২৭৮), কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত 'প্রকৃতি' (১২৮৭), 'বঙ্গবাসী' (১২৮৮), 'সুখসরোজ' (১২৮৯) ইত্যাদি।

দুই

বিজ্ঞান-পত্রিকার প্রকাশ এই যুগে নূতন নয়। অসম্পূর্ণ প্রকৃতির হলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত 'পশ্বাবলী' ও 'পক্ষীর বিবরণ'কে বিজ্ঞান-পত্রিকার দলে ফেলা যায়। কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম, অষ্টম ও নবম দশকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'বিজ্ঞানকৌমুদী' (১৮৬০), 'বিজ্ঞানরহস্য' (১২৭৮), 'বিজ্ঞান-বিকাশ' (১২৮০), 'বিজ্ঞান-দর্পণ' (১২৮৩) ও 'সচিত্র বিজ্ঞান-দর্পণ' (১২৮৯)।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় দেশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও আবিষ্কারের কথা লিপিবদ্ধ করাই সচিত্র বিজ্ঞান-দর্পণ প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সম্বন্ধে অবতরণিকায়[৫] বলা হয়েছিল,

> "......আমাদের কল্পিত সোপান বিজ্ঞান-দর্পণ নামে আখ্যাত হইল এবং ইহাতে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাষায় গ্রথিত ও

---

৫ ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, বিজ্ঞান-দর্পণ।

সমালোচিত বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলের সরল বাঙ্গালায় অনুবাদমাত্র সন্নিবিষ্ট হইবে। সেই অনুবাদিত বিষয় যাহাতে বিশদ বা অনায়াসেই হৃৎপ্রতীত হইতে পারে, তজ্জন্য চিত্রাদি প্রভৃতি উপায় সকলও অবলম্বিত হইবে।·····

পুরাকালে হিন্দুদিগের মধ্যে কতকগুলি বিজ্ঞানশাস্ত্র ছিল; সেই সকল শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তন্মধ্যে যাহা কিছু আমাদিগের প্রশস্ত বলিয়া বোধ হইবে, আমরা সেই সকল বিষয়ও ইহাতে সন্নিবেশিত করিব।"

কিন্তু আসলে প্রাচ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা এই পত্রিকায় নেই বললেই হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে উদ্ভিদ, প্রাণী ও শারীরবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বিজ্ঞান-দর্পণের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাগুলোর বৈশিষ্ট্য, এখানে কোনো বিশেষ ধরনের উদ্ভিদের আলোচনা না ক'রে সমগ্র উদ্ভিদ জীবনের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, ১২৮৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্ভিদজীবন প্রক্রিয়া' এবং ১২৮৯ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত কালীকৃষ্ণ বসাকের 'উদ্ভিদ ও উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা'। পূর্ণচন্দ্র সাহা এই পত্রিকায় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর রচনার প্রধান ত্রুটি, বিভিন্ন প্রবন্ধে অবান্তর কথায় অবতারণা। অবান্তর কথা কোথাও বা প্রবন্ধের প্রারম্ভে। এই প্রসঙ্গে 'উদ্ভিদের অনুভব শক্তি' (৩য় ভাগ, ১২৯১) শীর্ষক প্রবন্ধটির নাম করা যেতে পারে। 'উদ্ভিদের আহার' (৩য় ভাগ, ১২৯১) নামক প্রবন্ধটির মাঝে মাঝে অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা রয়েছে। কোথাও বা প্রবন্ধের উপসংহারে বক্তৃতার ধরনে অবান্তর কথার অবতারণা করা হয়েছে। যেমন, 'উদ্ভিদসমাজে দস্যু' (৩য় ভাগ, ১২৯১)।

বিজ্ঞানদর্পণের প্রাণিবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধই গতানুগতিক প্রকৃতির। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১২৯০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কালীকৃষ্ণ বসাকের 'মধুমক্ষিকা'

এবং ১২৮৯ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রাণীবিদ্যা'। দু'টি রচনাই তথ্যসমৃদ্ধ। কিন্তু রচনাভঙ্গী একেবারেই নীরস।

কেবলমাত্র উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধই নয়, কালীকৃষ্ণ বসাক বিজ্ঞানদর্পণে জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'চন্দ্র' (ফাল্গুন, ১২৮৯)। প্রবন্ধটিতে চান্দ্রমাস ও চন্দ্রের কক্ষপথ, চন্দ্রগ্রহণ, চন্দ্রের প্রাকৃতিক অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা। এটি একটি নীরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর রচনাগুলোও গতানুগতিক প্রকৃতির। যেমন, শ্রীনাথ সিকদারের 'সূর্য্যই সর্ব্ববিধ শক্তির মূলীভূত কারণ' (কার্ত্তিক, ১২৯০)।

নূতন বিষয় নিয়ে উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিজ্ঞান-দর্পণে নেই বললেই হয়। বিজ্ঞান-দর্পণের সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রবাহ[৬] পত্রিকায় কঠোর মন্তব্য করা হয়েছিল,

> "...বিজ্ঞানদর্পণ সম্পাদক যেন মনে না করেন যে, তাঁহার পাঠকগণ সকলেই বিদ্যালয়ের ছাত্র। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চলিত কথা সকল লিখিয়া কাগজ পূরাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা বাসনা করি, ইহাতে বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চ উচ্চ বিষয় সকল অবতারিত হইবে।"

রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম শ্রেণীর কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় পাওয়া যায় না। তবে এই পর্যায়ের রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে আলোচনায়। যেমন, নগেন্দ্রনাথ ধর লিখিত 'বায়ু' (আষাঢ়, ১২৮৯), অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাচ' (কার্ত্তিক, ১২৮৯) ও 'কাগজ' (পৌষ, ১২৮৯) এবং রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'জল' (চৈত্র, ১২৮৯)। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে বায়ু যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ তা বুঝিয়ে জড়পদার্থের দু'টি গুণ বিস্তৃতি ও গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বায়ুর বিস্তৃতি-গুণটি পরীক্ষার সাহায্যে বোঝান হয়েছে। প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ প্রকৃতির। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাগুলোতে রাসায়নিক তথ্যাদি আছে। তবে উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এরা নয়।

৬ প্রবাহ— ১ম ভাগ ; ১২শ সংখ্যা।

বিজ্ঞানদর্পণের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলোরও কোনোরূপ অভিনবত্ব নেই। এই পর্যায়ের অধিকাংশ রচনাই সারগর্ভ, কিন্তু সরস নয়। কোনো কোনো রচনা টেক্‌নিক্যাল প্রকৃতির। যেমন, ১২৮৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মরুততত্ত্ব'। শ্রীনাথ সিকদারের রচনাগুলি দুরূহ ও দুর্বোধ্য প্রকৃতির। যেমন, 'আলোকবিজ্ঞান' (পৌষ, ১২৯০)। অন্নদাচরণ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীনাথ সিকদারের তুলনায় রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাভঙ্গী কিছুটা সরস ও সর্বজনবোধ্য। তাঁর পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'জড়জগতের নিয়ম আকর্ষণ' (অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১২৯০)। এটি সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী একটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

বিজ্ঞানদর্পণে প্রকাশিত ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা নগণ্য। এই পর্যায়ের অধিকাংশ প্রবন্ধই প্রাথমিক প্রকৃতির। প্রসঙ্গত সূর্যকুমার অধিকারীর 'পৃথিবী' (১২৯১) শীর্ষক প্রবন্ধটির নাম করা যায়। ভূবিদ্যা বিষয়ক মনোজ্ঞ আলোচনা এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যোগেশচন্দ্র রায় লিখিত 'পাথুরিয়া কয়লা' (আশ্বিন, ১২৮৯)।

১২৯০ সালের ভাদ্র সংখ্যা থেকে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে এই পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত। প্রশ্ন করতেন পাঠক। আর উত্তরদাতা ছিলেন সম্পাদক। প্রশ্নগুলোর অধিকাংশই প্রাথমিক প্রকৃতির। দু' একটি উত্তর ভুল। যেমন,

পাঠক। সূর্য্যোদয়ের ও সূর্য্যাস্তের সময়ে ওপরে আকাশ যে আজ কাল গাঢ় রক্তিমাবর্ণ ধারণ করে তাহার কারণ কি?

সম্পাদক। জাবা দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাতে প্রভূত পরিমাণে সবিদ্যুৎ বাষ্পরাশি বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত হওয়ায় সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও পরে আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করে।

বৈজ্ঞানিক-জীবনী এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, নগেন্দ্রনাথ ধর লিখিত 'চার্লস্ রবর্ট ডারুইন্' (জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ, ১২৮৯)। এতে ডারউইনের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা, আবিষ্কার

ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এটি একটি সুলিখিত বৈজ্ঞানিক-জীবনী।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ থাকা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এই পত্রিকায় কোনরূপ নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল না।

নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল 'নবজীবন'-এ (শ্রাবণ, ১২৯১) প্রকাশিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায়। রামেন্দ্রসুন্দর লেখনী ধারণ করার পর থেকে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হোল।

বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার—পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল ও ভূবিদ্যা

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির সাময়িক-পত্রকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করছিল। এর মূলে ছিল এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার। এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায়ও উন্নতি দেখা গেল। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন ইউরোপীয়েরা। কিন্তু এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয়রাও বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় যে জোয়ার এসেছিল তার মূলেও এই বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার। এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চা নতুনভাবে সুরু হয়েছিল প্রধানতঃ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে। প্রতিষ্ঠান তিনটি হোল মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন Surgeon William B. O'Shanghnessy. মেডিক্যাল কলেজে প্রথমে শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল ইংরেজী ভাষা। এই প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রথম হয়েছিল ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ থেকে বাংলা ভাষায় মেডিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। বাংলা বিভাগে রসায়নবিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা করা হোল ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। বস্তুতঃ, চিকিৎসাবিজ্ঞানকে বাদ দিলেও বাংলা দেশে পাশ্চাত্য রসায়নবিজ্ঞানের প্রসারে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অবদান বড় কম নয়।

এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা পরিষদের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গঠিত এই শিক্ষা পরিষদ (Council of Education) কলিকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন।[১] এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-চর্চার প্রস্তাবও

১ Hundred years of the University of Calcutta—PP. 43-44.

করা হয়। এই প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই কার্যকরী হয়েছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 'প্রভিসনাল কমিটি' (Provisional Committee) এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠ্যসূচীর মধ্যে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিল প্রাকৃতিক ভূগোল, গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, প্রাথমিক যন্ত্রবিজ্ঞান এবং প্রাথমিক প্রাণী ও উদ্ভিদবিজ্ঞান। বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্য-সূচীর মধ্যে ছিল গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, শারীরবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি।[২] ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান (Natural and Physical Science) পড়ান হবে বলে স্থির করা হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানের নূতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বি এ পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষিত বিষয়গুলির মধ্যে অবশ্যপাঠ্য ছিল রসায়নবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক ভূগোল। এছাড়া জড়বিজ্ঞানের (Physical Science) যে কোনো দু'টি বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল। এফ্. এ. পরীক্ষায় অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান। এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়গুলোর মধ্যে গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হোল। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠ্যসূচীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ক্রমেই প্রাধান্য পেল।

এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের অবদানও বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এদেশে যাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা হয় সে উদ্দেশ্যে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা বিষয়ক একখানি মাসিক পত্রে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঐ প্রস্তাব তিনটির মর্ম ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও অমৃতলাল সরকার কর্তৃক সংকলিত 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' (১৯০৩) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় দেওয়া আছে। প্রস্তাব তিনটি নিম্নরূপ :—

১ "এদেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার নিমিত্ত কলিকাতায় একটি সভা স্থাপিত হউক, এবং ভারতবর্ষের নানাস্থানে তাহার সহিত সংযোগে শাখা সভা সংস্থাপিত হউক।

২ Hundred years of the University of Calcutta—P. 64.

২ ভারতের লোককে নানাবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করা এই সভার উদ্দেশ্য হইবে। বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্বন্ধে ভারতে যে সমুদয় প্রাচীন পুস্তক আছে, তাহাও প্রকাশিত করা এ সভার একটী উদ্দেশ্য হইবে।

৩ এই সভার নিমিত্ত গৃহ, নানারূপ যন্ত্র, ও কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত লোকের আবশ্যক। ইহার জন্য অর্থের প্রয়োজন। চাঁদা স্বরূপ সেই অর্থ সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত হইবে।"

বিজ্ঞানসভার কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ডাঃ সরকার বিভিন্ন যায়গায় বক্তৃতা করেন এবং সংবাদপত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এর ফলে সরকার ও জনসাধারণ ডাঃ সরকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হলেন। বিজ্ঞান-সভার কর্মপন্থা আলোচনার উদ্দেশ্যে ডাঃ সরকারের সমর্থকেরা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে এক সভায় মিলিত হলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী দেশের বহু গণ্যমান্য লোকের উপস্থিতিতে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা স্থাপিত হোল।[৩] ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বাংলার তৎকালীন ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল। জনসাধারণ ও সরকারের সহযোগিতায় অল্পকালের মধ্যেই বিজ্ঞানসভার সুবৃহৎ গৃহ প্রতিষ্ঠিত হোল। তা' ছাড়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হোল সুসজ্জিত পরীক্ষাগার। কিন্তু বিজ্ঞানসভা বিজ্ঞান-সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক ও গবেষণার দিকেই নজর দিলেন বেশী। তবে এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে বিজ্ঞানের প্রতি কিছু সংখ্যক লোকের যে অনুরাগের সৃষ্টি হয়, তা' বাংলাভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার উপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টিতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। তা' ছাড়া লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে (১৮৪৮-১৮৫৬) শিল্পবিজ্ঞান ও যানবাহন ব্যবস্থায়ও দেশের অগ্রগতি সাধিত হোল। ডালহৌসীর সময়েই ভারতবর্ষে প্রথম ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ও রেলপথ স্থাপিত হয়। সরকারীভাবে এদেশে টেলিগ্রাফ লাইন প্রথম খোলা হয়েছিল ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে এবং প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে।

৩ ১২৭৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে অনুষ্ঠানপত্রের সাতটি ধারার সমালোচনাও প্রকাশ করা হয়।

এক

ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ের যে প্রভাব সমাজজীবনে ব্যাপৃত হোল তা প্রভাবিত করল সাহিত্যকেও। কালিদাস মৈত্র লিখলেন 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১৮৫৫) এবং 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ' (১৮৫৫)। 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বা তড়িত বার্তাবহ প্রকরণ'-এর লেখক কালিদাস মৈত্রের নিবাস ছিল শ্রীরামপুরে। তিনি কিছুকাল সাময়িক-পত্রের পরিচালনা করেছিলেন। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'জ্ঞানারুণোদয়' (১৮৫২) নামক মাসিক-পত্রের সম্পাদনায় তিনি প্রায় এক বৎসরকাল সহায়তা করেছিলেন। এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হবার পর তিনি কিছুকাল ধ'রে 'সংবাদ শশধর' (১৮৫২) নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। সংবাদ শশধরে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। তবে কালিদাস মৈত্রের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ'। শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীনাথ দে চতুর্ধুরীণ[৪] ও হরিশ্চন্দ্র দে চতুর্ধুরীণের অনুমতি অনুসারে এবং শ্রীনাথ দের সহায়তায় কালিদাস মৈত্র এই গ্রন্থটি রচনা করেন। কালিদাস মৈত্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করেছিলেন জন ম্যাকের কাছে। এই গ্রন্থটি রচনায় চেম্বারের 'ইনফরমেশন ফর দি পিপ্‌ল' (Chambers's Information for the people), গার্ডনারের 'মিউজিয়াম অব সায়েন্‌স্ এণ্ড আর্ট' (Museum of Sciences and art) এবং 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা' (Encyclopædia Americana) এই তিনটি গ্রন্থ থেকে বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু অনুবাদ ও সংকলন করা হয়েছে। অবশ্য এন্‌সাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানার উল্টো কথাও যায়গায় যায়গায় রয়েছে। আকাশস্থ বিদ্যুৎ সম্বন্ধে এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় আছে,······"the intensity of this free electricity is greater at the middle of the day than at morning or night[৫] ..আর কালিদাস মৈত্র লিখেছেন, "····সূর্য্য উদয়াবধি দুই তিন ঘণ্টা আকাশে বিদ্যুতীয় প্রভার বৃদ্ধি হইয়া মধ্যাহ্নকালে

৪ চতুর্ধুরীণ উপাধি দিনেমারদের দেওয়া।
[শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস—পৃঃ ৭০]

৫ The Encyclopædia Americana—Vol. 10 ; P. 180.

হ্রাস হয় আবার সূর্য্যের অস্তের প্রাক্‌কালে আকাশে বিদ্যুৎপ্রভা বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে রাত্রিতে লাঘব হয়।"[৬]

ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ হোল বাংলা ভাষায় রচিত টেলিগ্রাফ সম্বন্ধীয় প্রথম গ্রন্থ। অবশ্য ইতিপূর্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও বিবিধার্থ-সংগ্রহে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বিষয়ক কিছু কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তা ছাড়া এম্. টাউনসেণ্ড (M. Townsend) ও জে রবিন্‌সন্ (J. Robinson) সত্যপ্রদীপ নামক পত্রিকায় বিদ্যুৎ বিষয়ক নিবন্ধাদি লিখেছিলেন।

ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ রচনা করবার সময় লেখক কোনো বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সাহায্য পান নি। এজন্যে অনেকক্ষেত্রে ভাবানুসারে অর্থ ক'রে তার পাশে ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ছাড়াও বিদ্যুতের উৎপত্তি, গুণ ও কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রারম্ভে 'পরিভাষা' শীর্ষক অধ্যায়ে বিদ্যুৎ সম্পর্কে দেশীয় লোকদের ধারণা এবং বিদ্যুৎ কি তা বোঝাতে গিয়ে লেখক যে সকল শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতির অবতারণা করেছেন, তাতে তার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এর পর আকর্ষণ কি তা ব্যাখ্যা ক'রে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণ সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিদ্যুৎ পরিমাপক যন্ত্র, বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র, আকাশস্থ বিদ্যুৎ, আকর্ষণশক্তি, বিদ্যুতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রসায়নবিজ্ঞান এবং ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটিতে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। কালিদাস মৈত্রের রচনাভঙ্গী সরস নয়। তবে ভাষা মোটামুটি প্রাঞ্জল।

কালিদাস মৈত্রের অপরাপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'জিওগ্রাফি বা ভূগোল' এবং 'খগোল বিবরণ'। এ ছাড়া এই লেখকের ইচ্ছে ছিল, 'পদার্থতত্ত্ব' নাম দিয়ে আর একটি গ্রন্থ রচনা করবার। কিন্তু গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

এই যুগের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অক্ষয়কুমার দত্তের 'পদার্থবিদ্যা'।[৭] তবে এই গ্রন্থে শুধুমাত্র জড় ও জড়ের গুণ নিয়ে আলোচনা

---

৬ ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ—কালিদাস মৈত্র, পৃঃ ৫৩।

৭ লঙের ক্যাটালগ থেকে জানা যায়, 'European Science Translating Society'র উদ্যোগে 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৩৩) নামে একটি গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটিই সম্ভবতঃ বাংলায় রচিত প্রথম পদার্থবিজ্ঞান।

রয়েছে। জড় ও জড়ের গুণ ছাড়াও যন্ত্রবিজ্ঞান ও বাষ্পীয় যন্ত্র নিয়ে আলোচনা পাওয়া গেল ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে। মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পদার্থদর্শনে (সংবৎ ১৯২৭) তাপ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হোল। মহেন্দ্রনাথ কলিকাতা নর্মাল বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর গ্রন্থটি মোট পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম চারটি অধ্যায়ে জড়ের ধর্ম, আকর্ষণ, বেগ ও গতির নিয়ম এবং তরল ও বায়বীয় পদার্থের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে তাপের উৎপত্তি সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তবে তাপকে পদার্থবিজ্ঞানের একটি প্রধান বিভাগ হিসাবে ধরে নিয়ে বাংলা পদার্থবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে এই প্রথম আলোচনা করা হোল। এই গ্রন্থে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী শব্দসমূহ বাংলায় অনুবাদিত হয়েছে। অনুবাদে সংস্কৃতানুগত্য। তা' ছাড়া মহেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গী কিছুটা দুরূহ প্রকৃতির। গাণিতিক প্রসঙ্গও দু' এক যায়গায় আছে।

পদার্থদর্শনের দুরূহতার কথা ভেবে মহেন্দ্রনাথ 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৭৩) রচনা করেন। পদার্থবিদ্যায় প্রথমে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের ধর্ম এবং গতি, শক্তি ও তাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল। পঞ্চদশ সংস্করণে (১৮৮৯) শব্দ, আলোক, চুম্বক ও তড়িৎ নিয়েও আলোচনা করা হোল। শুধু পরিকল্পনা ও বিষয়বিভাগেই নয়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ পদার্থ-দর্শনের তুলনায় এই গ্রন্থের ভাষাও অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। তবে তাপ সম্বন্ধে আলোচনা সূর্যকুমার অধিকারীর প্রকৃতিবিজ্ঞানেই অধিকতর বিস্তারিত। শব্দ ও আলোক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উভয় গ্রন্থেই রয়েছে। কিন্তু তড়িৎ ও চুম্বক সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথই অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মহেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গী নীরস। ভাষায় সংস্কৃতানুগত্য এই গ্রন্থটিতেও রয়েছে। তা' ছাড়া মহেন্দ্রনাথের রচনায় অনেক ভুল আছে। ১২৮৭ সালের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'বঙ্গ বৈজ্ঞানিক' শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে কঠোর মন্তব্য করা হয়েছিল।

মহেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারে অনেকক্ষেত্রেই অক্ষয়কুমারকে অনুসরণ করেছেন। তবে দু' এক যায়গায় তাঁকে নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও সূর্যকুমার অধিকারীর মধ্যেও মিল দেখা যায়। যেমন, Neutral Equilibrium অর্থে উভয়েই লিখেছেন উদাসীন সাম্যভাব। তা' ছাড়া আরও বহু

শব্দের ব্যবহারে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, Tenacity—টানসহত্ব, Reflection (of heat, light or motion)—প্রতিফলন, Absorption (of heat, light)— পরিশোষণ, Adhesion—সংসক্তি, ইত্যাদি।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সমসাময়িক যুগে পদার্থবিজ্ঞান লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কানাইলাল দে ও সূর্যকুমার অধিকারী। কানাইলাল দে'র পদার্থবিজ্ঞান (প্রথম ভাগ) ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এসিষ্টাণ্ট সার্জেন কানাইলাল দে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। রসায়নবিজ্ঞান নামে তিনি আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কানাইলাল দে গ্রেটবৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটির সম্মানিত সদস্য (Honorary Member) মনোনীত হয়েছিলেন। ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের কাছে তিনি পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এ গ্রন্থটি হোল তারই সংকলন। গ্রন্থটি প্রকাশের মূলে ছিল ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত উচ্চ পরীক্ষক পরিষদের (Senior Board of Examiners) নিম্নোক্ত মন্তব্য :—

> "That in the opinion of this meeting it is very desirable that elementary text-books treating of the Natural Sciences, be prepared specially for teaching these subjects to Indian students. The text-books now available, though excellent of their kind, having been prepared for English boys, deal more specially with objects familiar or common in Europe, and have but few references to such as are interesting and familiar to the Indian learner. This want is more specially felt in teaching subjects as Zoology, and Physical Geography......
>
> The meeting is of opinion that the extension of Physical Science teaching in India would be greatly facilitated with [the aid of works specially adapted for local teaching]."

বস্তুতঃ, এই যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক অসংখ্য পাঠ্যপুস্তক রচনার মূলে ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চর্চায় উৎসাহ দান। কানাইলাল দে'র 'পদার্থবিজ্ঞান' পাঠ্যপুস্তক হলেও সহজ ভাষায় পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে এই গ্রন্থে যে আলোচনা করা হয়েছে তা সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী। গ্রন্থটি রচনায় লেখককে সাহায্য করেছিলেন ডাঃ এফ্. এন্. ম্যাক্‌নামারা এবং পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয়, বস্তুর সাধারণ গুণ (General properties of matter) এবং তাপ। দ্বিতীয় ভাগে 'আলোক, 'বিদ্যুৎ' প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছে লেখকের ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় নি।

কানাইলাল দে'র রচনাভঙ্গী সরল। ভাষা প্রাঞ্জল। অনুক্রমণিকায় পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে ভূমিকাটি চমৎকার। কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ এবং গতি ও তাপ সম্বন্ধে আলোচনাও বেশ সরস। আলোচনা কোথাও টেক্‌নিক্যাল হয়ে পড়ে নি। গাণিতিক প্রসঙ্গের অবতারণাও নগণ্য। এদিক থেকে এবং ভাষার সারল্যের দিক থেকে বিচার করলে কানাইলাল দে'র পদার্থবিজ্ঞান সর্বজনবোধ্য একটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। শুধু ভাষা ও রচনারীতির দিক দিয়েই নয়, বিষয়বস্তু সমাবেশের দিক থেকেও গ্রন্থটি অভিনব। ইতিপূর্বে রচিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো গ্রন্থেই বস্তুর সাধারণ গুণ নিয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা করা হয় নি। তা ছাড়া তাপ সম্বন্ধে এত সারগর্ভ আলোচনাও ইতিপূর্বেকার কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে লেখক পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী শব্দগুলো বাংলায় অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের সময় শব্দের শ্রুতিমধুরতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। রচনার নিদর্শন :

বল

"এই গতি কে উৎপাদন করে? সকল পদার্থই জড়, স্বেচ্ছামত থাকিতেও পারে না, চলিতেও পারে না। কিন্তু দেখিতেছি, একটি পদার্থ এই স্থির ও নিশ্চল রহিয়াছে, পর মুহূর্তেই গতিসম্পন্ন হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল; ইহাকে কে চালাইল? এই দেখিতেছি, আর এক পদার্থ চলিতেছে,—ক্রমাগতই চলিতেছে, সহসা স্থির ও নিশ্চল। ইহাকে কে থামাইল?—বল (Force)।

বল, পদার্থকে গতিসম্পন্ন করে, আবার বলই প্রতিকূল দিকে প্রযুক্ত হইয়া সেই পদার্থকে নিশ্চল করে, যে পরিমাণ বল সেই পদার্থকে গতি প্রদান করে, সেই পরিমাণ বলই আবার প্রতিকূল দিকে প্রযুক্ত হইয়া তাহাকে স্থির করিয়া ফেলে।

যে পদার্থকে চালান যত শক্ত বা সহজ তাহাকে আবার থামানও তত শক্ত বা সহজ। একটী ক্ষুদ্র বর্তুলকে একটুকু আঘাতেই সঞ্চালিত কবিতে পারা যায়, সেই একটুকু প্রতিঘাতেই আবার তাহাকে নিশ্চল করা যায়। কিন্তু একটী বৃহৎ বর্তুল বা অন্য কোন বৃহৎ পদার্থকে নড়াইতে বা থামাইতে হইলে অধিক বলের আবশ্যক। সুতরাং যাহা কোন চল বা অচল পদার্থের অবস্থার পরিবর্ত্তন করে তাহাকেই বল বলা যায়।"

এই যুগের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত 'শিশুবিজ্ঞান বা সংক্ষিপ্ত পদার্থবিদ্যা' (১৮৭৪)। এই গ্রন্থে জড়পদার্থ কি তা বুঝিয়ে জড়ের সাধারণ গুণ এবং তাপ, শব্দ ও আলোক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সূর্যকুমার অধিকারীর 'প্রকৃতিবিজ্ঞান' ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখক মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানের অভিনবত্ব এর বিষয়বস্তু নির্বাচনে। ইতিপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক যে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের কোনোটিতেই শব্দ, আলোক ও তড়িৎ নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। কিন্তু সূর্যকুমার অধিকারীর প্রকৃতিবিজ্ঞানে জড় ও জড়ের গুণ, বল ও গতির নিয়ম ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা ছাড়াও শব্দ, তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। তা' সত্ত্বেও সূর্যকুমারের গ্রন্থেই সর্বপ্রথম পদার্থবিজ্ঞানের মূল বিভাগগুলো নিয়ে আলোচনা করা হোল। গ্রন্থটি রচনায় বালফোর ষ্টুয়ার্ট (Balfour Stewart), টিণ্ডাল (Tyndall), গ্যানো (Ganot) প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানের সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক শব্দগুলো বাংলায় অনুবাদিত হয়েছে। অনুবাদের সময় কোনো কোনো স্থলে লেখক পূর্ববর্তী গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু শব্দ, আলোক ও তড়িৎ-বিদ্যার

অধিকাংশ শব্দের অনুবাদ সূর্যকুমার নিজেই করেছেন। অনুবাদের রীতি দেখলে মনে হয়, লেখক শব্দের লালিত্য অপেক্ষা অর্থের দিকেই বেশী জোর দিয়েছেন। ফলে অনুবাদিত শব্দগুলো দু'এক যায়গায় শ্রুতিকটু হয়ে পড়েছে। যেমন, উৎসেচন ও উচ্ছোষণ (Ebullition and Evaporation), বৈশেষিক তাপ (Specific heat) ইত্যাদি। প্রকৃতিবিজ্ঞানে শব্দ, আলোক ও তড়িৎ সম্বন্ধে আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত। এ তুলনায় জড়ের সাধারণ ধর্ম ও তাপ সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। গ্রন্থটির তথ্যসমাবেশ প্রাথমিক প্রকৃতির। রচনাভঙ্গী নীরস।

রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ এই যুগে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, গোপাললাল মিত্র ও ভুবনমোহন মিত্র লিখিত 'কৌতুকতরঙ্গিণী' (২য় সংস্করণ, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে)। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ কতকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষার কথা বর্ণিত।[৮] তবে ম্যাকের কিমিয়াবিদ্যার সারের পর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল রসায়নবিজ্ঞান রচনায় ভাটা পড়ে। এর মূলে এদেশে রসায়নবিজ্ঞান চর্চার অভাব। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাংলা ভাষায় কয়েকটি রসায়নবিজ্ঞান রচিত হোল। এর কারণ, এদেশে রসায়ন-চর্চার ক্রমবর্ধমান প্রসার। এই প্রসার ঘটেছিল তিনটি সূত্রকে কেন্দ্র ক'রে। সূত্র তিনটি হোল, (১) মেডিক্যাল কলেজে বাংলায় রসায়নবিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা, (২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় এবং (৩) মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় রসায়নবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি। মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় রসায়নবিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হবার পর বাংলায় রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 'পদার্থদর্শন' ও 'পদার্থবিদ্যা'র রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'রসায়ন' (১৮৭৭)। এই গ্রন্থে কয়েকটি প্রধান প্রধান মূল ও যৌগিক পদার্থের বিবরণ দিয়ে জল, বায়ু ও অগ্নির রাসায়নিক তত্ত্বাদি

৮ লঙের ক্যাটালগ (১৮৫৫), ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ক্যাটালগ [Vol .II, Part. IV, (1905)] এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাংলা বইয়ের সাপ্লিমেণ্টারী ক্যাটালগে (1910) বইটির উল্লেখ আছে।

আলোচিত হয়েছে। এরপর পরমাণুবাদ সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। পরিশেষে ইউরোপীয় রাসায়নিকদের দ্বারা অনুসৃত সাংকেতিক চিহ্নগুলো বুঝিয়ে ধাতুঘটিত কয়েকটি দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, এখানে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থসমূহের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, হাইড্রোজেনের বাংলা করা হয়েছে অব্জনক বা জলজনক বায়ু।[১] এরূপ নামকরণের অপরাপর উদাহরণ, অনিলজনক বা অম্লজনক বায়ু (অক্সিজেন), অঙ্গারক (কার্বন), আর্দ্রভৌমিক বায়ু (মার্শ গ্যাস) ইত্যাদি। এই নামকরণ দু'এক যায়গায় দুরূহ ও শ্রুতিকটু। গ্রন্থটিতে স্বল্পপরিসরের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, একথা মেনে নিয়েও বলা যায়, আলোচনা প্রায় প্রতিটি স্থলেই অসম্পূর্ণ। গ্রন্থটির ভাষায় কৃত্রিমতা রয়েছে। তা' ছাড়া রচনাভঙ্গী নীরস ও একঘেয়ে। এই গ্রন্থে রাসায়নিক সংযোগ বোঝাতে গিয়ে বাংলা সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহারে নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য বাংলায় সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের পদ্ধতি পরবর্তী দু'একটি গ্রন্থেও অনুসৃত হয়েছিল। যেমন, 'রসায়নের উপক্রমণিকা'। তবে এ ব্যাপারে মহেন্দ্রনাথই পথপ্রদর্শক। মহেন্দ্রনাথের রচনার নিদর্শন :—

"চূর্ণজনক বা চূর্ণক

ইংরাজী নাম ; কেল্সীয়ম

যে ধাতু, চূর্ণ অর্থাৎ চূণের উপাদান তাহার নাম চূর্ণজনক বা চূর্ণক। ইহার সহিত অম্লজনকের যোগে চূর্ণের উৎপত্তি। চূর্ণের সহিত আঙ্গারিক অম্লের সংযোগে মার্ব্বল প্রস্তর, ফলখড়ি, চূর্ণ প্রস্তর এবং প্রবাল উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত লবণ দ্রাবকে মার্বলাদি দ্রব করিলে আঙ্গারিকাম্ল বিমুক্ত হয়। মার্ব্বল প্রস্তর সমধিক উত্তপ্ত করিলে বিশুদ্ধ চূর্ণ উৎপন্ন হয় আর আঙ্গারিক অম্লভাগ উড়িয়া যায়। সচরাচর ঘুটিং প্রভৃতি চূর্ণ ঘটিত বস্তুকে ভাঁটীতে দগ্ধ করিয়া চূণ প্রস্তুত করে, চূণের সহিত জলের রাসায়নিক সংযোগ হয় এবং সেই

১ "অপ অর্থাৎ জলের জনয়িতা বলিয়া এই মূল পদার্থটির নাম অব্জনক বা জলজনক রাখা হইয়াছে"। [রসায়ন - মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০]।

সংযোগ নিবন্ধন তাপ উদ্ভূত হয়। অনাবৃত পাত্রে চূণের জল রাখিয়া দিলে বায়ুস্থ অম্লজনকের সহিত উহার সংযোগে অঙ্গারায়িত চূর্ণ (কার্বণেট অব লাইম) জন্মে। অঙ্গারায়িত চূর্ণ জলে দ্রব হয় না। মার্ব্বল প্রস্তর বিশুদ্ধ কার্বণেট-অব-লাইম। লবণ দ্রাবকে মার্ব্বেল প্রস্তর দ্রব করিলে উহার আঙ্গারিক অম্লভাগ উড়িয়া যায় আর হরিতজ চূর্ণক (কেলসীয়ম ক্লরাইড) দ্রব হইয়া থাকে। এই হরিতজ চূর্ণক ঘটিত জল জাল দিয়া ঘন করিলে শ্বেতবর্ণ কঠিন হরিতজ চূর্ণক (কেলসীয়ম ক্লরাইড) জন্মে। অঙ্গারায়িত চূর্ণ যেমন জলে দ্রব হয় না, হরিতজ চূর্ণক সেরূপ নহে। হরিতজ চূর্ণক সহজেই জলে দ্রব হয়; এমন কি অনাবৃত পাত্রে রাখিয়া দিলে চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ু হইতেও জলীয় ভাগ গ্রহণ করিয়া আর্দ্র হয়। বায়বীয় ও বাষ্পীয় বস্তুর জলীয় ভাগ নিরাকরণার্থ এই বস্তুটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চূর্ণের সহিত হরিতকের প্রবাহ চালিত হইলে চূর্ণের সহিত হরিতকের সংযোগে হরিতজ চূর্ণ (ক্লরাইড-অব লাইম) উৎপন্ন হয়। ইহার ধৌতকারিত্ব গুণ থাকাতে বস্ত্রাদি ধৌত করণার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়। ক্লরাইড-অব লাইম ঘটিত জলে কিঞ্চিৎ গন্ধক দ্রাবক ঢালিয়া দিয়া তাহাতে যদি একখানি লাল কি অন্য কোন বর্ণের রুমাল তুই চারিবার ডুবান যায় তাহা হইলে শাদা হইয়া যায়।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রস্কোর 'রসায়ন সূত্র' (১৮৭৫)। এই গ্রন্থটি হোল ম্যাঞ্চেষ্টারের ওএন্ কলেজের অধ্যাপক এচ্. ই. রস্কোর (H. E. Roscoe) গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ। স্যার রিচার্ড টেম্পল রস্কোর এই গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ করেন।[১০] রসায়ন সূত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে অগ্নি, বাতাস, জল, ক্ষিতি, উপধাতু ও ধাতু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। 'সার সংগ্রহ' অধ্যায়ে নির্দিষ্ট সমানুপাতে সংযোগ, মৌলিক পদার্থের আণবিক গুরুত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা। পরিশেষে যন্ত্রাদির ব্যবহার এবং পরীক্ষার সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দেওয়া

১০ রসায়ন শিক্ষা—ভূমিকা : পৃঃ (iii)

হয়েছে। রসায়ন সূত্রে অগ্নি, বাতাস, জল ও ক্ষিতি সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। অধাতু (Non metals) ও ধাতু সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। শুধুমাত্র প্রধান প্রধান ধাতু ও অধাতু সম্বন্ধে আলোচনা এই গ্রন্থে রয়েছে। অধাতুদের প্রস্তুতপ্রণালী এতে নেই ; শুধুমাত্র গুণ বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন পরীক্ষার সরল বর্ণনায়। রসায়ন সূত্রে রাসায়নিক পদার্থসমূহের নাম বাংলায় অনুবাদিত হয়েছে। অনুবাদ কয়েক যায়গায় শ্রুতিকটু। শব্দের ব্যবহারে অনেক যায়গায় বিদেশী উচ্চারণের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কোলতার (Coal Tar), বাওলেট্ (Violet)।

রস্কোর গ্রন্থ আক্ষরিক অনুবাদিত হয়েছিল। কিন্তু কানাইলাল দে'র রসায়ন-বিজ্ঞানে অনুবাদ অপেক্ষা সংকলনের উপর জোর দেওয়া হোল। রসায়ন-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ যথাক্রমে ১৮৭৭ ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের লেখক কানাইলাল দে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনুবাদ অপেক্ষা সংকলনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তুও বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। বস্তুতঃ, বিজ্ঞানগ্রন্থাদির ক্ষেত্রে অনুবাদ অপেক্ষা সংকলনের উপযোগিতাই বেশী বলে মনে হয়। কারণ, কোনো অঞ্চলের জলবায়ু, সামাজিক অবস্থা এবং স্থানীয় উপকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করলে অনেক সময় তা জনপ্রিয়তা অর্জনের অবকাশ পায়। তা ছাড়া অনুবাদে নতুন পরিকল্পনায় গ্রন্থ লিখবার অবকাশ নেই। সংকলনে সে অবকাশ আছে। সংকলক বিদেশী ভাষা থেকে আহৃত বিষয়গুলোকে নতুন ক'রে দেশীয় ছাঁচে ঢালতে পারেন। এদিক থেকে বিচার করলে কানাইলাল দে কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছেন। কারণ, এই গ্রন্থে দুরূহ কোনো পরীক্ষার কথা তিনি বর্ণনা করেন নি ভারতবর্ষে রাসায়নিক যন্ত্রপাতির অভাবের কথা ভেবে। যে পরীক্ষাগুলো কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের লেবরেটরীতে তিনি নিজে করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র তাদের থেকে ভারতীয়দের উপযোগী কতকগুলি পরীক্ষা বেছে নিয়ে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। বৈজ্ঞানিক শব্দগুলোর ইংরেজী নামই এই গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়েছে বটে, কিন্তু যে পদার্থগুলোর বাংলা নাম সুবিজ্ঞাত ছিল সেগুলোর দেশীয় নামই ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর তথ্যসন্নিবেশে। রস্কোর গ্রন্থের তুলনায় এতে আরও বেশী সংখ্যক ধাতু ও

অধাতু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার রীতিও বিস্তৃততর। এই গ্রন্থে বিভিন্ন ধাতু ও অধাতুর স্বরূপ, প্রস্তুতপ্রণালী, ধর্ম ও পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের আলোচনায় সুপরিকল্পনার ছাপ বিদ্যমান। যৌগিক পদার্থগুলো নির্বাচন করা হয়েছে এদের প্রয়োগ এবং উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে। মহেন্দ্রনাথের গ্রন্থ কানাইলালের গ্রন্থের তুলনায় প্রাথমিক প্রকৃতির।

এ ছাড়া এই যুগে রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তবে এদের অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক। বিপিনবিহারী দাসের 'রসায়নের উপক্রমণিকা' (১২৮৪) মাইনর ও বাংলা ছাত্রবৃত্তি ক্লাশের পরীক্ষার্থীদের জন্যে লেখা। রাসায়নিক পদার্থের জটিল পরীক্ষাগুলোর বর্ণনা না ক'রে এই গ্রন্থের লেখক রসায়নবিদ্যার মূল তত্ত্বগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, যৌগিক পদার্থসমূহের বাংলা অনুবাদে। এই অনুবাদে একটি সুচিন্তিত রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজী ide, ic, ous ইত্যাদি প্রত্যয়ান্ত যৌগিক পদার্থগুলোর নাম বাংলায় অনুবাদের কালে যথাক্রমে জ, ষ্ণিক ও ষ্ণীয় প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। এই অনুবাদের সময় অর্থের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যেমন, Oxide, Hydride ইত্যাদির অনুবাদ করা হয়েছে অম্লজ, অক্ত ইত্যাদি। Nitric, Nitrous ইত্যাদির স্থলে লেখা হয়েছে যাবক্ষারিক, যবক্ষারীয় ইত্যাদি।

যৌগিক পদার্থের নামকরণে অভিনবত্বের পরিচয় রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর 'সচিত্র রসায়ন শিক্ষা'য়ও (১৮৭৭) পাওয়া গেল। কোন কোন মৌলিক পদার্থের কতখানি অংশ যৌগিক পদার্থে আছে, যৌগিক পদার্থের নামকরণের মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থের লেখক তা' বোঝাতে চেয়েছেন। এই নামকরণ করতে গিয়ে লেখক বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আদি অংশ গ্রহণ করেছেন। যেমন, অম্লজানের অম্ল, উদজানের উদ ইত্যাদি। এক ভাগ অম্লজান ও দু' ভাগ উদজান মিলে জল হয়; এই রীতি অনুযায়ী জলের নামকরণ করা হয়েছে একাম্ল-দ্ব্যুদজান। ঠিক এই পদ্ধতি অনুসারেই ফেরাস সালফেটের নামকরণ হয়েছে চতুরম্ল-গন্ধ লৌহ। সচিত্র রসায়ন শিক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৮৭৮ ও ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। রসায়ন শিক্ষা রচনার মূলে ছিল রস্কোর 'A Primer of Chemistry' নামক গ্রন্থ। স্কুল পরিদর্শক

আর. এল. মার্টিন রস্কোর এই গ্রন্থটি অনুবাদের ভার লেখককে দিয়েছিলেন। অনুবাদ ছাত্রদের উপযোগী হবে না ভেবে কিছু অংশ লেখবার পর লেখক এই কাজে ইস্তফা দেন। এদিকে রস্কোর গ্রন্থটি অনুবাদ করলেন স্যার রিচার্ড টেম্পল। এই অনুবাদ দেখে লেখক রসায়ন শিক্ষা রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। আলোচ্য গ্রন্থটি মোট তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে অধাতু, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ধাতু এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে অগ্নি, বাতাস, জল ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ একে বলা যায় না। বিভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনাও বিস্তারিত নয়। তা' ছাড়া রচনাভঙ্গীও নিকৃষ্ট প্রকৃতির। তবে রস্কোর গ্রন্থের তুলনায় এখানে অধিক সংখ্যক ধাতু ও অধাতু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যাদবচন্দ্র বসুর 'রসায়ন' (১৮৭৮)। যাদবচন্দ্র হুগলী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাকে রসায়ন রচনায় সহায়তা করেছিলেন হুগলী কলেজের বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ জর্জ ওয়াট্। এই গ্রন্থে অজৈব রসায়নশাস্ত্রের (Inorganic Chemistry) কতকগুলো মূল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ বিদ্যমান। এখানে বিভিন্ন পদার্থকে 'পরমাণবস্থানুসারে' (atom-fixing power) সাজান হয়েছে। এই গ্রন্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, রাসায়নিক পরীক্ষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও যাতে এখানে বর্ণিত পরীক্ষাগুলো সহজেই ক'রে দেখতে পারেন, সেদিকে নজর রেখে লেখক গ্রন্থটি রচনা করেছেন। রাসায়নিক পরীক্ষা-গুলোর বর্ণনা করা হয়েছে সরল ভাষায়। যাদবচন্দ্রের বর্ণনাভঙ্গী উৎকৃষ্ট। আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের প্রচলিত বাংলা নামই ব্যবহৃত। কয়েকস্থলে প্রয়োজনবোধে নূতন নামও সংকলন করা হয়েছে। তবে প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন পদার্থের বাংলা নামের পাশে ইংরেজী নাম দেওয়া আছে। বিভিন্ন পদার্থ ও সেই পদার্থগুলোর সংযোগে গঠিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা এতে রয়েছে। তবে যাদবচন্দ্রের গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি, ধাতব পদার্থসমূহের আলোচনায়। ধাতব পদার্থের অধিকাংশ আলোচনাই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। একমাত্র লৌহের আলোচনাই কিছুটা বিস্তারিত।

তিন

শুধুমাত্র পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানেই নয়, এই যুগে বাংলা গণিত রচনায়ও প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হোল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, বাংলায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ অঙ্ক বই প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর 'পাটীগণিত' (১২৬২)। বাংলা পাটীগণিতের পথপ্রদর্শক প্রসন্নকুমার। বাংলাভাষায় গণিতের পরিভাষার সৃষ্টি সর্বপ্রথম তিনিই করেছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে হুগলীর রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম যদুনাথ সর্বাধিকারী। প্রসন্নকুমার হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। গণিত, সংস্কৃত, ইতিহাস ও দর্শনে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। ছাত্রজীবন শেষ ক'রে তিনি ঢাকা কলেজ, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতিতে অধ্যাপনা করেছিলেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষার উন্নতির জন্যে তিনি নিজেও বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রসন্নকুমারের পাটীগণিতের বিষয়বস্তু কোলেন্সো, নিউ মার্চ, চেম্বার্স প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে সংকলিত। গাণিতিক শব্দগুলোর সংকলনে সাহায্য করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পাটীগণিতের যায়গায় যায়গায় এদেশীয় অঙ্কের প্রণালীও লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পাটীগণিতের ত্রয়োদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৭৬ সালে। প্রসন্নকুমার পরবর্তী যুগের পাটীগণিত রচয়িতাদের প্রভাবিত করেছিলেন।

পরবর্তী যুগের যে সব পাটীগণিতে প্রসন্নকুমারের গ্রন্থের প্রভাব পড়েছে, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, চন্দ্রকান্ত শর্মার 'গণিতাঙ্কুর' (সংবং ১৯১৬), কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পাটীগণিত' (১৮৬৬), শান্তিপুরের ইংরেজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামীর 'গণিতবিজ্ঞান' (তৃতীয় সংস্করণ: ১২৭৭) এবং ভুবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পাটীগণিতাঙ্কুর' (১৮৭৯)। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি প্রাথমিক প্রকৃতির। এটি রচনায় বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে এবং প্রধানতঃ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর পাটীগণিত থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। গ্রন্থরচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। গণিতাঙ্কুরে অঙ্কের সরল বিষয়গুলো সহজ ভাষায় বোঝান হয়েছে। কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়ের পাটীগণিতের বিষয়বস্তু ডি. মর্গ্যান, নিউমার্চ, কোলেন্সো প্রভৃতির ইংরেজী গ্রন্থ থেকে এবং প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর পাটীগণিত থেকে সংগৃহীত। গাণিতিক শব্দগুলো প্রসন্নকুমারের

পাটীগণিত থেকে সংকলিত হয়েছিল। তা' ছাড়া গ্রন্থটির পরিকল্পনায়ও প্রসন্নকুমারের প্রভাব রয়েছে। জয়গোপাল গোস্বামীর গণিতবিজ্ঞানের পরিকল্পনায় ও সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহারে প্রসন্নকুমারের পাটীগণিতের প্রভাব পড়েছে। তা' ছাড়া ভুবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাটীগণিতাঙ্কুর রচনায় প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাটীগণিত থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।

এ ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আরও বহু গণিত রচিত হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'গণিতসার' (১৮৫৫), বিপিনমোহন সেনগুপ্তের 'সংখ্যাসার' (১৭৮৩ শক), শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চুনিলাল শীল সংকলিত 'গণিত দর্পণ' (১৮৭০), যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন সংকলিত 'অঙ্কসার, ১ম ভাগ' (১৮৭১) এবং স্বর্ণনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত 'আশু অঙ্কবোধক' (১২৮৮)। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি-প্রকাশিত এবং উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত গণিতসার রচনায় কীথ (Keith) ও বনিকাস্‌ল (Bonnycastle) প্রভৃতির অঙ্ক বই, ইউনিভার্সেল ক্যালকুলেটর (Universal Calculator) এবং শুভঙ্করের গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। গ্রন্থটিকে একেবারে প্রাথমিক প্রকৃতির বলা যায় না। বিপিনমোহন সেনগুপ্তের 'সংখ্যাসার' গণিতের একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ না হলেও বাংলা ভাষায় সংখ্যার পর্যায় সম্বন্ধে এটিই প্রথম গ্রন্থ। গণিত দর্পণ ও অঙ্কসার, ১ম ভাগে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। স্বর্ণনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের আশু অঙ্কবোধক একটি নতুন ধরনের গ্রন্থ। লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গণিতের পাশাপাশি সমাবেশ এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শুভঙ্করের সূত্রের মাধ্যমে পাটীগণিতের মূল বিষয়সমূহ আলোচিত। অনেক যায়গায় লেখকের নিজস্ব মতামতও ব্যক্ত। গ্রন্থটি রচনায় সাহায্য করেছিলেন ব্রহ্মমোহন মল্লিক, গৌরীশঙ্কর দে প্রভৃতি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ভাষায় মানসাঙ্ক সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। রঘুমণি সরকারের 'মানসাঙ্ক' (১২৬৯) বাংলায় মানসাঙ্ক সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী পুস্তক থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। মানসাঙ্ক সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। শিশুদের উদ্দেশ্যে পাঁচ ভাগে মানসাঙ্ক লিখেছিলেন গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মানসাঙ্কের বিভিন্ন ভাগগুলি ১২৭১ থেকে ১২৭৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

এই যুগে বাংলা ভাষায় বীজগণিত রচনার সূত্রপাত হোল। বাংলায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে প্রথম বীজগণিত লিখলেন পাটীগণিতের পথপ্রদর্শক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। প্রসন্নকুমারের বীজগণিত ১ম ভাগ (সংবৎ ১৯১৬ ও ২য় ভাগ। সংবৎ ১৯১৭) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরামর্শ অনুযায়ী রচিত হয়েছিল। উড, পীকক প্রভৃতির ইংরেজী বীজগণিত এবং ইউলর্ ও লাক্রোয়ারের ফরাসী বীজগণিতের ইংরেজী অনুবাদ থেকে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংকলিত হয়েছিল। তা ছাড়া ভাস্করাচার্যের সংস্কৃত বীজগণিত থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়। গ্রন্থরচনায় সাহায্য করেছিলেন রামকমল ভট্টাচার্য। এই গ্রন্থে অব্যক্ত রাশির প্রতীক ব্যবহারে ভাস্করাচার্য প্রণীত রীতি অনুসরণ না ক'রে ইউরোপীয় রীতি অনুসৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও স্বদেশিয়ানাই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, কি পরিভাষার ব্যবহারে, কি বীজগণিত সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলোর সমাধানে সর্বত্রই বাংলা ভাষার ব্যবহার গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য। উচ্চাঙ্গের বীজগণিত না হলেও একেবারে প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ একে বলা যায় না। সূচকবাদ (Indices), করণী (Surds) ইত্যাদি প্রসঙ্গ এতে আছে। গ্রন্থের পরিকল্পনাটিও মোটামুটি বৃহৎ। তা ছাড়া প্রসন্নকুমারের বোঝাবার ভঙ্গী প্রাঞ্জল।

এই যুগের অপরাপর বীজগণিতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যদুনাথ ভট্টাচার্যের 'বীজগণিত' (১৮৬০), যশোদানন্দন সরকার সংকলিত 'বীজগণিত প্রবেশিকা' (১২৭৯), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বীজগণিত' (১৮৭২) এবং মহেন্দ্রনাথ রায়ের 'বীজগণিত'।

এই যুগে জ্যামিতি রচনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজন কৃতী লেখক। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর জ্যামিতি রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রামকমল ভট্টাচার্য। রামকমল ভট্টাচার্যের 'জ্যামিতি' গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ইউক্লিডের জ্যামিতির মূল তত্ত্বগুলো আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির শেষ দিকে আলোচ্য অংশের ইংরেজী অনুবাদও দেওয়া আছে। বিভিন্ন জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞার বিশ্লেষণ বাংলা অক্ষরের সাহায্যে করা হয়েছে। রামকমলের বোঝাবার ভঙ্গী ভাল। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের পরিকল্পনা কৃষ্ণমোহন বা ভূদেবের গ্রন্থের তুলনায় স্বল্পপরিসর।

এ ছাড়া এই যুগের জ্যামিতির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রাজমোহন দে সংকলিত ইউক্লিডের 'ক্ষেত্র-জ্যামিতি' (১৮৭০)। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম অধ্যায়। বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রতত্ত্ব অবলম্বন ক'রে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। ক্ষেত্র-জ্যামিতি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এর ত্রয়োদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি জ্যামিতিক সংজ্ঞা আলোচনার পর কতকগুলো স্বীকার্য সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিজ্ঞার পর আবশ্যক অনুযায়ী অনুমান ও অনুসিদ্ধান্তের সংযোজন এই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য। রাজমোহন দে'র বোঝাবার ভঙ্গী সরল। অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা তাঁর গ্রন্থে একেবারেই নেই।

'খগোলবিবরণ'-রচয়িতা নবীনচন্দ্র দত্তের 'ব্যবহারিক জ্যামিতি' (১৮৭৩) কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির আদেশ অনুযায়ী লিখিত হয়। এই গ্রন্থটি হোল স্কট্-এর 'নোট্‌স্ অন্ প্রাক্‌টিক্যাল জিয়মিট্রি'র অনুবাদ। নবীনচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গী বেশ স্বচ্ছ। এ ছাড়া নবীনচন্দ্র গণিত ও জ্যামিতি বিষয়ক আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর 'ক্ষেত্রব্যবহার বা ব্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহার, জরীপ এবং সমস্থল প্রক্রিয়া' ১২৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ ভোলানাথ মজুমদারের 'প্লেন ত্রিকোণমিতি' ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছিলেন লেখকের পুত্র বিহারীলাল মজুমদার। ত্রিকোণমিতির রচয়িতা ভোলানাথ মজুমদার কলিকাতার জোড়াসাঁকো নিবাসী ছিলেন। ডেভিড হেয়ার বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ ক'রে তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। গণিতে শৈশব থেকেই তাঁর অনুরাগ ছিল। গণিতে পারদর্শিতার জন্যে তিনি অধ্যাপক রিজের সহায়তায় কম্পিউটেটরের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ২৩ বৎসর কাল তিনি এই কাজ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্লেন ত্রিকোণমিতি গ্রন্থে রেখা ও কোণের পরিমাণ, ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধীয় অনুপাত ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে এটি একটি প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা এই যুগে অপেক্ষাকৃত অল্প। বাংলা

ভাষা ও সাহিত্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান রচনায় পথ দেখিয়েছিলেন উইলিয়ম ইয়েট্‌স্। ইয়েট্‌স্-এর জ্যোতির্বিদ্যা প্রকাশিত হবার বিশ বৎসরাধিক কাল পর জ্যোতির্বিজ্ঞান লিখলেন গোপীমোহন ঘোষ। তাঁর 'জ্যোতির্বিবরণ' ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে (সংবৎ ১৯১৬) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থ-রচনার কারণ সম্বন্ধে লেখক 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "কিছুদিন পূর্ব্বে এক পৌরাণিক পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত কথোপকথন ক্রমে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। তিনি আমার নিকট ইউরোপীয় মতানুসারে গ্রহণ ঋতু-পরিবর্ত্তনাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়া সমধিক পরিজ্ঞানার্থ কৌতূহল প্রদর্শন করেন। তদনুসারে আমি সহজ সহজ ইঙ্গরেজী পুস্তক দেখিয়া জ্যোতিবিষয়ক স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করি।" ঐ বিজ্ঞাপন থেকেই জানা যায় লেখকের প্রথমে ইচ্ছে ছিল, জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা নিজের হাতে লিখে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পাঠাবেন। কিন্তু রচনা কিছুদূর এগোবার পর এক বন্ধুর উৎসাহ ও অনুরোধে আলোচিত বিষয়বস্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটি ক্ষুদ্রকায় হলেও আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি বিরাট। এতে চন্দ্র, নক্ষত্র, সূর্য, দিনরাত্রি, ঋতুপরিবর্তন, গ্রহণ, গ্রহ, ধূমকেতু, ছায়াপথ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং প্রাথমিক প্রকৃতির। তথ্যসমাবেশও যায়গায় যায়গায় দুর্বল। তবে গোপীমোহনের ভাষা সবল ও প্রাঞ্জল। রচনা দেখে মনে হয়, বন্ধুর অনুরোধে আলোচ্য বিষয়বস্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় লেখক গ্রন্থটি বালকদের উপযোগী ক'রে লিখেছিলেন। নাটকত্ব ও চিত্রধর্মিতা এই গ্রন্থের রচনারীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন,

> "ঐ দেখ, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে. ঐ বৃক্ষের শাখাপল্লবের মধ্যে মধ্যে যে সকল পক্ষী বিহার করিতেছে, তাহা কিছুই তোমাদের নয়নগোচর হইতেছে না; বৃক্ষের পত্রসকল পৃথক পৃথক রূপে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে না; কিন্তু যদি দূরবীক্ষণ-যন্ত্রে নয়ন সংযোগ করিয়া ঐ বৃক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, তাহা হইলে ঐ বৃক্ষস্থিত নানাবিধ পক্ষিগণকে এক এক করিয়া দেখিতে পাইবে, ঐ বৃক্ষের শাখা ও পল্লবসকল বায়ুভরে যেভাবে সঞ্চালিত হইতেছে, তাহাও অনায়াসে দেখিতে পাইবে।"

'জ্যোতির্ব্বিবরণ'-এর দু'একটি সুন্দর বর্ণনায় সাহিত্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, ডাঃ ক্রষ্টরকে অনুসরণ ক'রে চন্দ্রের পর্বতের বর্ণনা।

এই যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, কালিদাস মৈত্রের 'খগোলবিবরণ' (১৮৫৯)। কালিদাস মৈত্র ইতিপূর্বে 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ,' 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে,' 'জিওগ্রাফি বা ভূগোল' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'খগোলবিবরণ' ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি ছাড়াও উচ্চাঙ্গের কয়েকটি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রসঙ্গ এতে আছে। যেমন, গ্রহাদির দূরত্ব এবং গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান নির্ণয়ের উপায় ইত্যাদি প্রসঙ্গ। বস্তুতঃ, এখানেই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে খগোলবিবরণের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এক একটি জ্যোতিষ্ক নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে গ্রন্থরচনার প্রয়াস এই যুগে দেখা গেল। প্রভাতচন্দ্র সেনের 'চন্দ্রতত্ত্ব' (১৮৬১) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রতত্ত্ব প্রধানতঃ বালকবালিকাদের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এর ভাষা ছোটদের উপযোগী নয়। চন্দ্রতত্ত্বে চন্দ্রের আকৃতি, দূরত্ব, গতি ইত্যাদির বর্ণনা দিয়ে চন্দ্রে প্রাণীর অস্তিত্ব, চন্দ্রের উপরিভাগ এবং জোয়ার ও ভাঁটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা তথ্যপূর্ণ। গ্রন্থটিতে লেখকের যুক্তিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। গাণিতিক প্রসঙ্গ যায়গায় যায়গায় আছে; তবে তা' দুরূহ নয়। চন্দ্রতত্ত্বের সর্বপ্রধান ত্রুটি রচনাভঙ্গীর আড়ষ্টতা। যায়গায় যায়গায় উৎকট সন্ধি রচনার শ্রুতিমধুরতা নষ্ট করেছে।

চন্দ্রতত্ত্বের লেখক প্রভাতচন্দ্র সেনের ইচ্ছে ছিল 'সূর্য্যতত্ত্ব' নামে আর একটি গ্রন্থ রচনা করবার। কিন্তু 'সূর্যতত্ত্ব' প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নবীনচন্দ্র দত্তের 'খগোলবিবরণ' ১২৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। 'ব্যবহারিক জ্যামিতি'র রচয়িতা নবীনচন্দ্র ১২৪৩ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পাঠশালার পাঠ শেষ ক'রে কিছুকাল সংস্কৃত কলেজে পড়বার পর তিনি ফ্রী চার্চ ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি 'সংবাদ প্রভাকর', 'জ্ঞান রত্নাকর' প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। পরে 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ ছাড়া সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনা এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ ক'রে নবীনচন্দ্র খ্যাতি

অর্জন করেন। বত্রিশ বৎসরকাল সরকারী চাকুরী করবার পর ১২৯৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন। ১৩০৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। খগোল-বিবরণের বিষয়বস্তু 'নিউটন্‌স প্রিন্‌সিপিয়া,' 'হারসেলস্‌ অ্যাষ্ট্রনমি, 'মিল্‌স অ্যাষ্ট্রনমি' প্রভৃতি ইংরেজীগ্রন্থ এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। খগোল-বিবরণে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও বিভিন্ন উপগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নবীনচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। তথ্যসমাবেশও নগণ্য নয়। গ্রন্থটি যে তৎকালীন যুগের পাঠকদের মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়েছিল তা' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি থেকে জানা যায়ঃ—

> "অতি বাল্যকালে খগোলবিবরণ নামে একখানি বাঙ্গালায় লেখা জ্যোতিষের বহি পড়িয়াছিলাম; ঐ পুস্তকে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ সকলের বিবরণ পড়িয়া বালকের মনে কত আনন্দের উদয় হইত, কত কৌতূহল জাগিয়া উঠিত! ঐ পুস্তকখানির প্রণেতার নাম মনে হইতেছে নবীনচন্দ্র দত্ত।"[১১]

চার

এই যুগে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক কয়েকটি সর্বজনবোধ্য গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা দেখা গেল। তা' ছাড়া এই সময়ে ভূগোল বিষয়ক বহু পাঠ্য-পুস্তকও রচিত হোল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ভূগোল রচনার সূত্রপাত করেছিলেন ইউরোপীয়েরা। এই প্রসঙ্গে মার্শম্যান, পিয়ার্স ও পিয়ার্সনের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁদের গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা নগণ্য। রামমোহন রায়ের পর এদেশীয়দের মধ্যে ভূগোল রচনা করেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এঁদের গ্রন্থেও রাজনৈতিক ভূগোলের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী গ্রন্থকার গৌরীশংকর ভট্টাচার্যও রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোলকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। গৌরীশংকর রচিত 'ভূগোলসার' ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে বিভিন্ন মহাদেশের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও প্রাকৃতিক ভূগোল নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রাকৃতিক ভূগোল রচনার প্রথম কৃতিত্ব রাজেন্দ্রলাল মিত্রের।

১১ আকাশের গল্প (১৩২০)—যতীন্দ্রনাথ মজুমদার। ভূমিকা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমসাময়িক যুগে ভূগোল বিষয়ক বহু পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 'বারাসতস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ সংকলিত ভূগোল-বৃত্তান্ত' (১৮৫৫), স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রচিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ 'ভূগোলবিদ্যাসার' (১৮৫৬) এবং তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'ভূগোল বিবরণ' (১৮৫৬)[১২]। তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভূগোল প্রবেশ' (১৮৫৮) হোল ভূগোল বিবরণের সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য সংস্করণ। এই যুগের অপরাপর স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, গোপালচন্দ্র বসুর 'ভূগোল-সূত্র' (১২৬৪), শ্যামাচরণ বসু অনুবাদিত 'ভারতবর্ষের ভূগোল বৃত্তান্ত' (১৮৬২), শশীভূষণ শর্মার 'ভূগোল পরিচয়' (সম্বৎ ১৯২৩), হুগলী মডেল স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রচিত 'ভবৃত্তান্ত' (২য় ভাগ—১২৭৩), হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'আসিয়ার বিবরণ' (১৮৬৮), কালীপ্রসাদ সাণ্ডিল্য সংকলিত 'উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভূ-বৃত্তান্ত' (১৮৭০), রজনীকান্ত ঘোষের 'ভূগোলবিদ্যাসার' (১৮৭১), নীলকমল ঘোষালের 'ভূগোল-সার সংগ্রহ' (১২৮০), পূর্ণচন্দ্র দত্ত অনুবাদিত 'প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক কতিপয় পাঠ' (১৮৭৬) এবং কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ই, লেথব্রিজের আদেশ অনুযায়ী বঙ্গভাষায় অনুবাদিত 'বাঙ্গালার ভূগোল ও ইতিহাস' (১৮৭৬) ও নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাকৃতিক ভূগোল' (১৮৮২)। শেষোক্ত গ্রন্থটি ছাড়া উল্লিখিত সবগুলো গ্রন্থেই প্রাকৃতিক ভূগোলের আলোচনা নগণ্য।

সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত এই যুগের প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থেই পৌরাণিক তথ্যাদি এসে গেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে,' 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ,' 'খগোলবিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক কালিদাস মৈত্রের 'জিওগ্রাফি বা ভূগোল-বিজ্ঞাপক' (১২৬৩)। গ্রন্থটি শ্রীনাথ দে চতুর্ধুরিণের অনুমতি অনুসারে রচিত হয়েছিল। 'ভূগোল-বিজ্ঞাপক' চার খণ্ডে সম্পূর্ণ হবার কথা ছিল। প্রথম খণ্ডে পৃথিবীর আকার, প্রকার ও গতির নিয়ম আলোচিত হয়েছে। অপরাপর খণ্ডগুলো প্রকাশিত হয় নি বলেই মনে হয়। শাস্ত্র ও

১২ ভূগোল বিবরণের ২য় ভাগ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

পুরাণে কালিদাস মৈত্রের পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ও তড়িৎ বার্ত্তাবহ' নামক গ্রন্থে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে এদেশীয় লোকের ধারণা শাস্ত্রীয় তথ্যাদির মাধ্যমে বোঝান হয়েছে। এখানেও পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে প্রাচীন বিশ্বাসের কথা আলোচিত হয়েছে শাস্ত্র, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে। পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে প্রাচীন ইউরোপীয়দের বিশ্বাস, বাইবেলে পৃথিবীর আকারের বর্ণনা এবং টলেমি ও কোপারনিকসের মতবাদ আলোচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পাণ্ডিত্যের পরিচয় 'পুরাণ সম্মত ভূগোল বিবরণ' শীর্ষক অধ্যায়ে আরও সুস্পষ্ট। তবে কালিদাস মৈত্রের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের। অনেকক্ষেত্রেই পৌরাণিক ধারণাকে তিনি যুক্তি সহকারে খণ্ডন করেছেন। একদিকে পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে পাণ্ডিত্য, অপরদিকে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কালিদাস মৈত্রের রচনাকে একটি বিশিষ্টতা দান করেছে।

পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল দ্বারকানাথ বিদ্যারত্নের 'ভূতত্ত্ব বিচার' (১৭৯৪ শক) নামক গ্রন্থে। যাঁরা পুরাণ ও শাস্ত্রে অবিশ্বাসী তাঁদের যুক্তির ভ্রমপ্রদর্শন লেখকের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে লেখক বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। তবে শাস্ত্রীয় মতবাদ-গুলোর যে যে স্থানে যথোপযুক্ত যুক্তির অভাব সে সকল স্থানে নতুন-ভাবে যুক্তি উপস্থাপিত ক'রে তিনি সে সকল মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বস্তুতঃ, বেদপুরাণাদি শাস্ত্রের অন্তর্গত ভূগোলের যৌক্তিকতা প্রদর্শনই এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য। 'ভূতত্ত্ব বিচার' দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে পৃথিবীর আকার, জলস্থল-বিভাগ ইত্যাদি প্রসঙ্গ এবং দ্বিতীয় ভাগে জোয়ার-ভাঁটা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা। দু'এক যায়গায় সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মবিশ্বাস অতি প্রকট।

কালিদাস মৈত্রের 'জিওগ্রাফি বা ভূগোল-বিজ্ঞাপক' এবং দ্বারকানাথ বিদ্যারত্নের 'ভূতত্ত্ব বিচার' ছাড়াও এই যুগে আরও কয়েকটি পুরাণ-নির্ভর ভূগোল রচিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গোবিন্দমোহন রায় সংকলিত 'মৃন্ময়ী' (১৭৯৯ শক) এবং গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ রচিত 'ভুবন বৃত্তান্ত' (১৮৭৮)। মৃন্ময়ী একটি নতুন ধরনের গ্রন্থ। পুরাণ-নির্ভর হলেও এই গ্রন্থের যায়গায় যায়গায় ইউরোপীয় মতের সঙ্গে এদেশীয়

মতের সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যের কারণ দেখান হয়েছে। গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "প্রাচীন হইতেও প্রাচীনতম কালে ভারতে গণিত-বিজ্ঞানাদির বহুল প্রচার ছিল এ বিষয় অবগত হইয়া বঙ্গবাসী যুবকবৃন্দের স্বদেশানুরাগ উপচিত হইবে এই উদ্দেশ্যই মৃন্ময়ী সঙ্কলনের প্রধান কারণ।" সূর্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে 'মৃন্ময়ী'র বিষয়বস্তু সংকলিত। বস্তুতঃ, এই গ্রন্থটি লেখকের গবেষণার ফল। প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে তিনি শুধু তথ্য সংগ্রহই করেন নি, প্রয়োজনবোধে নিজস্ব মতামতও ব্যক্ত করেছেন। গোলাধ্যায়, সূর্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে লেখক যেভাবে ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক তথ্যাদি আহরণ করেছেন এবং যেভাবে বিভিন্ন মতবাদ ও মতভেদ বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিচার-কুশলতার পরিচয় সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থে 'গ্রহভ্রমণ বিষয়ে মতভেদ', 'পৃথিবীর আকার ও গোলতার প্রমাণ', আকর্ষণশক্তি, ঋতুবিভাগ, দিনরাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রসঙ্গ শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের ভূগোল বিষয়ক মতবাদ-গুলোর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা গেল গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণের 'ভুবন বৃত্তান্ত'-তে। গোবিন্দকান্ত পাবনা জেলার শালখিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীকান্ত লাহিড়ী। শাস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত ক'রে তিনি কাশিমবাজারের মহারাণীর দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে তিনি দণ্ডবিধি ও রাজস্বকার্যের বিচারকের পদে নিযুক্ত হন। রাজকার্যের অবসরে তিনি সাহিত্যসেবা করতেন। কিন্তু 'ভূগোল বৃত্তান্ত' তাঁর সাহিত্যসেবার ব্যর্থতার পরিচয় বহন করে। আলোচ্য গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব। তা' ছাড়া যায়গায় যায়গায় অন্ধ বিশ্বাসের পরিচয় রয়েছে। এমনকি ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক আধুনিক মতবাদগুলোকে কয়েক যায়গায় লেখক খণ্ডন করতে চেয়েছেন। রচনাভঙ্গীরও প্রশংসা করা চলে না। বাক্য অযথা দীর্ঘ ও জটিল।

পুরোপুরিভাবে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেও এই যুগে ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাদি রচিত হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা নিয়ে গ্রন্থ লিখলেন রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র বসু ও স্বর্ণকুমারী দেবী। রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'ভূবিদ্যা'

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলোর অধিকাংশই তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভূগোল বিবরণ' থেকে সংগৃহীত। 'ভূবিদ্যা'য় ভূগর্ভ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্যাদি নেই। আলোচনা প্রধানতঃ প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে। ভূবিদ্যার বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর জলস্থল বিভাগ, পর্বত, আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, সাগর ইত্যাদি প্রসঙ্গ। রাধিকাপ্রসন্নের ভাষা সরস। তথ্যসমাবেশ উচ্চাঙ্গের নয়। আলোচনা সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। গ্রন্থটিতে যায়গায় যায়গায় কবিত্বের আভাস আছে।

বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ ভূবিজ্ঞান রচনার প্রথম কৃতিত্ব গিরিশচন্দ্র বসুর। তাঁর 'ভূতত্ত্ব—প্রথম ভাগ' ১২৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে ভূতত্ত্ব কিছু কিছু আলোচিত হয়েছিল বটে ; কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে বাংলায় ভূবিজ্ঞান লিখবার প্রচেষ্টা এই গ্রন্থেই প্রথম দেখা গেল। অবশ্য ইতিপূর্বে সাময়িক-পত্রে (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়) ভূবিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তবে প্রত্নজীববিদ্যা (Palaeonthology) সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা এই গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া গেল। ফসিলের সাহায্যে বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে কিভাবে আমাদের জ্ঞানলাভ হয়, এই গ্রন্থে মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে তা' আলোচিত হয়েছে। ভূতত্ত্ব—প্রথম ভাগের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে শিলা, স্তর, ফসিল, স্তর ও ফসিল পাষাণীভূত হবার পদ্ধতি, ভূপৃষ্ঠ ক্ষয়ের বিভিন্ন কারণ, বয়স অনুসারে শিলার শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। ইংরেজী ভূবিদ্যা বিষয়ক শব্দগুলো বাংলায় অনুবাদের সময় লেখক শুধুমাত্র অর্থের দিকেই নজর দেন নি, অনুবাদিত শব্দগুলোর শ্রুতি-মধুরতার দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন। অবশ্য কয়েকক্ষেত্রে ইংরেজী নামই হুবহু ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থটি ক্ষুদ্রকায় হলেও তথ্যপূর্ণ। ভূবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এমন প্রসঙ্গ এতে নেই বললেই হয়। অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ দিয়ে সহজ ভাষায় এই গ্রন্থে ভূবিজ্ঞান আলোচিত হয়েছে। 'ভূতত্ত্বে' বিষয়বস্তুর বিন্যাস কিছুটা সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির হলেও বাংলায় ভূবিজ্ঞান রচনার প্রথম সুপরিকল্পিত প্রয়াস বলে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে। প্রত্নজীববিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনার একাংশ রচনার নিদর্শন হিসাবে উদ্ধৃত হোল :—

......"কোন কোন স্তর কেবল জীব পদার্থ হইতে উৎপন্ন, যথা প্রবাল স্তর; কিন্তু তদ্ব্যতীত কোন কোন স্থানে এমন স্তর পাওয়া গিয়াছে, যাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ জীববেত্তারাও জীব পদার্থ হইতে উৎপন্ন একবার মনেও করেন নাই। এক্ষণে সেই সকল স্তর সম্পূর্ণ-রূপে জৈবনিক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। বার্লিনের অধ্যাপক এলেন-বার্গ আবিষ্কার করিয়াছেন যে টিপলি (Tipoli) নামক এক-প্রকার সিলিকনিত শিলা বিনা-অণুবীক্ষণে অদৃশ্য, অতি ক্ষুদ্র ডায়াটমাদি (Diatomaceœ) শ্রেণীভুক্ত উদ্ভিদ্-কায়া হইতে উৎপন্ন। এই জাতীয় উদ্ভিদ্ অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিতে অতি সুন্দর, তাহাদের ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র কায়া সিলিকনিত পুট বা আবরণ দ্বারা আবৃত। সেই পুট সকল সুন্দর কারুকার্য্য বহুল। উদ্ভিদ্-জীবনান্তে কায়া-পুট একত্রিত হইয়া স্তর প্রস্তুত হয়। অধ্যাপক এলেনবার্গ গণনা করিয়াছেন, এক ঘন ইঞ্চিতে ৪১০০০ উদ্ভিদ্ পাওয়া যায়। আয়তন অনুমান করিবার জন্য এই গণনা দেওয়া গেল। শ্বেত-খড়ী বা অণুবীক্ষণ-দৃশ্য অতি ক্ষুদ্র ফোরামিনিফারা (Foraminifera) প্রাণীর দেহাবশেষ মাত্র, তাহাও অধুনা জানা গিয়াছে।"

গিরিশচন্দ্র বসুর পর ভূবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বর্ণকুমারী রচিত 'পৃথিবী' ১২৮৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে পৃথিবীর গতিপ্রণালী, উৎপত্তি, ভূপঞ্জর, ভূগর্ভ, পৃথিবীর পরিণাম ইত্যাদি প্রসঙ্গ মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত। প্রাচ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির উল্লেখ যায়গায় যায়গায় থাকলেও গ্রন্থটি মূলতঃ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রেই রচিত।

এইভাবে জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায়ও উন্নতি সাধিত হোল।

জীববিজ্ঞান (উদ্ভিদ, প্রাণী, শারীর, অস্থিবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব), সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব

জড়বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জীববিজ্ঞান বিষয়ক বহু পাঠ্যপুস্তক এবং সর্বজনবোধ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এর মূলে ছিল মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার। তা' ছাড়া তত্ত্বোধিনী, বিবিধার্থ-সংগ্রহ, রহস্য-সন্দর্ভ, বামাবোধিনী প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক-পত্রিকার মাধ্যমেও জনসাধারণের দৃষ্টি জীববিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

এক

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উদ্ভিদবিজ্ঞান 'বালকশিক্ষার্থ উদ্ভিজ্জ বিদ্যা' (১৮৫৪) ব্রজনাথ বিদ্যালংকার কর্তৃক অনুবাদিত হয়েছিল। বালকপাঠ্য হলেও একেবারে প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ একে বলা যায় না। উদ্ভিদজগৎ সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটি বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়কে সমগ্র গ্রন্থটির উপক্রমণিকা বলা যেতে পারে। এখানে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ প্রকৃতির। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষার উপকারিতা, পরমায়ু অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ এবং মূল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির আলোচনা রয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে কথোপকথনের মাধ্যমে মূল, কাণ্ড ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্ণিত। রচনাভঙ্গীর দুরূহতা এবং সুপরিকল্পনার অভাব গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি।

বাংলায় সুপরিকল্পিতভাবে সর্বপ্রথম উদ্ভিদবিজ্ঞান রচনা করেন ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। যদুনাথ সংকলিত 'উদ্ভিদ্-বিচার' ১২৭৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে স্কুলের বালকদের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি রচিত হয়। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ হলেও বাংলা ভাষায় উদ্ভিদ-বিজ্ঞান লিখবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা বলে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাসে উদ্ভিদ্-বিচারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু

একাধিক ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। উদ্ভিদ্-বিচারের কিছু কিছু অংশ এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের লেখক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী সমগ্র উদ্ভিদ-জগৎকে সপুষ্পক ও অপুষ্পক এই দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। জোর দেওয়া হয়েছে সপুষ্পক উদ্ভিদের উপরেই। তিন ভাগে বিভক্ত উদ্ভিদ্-বিচারের প্রথম ভাগে সপুষ্পক উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, ফুল ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই ভাগে অপুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কার্যের কথা বর্ণিত। তৃতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় উদ্ভিদের জাতিবিভাগ। আলোচ্য গ্রন্থে এদেশে সহজেই পাওয়া যায়, এমন সব পরিচিত উদ্ভিদের উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য বিষয় বোঝান হয়েছে; গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এখানেই। কানাইলাল দে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত এক চিঠিতে উদ্ভিদ্-বিচারের প্রশংসা ক'রে মন্তব্য করেছিলেন, "This book has the rare merit of being intelligible to those who know no other language but the Bengali." এই গ্রন্থে উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক ইংরেজী নামগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ক শব্দের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। এই নাম নির্বাচনে বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমগ্র গ্রন্থে বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের একেবারেই অনুল্লেখ। উদ্ভিদ্-বিচার জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৩ সালে।

'বালকশিক্ষার্থ উদ্ভিজ্জবিদ্যা' ও 'উদ্ভিদ্-বিচার'-এর বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও অনুবাদিত হয়েছিল। মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া গেল হরিমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'উদ্ভিদ ব্যবচ্ছেদ দর্শন'-এ (১২৮৬)। এটি একটি নতুন ধরনের গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থের ন্যায় ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও অনুবাদিত হয় নি। স্বয়ং পর্যবেক্ষণের দ্বারা লেখক যা' জেনেছেন, এখানে তা' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে পাশ্চাত্য গ্রন্থকারদের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটেছে। তবে কোনোরূপ গোঁড়ামির পরিচয় গ্রন্থটিতে নেই। লেখক ভারতবর্ষীয় বৃক্ষলতাদি ব্যবচ্ছেদ ক'রে নিজে যা জেনেছেন, তা'রই বিবরণ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। 'উদ্ভিদ ব্যবচ্ছেদ দর্শন'-এ উদ্ভিদকোষ, মূল, কাণ্ড, ফুল, ফল, বীজ ইত্যাদি নিয়ে

আলোচনা রয়েছে। উদ্ভিদের অন্তরঙ্গ (Histology) ও বহিরঙ্গ (Morphology) উভয়বিধ আলোচনাই এতে আছে। সর্বত্রই এদেশে সচারাচর দৃষ্ট উদ্ভিদের কথা বলা হয়েছে। তা' ছাড়া সর্বত্র উদাহরণের ছড়াছড়ি। উদাহরণ নির্বাচনে এবং বর্ণনীয় বিষয়বস্তুতে লেখকের মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির রচনাভঙ্গীর প্রশংসা করা যায় না। ভাষা নীরস। কমা ও পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার যথাযথ নয়। রচনার নিদর্শন :—

> "বহির্বর্দ্ধিষ্ণু কাণ্ড ধরাতল রেখায় কাটিয়া দেখিলে ইহাদিগের ভিতর নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ; মাইজ, কাষ্ঠচক্র, পত্ররেখা, পত্ররেখার আচ্ছাদন ও ছাল। উদ্ভিদের প্রথম অবস্থায় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না কেবল কোশ স্তরে নির্ম্মিত প্রতিভাত হয়। পরে পত্র মধ্যে কাষ্ঠ উৎপাদক রস উৎপন্ন হইয়া উহা কাণ্ডের ভিতর আসিয়া ছেনির আকারে কাষ্ঠস্তর সকল উৎপাদন করে। পরে এই কাষ্ঠস্তর সকল কাণ্ডের কোশ স্তরকে তিন অংশে বিভাগ করে প্রথমতঃ কাণ্ডের কেন্দ্রস্থিত অংশ মাইজরূপে পরিণত হয় দ্বিতীয় ইহাদিগের বাহিরে যে অংশ থাকে তাহাতে ছাল উৎপন্ন হয় তৃতীয় ইহাদিগের মধ্যস্থিত যে সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশ থাকে তাহারা পত্ররেখা হইয়া থাকে।"

'উদ্ভিদ ব্যবচ্ছেদ দর্শন'-এর লেখক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণার রাহুতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে 'সাধারণী'তে কবিতা লিখে হরিমোহনের সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত। সোমপ্রকাশ, বান্ধব, নবজীবন প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে লিখতেন। কিছুকাল তিনি সোমপ্রকাশের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। 'কল্পদ্রুম' নামক পত্রিকাটির সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত গভর্ণমেন্টের রাজস্ব ও কৃষিবিভাগের কাজে যোগদান করেন।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ছাড়া উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে সর্বসাধারণের উপযোগী গ্রন্থ এই যুগে আর কেউ লিখেছেন বলে জানা যায় না। তবে উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক এই যুগে রচিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য, হুগলী কলেজের অধ্যাপক জর্জ ওয়াট্ রচিত ও হুগলী কলেজিয়েট্

স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক দ্বারকানাথ চক্রবর্তী অনুবাদিত 'উদ্ভিদবিদ্যার প্রথম সোপান' (১৮৭৬) এবং মিস্, ই. এ. ইওমান্ প্রণীত ও ব্রজেন্দ্রনাথ দে অনুবাদিত 'উদ্ভিদশাস্ত্রের উপক্রমণিকা' (১৮৭৬)।

দুই

বাংলা ভাষায় প্রাণী, শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার প্রসারে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির অবদান উপেক্ষণীয় নয়। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ইতিপূর্বে বিদ্যাহারাবলী ও পশ্বাবলী প্রকাশ ক'রে অস্থি, শারীর ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত করেছিলেন। এই যুগে ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকায় এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ভার্ণাকুলার লিটারেচার ডিপার্টমেণ্ট থেকে প্রকাশিত রহস্য-সন্দর্ভে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক অসংখ্য সরস প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল। ভার্ণাকুলার লিটারেচার ডিপার্টমেণ্ট ১৮৫১-১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হোল। সোসাইটির রিপোর্টে[১] বলা হয়েছিল, "The object of the society in the Vernacular Literature Department is to supply and distribute, at the lowest possible price, a healthy household literature in the Vernacular tongues." ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির ভার্ণাকুলার লিটারেচার ডিপার্টমেণ্টকে উঠিয়ে দেওয়া হোল। আর্থিক ক্ষতির জন্যে এবং গভর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ করবার ফলে এই বিভাগের সব কিছু কাজ সোসাইটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত করা হোল।

ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি প্রকাশিত ও কমিটির সহকারী সম্পাদক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত 'জীবরহস্য—১ম ভাগ' ১২৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। অনুবাদক-সমাজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড জে, লঙ্-এর প্রস্তাব অনুযায়ী 'জীবরহস্য—১ম ভাগ' অনুবাদিত ও মুদ্রিত হয়। ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৬৮ সালে। জীবরহস্যের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে লঙ্ কর্তৃক সংকলিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটি অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা

---

১ Calcutta School Book Society's 23rd Report (1862-'63).

অর্জন করে। জীবরহস্য—১ম ভাগের ১ম সংস্করণ মাত্র ছয় মাসের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার মূলে ছিল রচনারীতির সারল্য ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনবত্ব। তবে ভাষায় যায়গায় যায়গায় ব্যাকরণগত অশুদ্ধি রয়েছে। জীবরহস্য প্রধানতঃ বালকদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। বালকদের উপযোগী চিত্তাকর্ষক কয়েকটি প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে রয়েছে। তা' ছাড়া সরস উপমার সাহায্যে বক্তব্য বিষয়ের দুরূহতা লাঘবের প্রচেষ্টা দেখা যায়। বালকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এখানে যায়গায় যায়গায় সত্যঘটনাশ্রিত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ছাড়াও এই যুগে বালকদের পাঠোপযোগী প্রাণি-বিজ্ঞান রচনা ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সাতকড়ি দত্ত, তারকব্রহ্ম গুপ্ত ও গিরিশচন্দ্র তর্কালংকার। উল্লিখিত লেখকত্রয়ের গ্রন্থগুলো মূলতঃ পাঠ্য-পুস্তক। সকলেই প্রধানতঃ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আকৃতি, প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তা' ছাড়া রচনা বালকদের কাছে আকর্ষণীয় ক'রে তুলবার প্রচেষ্টা সকলের গ্রন্থেই দেখা যায়।

সাতকড়ি দত্তের 'প্রাণিবৃত্তান্ত—১ম ভাগ'-এর (১২৬৬) বিষয়বস্তু কৌণ্ট. ডি. বফন ও মেকেঞ্জি, হোর্ট, গোল্ড্স্মিথ প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে সংকলিত। কিছু কিছু অংশ প্যাটার্সন, মিলনি, এডোয়ার্ডস্ প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়। সাতকড়ি দত্ত ছিলেন কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠশালার শিক্ষক। তাঁকে গ্রন্থ-রচনায় সাহায্য করেছিলেন গোপালচন্দ্র বসু এবং বাঙ্গালা পাঠশালার শিক্ষক রামকমল বিদ্যাবাগীশ। ছোটদের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল বলেই জীববিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের তথ্যাদির এখানে একান্ত অভাব। এই গ্রন্থে প্রাণীদের আকৃতি নিয়ে আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত। গ্রন্থটি ছোটদের কাছে চিত্তাকর্ষক করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রাণীর প্রকৃতি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সাতকড়ি দত্তের ভাষা সরল। তাঁর রচনার একটি বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন প্রাণী নিয়ে আলোচনা করবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অপরাপর দেশে দৃষ্ট সেই ধরনের প্রাণীদের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাণিবৃত্তান্তের আলোচ্য বিষয় মেরুদণ্ডী প্রাণী। তবে গ্রন্থটির অধিকাংশ অংশ জুড়েই স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডীদের নিয়ে আলোচনা। পক্ষী, সরীসৃপ ও মৎস্য সম্বন্ধে আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ প্রকৃতির।

তারকব্রহ্ম গুপ্ত সংকলিত 'প্রাণিবিদ্যা—১ম ভাগ'-এও (সংবৎ ১৯১৮)

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের চারটি বিভাগ—মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির আলোচনা করা হয়েছে।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র তর্কালংকারের 'জীবতত্ত্ব' (১৮৬২) একটি সুলিখিত গ্রন্থ। গিরিশচন্দ্র ২৪ পরগণা জেলার দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে জীবতত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থটি প্রধানতঃ জেম্‌স্‌ ওয়েনের 'ষ্টেপিং ষ্টোন টু ন্যাচরল হিষ্টরি' অবলম্বন ক'রে রচিত হয়। পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নির্দেশে অর সাহেবের গ্রন্থ অনুযায়ী পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো অংশ সংশোধিত হয়েছিল। এখানে লেখক হুবহু অনুবাদ অপেক্ষা সারাংশ সংকলনের উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। সকল ধরনের জীবের বৃত্তান্ত লেখা লেখকের ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে প্রথম সংস্করণে মৎস্যের বৃত্তান্ত লিখে উঠতে পারেন নি। দ্বিতীয় সংস্করণেও তা' সম্ভবপর হয় নি। বালকদের সুবিধের জন্যে এই গ্রন্থে লেখক কতকগুলি লাটিন্‌ ও ইংরেজী শব্দ বাংলায় অনুবাদ ক'রে দিয়েছেন। অনুবাদিত নূতন শব্দগুলো দুর্বোধ্য হতে পারে ভেবে গ্রন্থটির শেষে নূতন শব্দগুলোর অর্থ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি সুপরিকল্পিত। এতে আলোচ্য জীবদের চারটি বর্গে বিভক্ত ক'রে বিভিন্ন জীবের শ্রেণী ও জাতিবিভাগ সম্বন্ধে সারগভ আলোচনা করা হয়েছে। একই বর্গের জীবদের আকৃতি ও প্রকৃতির সমধর্মিতা সম্বন্ধে আলোচনাও বেশ তথ্যপূর্ণ। রচনার প্রধান ত্রুটি, অনেক বাক্যে অযৌক্তিকভাবে কর্তৃপদের অনুল্লেখ।

এই যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত প্রাণিবিজ্ঞানের একটিও উচ্চাঙ্গের নয়। তথ্যসমাবেশ এবং পরিকল্পনার দিক থেকে এদের অধিকাংশই এমনকি স্কুলপাঠ্য ও বালকপাঠ্য প্রাণিবিজ্ঞান অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। এই যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রাণিবিজ্ঞান লিখেছিলেন মথুরানাথ বর্ম, কমলকৃষ্ণ সিংহ ও জগৎকৃষ্ণ সিংহ এবং জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী। বালকপাঠ্য গ্রন্থের মতো প্রাণিবিজ্ঞানের সামগ্রিক পরিচয় দেবার চেষ্টা এঁদের কেউই করেন নি। এঁদের সকলেই প্রাণিবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষকে আলোচনার জন্যে বেছে নিয়েছেন। এরূপ আলোচনায় রচনা সারগর্ভ ও বিস্তৃত হবার অবকাশ থাকলেও বিষয়বস্তুর সুপরিকল্পনার অভাবে এখানে তা' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

মথুরানাথ বর্ম প্রণীত 'স্তন্যপায়ী— ১ম ভাগ'-এ (১৭৮৫ শক) স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ত্বক, মস্তক, স্নায়ু, পরিপাকক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন ও নিশ্বাসক্রিয়া নিয়ে আলোচনা রয়েছে। মথুরানাথের রচনাভঙ্গীর প্রশংসা করা যায় না। ভাষা নীরস ও আড়ষ্ট।

রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ ও রাজা জগৎকৃষ্ণ সিংহ সংগৃহীত এবং ময়মনসিংহের সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের রুক্মিনীকান্ত ঠাকুর প্রকাশিত 'অশ্বতত্ত্ব—প্রথম খণ্ড' ১২৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কমলকৃষ্ণের পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ সিংহ। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কমলকৃষ্ণের জন্ম হয়। কমলকৃষ্ণ বিদ্যা ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তিনি অশ্বতত্ত্ব ছাড়াও আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।[২] অশ্বতত্ত্বের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সংস্কৃত, উর্দু ও ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। গ্রন্থরচনায় কোনোরূপ পরিকল্পনা নেই। অশ্ব সম্বন্ধে সব কিছুই এখানে বলবার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটির রচনাভঙ্গী নীরস ; ভাষা শ্রুতিকটু। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ একে বলা যায় না।

পাঁচ খণ্ডে 'জীবতত্ত্ব' রচনা করেন জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী। জীবতত্ত্বের বিভিন্ন খণ্ড ১২৮৯ থেকে ১২৯২ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ড 'মীনতত্ত্ব' নামে ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড যথাক্রমে 'গোতত্ত্ব' (১২৯০), 'সারমেয়তত্ত্ব' (১২৯১), 'মার্জারতত্ত্ব' (১২৯২) ও 'অশ্বতত্ত্ব' (১২৯২) নামে প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর কোনোটিকেই পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বলা যায় না। জ্ঞানেন্দ্রকুমারের রচনায় সুপরি-কল্পনার একান্ত অভাব। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচ্য জীব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব কিছু প্রসঙ্গই বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ এক একটি গ্রন্থ এক একটি জীবজগতের এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। প্রতি খণ্ডেরই অর্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে বিজ্ঞান-বহির্ভূত প্রসঙ্গ। জীবতত্ত্ব রচনায় বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ, রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম অভিধান, পুরাণ, বামাবোধিনী পত্রিকা ও বিভিন্ন বাংলা সাময়িক-পত্র থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় ও পঞ্চম খণ্ড রচনায় সাহায্য করেছিলেন কালীবর বেদান্তবাগীশ। জ্ঞানেন্দ্রকুমারের রচনাভঙ্গী নীরস। তা' ছাড়া বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারে তিনি কোনোরূপ সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করেন নি। যেমন, চতুর্থ খণ্ডে 'কম্পারেটিভ এনাটমি'

২ জীবনীকোষ—২য় খণ্ড, শশিভূষণ বিদ্যালংকার। পৃঃ ১৬।

(Comparative Anatomy), 'ইন্‌টেষ্টাইন' (Intestine) ইত্যাদি শব্দগুলো হুবহু ইংরেজী হরফেই ব্যবহৃত। জ্ঞানেন্দ্রকুমারের আলোচনা-ভঙ্গীরও প্রশংসা করা যায় না। বর্ণনার অন্তরালে অনেক ক্ষেত্রেই মূল বক্তব্য যেন হারিয়ে গেছে। এই যুগে শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তবে এদের অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক। সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর 'নরদেহ নির্ণয়' (১২৬৬) শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভবিষ্যৎ লেখক রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে শারীরবৃত্ত বিষয়ক বিভিন্ন ইংরেজী পুস্তক থেকে আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংকলিত হয়। গ্রন্থটির পরিকল্পনা সম্বন্ধে লেখক ভূমিকায় বলেছেন, "বাহুল্য বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল অংশ অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে বিবেচনা করিয়াছি, ও সকলেরই জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ভাবিয়াছি, তৎসমুদায় সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থ প্রচারিত করিলাম।" বস্তুতঃ, শারীরবিজ্ঞান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে নেই। পনেরটি অধ্যায়ে বিভক্ত 'নরদেহ নির্ণয়ে' 'অস্থি-সন্ধি-বন্ধনী', পেশী, স্নায়ু, রক্ত ও রক্তসঞ্চালন, শ্বাসক্রিয়া, পরিপাকক্রিয়া, ত্বক ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে কোনোরূপ টেকনিক্যালিটির মধ্যে না গিয়ে যথাসম্ভব সরস করে বক্তব্য বিষয় বোঝান হয়েছে। শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা নামই সর্বত্র ব্যবহৃত। রচনার নিদর্শন—

রক্ত-সঞ্চার।

"শরীরের কিছু কিছু ভাগ অবিরতই ক্ষয় পাইতেছে। শারীরবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কোন নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে শরীর সর্ব্বতঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, অর্থাৎ ঐ কালের পূর্ব্বে শরীরে যে পদার্থ থাকে, ঐ কালের পর তাহার আর কিছুই থাকে না; সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ তাহার স্থান অধিকার করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের মতানুসারে ঐ কাল সাত বৎসরব্যাপক গণিত ছিল; কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা উহার পরিমাণ ৩০ দিনের অনধিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, যেমন কোন পদার্থ দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হইলে জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, সেইরূপ, শরীরস্থ পদার্থ জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া নিয়তই স্বেদ ক্লেদাদির

আকারে শরীর হইতে অন্তরিত হইতেছে। যদি এইরূপ ক্ষতি ক্রমাগত হইতে থাকে, এবং অন্য কোন রূপে ক্ষতিপূরণ না হয়, তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যেই শরীর বিনষ্ট হইয়া যায়। অপিচ, জন্মাবধি শরীরের পরিণতাবস্থা পর্য্যন্ত আমাদিগের আকার ও ভার বৃদ্ধি হয়, অতএব, সেই সময়ে শরীরের প্রাত্যহিক ক্ষতি পূরিত হইবার উপায়মাত্র থাকিলে চলে না, তৎকালে যাহাতে ক্ষতিপূরণ ও শরীরের সম্বর্দ্ধন হয়, এরূপ বিধান থাকা আবশ্যক।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা দ্বারা শরীরের ক্ষতিপূরণ ও সম্বর্দ্ধন হয়, তাহাকে রক্ত কহে। রক্ত শরীরের সর্ব্বাবয়বে উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা পরিচালিত হয়। রক্তে যে পুষ্টিকর পদার্থ থাকে, যন্ত্র-বিশেষ দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য হইতে, ও নিশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা বহিঃস্থ বায়ু হইতে তাহা সংগৃহীত হয়।"

শারীরবৃত্ত বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর 'ফিজিয়োলজী বা শারীরবিধান-তত্ত্ব' (১৮৭২) নামক বিরাট গ্রন্থটি মূলতঃ মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লেখা। ক্যাম্বেল্ মেডিক্যাল স্কুলে শারীরবৃত্ত শিক্ষাদানের প্রস্তাব উঠলে মহেন্দ্রনাথ 'জীবিতের দেহতত্ত্ব' (১৮৮০) নামে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহারের কোনো নির্দিষ্ট রীতি মহেন্দ্রনাথের গ্রন্থে দেখা যায় না। কোথাও বা বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি বাংলায় অনুবাদিত হয়েছে; অনুবাদ কোথাও বা অর্ধেক; আবার কোথাও বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি হুবহু বাংলা হরফে ব্যবহৃত। ডাঃ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'নির্দ্দেশক এবং অস্ত্রসম্বন্ধীয় শারীর তত্ত্ব' (২য় খণ্ড, ১৮৭৩) নামক গ্রন্থটিরও একই ত্রুটি।

তিন

উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত নৃতত্ত্ব বিষয়ক একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'The evolution of man' বা 'মানবপ্রকৃতি'র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে বিভিন্ন জাতির মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এতে বিচিত্র জাতি-উপজাতির প্রকৃতি ও

আচার-আচরণ বর্ণনা ক'রে মানবপ্রকৃতির ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়েছে। ক্ষীরোদচন্দ্রের ভাষা প্রাঞ্জল। তবে প্রথম খণ্ডে রচনা অনেক যায়গাতেই তথ্যভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয় বিবর্তনবাদ। দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় ডারউইন, স্পেন্সার, হাক্স্‌লি, টিণ্ডাল প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কি বিবর্তনবাদের আলোচনায়, কি গ্রন্থটির শেষদিকে মনোবৃত্তির ক্রমবিকাশ বর্ণনায়, সর্বত্রই রচনা প্রাঞ্জল ও তথ্যপূর্ণ।

চার

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞানের সাধারণ প্রসঙ্গ (Sciences in general) নিয়েও গ্রন্থরচনার প্রচেষ্টা এই যুগে দেখা গেল। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ও 'চারুপাঠ'-এ অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান নিয়ে সর্বজনবোধ্য যে আলোচনা করলেন, তা' বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের জনপ্রিয়তায় সহায়তা করল। অক্ষয়কুমার দত্তের সমসাময়িক যুগে বিজ্ঞানের সাধারণ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা ক'রে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যকে যাঁরা জনপ্রিয় ক'রে তুললেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম।

বিদ্যাসাগর রচিত 'জীবনচরিত'-এ (১৮৫০) বৈজ্ঞানিক-জীবনীর উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। এই গ্রন্থে কোপার্নিকস, গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের জীবনী অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত। বাংলা গ্রন্থে বৈজ্ঞানিকদের জীবনচরিত আলোচনার প্রচেষ্টা বিদ্যাসাগর-রচিত জীবনচরিতেই প্রথম দেখা গেল। জীবনচরিতের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও অনুবাদিত। তবে অনেক স্থলেই অবিকল অনুবাদ করা হয় নি। মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ ক'রে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে, এই আশায় বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থটি রচনা করেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা এখানে নগণ্য। এই গ্রন্থে বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির বাংলা অনুবাদে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার সাহায্য নিয়েছেন। তা' ছাড়া এই অনুবাদ করা হয়েছে শব্দের অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। বিদ্যাসাগরের বিশ্রুত গ্রন্থ বোধোদয়ের (শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ) অধিকাংশ অংশ জুড়েই প্রাথমিক প্রকৃতির বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ। 'বোধোদয়' ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে

সংকলিত হয়েছিল। তবে বোধোদয় রচিত হয়েছিল মূলতঃ 'চেম্বার্স রুডিমেণ্টস্ অব নলেজ' নামক গ্রন্থের অনুকরণে।[৩] বোধোদয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর ঝরঝরে ভাষা এবং স্বল্পপরিসরের মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান প্রধান বিভাগের সমাবেশ। প্রাণিবিদ্যা, শারীরবৃত্ত ও উদ্ভিদবিদ্যা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক প্রসঙ্গ এতে আছে। বোধোদয়ের বৈজ্ঞানিক রচনাগুলিকে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-প্রবন্ধ বলা না গেলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় অধিকাংশ রচনায়ই সুস্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ 'চেতন পদার্থ' শীর্ষক রচনাটির নাম করা যায়। আলোচনা এখানে একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির এবং খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই আলোচনায় একটি সুপরিকল্পনার ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে একে একে জন্তু, পাখী, মাছ, সাপ, পতঙ্গ ও কীট নিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির আলোচনা করা হয়েছে। জীবজগতের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগের কথা লেখক আলোচনার প্রারম্ভে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও বিষয়বস্তুর এই বিন্যাস দেখে সহজেই বোঝা যায়, রচনার সময়ে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা সম্বন্ধে লেখক সচেতন ছিলেন। টেক্‌নিক্যালিটি এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস বোধোদয়ের রচনাগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন, স্বর্ণের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে 'আপেক্ষিক গুরুত্ব' কথাটির উল্লেখ পর্যন্ত করা হয় নি। শুধু বলা হয়েছে, "স্বর্ণ জল অপেক্ষা উনিশ গুণ ভারী।" তা' ছাড়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সম্পর্কে আলোচনায় শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক নামগুলি লেখক এড়িয়ে গেছেন। কোনো কোনো প্রসঙ্গে এদেশীয় রীতি অনুসৃত। যেমন, কাল এবং বস্তুর আকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনায়। বোধোদয়ের কোনো কোনো অংশ গল্পের মতো সুখপাঠ্য। 'মানবজাতি' শীর্ষক রচনাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বোধোদয় একটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গের অবতারণা এই গ্রন্থে নতুন নয়। ইতিপূর্বে রচিত রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে' এর ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু বোধোদয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে সরল ভাষায় বিজ্ঞানের অতি সাধারণ ও পরিচিত প্রসঙ্গগুলি লিপিবদ্ধ করলেন, তা' তখনকার যুগের বাংলা সাহিত্যে একেবারে অভিনব। বোধোদয়ের রচনার নিদর্শন ; 'কাচ' শীর্ষক রচনাটির একাংশ :—

---

৩ বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ১৬৯।

"কাচ অতি কঠিন, নির্ম্মল, মসৃণ পদার্থ, এবং অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ, অর্থাৎ অনায়াসে ভাঙ্গিয়া যায়। কাচ স্বচ্ছ, এ নিমিত্ত, উহার ভিতর দিয়া, দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে থাকিয়া, জানালা ও কপাট বন্ধ করিলে, অন্ধকার হয়, বাহিরের কোনও বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাসি বন্ধ করিলে, পূর্ব্বের মত আলোক থাকে, ও বাহিরের বস্তু দেখা যায়। তাহার কারণ এই, সাসি কাচে নির্ম্মিত; সূর্য্যের আভা, কাচের ভিতর দিয়া, আসিতে পারে, কিন্তু কাষ্ঠের ভিতর দিয়া, আসিতে পারে না।

বালুকা ও একপ্রকার ক্ষার, এই দুই বস্তু একত্রিত করিয়া, অগ্নির উৎকট উত্তাপ লাগাইলে, গলিয়া উভয়ে মিলিয়া যায়, এবং শীতল হইলে কাচ হয়। বালুকা যেরূপ পরিষ্কার থাকে, কাচ সেই অনুসারে পরিষ্কার হয়। কাচে লাল, সবুজ, হরিদ্রা প্রভৃতি রং করে; রং করিলে, অতি সুন্দর দেখায়।

কাচ অনেক প্রয়োজনে লাগে। সাসি, আরসি, সিসি, বোতল, গেলাস, ঝাড়, লণ্ঠন, ইত্যাদি নানা বস্তু কাচে প্রস্তুত হয়।

কাচ কোনও অস্ত্রে কাটা যায় না, কেবল হীরাতে কাটে। হীরার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ কাচের উপর দিয়া টানিয়া গেলে, একটি দাগ পড়ে। তার পর জোর দিলেই, দাগে দাগে ভাঙ্গিয়া যায়। যদি হীরার অগ্রভাগ স্বভাবতঃ সূক্ষ্ম থাকে, তবেই তাহাতে কাচ কাটা যায়। যদি হীরা ভাঙ্গিয়া, অথবা আর কোনও প্রকারে উহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়া, লওয়া যায়; তাহাতে কাচের গায়ে আঁচড় মাত্র লাগে, কাটিবার মত দাগ বসে না।"

বোধোদয়ের পরিকল্পনায় প্রধানতঃ ইউরোপীয় রীতি অনুসৃত হয়েছিল। বিষয়বস্তুও সংগৃহীত হয়েছিল বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে। তবে এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে বিষয়বস্তু নিয়েও সর্বজনবোধ্য বিজ্ঞানালোচনা এই যুগের কোনো কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, হুগলী জেলার ডুমুরদহ গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণচৈতন্য বসুর 'জ্ঞানরত্নাকর' (১৭৮০ শক)। গ্রন্থটি গদ্যে ও পদ্যে গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের

মাধ্যমে রচিত। জ্ঞানরত্নাকরের বিষয়বস্তু এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে সংকলিত। ন'টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ। আলোচনার প্রায় সর্বত্রই পৌরাণিক বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। তবে কদাচিৎ দু'এক যায়গায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির ভাষা নীরস।

এই যুগের কয়েকটি গ্রন্থে বিভিন্ন বস্তু ও শিল্প নিয়ে আলোচনা পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রামগতি ন্যায়রত্নের 'বস্তুবিচার' (সংবৎ ১৯১৫), উপেন্দ্রলাল মিত্র অনুবাদিত 'বস্তুপরিচয়' (১৮৫৯) এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'শিল্পিক দর্শন' (১৮৬০)। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী মডেল স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রচিত।[৪] 'বস্তুবিচার'কে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ বলা না গেলেও এতে কাচ, স্বর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে।

উপেন্দ্রলাল মিত্রের 'বস্তুপরিচয়' মেয়োর 'লেসেন্স্ অন্ থিংস্' গ্রন্থটির অনুবাদ। অনুবাদ হুবহু নয়। লেখক মেয়োর গ্রন্থের কিছু অংশ পরিত্যাগ ক'রে বাকী অংশ পরিবর্তিত আকারে অনুবাদ করেছেন। বস্তুপরিচয়ে বিভিন্ন পদার্থের ধর্ম, গুণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এখানে তথ্যসমাবেশ একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির। রামগতি ও উপেন্দ্রলালের গ্রন্থ দু'টি মূলতঃ বালকদের উদ্দেশ্যে রচিত। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের শিল্পিক দর্শনের শিল্প বিষয়ক প্রস্তাবগুলি সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী ক'রে লেখা।

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাকৃত তত্ত্ববিবেক—১ম ভাগ' ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ একে বলা না গেলেও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এতে কিছু কিছু রয়েছে। অবশ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখবেন বলে লেখক এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা করেন নি। জগদীশ্বরের মহিমাকীর্তনই তাঁর উদ্দেশ্য। তবে জগদীশ্বরের মহিমার বিরাটত্ব বোঝাতে গিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির যে সব প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, তা'তে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এসে গেছে। এই গ্রন্থে রয়েছে জল, সমুদ্র, বায়ু, উদ্ভিদ, আলোক, জীবশরীর ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা। ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ; তবে উচ্ছ্বাসের আধিক্য বড় বেশী।

অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া গেল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞানরহস্য'-তে (১৮৭৫)।

৪ ভূদেব চরিত—১ম ভাগ, পৃঃ ১৯৮

ভাষার লালিত্যে ও প্রকাশভঙ্গীর নৈপুণ্যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক উৎকর্ষতা লাভ করতে পারে তারই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বিজ্ঞান-রহস্যের প্রবন্ধগুলি।[৫]

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি বরাবরই বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণ ছিল। বাল্যকালে সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে গণিত ও ভূগোলেও তিনি পারদর্শিতা দেখান।[৬] গণিতে প্রায়ই তিনি ক্লাশের ছাত্রদের থেকে এগিয়ে থাকতেন।[৭-৮] কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে ছিল মনস্তত্ত্ব, প্রাকৃতিক ভূগোল, গণিত, শরীরবিজ্ঞান ইত্যাদি। এ ছাড়া বি. এ. পরীক্ষাদানকালেও বঙ্কিমকে গণিত, প্রাকৃতিক ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি পড়তে হয়েছিল। অতএব, পরিণত বয়সে যিনি বিজ্ঞানরহস্য লিখেছিলেন, বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি সুরু হয়েছিল ছাত্রজীবন থেকেই।

'চন্দ্রলোক' ছাড়া বিজ্ঞানরহস্যে সংকলিত সবগুলি প্রবন্ধই ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। চন্দ্রলোক ১২৮১ সালের চৈত্র সংখ্যা ভ্রমরে প্রকাশিত হয়। ১২৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'সর উইলিয়ম টমসন-কৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা' বিজ্ঞানরহস্যের প্রথম সংস্করণে স্থান পায়, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হয়।

বিজ্ঞানরহস্যের অধিকাংশ প্রবন্ধই জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে। তবে জীববিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও এতে আছে। প্রতিটি প্রবন্ধই সরস ও সারগর্ভ। গাণিতিক তথ্যাদি এবং বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে ওয়াকিবহাল ছিলেন তার নিদর্শন গ্রন্থটির সর্বত্রই পাওয়া যায়। যথাযথ তথ্যসমাবেশ এবং চিত্তাকর্ষক প্রকাশভঙ্গীর গুণে বিশ্বজগৎ ও জীবজগতের অনন্ত রহস্য এখানে দানা বেঁধে উঠেছে। গ্রন্থটির বিজ্ঞানরহস্য নাম এই কারণেই সার্থক। আলোচ্য গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু উদ্ধৃতি কোথাও প্রাধান্য লাভ করে নি। বিভিন্ন মতামত মিলিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজস্ব মতবাদ গড়ে তুলেছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর

৫ বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬ সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—২২ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) চতুর্থ সংস্করণ—পৃঃ ১০।

৭ বঙ্কিমচন্দ্র (২য় সংস্করণ—১৩২৩)—দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পৃঃ ১৫-১৬।

৮ বঙ্কিমজীবনী (৩য় সংস্করণ—১৩৩৮)—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৩২-৩৩।

এই মৌলিকতা প্রতিটি প্রবন্ধেরই বৈশিষ্ট্য। রচনার নিদর্শন ; 'আকাশে কত তারা আছে?' শীর্ষক রচনার একাংশ :—

"স্ট্রুব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশমণ্ডলে দুই কোটি নক্ষত্র আছে। মস্যুর শাকোর্ণাক্ বলেন, 'সর্ উইলিয়ম হর্শেলের আকাশসন্ধান এবং রাশিচক্রের চিত্রাদি দেখিয়া, বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সকলের তালিকার ভূমিকাতে যেরূপ গড়পড়তা করা আছে, তৎসম্বন্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহা গণনা করিয়াছি যে, সমুদায় আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।'

এই সকল সংখ্যা শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। যেখানে আকাশে তিন হাজার নক্ষত্র দেখিয়া আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচনা করি, সেখানে সাত কোটি সপ্তুতি লক্ষের কথা দূরে থাকুক, দুই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার।

কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্রসংখ্যার শেষ হইল না। দূরবীক্ষণের সাহায্যে গগনাভ্যন্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধূম্রাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। উহাদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল দূরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, বহুসংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্রপুঞ্জ। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ বলেন, যে সকল নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষে বা দূরবীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমুদায় একটি মাত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অন্যান্য নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দূর-দৃষ্ট তারা-পুঞ্জময়ী নীহারিকা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। সমুদ্রতীরে যেমন বালি, বনে যেমন পাতা, একটি নীহারিকাতে নক্ষত্ররাশি তেমনি অসংখ্য এবং ঘনবিন্যস্ত। এই সকল নীহারিকান্তর্গত নক্ষত্রসংখ্যা ধরিলে সাত কোটি সত্তর লক্ষ কোথায় ভাসিয়া যায়। কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্যবুদ্ধি চিন্তায় অশক্ত হইয়া উঠে। চিত্ত বিস্ময়বিহ্বল হইয়া যায়। সর্ব্বত্র-গামিনী মনুষ্যবুদ্ধিরও গগনসীমা দেখিয়া চিত্ত নিরস্ত হয়।

এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সূর্য্য। আমরা যে এক সূর্য্যকে সূর্য্য বলি, সে কত বড় প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা সৌরবিপ্লব সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। নাক্ষত্রিক জগৎমধ্যস্থ অনেকগুলি নক্ষত্র যে, এ সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহৎ, তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। এমনকি, সিরিয়স (sirius) নামে নক্ষত্র এই সূর্য্যের ২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহা স্থির হইয়াছে। কোন কোন নক্ষত্র যে, এ সূর্য্যাপেক্ষা আকারে কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহাও গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। এইরূপ ছোট বড় মহাভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট, মহাভয়ঙ্কর তেজোময় কোটি কোটি সূর্য্য অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতেছে। যেমন আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যকে ঘেরিয়া গ্রহ উপগ্রহাদি বিচরণ করিতেছে, তেমনি ঐ সকল সূর্য্যপার্শ্বে গ্রহ উপগ্রহাদি ভ্রমিতেছে, সন্দেহ নাই। তবে জগতে জগতে কত কোটি কোটি সূর্য্য, কত কোটি কোটি পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়া উঠিতে পারে? এ আশ্চর্য্য কথা কে বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে এক কণা বালুকা, জগৎমধ্যে এই সসাগরা পৃথিবী তদপেক্ষাও সামান্য, রেণুমাত্র,—বালুকার বালুকাও নহে। তদুপরি মনুষ্য কি সামান্য জীব! এ কথা ভাবিয়া কে আর আপন মনুষ্যত্ব লইয়া গর্ব্ব করিবে?"

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে রচিত আর একটি নতুন ধরনের গ্রন্থ রাম পালিতের 'প্রকৃতিতত্ত্ব' (১৮০০ শক)। এই গ্রন্থে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞান থেকে সুরু ক'রে জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রসঙ্গ কবিতায় লেখা। ঈশ্বরের মহিমার প্রতি লেখকের অপার বিশ্বাসের পরিচয় গ্রন্থটির সর্বত্রই সুস্পষ্ট। গ্রন্থরচনায় যায়গায় যায়গায় তত্ত্ববোধিনী, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকা থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। রচনারীতি সরল। উপমাপ্রয়োগে দু' এক যায়গায় কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঁচ

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন কলিকাতা ফ্রেনলজীক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হবার পর থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মস্তিষ্কবিদ্যা ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে

গ্রন্থরচনার সূত্রপাত হয়। বাংলা ভাষায় মনস্তত্ত্ব বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ 'চিত্তোৎকর্ষ-বিধান' দুই খণ্ডে ১৮৪৯—'৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল।[১] মনস্তত্ত্ব বিষয়ক এই যুগের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রাধাবল্লভ দাসের 'মনতত্ত্ব সারসংগ্রহ' (১২৫৬)। রাধাবল্লভ দাস কলিকাতা ফ্রেনলজীক্যাল সোসাইটির সভ্য ছিলেন। মনতত্ত্বসারসংগ্রহের বিষয়বস্তু 'ইশ্পর্জিম্ ও কোমব'-এর ফ্রেনলজী গ্রন্থ এবং ফ্রেনলজীক্যাল চার্ট থেকে সংগৃহীত ও অনুবাদিত হয়েছিল।

মনতত্ত্বসারসংগ্রহ তিন খণ্ডে বিভক্ত। ১ম খণ্ডে মনোবিদ্যার তাৎপর্য ব্যাখ্যা ক'রে দ্বিতীয় খণ্ডে মনের ইন্দ্রিয় সকলের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই বিবরণ দিতে গিয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে—কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। তৃতীয় খণ্ডে মনের বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-পদ্ধতি আলোচিত। গ্রন্থটি ক্ষুদ্রকায় হলেও সারগর্ভ ও সুপরিকল্পিত। কিন্তু ভাষা অনুবাদগন্ধী এবং নীরস প্রকৃতির।

রাধাবল্লভ দাসের মনতত্ত্বসারসংগ্রহ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা। প্রাচ্য পদ্ধতিতে মনোবিদ্যা লিখলেন রাধাপ্রসাদ রায়। রাধাপ্রসাদ রায়ের 'বিজ্ঞান কল্প লতিকা অর্থাৎ ন্যায় ও যুক্তি সংশ্লিষ্ট মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রস্তাব'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮০৪ শকাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মনোবিজ্ঞান বিষয়ক কতকগুলি প্রস্তাব পুরাণ, ইতিহাস ও বিভিন্ন কাব্য থেকে আহৃত উদাহরণ সহযোগে আলোচিত হয়েছে। বিজ্ঞান কল্প লতিকার ১ম ভাগে প্রধানতঃ মন ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা। ২য় ভাগে আলোচিত হয়েছে সাধারণ মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির একান্ত অভাব।

এইভাবে জীববিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায় ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মনোবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত হোল।

[১] **A Descriptive Catalogue of Bengali Works (1855)—J. Long.**

তৃতীয় পর্ব (আধুনিক যুগ)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও আধুনিক কাল

(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী থেকে জগদানন্দ রায়)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর হস্তলিপি (ছোটদের জন্যে লেখা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'গণিত' থেকে)। রামেন্দ্রবাবু ছোটদের জন্যে একটি গণিত লিখেছিলেন। গ্রন্থটি এখনও অপ্রকাশিত। এই অপ্রকাশিত গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি রামেন্দ্রসুন্দরের দৌহিত্র নির্মল চন্দ্র রায়ের কাছে রয়েছে। নির্মলবাবুর সৌজন্যেই মূল পাণ্ডুলিপিটি ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেছিলেন ইউরোপীয়েরা। কিন্তু ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানসাহিত্যের ভাষা ছিল কৃত্রিম ও জটিল। ভাষার কৃত্রিমতা দূর ক'রে এদেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে সর্বপ্রথম জনপ্রিয় ক'রে তুললেন অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক যুগে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের যাঁরা সমৃদ্ধি সাধন করলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম। বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানরহস্যে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হোল।

এক

পরবর্তী লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণকুশলতা ও মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া গেল, বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে তা' একক ও অভিনব। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বগুলোকে রামেন্দ্রসুন্দর যেরূপ সরল ও সহজ ক'রে সর্বসাধারণের কাছে পরিবেশন করেছেন, ইতি-পূর্বেকার আর কোনো গ্রন্থকারই তা' করেন নি। রচনা জটিল হয়ে পড়বার ভয়ে পূর্ববর্তী লেখকদের প্রায় সকলেই বিজ্ঞানের দুরূহ দিকগুলো এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানসাহিত্যের অধিকাংশই বিজ্ঞানের জটিল এবং রহস্যময় দিকগুলো নিয়ে। রচনা দুর্বোধ্য হয়ে পড়বার আশঙ্কায় বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বগুলো কোনো সময়েই তিনি এড়িয়ে যান নি, বরং সেই তত্ত্বগুলো সহজ ও মনোজ্ঞ ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে ব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বকে উপেক্ষা না করার কারণ, তিনি নিজে সে সকল তত্ত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক উইলিয়ম কিংডন ক্লিফোর্ড (১৮৪৫-১৮৭৯) সম্বন্ধে বার্টর্যাণ্ড রাসেল যে মন্তব্য করেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্বন্ধে এখানে তা' প্রযোজ্য—

> "Clifford possessed an art of clarity such as belongs only to a very few great men—not the

> pseudo-clarity of the popularizer, which is achieved by ignoring or glozing over the difficult points, but the clarity that comes of profound and orderly understanding, by virtue of which principles become luminous."[১]......

উপলব্ধির গভীরতার বলেই রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের দুরূহ তথ্যকে নিজস্ব চিন্তার আলোকে বিচার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিজ্ঞানে রামেন্দ্রসুন্দরের পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। শৈশবকাল থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। ছাত্রজীবনে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বি. এ. (অনার্স) পরীক্ষায় বিজ্ঞানে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। বৃত্তিলাভের পর কিছুকাল তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবোরেটরিতে বিজ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত থাকেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজের পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পদার্থবিদ্যার দুরূহ বিষয়গুলো গণিতের সাহায্য ছাড়াই ছাত্রদের তিনি বুঝিয়ে দিতেন। পরবর্তী-কালে রামেন্দ্রসুন্দর গণিতের সাহায্য না নিয়েই বিজ্ঞানের অতি জটিল তত্ত্বাদি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। গণিতকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের স্বরূপ দর্শন করার স্পৃহা রিপন কলেজে অধ্যাপনার সময় থেকেই তাঁর জীবনে সুপরিস্ফুট হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় গণিতের অভাব পূর্ণ করেছে দর্শন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় দর্শনেই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। অবশ্য দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয় অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। রিপন কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি কঠোর অভিনিবেশ সহকারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন পাঠ করেন।

১ The common sense of the exact sciences—W. K. Clifford. Edited by Karl Pearson (1945): Preface P. V.

কিন্তু দর্শন বা বিজ্ঞানের চেয়েও রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে আরও বড় সত্য হোল সাহিত্য। তিনি যখন যা' লিখেছিলেন তা'ই সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যপ্রতিভার বীজ রামেন্দ্রসুন্দরের রক্তের মধ্যেই ছিল। তাঁর জন্ম হয় এক সাহিত্যসাধক পরিবারে। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতামহ ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী কবি ও কাব্যরসিক ছিলেন। ব্রজসুন্দর 'মাধব-সুলোচনা' নামে একখানি গদ্যপদ্যময় নাটক ও 'স্বর্ণসিন্দুর সিংহ বা গৌরলাল সিংহ' নামে একখানি প্রহসন লিখেছিলেন। তা' ছাড়া শাস্ত্র ও পুরাণেও তাঁর অগাধ অনুরাগ ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা গোবিন্দসুন্দর 'বঙ্গবালা' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসটির ভূমিকা পয়ার ছন্দে লেখা। এ ছাড়া গোবিন্দসুন্দর 'দ্রৌপদীনিগ্রহ' নামে আর একটি ছোট নাটক লিখে অভিনয় করিয়েছিলেন। জ্যোতিষ ও গণিতেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের খুল্লতাত উপেন্দ্রসুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইংরেজী স্কুলে পড়বার সময় রামেন্দ্রসুন্দর নিজেও কবিতা লিখতেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পূর্বে তিনি লুকিয়ে বঙ্গদর্শন পড়তেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বরাবরই তাঁর প্রিয় ছিল।[২] অতএব পরবর্তীকালে যিনি 'দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা'[৩] বলে অভিহিত হয়েছিলেন তাঁর জীবনে দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার প্রস্তুতি চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম রচনা 'মহাশক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধটি ১২৯১ সালের পৌষ সংখ্যা 'নবজীবনে' প্রকাশিত হয়।[৪] এই পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রেই রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত। নবজীবনে তাঁর আরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'বিবর্ত্তন' (শ্রাবণ, ১২৯২), 'মহাতরঙ্গ' (অগ্রহায়ণ, ১২৯২), 'জড় জগতের বিকাশ' (আষাঢ়, ১২৯৩)। এই প্রবন্ধগুলো রামেন্দ্রসুন্দরের কোনো গ্রন্থে স্থান পায় নি। তবে বিশ্বজগতের অনন্ত রহস্য সাহিত্যসাধনার আরম্ভ থেকেই তাঁর মন-

২ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর—অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ১৬—১৭।

৩ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত। পৃঃ ১৩ [সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিত প্রবন্ধ]।

৪ রামেন্দ্রসুন্দর—আশুতোষ বাজপেয়ী ; পৃঃ ১৮২।

প্রাণকে আলোড়িত করেছিল; তার ইঙ্গিত এই সকল রচনায় পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলিতে ভাষার জাঁকজমক এবং কবিত্ব ও উচ্ছ্বাসের কিছুটা আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর প্রথম জীবনে কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'গমগমে ভাষার প্রভাব'—একথা রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই স্বীকার করেছিলেন। এই জমকালো ভাষার মোহ অল্পকালের মধ্যেই তিনি কাটিয়ে উঠলেন। রামেন্দ্রসুন্দর লেখনী ধারণ করার পর থেকেই বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে নব-যুগের সূত্রপাত। দর্শনের বেদীমূলে বিজ্ঞানকে বসিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে নতুন ক'রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর এই বিজ্ঞানদর্শন বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

বিজ্ঞান রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে পরম আনন্দের সামগ্রী। কিন্তু বিজ্ঞানের যান্ত্রিক দিক তাঁর কাছে কোনোদিনই বড় হয়ে ওঠে নি। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন,—

> "বৈজ্ঞানিক জড় জগৎকে স্বার্থসাধনে নিয়োগ করিয়া জীবন-যুদ্ধে সাহায্য লাভ করিতেছেন বটে; কিন্তু এই জগতের প্রতি চাহিয়া, এই জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিয়া, এই জগতের আঁধারে আলোক আনিয়া, এই জগতের অজ্ঞানাধিকৃত অংশে জ্ঞানের অধিকার প্রসার করিয়া বৈজ্ঞানিক যে পরম আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ডাইনামো ও মোটর, বৈদ্যুতিক ট্রাম ও বৈদ্যুতিক আলো, ষ্টীমশিপ আর এরোপ্লেন অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ।"

(জিজ্ঞাসা: মায়াপুরী)

দীর্ঘকাল ধরে রামেন্দ্রসুন্দর বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত সেই সকল দিক যে দিকগুলো জগৎ-তত্ত্বের মূল রহস্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত। বিজ্ঞানের যান্ত্রিক দিক নিয়ে তাঁর প্রবন্ধ নেই বললেই হয়।

রামেন্দ্র-সাহিত্যের বিরাট এক অংশ জুড়ে আছে বিজ্ঞান। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে প্রাধান্য লাভ করে নি। বিজ্ঞানকে বাহন মাত্র ক'রে তিনি জগৎ-রহস্যের মূল অনুসন্ধানে বেরিয়েছেন। বিজ্ঞান এখানে উপলক্ষ্য; লক্ষ্য জগৎ-রহস্যের মূল অনুসন্ধান। তবে যুক্তি

ও প্রমাণ ভিন্ন কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যকেই তিনি মেনে নেন নি। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন,

> "আমি বৈজ্ঞানিকতার স্পর্দ্ধা রাখি না ; কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিকতা-জীবী বিজ্ঞানভিক্ষু। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ ব্যাবহারিক বিদ্যায় আমার নিকট অগ্রাহ্য।"
>
> (বিচিত্র জগৎ : প্রাণময় জগৎ)

প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর এই আস্থা ছিল বলেই বিজ্ঞান এক এক যায়গায় রামেন্দ্রসুন্দরকে নিরাশ করেছে। বিজ্ঞানবিদ্যার গলদ তাঁর কাছে ধরা পড়ে গেছে।

বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানবিদ্যায় কৃতী ছাত্র হলেও রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক নন। পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের দ্বারা তিনি নতুন কিছু তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নি। আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে যুক্তি ও অনুভূতির মাপকাঠিতে তিনি দর্শন করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই বিজ্ঞানদর্শনের সাহায্যে যখনই তিনি জগৎতত্ত্বের মূল রহস্যের উত্তর খুঁজেছেন তখনই বিজ্ঞানবিদ্যার ফাঁকি তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। এই ফাঁকি প্রকট হয়ে উঠেছে যখন তিনি বেদান্তবাদী দার্শনিকের বিচারভূমিতে বসে বিশ্বজগতের রহস্য অনুসন্ধান করেছেন। জিজ্ঞাসার 'মায়াপুরী' নামক প্রবন্ধে এই মনোভাব সুস্পষ্ট ঃ—

> "এই কাল্পনিক জগৎ আমারই একটা কিম্ভূতকিমাকার খেয়াল হইতে উৎপন্ন এবং এই কাল্পনিক জগতের অন্তর্গত যাবতীয় ঘটনা আমারই খেয়াল হইতে উদ্ভূত ; আমি কিন্তু ঠিক উল্‌টা বুঝিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত করিয়া উহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ভাবিতেছি। এই বন্ধনের বৃত্তান্ত লইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্র ; কিন্তু এই বন্ধন যখন কাল্পনিক বন্ধন, তখন বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এইখানে গোড়ায় গলদ।"

বিজ্ঞানবিদ্যার এই গোড়ায় গলদ স্বীকার ক'রে নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর আলোচনায় এগিয়েছেন। তাই বহু ক্ষেত্রেই তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভিত্তিভূমি দর্শন।

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য, তাঁর দৃষ্টিকোণের অভিনবত্ব। কোথায় দাঁড়িয়ে, কি ভাবে দেখলে কোন জিনিসটি সহজে বিচারের সুবিধা, আশ্চর্য বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি তা' নির্ণয় করেছেন। তাঁর এই বিচারপ্রণালী থেকে যায়গায় যায়গায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বা attitude-এর পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, দর্শনের রাজ্যে তাঁর যাত্রা বিজ্ঞানের পথ বেয়ে।

দুই

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'তে (১৮৯৬) বিজ্ঞানেরই কলধ্বনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল কয়েকটি বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কেন্দ্র ক'রে। রামেন্দ্রসুন্দরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২), হেলম্‌হোল্‌ৎজ (১৮২১-১৮৯৪), কেল্‌ভিন্‌ (১৮২৪-১৯০৭) ও টমাস হেন্‌রী হাক্স্‌লী (১৮২৫-১৮৯৫) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যজাল একে একে উন্মোচিত ক'রে দিচ্ছে, এ সত্যটি রামেন্দ্রসুন্দরকে মুগ্ধ করেছিল। উল্লিখিত বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত তথ্যাদিকে ভিত্তি ক'রে আলোচ্য গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্বপ্রকৃতির কয়েকটি দিকের রহস্যযবনিকা উত্তোলিত করবার চেষ্টা করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগতে যাঁরা বিপ্লব এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য চার্লস্‌ রবার্ট ডারউইনের নাম। লামার্ক জানিয়েছিলেন, জৈবনিক পদার্থগুলো ক্রমবিবর্তনের পথে আভ্যন্তরিক শক্তির সাহায্যে, উত্তরাধিকারসূত্রে এবং পারিপার্শ্বিক থেকে প্রাপ্ত গুণগুলির সাহায্যে, প্রাণিদেহকে উন্নতিতে সাহায্য করছে। ডারউইন এই মতকে সমর্থন ক'রে একটি নতুন কথা বললেন,—জীবকোষগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে বেঁচে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে। ডারউইনের মতে, প্রাণীর যে যে অংশ ও গুণ তার পক্ষে হিতকর, প্রকৃতি কেবলমাত্র সেই সব অংশ ও গুণগুলিকে রক্ষা ক'রে থাকে। ফলে অধিক গুণসম্পন্ন প্রাণীরা অধিককাল জীবিত থাকে ও সন্তানসন্ততি রেখে যায়। আর যে ক্ষমতাহীন ও গুণহীন, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে সে বিলুপ্ত হয়। প্রকৃতির এই প্রক্রিয়াকেই

ডারউইন বলেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)।[৫] প্রধানতঃ এই দু'টি মতবাদকে ভিত্তি ক'রে প্রকৃতির 'মৃত্যু' শীর্ষক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর জীবতত্ত্ব ও জীবনপ্রবাহ সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন, প্রকাশভঙ্গীর স্বচ্ছতা ও চিন্তার গভীরতার দিক থেকে তা' অনন্য। সাধারণতঃ বার্ধক্যে উপনীত হলেই জীব ইহলোক পরিত্যাগ করে—এরই নাম মৃত্যু। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর যে বিজ্ঞাননির্ভর উপসংহারে পৌঁছেচেন তা' হোল এই—জীবের বীজদেহ অনশ্বর। তিনি বলতে চেয়েছেন, মৃত্যু বীজের ধর্ম নয়, আবরণশরীরের ধর্ম।

> "বীজ গৃহ ছাড়িয়া গৃহান্তরে যায়; জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া নূতন বসন পরিধান করে। পরিত্যক্ত গৃহ গৃহীর অমনোযোগে ভাঙ্গিয়া যায়; জীর্ণ পরিধান কালক্রমে ছিঁড়িয়া যায়।" (প্রকৃতি: মৃত্যু)

এর সঙ্গে গীতার শ্লোকের তুলনা করা যায়—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী ॥

পরবর্তীকালে 'জিজ্ঞাসা' ও 'বিচিত্র জগৎ' পর্বেও গীতার এই বাণী রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে।

ডারউইনের চিন্তাধারার প্রভাব 'প্রকৃতির মূর্তি' নামক প্রবন্ধেও সুস্পষ্ট। এই প্রবন্ধের শেষাংশে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বিভিন্ন জীবের কাছে প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে দেখা দেয় বটে, কিন্তু একই শ্রেণীর বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে প্রকৃতি প্রায় একই রূপে প্রতিভাত হয়। এর মূলে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা বলেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী ও দার্শনিক টমাস হেন্‌রী হাক্স্‌লীর মতবাদও তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। প্রকৃতির 'পৃথিবীর বয়স' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি হাক্স্‌লীর মতবাদকে সমর্থন না করলেও পদার্থবিজ্ঞানবিদ লর্ড কেল্‌ভিনের সঙ্গে হাক্স্‌লীর মতবাদের বিরোধটি অতি সুন্দর ও স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন।

৫ On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the struggle for Life (1859).

আকাশতরঙ্গ সম্বন্ধে ম্যাক্স্‌ওয়েল ও হার্ৎজের আবিষ্কার রামেন্দ্রসুন্দরকে আকৃষ্ট করেছিল। 'প্রকৃতি'র কয়েক যায়গাতেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। 'আকাশতরঙ্গ' প্রবন্ধে তরঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে প্রধানতঃ এঁদের আবিষ্কৃত তথ্যাদির উপর নির্ভর ক'রে। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০৯) সংযোজিত 'আলোকতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধেও ম্যাক্স্‌ওয়েল ও হার্ৎজের মতবাদের উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে।

বিশ্ববিশ্রুত জার্মান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হেলম্‌হোল্‌ৎজ-এর চিন্তাধারা প্রকৃতির রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছে। পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ 'সৌরজগতের উৎপত্তি' ও 'প্রাকৃত সৃষ্টি' নামক প্রবন্ধ দু'টিতে আলোচিত। 'প্রকৃতির মূর্ত্তি' নামক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ব্যক্ত প্রকৃতির স্বরূপ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা'তে হেল্‌মহোল্‌ৎজের দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছে।

বিখ্যাত ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক উইলিয়ম কিংডন ক্লিফোর্ডের চিন্তাধারা ও রচনাপদ্ধতির সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের মিল দেখা যায়। 'ক্লিফোর্ডের কীট' নামক প্রবন্ধে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ক্লিফোর্ডের মতবাদকেই প্রকারান্তরে সমর্থন করেছেন। অতএব, প্রকৃতির প্রবন্ধগুলি আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম জীবনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ডারউইন, ম্যাক্স্‌ওয়েল, হেলম্‌হোল্‌ৎজ, কেল্‌ভিন্‌, ক্লিফোর্ড প্রমুখ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকদের পথেই এগিয়েছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থেরই 'জ্ঞানের সীমানা' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার ও ব্যাখ্যায় তিনি যেন পরিতুষ্ট নন। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে গিয়ে তাঁর মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে, হেল্‌মহোল্‌ৎজের ব্যাখ্যায় তার উত্তর মিলছে না। রামেন্দ্রসুন্দর শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন—

> "জড়জগতের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র। এই কল্পনা জীবনরক্ষার একটা উপায় বা কৌশল। প্রকৃতি করাইতেছেন, তাই যথানিযুক্তবৎ করিতেছি।"

এখানে বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের (১৮২০-১৯০৩) সঙ্গে তাঁর চিন্তার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 'First Principles' (1862)

প্রথম খণ্ডে হার্বার্ট স্পেন্সারও বলতে চেয়েছেন, সর্বশেষ metaphysical প্রশ্নগুলোর কোনো সমাধান নেই এবং এক্ষেত্রে কোনো অজ্ঞাত শক্তি যা'কে জানবার কোনো উপায়ই নেই তা'কে স্বীকার করতে হয়।

জড়জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের এই যে সংশয়, পরবর্তীকালে রচিত জিজ্ঞাসার বীজ এরই মধ্যে নিহিত। বস্তুতঃ, এখান থেকেই বিজ্ঞানের আলোকোদ্ভাসিত রাজদরবার ছেড়ে বিজ্ঞানদর্শনের কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় পথে রামেন্দ্রসুন্দরের যাত্রা সুরু। কিন্তু যে পথেই তিনি গিয়েছেন সে পথেই সাহিত্যের রত্নবেদী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃতির রচনাগুলি বিজ্ঞান-সাহিত্যের রত্নবেদী। বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কেন্দ্র ক'রে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে গিয়ে আলোচ্য গ্রন্থে তিনি যা' সৃষ্টি করেছেন তা' হয়ে উঠেছে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য। রচনারীতির সারল্য ও উপমা নির্বাচনের অভিনবত্বের দিক থেকে বিচার করলে হাক্স্‌লীর সঙ্গে এদের তুলনা করা যায়। হাক্স্‌লীর ন্যায় রামেন্দ্রসুন্দরের উপমা নির্বাচনেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন ঃ—

> "একটি কয়লার পৃথিবী গড়িয়া ছত্রিশ ঘণ্টায় পোড়াইতে পারিলে যে পরিমাণ তাপ জন্মে, সূর্য্যপৃষ্ঠে প্রতি বর্গফুট হইতে প্রতি ঘণ্টায় সেই পরিমাণ তাপ নিয়ত বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"
>
> [প্রকৃতি : সৌরজগতের উৎপত্তি]

অন্যত্র,

> "এক ফোঁটা জলকে যদি কোনরূপে বড় করিয়া আমাদের পৃথিবীর সমান করিতে পারি,—যে পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল, সেই পৃথিবীর সমান করিতে পারি,—তবে সেই জলের ফোঁটায় এক একটি অণু এক একটা বেলের মত বড় দেখাইবে।"
>
> [প্রকৃতি : পরমাণু]

'On a piece of chalk' শীর্ষক প্রবন্ধের এক যায়গায় হাক্স্‌লী লিখেছেন ঃ—

> "If all the points at which true chalk occurs were circumscribed, they would lie within an irregular

oval about 3,000 miles in long diameter—the area of which would be as great as that of Europe, and would many times exceed that of the largest existing inland sea—the Mediterranean."*

প্রকৃতির যায়গায় যায়গায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের অন্তরালে বৈজ্ঞানিক সত্যকে নগ্নভাবে প্রকাশ ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর মানবজীবনের ট্র্যাজিডি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। যেমন,

"প্রকৃতি মাতার বহু যত্নে লালিত ও বহু যুগের প্রয়াসে গঠিত ও পুষ্ট মানুষের এই সুন্দর তনুখানি এত সহজে বাক্‌টিরিয়া কর্তৃক অঙ্গারাম্ল বায়ুতে পরিণত হইতে দেখিয়া প্রকৃতি মাতা কাঁদেন কি হাসেন বলিতে পারি না।"

[প্রকৃতি : ক্লীফোর্ডের কীট]

অন্যত্র,

"অদ্যাপি পুরাতনী সুরধুনীর সহস্রধারা 'গতপ্রাণী মৃতকায়া' সহস্রজীবের কাক-শৃগাল-পরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত করিয়া ভবিষ্যতের ভূতত্ত্ববিদের নিমিত্ত সেই স্তরমধ্যে সমাহিত করিয়া রাখিতেছে।"

[প্রকৃতি : পৃথিবীর বয়স]

তিন

'জিজ্ঞাসা'য় (১৯০৪) রামেন্দ্রসুন্দর এক নতুন জগতে পদক্ষেপ করেছেন। প্রকৃতিপর্বে নবাবিষ্কৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাহায্যে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁকে নিরাশ করেছে। জগৎ-রহস্য ভেদ করতে গিয়ে যখনই রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের কাছে উত্তর বা মীমাংসা খুঁজে পান নি তখনই উত্তর খুঁজেছেন দর্শনের কাছে। কিন্তু দর্শনবিদ্যার উত্তরও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁকে পরিতুষ্ট করতে পারে নি। তাই দেখা যায়, দর্শনের বিচার ও তর্কবহুল পথ ঘুরে

* Collected Essays (Vol. III) (1896)—T. H. Huxley– P. 3

আবার তিনি বিজ্ঞানবিদ্যার কাছেই মীমাংসার পথ খুঁজেছেন। এভাবে বিজ্ঞান থেকে দর্শনে এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে তাঁর চিন্তা আনাগোনা করেছে বারবার। আলোচ্য গ্রন্থেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিন্তু কি দর্শন, কি বিজ্ঞান—কোনো বিদ্যাই জগৎরহস্যের কিনারা করতে অক্ষম। জগৎরহস্যের গোড়ার কথা তাই আজও পর্যন্ত জিজ্ঞাসাই থেকে গেছে। আলোচ্য গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর জগৎতত্ত্বের এমন কয়েকটি গোড়ার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে প্রশ্নগুলো যুগে যুগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ভাবিয়ে তুলেছে। গ্রন্থটির জিজ্ঞাসা নামকরণের সার্থকতা এখানেই। আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ আলোচনা করলে জিজ্ঞাসাগুলোর উপস্থাপনে অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ বিচার ও আলোচনা ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর মূল সমস্যাগুলিকে উত্থাপন করেছেন। তাঁর এই আলোচনা থেকে সমস্যা সমাধানে নতুন কোনো পথের নির্দেশ না পাওয়া গেলেও যায়গায় যায়গায় মূল সমস্যার সমাধানকল্পে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলোকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) বৈজ্ঞানিক, (২) বিজ্ঞানদর্শন এবং (৩) দার্শনিক।

"বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত আমার দার্শনিক প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল" জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলোর ভিত্তি দর্শন হলেও বহু প্রবন্ধেরই অবয়ব বিজ্ঞান। তা' ছাড়া জিজ্ঞাসায় চারটি পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রয়েছে। অবশ্য বিশ্ব জগতের গোড়ার কয়েকটি সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের কৌতূহল এখানেও জিজ্ঞাসার রূপ নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 'মাধ্যাকর্ষণ' নামক প্রবন্ধটি। কোপার্নিকস, কেপ্‌লার, নিউটন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ মাধ্যাকর্ষণকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা' নিয়ে এখানে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ কেন হয়,—এ প্রশ্নের উত্তর নিউটন জানতেন না; কেউ-ই জানেন না। এখানেই লেখকের জিজ্ঞাসা। 'বর্ণতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে প্রাকৃতিক দ্রব্যে বিবিধ বর্ণের বিকাশের কয়েকটি প্রধান কারণ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই বর্ণবৈচিত্র্যের উপযোগিতা কি, তা'র যথার্থ উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্য বটে, বর্ণবৈচিত্র্যে জীবনযাত্রার ও জীবনরক্ষার সুবিধা হয় এবং আনন্দ লাভ করা যায়, কিন্তু মূল প্রশ্নের

(যেমন, আকাশের নীলবর্ণের উপযোগিতা) মীমাংসা এ থেকে হয় না। বস্তুতঃ, লেখকের জিজ্ঞাসার মূলসূত্র এখানেই। জিজ্ঞাসায় সংযোজিত 'উত্তাপের অপচয়' নামক রচনাটি একটি নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। জগৎ জুড়ে তাপের যে অপচয় ঘটছে তা'র অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্বন্ধে এখানে বিজ্ঞাননির্ভর আলোচনা করা হয়েছে। উত্তপ্ত পদার্থ থেকে শীতল পদার্থে যাবার সময় তাপকে কাজে লাগান যায়। কিন্তু সবটুকু তাপকে কাজে লাগান যায় না। তাপের সামান্য একটা অংশ মাত্র কাজে লাগে। অবশিষ্ট সমস্ত তাপটুকুই উত্তপ্ত পদার্থ থেকে শীতল পদার্থে চলে যায়। তাপকে কাজে লাগাতে গিয়ে এভাবে তা'র চরম অপব্যয় ঘটছে। তা' ছাড়া তাপের ধর্মই হোল, উষ্ণ যায়গা থেকে শীতল যায়গায় যাওয়া। এর ফলে এমন একদিন আসবে যেদিন বিশ্বজগতের সকল যায়গার উষ্ণতা হবে একই রকম। সেদিন বিশ্বজগতের প্রলয়। প্রকৃতিতেও অবিরাম তাপের অপব্যয় ঘটছে। প্রকৃতির তাপের অপব্যয় রোধ করবার উদ্দেশ্যে ম্যাক্স্‌ওয়েলের কল্পিত দুরূহ পরীক্ষাটিকে লেখক যেমন সরল উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করেছেন, বিশ্লেষণের দিক থেকে তা' অভিনব। 'নিয়মের রাজত্ব' শীর্ষক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনাভঙ্গীর সরসতা। বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য। প্রকৃতির রাজ্যে যা' কিছু দেখা যায়, তা'তেই প্রাকৃতিক নিয়ম বিদ্যমান, এই হোল লেখকের বক্তব্য। যা' কিছু আজও পর্যন্ত দেখা যায় নি, তা'তে নিয়ম নেই বলে মনে হতে পারে; কিন্তু যে কোনো সময় একটা অঘটন ঘটে পূর্ববর্তী নিয়মকে ভেঙ্গে দিতে পারে। লেখক বলতে চেয়েছেন, এক্ষেত্রে এই ঘটনা এবং আমাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা মিলিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের সংজ্ঞা নতুন ক'রে গড়ে নিতে হবে। বস্তুতঃ, কোনো স্থলে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখলে সেই ব্যতিক্রমকেই নিয়ম বলতে হয়। কাজেই বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য। আলোচ্য প্রবন্ধটি এবং অপরাপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিশেষত্ব সূক্ষ্ম রসবোধ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

কিন্তু জিজ্ঞাসার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-দর্শন। বিজ্ঞানদর্শন পর্যায়ের প্রবন্ধগুলিকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাধারা বিজ্ঞান থেকে দর্শন এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে গতিপথ পরিবর্তন করেছে। বিজ্ঞান ও দর্শন— উভয় বিদ্যার সাহায্যেই তিনি জগৎতত্ত্বের রহস্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

'সৌন্দর্য্যতত্ত্ব', 'সৃষ্টি', 'অমঙ্গলের উৎপত্তি', এবং 'সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি' এই শ্রেণীর প্রবন্ধ। বিজ্ঞানদর্শন পর্যায়ের অপর শ্রেণীর প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর নিজস্ব চিন্তাধারা ও বিচারবুদ্ধির মাপকাঠিতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে দর্শন করেছেন ; বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গলদ কোথায় তা' বের করতে চেয়েছেন। 'মায়াপুরী' ও 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' এই শ্রেণীর প্রবন্ধ।

'সৌন্দর্যতত্ত্ব' ও 'সৌন্দর্যবুদ্ধি' নামক দু'টি প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় মানুষের সৌন্দর্যবোধ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য লাভ করেছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রাধান্য দর্শনের। একই বিষয়কে এই দু'টি প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর দু'টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ অর্থাৎ আর্ট বা ঈস্‌থেটিক বৃত্তি। সৌন্দর্যবোধ মনুষ্যত্বের অঙ্গ। জীবনের স্থূল প্রয়োজনের জন্যে সৌন্দর্যের যে অংশটুকু আমরা গ্রহণ করি তা' প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে উৎপন্ন। কিন্তু সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের মাত্রা নির্ভর করে সৌন্দর্যবুদ্ধির তীক্ষ্ণতার উপর। সৌন্দর্যতত্ত্ব ও সৌন্দর্যবোধের ব্যাখ্যায় দর্শনশাস্ত্র লেখককে নিরাশ করেছে। তিনি উত্তর খুঁজেছেন ডারউইনের কাছে। কিন্তু ডারউইনের প্রাকৃতিক-নির্বাচন ও যৌন-নির্বাচনতত্ত্বকে বিশ্লেষণ ক'রে প্রকৃতির বর্ণবৈচিত্র্যের উত্তর মিলল বটে, কিন্তু সেই বর্ণবৈচিত্র্য মানুষের চোখে ভাল লাগে কেন, তা'র কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। রামেন্দ্রসুন্দর এবার উত্তর খুঁজলেন মনোবিজ্ঞানের কাছে। সৌন্দর্যবোধের দু'টি হেতু মনোবিজ্ঞান নির্দেশ করে। একটি 'অনুভূতির প্রবাহে আকস্মিকতার ও আতিশয্যের অভাব' ; অপরটি 'সহানুভূতি' ; অর্থাৎ, একের চোখে যা' ভাল লাগে অপরের চোখে তা' সুন্দর। এদিক থেকে বিচার করলে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন রক্ষার সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের সম্বন্ধ রয়েছে। আবার ব্যক্তি ও সমাজজীবনের পরিপুষ্টি প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল। এতএব, শেষ পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানের বিচারবহুল পথ ঘুরে এসে রামেন্দ্রসুন্দর আবার ডারউইনের ব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক নির্বাচনেই পৌঁছুলেন। কিন্তু যে সৌন্দর্যবোধ শুধুমাত্র তৃপ্তি আনয়ন করে, যা'র সঙ্গে ফলাফল বা লাভক্ষতির কোনো সম্বন্ধ নেই, প্রাকৃতিক নির্বাচনকে কেন্দ্র ক'রে সেই সৌন্দর্যবোধের কারণ নির্ণয় দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রবন্ধে লাভক্ষতিহীন এই সৌন্দর্যবোধের ব্যাখ্যাও প্রকারান্তরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যেই করেছেন। 'ইউটিলিটি'

বা লাভক্ষতিবিহীন সৌন্দর্যবোধের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখবৃত্তিও ক্রমশঃ বাড়ছে। যে মানুষ যত উন্নত তার দুঃখও তত বেশী। আবার দুঃখবৃত্তি যা'র যত প্রবল, সৌন্দর্যবোধের ক্ষমতাও তার তত বেশী। দুঃখবহুল সংসারে আনন্দ রচনা না করলে কোনো মানুষেরই চলে না। অপরপক্ষে এই আনন্দরচনাশক্তিই হোল সৌন্দর্যবুদ্ধি। দুঃখ থেকে নিবৃত্তি পাবার জন্যে, নিজের লাভের জন্যে মানুষ সৌন্দর্য রচনা করে। আবার যা'তে লাভ তা'ই প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে উৎপন্ন। অতএব, দেখা যাচ্ছে, রামেন্দ্রসুন্দর এখানে সৌন্দর্যতত্ত্বের উত্তর খুঁজেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাছে। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়—

> "যাহাতে লাভ, তাহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন, ইহা স্বীকার করিলে এখানেও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দোহাই দেওয়া যাইতে পারে।"

'ইউটিলিটি'র দোহাই দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে সৌন্দর্যবুদ্ধির মূল বলে দেখাতে চাইলেন। কিন্তু 'সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি সমগ্র বিষয়টিকে বিচার করেছেন একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রথমোক্ত প্রবন্ধের মতো এখানেও আলোচনা সুরু করা হয়েছে ডারউইনের মতবাদ থেকে। ডারউইন জানিয়েছিলেন, যৌন-নির্বাচন থেকে জীবদেহের সৌন্দর্যের উৎপত্তি হতে পারে। কিন্তু মানুষ যেখানে সেখানে 'অহেতুক সৌন্দর্য্য' আবিষ্কার করে। কবি ও ভাবুকদের মধ্যে এই প্রবৃত্তি সবচেয়ে বেশী। এই শ্রেণীর অহেতুক সৌন্দর্যবুদ্ধি জীবনরক্ষায়ও কোনোরূপ আনুকূল্য করে না, বরং প্রতিকূল হয়ে থাকে। এই অকারণ সৌন্দর্যপ্রিয়তা জীবনসংগ্রামেও সাহায্য করে না। অতএব, কোনোরূপ প্রাকৃতিক কারণ থেকে এই সৌন্দর্যবোধের উৎপত্তি হয়েছে, এরূপ বলা চলে না। অভিব্যক্তিবাদের সমর্থক ওয়ালাশও একথা মেনে নিয়েছিলেন। কোনো কোনো জীবতাত্ত্বিকের মতে এই অহেতুক সৌন্দর্যপ্রিয়তা 'জাতীয় অভিব্যক্তির একটা আকস্মিক আগন্তুক আনুষঙ্গিক ফল মাত্র'। প্রাকৃতিক নির্বাচনে জীবের অভিব্যক্তির সময় জীবনরক্ষায় অনুকূল ধর্মগুলি বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন দু' একটি ধর্মও উৎপন্ন হতে পারে, জীবনরক্ষায় যাদের কোনো উপযোগিতা নেই। সৌন্দর্যবুদ্ধিও এরূপ একটা আনুষঙ্গিক ফললাভ মাত্র। এ থেকে লাভ

কিছুই নেই; তবে এর সাহায্যে বিনা কারণে খানিকটা আনন্দলাভের উপায় ঘটেছে। এই অকারণ আনন্দলাভের উপযোগিতা রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্টতঃই এখানে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্বে তিনি তা' স্বীকার করেছিলেন। এখানেই উভয় প্রবন্ধের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য।

'সৃষ্টি' নামক প্রবন্ধে সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রচলিত দার্শনিক মত কি তা' বুঝিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন। সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি প্রচলিত মতবাদ হোল—স্রষ্টার ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি। স্রষ্টারই বিধানে জগৎ চলছে। এই মতবাদটিকে অনেকে মেনে নিলেও জগতের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। তা' ছাড়া জগৎসৃষ্টির উপকরণ কোথা থেকে এল, তা'র উত্তর কোনো শাস্ত্রের কাছেই পাওয়া যায় না। তবে উপকরণ দেওয়া থাকলে জগৎ কিভাবে নির্মিত হোল বিজ্ঞান তা'র উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে। প্রাকৃতিক নিয়ম, একদল লোক যা'কে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বলে থাকে, বিজ্ঞান তা'রই সাহায্যে জগতের নির্মাণ-প্রণালী ও ক্রিয়া-প্রণালী বোঝাবার চেষ্টা করেছে। প্রাকৃতিক নিয়মগুলো পুরোপুরি জানলে জগৎ কিভাবে চলছে এবং কিভাবে চলবে, বৈজ্ঞানিক তা' বলে দিতে পারবেন। এই হোল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, আমারই চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমার জগৎ ক্রমে বিকাশ বা অভিব্যক্তি লাভ করছে। আমি বাহ্যজগতের কিছু অংশকে একসঙ্গে যথাস্থানে স্থাপিত ক'রে দেখি; এই হোল দেশব্যাপ্তি। আর কিছু অংশকে যথাকালে পর পর বিন্যস্ত ক'রে দেখি; এই হোল কালব্যাপ্তি। প্রকৃতিতে যে নিয়মের শৃঙ্খলা তা'রও প্রতিষ্ঠাতা আমিই। আমিই নিজের সুবিধার জন্যে এই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছি। নিয়ম প্রতিষ্ঠার এই সফলতা ধরেই আমার আত্মবিকাশের পরিমিতি। এই আত্মবিকাশের নামই বিজ্ঞানচর্চা। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, জগৎ অনাদি নয়; আবার কালও অনন্ত নয়। জগতের যেটুকু অংশ যখন আমি দেখছি, সেটুকুর অস্তিত্বই তখন আমার কাছে সত্য। আবার কালের যেটুকু অংশের সঙ্গে আমার পরিচয়, সেটুকুই আমার কাছে সত্য। এখানে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়,

"অনাদি অনন্ত এই সকল দীর্ঘ বিশেষণ কবিকল্পনা, বাক্যালঙ্কার; উহা কাব্যে শোভা পায়; বিজ্ঞানে উহাদের অস্তিত্ব নাই।"

জিজ্ঞাসার 'অমঙ্গলের উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধেও ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে। মঙ্গলের উৎপত্তি বোঝা যায়, কারণ, ঈশ্বরের এই উদ্দেশ্য। কিন্তু অমঙ্গলের উৎপত্তি বোঝা দুরূহ। ঈশ্বর অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা বললে তাঁর দয়াময়ত্বে সন্দেহ দেখান হয়। অমঙ্গল সৃষ্টির জন্যে শয়তানকে দায়ী করলে ঈশ্বরের করুণাময়ত্বে সন্দিহান হতে হয়। আবার এজন্যে মানুষকেও দায়ী করা যায় না। এদিকে দায়িত্বশূন্য ইতর জীবের যাতনা-ভোগের উদ্দেশ্যও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বলতে হয়, 'অমঙ্গলের উদ্দেশ্য মঙ্গলাত্মক', স্থূলদৃষ্টিতে যা' অমঙ্গল, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তা'ই মঙ্গল। এই যুক্তিকেই রামেন্দ্রসুন্দর এখানে মেনে নিয়েছেন। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদকে ভিত্তি ক'রে তিনি বলতে চেয়েছেন, জীবসমাজে যে ভয়াবহ জীবন-সংগ্রাম, সবলের অত্যাচার, দুর্বলের নিগ্রহ ও মৃত্যু পরিলক্ষিত হয়, আপাতঃদৃষ্টিতে তা' অমঙ্গল বলে মনে হলেও এর মূলে মঙ্গলই নিহিত। কারণ, অযোগ্যের বিনাশের মধ্য দিয়েই জীবসমাজের অভিব্যক্তি ঘটছে। জীবের উন্নতির মূলে রয়েছে এই অভিব্যক্তি। এরই ফলে নব নব বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের বিকাশ। ধার্মিক ও দার্শনিকেরা বলে থাকেন, মঙ্গলের রাজ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব নেই। জীব নিজের মায়া বা ভ্রান্তিবশতঃই অমঙ্গলের অস্তিত্ব কল্পনা ক'রে বিভীষিকা দেখে। জীব যা'কে অমঙ্গল বলে ভাবছে, আসলে তা' মঙ্গল; যা'কে দুঃখ বলে ভাবছে, আসলে তা' হোল আনন্দ। রামেন্দ্রসুন্দর এই দার্শনিক মতবাদকে মেনে নেন নি। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, জীবের উন্নতি বা অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও দুঃখ, মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ের মাত্রাই বাড়ছে। এক-কে ছেড়ে অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এ জগতে মঙ্গল ও অমঙ্গলের আবির্ভাব একই ক্ষণে। জীবনের সঙ্গে মঙ্গল ও অমঙ্গলের নিবিড় সম্বন্ধ।

'মায়াপুরী' ও 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' নামক দু'টি প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে দর্শন করেছেন। এখানে তিনি দার্শনিকের বিচারভূমিতে দাঁড়িয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। 'মায়াপুরী' ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯১৪) পুনর্মুদ্রিত হয়। 'মায়াপুরী' রামেন্দ্রসুন্দরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর সমগ্র বিজ্ঞানদর্শনের স্বরূপ এই প্রবন্ধে উদঘাটিত। এই প্রবন্ধেরই কয়েকটি 'আইডিয়া' পরবর্তীকালে 'বিচিত্র জগৎ'-এর রচনাগুলিতে পরিণতি

লাভ করেছে। বিশ্বজগতের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই ; এ জগৎ জীবের খেয়াল থেকে উৎপন্ন। এই দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখেছেন বলেই বিশ্বজগৎ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এক বিরাট মায়াপুরী। বিজ্ঞানের যাবতীয় কারবার এই মায়াপুরী বা কাল্পনিক জগৎ নিয়ে। অতএব, বিজ্ঞানশাস্ত্রের এখানে গোড়ায় গলদ। বিজ্ঞানের এই গলদ স্বীকার ক'রে নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর আলোচনায় এগিয়েছেন। এ আলোচনা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। বস্তুতঃ, দর্শনের ভিত্তির উপর সমগ্র রচনাটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বিজ্ঞানই আলোচ্য প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য। প্রথমে বাহ্যজগতের সঙ্গে জীবদেহের দ্বৈত সম্পর্ক মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, একদিকে বাহ্যজগৎ সর্বক্ষণ জীবকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় আছে। অপরদিকে বাহ্যজগৎ থেকে উপাদান নিয়েই জীব আপনাকে পুষ্ট করছে। অতএব, বাহ্যজগৎ একদিকে যেমন পরম শত্রু, অপরদিকে তেমনি পরম মিত্রও। জীবদেহের সঙ্গে বাহ্যজগতের সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে জীবদেহের গঠনবৈচিত্র্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সরস আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ জীববিজ্ঞানীর মতো রামেন্দ্রসুন্দরও জীবদেহকে যন্ত্র হিসাবেই দেখেছেন। তা' সত্ত্বেও জীবদেহ নয়, জীবন এবং জীবনপ্রবাহই রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বড়। বিভিন্ন রচনায় তিনি বার বার বলতে চেয়েছেন, সন্তানোৎপাদনের মধ্য দিয়ে বীজের নবজীবন আরম্ভ হয় ; ব্যক্তি যায়, কিন্তু জাতি থাকে। আবার তা'ই যদি হবে তো এককালে যে সব জীব পৃথিবীতে আদৌ ছিল না, কালক্রমে তা'রা কিভাবে আবির্ভূত হোল ? রামেন্দ্রসুন্দর এ প্রশ্নেরও জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন ডারউইনের জীবতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনের ত্রুটি কোথায়, এই প্রসঙ্গে তা' নির্দেশ করা হয়েছে। জীবনযুদ্ধে জীব অবিরাম হেয় বর্জন ও উপাদেয় গ্রহণ করছে। জীবের কাছে যা' উপাদেয়, তা' তা'কে সুখ দেয়। এ হোল প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই পরোক্ষ ফল। কিন্তু এই হেয় বর্জন ও উপাদেয় গ্রহণ ক্ষমতায় যে অসঙ্গতি রয়েছে, রামেন্দ্রসুন্দর তা' অতি প্রাঞ্জলভাবে দেখিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, এমন অনেক জিনিস আছে যা' জীবনসমরে প্রতিকূল। অথচ স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও জীব সেই জিনিসগুলিকে গ্রহণ করতে চায়। এখানেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের অপূর্ণতা। আলোচ্য প্রবন্ধে জীবের সংস্কার ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সারা জীবনব্যাপী জীবদেহের

উপর যে সকল আক্রমণ চলছে, তা' থেকে পরিত্রাণ পেতে হোলে সহজ সংস্কারই একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু এমন সব ঘটনাও ঘটে থাকে, জীবের সহজাত সংস্কার যেখানে কোনোরূপ লক্ষ্য নির্দেশ করতে পারে না। আপাততঃ সুখ বলে জীব যা'কে গ্রহণ করে, পরিণামে তা' দুঃখ এনে দেয়। এখানেও লেখক প্রাকৃতিক নির্বাচনের অসম্পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেখানে সহজ সংস্কার পথ দেখায় না, সেখানে 'বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তি' জীবকে সাহায্য করে। এই বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতায় মানুষ জীবজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিবৃত্তি আবার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবার সুযোগ থাকায় বিজ্ঞানের শক্তিও দিন দিন বাড়ছে। বৈজ্ঞানিক আবার নিজে যা' দেখছেন, তা'ই লিপিবদ্ধ করছেন। কিন্তু বিশ্বজগতের অতি সামান্য অংশই বৈজ্ঞানিকের নজরে পড়ে। জগৎতত্ত্বের কয়েকটি গোড়ার প্রশ্নের সদুত্তর আজও পর্যন্ত বিজ্ঞান দিতে পারে নি। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়,

> "জীবনরহিত জড় দ্রব্যে কখন্ কিরূপে জীবনের আবির্ভাব হইল, জীবের মধ্যে কিরূপে সুখ-দুঃখের বেদনা-বোধ আবির্ভূত হইল, কিরূপে তাহার মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইল, চেতন জীব কিরূপে আবার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি লাভ করিল, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। ডারুইনবাদী দেখাইয়াছেন, জীবের জীবন-রক্ষার্থ এই সকল ব্যাপারের আবশ্যকতা আছে; অতএব জীব যখন জীবন ধারণ করে, তখন তাহাতে এই এই সকল ব্যাপার ঘটিলে ভাল হয় ও ফলেও তাহা ঘটিয়াছে। কিন্তু জগদ্‌যন্ত্রকে যন্ত্র হিসাবে দেখিলে ঐ ঐ ব্যাপারের কিরূপে আবির্ভাব হইয়াছে, -তাহার সম্যক্ উত্তর পাওয়া যায় নাই।"

'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' শীর্ষক প্রবন্ধে বিজ্ঞানবিদ্যার ত্রুটি আরও স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, বিজ্ঞান যে সব জাগতিক সত্য নিয়ে কারবার করে এবং যা'দের নিরপেক্ষ সত্য বলে নির্দেশ করে, প্রকৃতপক্ষে তা'রা মনঃকল্পিত সত্য। বিজ্ঞানবিদ্যায় আমরা কেবল কতকগুলো মনগড়া পুতুল তৈরী ক'রে প্রতিষ্ঠা করেছি এবং ঢাকঢোল বাজিয়ে তা'দের পূজা করছি—এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রথমেই

রামেন্দ্রসুন্দর সত্যের শ্রেণীবিভাগ ক'রে নিয়েছেন। কতকগুলো সত্য আমরা মানতে বাধ্য। এরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আর কতকগুলো সত্য প্রত্যক্ষ-প্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে আমরা মেনে থাকি। পদার্থবিষ্ঠার সাহায্য নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমে দেখিয়েছেন, দুই দ্রব্য প্রত্যেকে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হলে তা'রা পরস্পর সমান হবে, ইউক্লিডের শাস্ত্রে এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হলেও সকল ক্ষেত্রে ও সকল শাস্ত্রে তা' স্বতঃসিদ্ধ নয়। দৈর্ঘ্যের তুলনা-মূলক বিচারেও এ নিয়মের ব্যত্যয় হতে পারে। লেখকের মতে, স্থানভেদে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনই এজন্যে দায়ী। বস্তুতঃ এখানেও রামেন্দ্রসুন্দর ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের মূল আকর্ষণ ক'রে যুক্তির অণুবীক্ষণে সেই স্বতঃসিদ্ধকে বিচার করেছেন। এরপর ভার (Weight) ও বস্তুর (Mass) পার্থক্য আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন, বস্তু অল্প হলে ভার অল্প হয়, এটাও পরীক্ষালব্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়। জড় পদার্থের উৎপত্তি ও ধ্বংস নেই, একথাও স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান জড়কে অবিনাশী আখ্যা দিয়েছিল। উদাহরণ সহযোগে আলোচনা ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানবিষ্ঠার এই সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি প্রদর্শন করেছেন। যে ধাক্কা দেবার ও ধাক্কা খাবার শক্তি দিয়ে জড় পদার্থের জড়ত্ব বা বস্তুর নিরূপণ হয়, তড়িতের সেই শক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। তড়িতের কণিকাগুলি যতক্ষণ স্থির থাকে, ততক্ষণ তাদের জড়ত্ব থাকে না ; যখন বেগে চলে তখনই জড়ত্ব জন্মে। বেগ যত বাড়ে, জড়ত্বও তত বেড়ে যায়। অতএব, বস্তুর পরিমিতি যখন বেগের উপর নির্ভরশীল তখন জড় পদার্থের উৎপত্তি বা ধ্বংস নেই, একথা বলা চলে না। কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক জড় পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না। তাঁরা শক্তিকে স্বীকার করেন। শক্তি অর্থে কাজ করবার শক্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্রও শক্তির অবিনাশিতা বা শক্তি নানাবিধ রূপ গ্রহণ ক'রে থাকে, একথা স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর প্রমাণ করতে চেয়েছেন, 'অতি সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে' এটিও একটি 'পরীক্ষালব্ধ সত্য'। এতে কোনোরূপ 'স্বতঃসিদ্ধতা' নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সাহায্যে রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। এদের সাহায্যে বিশ্ব-জগতের কিয়দংশ মাত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি। জড় ও শক্তি আমাদেরই

মনগড়া পদার্থ মাত্র। একটা সংকীর্ণ অর্থে আমরা এদের অবিনাশিতা কল্পনা ক'রে নিয়েছি। বিজ্ঞান যে বিশ্বজগতের কল্পনা ক'রে নেয়, বাস্তব জগতে তা'র কোনো অস্তিত্ব নেই। বৈজ্ঞানিকের এই জগৎ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে 'বিচিত্র জগৎ'-এ।

'জিজ্ঞাসা'র কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এসে গেছে। 'সুখ না দুঃখ?', 'সত্য', 'অতিপ্রাকৃত—প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব', 'কে বড়?' ও 'পঞ্চভূত' এই শ্রেণীর প্রবন্ধ। দার্শনিক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অবতারণা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কেননা, দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সংমিশ্রণ সকল যুগেই ঘটে থাকে। বিজ্ঞানবিদ্যায় কোনো পরিবর্তন সূচিত হলে দর্শনেও তা'র প্রতিক্রিয়া হয়। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান-সাহিত্যিক স্যার জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ বলেছেন,

> "The philosophy of any period is always largely interwoven with the science of the period, so that any fundamental change in science must produce reactions in philosophy."[৭]

রামেন্দ্রসুন্দরের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। তাঁর বহু দার্শনিক প্রবন্ধেই বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সাহায্যে মূল সমস্যার উপর আলোকসম্পাত করতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'সুখ না দুঃখ?' শীর্ষক প্রবন্ধটি। এ জগতে সুখ বেশী না দুঃখ বেশী—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লেখক প্রথমেই ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। এরপর শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যানের দুঃখবাদ, দার্শনিকদের মুক্তিবাদ এবং কবিদের পরস্পরবিরোধী মতবাদ আলোচনা ক'রে লেখক যে জিজ্ঞাসাটি উত্থাপিত করেছেন তা'তে দুঃখের দিকেই 'বেশী টান' দেখান হয়েছে বলে মনে হয়।

'সত্য' নামক প্রবন্ধটিতে দু' এক যায়গায় দার্শনিক বক্তব্যের মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক মতবাদ এসে গেছে। এই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা এক হিসাবে সত্য। তাই বলে প্রকৃতি যে চিরকাল একই নিয়মে চলবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমাদের ভূয়োদর্শন

৭ **Physics & Philosophy (1948)—Sir James Jeans : P. 2.**

অনুযায়ী সত্যের মূর্তিও পরিবর্তিত হয়। এ জগতে নিরপেক্ষ বা ধ্রুবসত্য হোল 'আমি আছি।' আমার অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে আরও যে কয়েকটি সত্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তারা হোল আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক সত্য। আবার ব্যবহারিক সত্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় হোল প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা। তাই বলে প্রকৃতি যে চিরকাল একই নিয়মে চলবে তা'ও আমরা বলতে পারি নে। তবে নিয়মের ব্যতিক্রম যখন হবে তখন জগৎযন্ত্র আর একটা ব্যাপকতর নিয়মের অধীন হবে মাত্র। আলোচ্য প্রবন্ধে দার্শনিক-কল্পনা প্রাধান্য লাভ করলেও যুক্তিজাল বিস্তারের ক্ষেত্রে যায়গায় যায়গায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সমাবেশ ঘটেছে।

'অতিপ্রাকৃত' বিষয়ক প্রস্তাব দু'টিতে বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে রামেন্দ্রসুন্দর অতিপ্রাকৃতের মূল অনুসন্ধান করেছেন। প্রথম প্রস্তাবে তিনি বলতে চেয়েছেন, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসও কমে আসছে। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, কোনো ঘটনাকে আমরা নিয়মছাড়া বলে থাকি আমাদের অজ্ঞতাবশে। আসলে সে ঘটনা নিয়মছাড়া নাও হতে পারে। কারণ, বিশ্বব্যাপী প্রকৃতির যেখানে যা' কিছু ঘটছে সবই প্রাকৃত। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ঘটনার কার্যকারণসম্বন্ধ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। তাঁর মতে, অতিপ্রাকৃত বলে কোনো কিছু থাকতেই পারে না। যে সকল ঘটনাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলে থাকি, মানুষের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসবে বলে তিনি মনে করেন। এখানে রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিভঙ্গী আশাবাদী বৈজ্ঞানিকের। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 'অতিপ্রাকৃত—দ্বিতীয় প্রস্তাব'-এ আরও সুস্পষ্ট। বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে অতিপ্রাকৃতের কারণ নির্ণয় করতে চেয়েছেন এবং বলেছেন, মানুষ জীবনসংগ্রামে সুবিধার জন্যে স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আপনার কল্পিত জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা যখন সীমাবদ্ধ তখন প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে কোনোরূপ নির্দেশ দেওয়া মানুষের পক্ষে অবৈজ্ঞানিক।

বিজ্ঞানের যেখানে সমাপ্তি, দর্শনের সেখানে সূত্রপাত। এরই একটি সুন্দর নিদর্শন 'কে বড় ?' শীর্ষক প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটির আরম্ভ বিজ্ঞান দিয়ে। কিছুকাল পূর্বেও বিজ্ঞান স্থির করেছিল, বিশ্বজগৎ মানুষের জন্যে সৃষ্ট।

মানুষের উপকারে আসে না, এমন কোনো বস্তু ব্রহ্মাণ্ডে নেই। কিন্তু কিছুকাল পরে এই বিজ্ঞানই আবার জানাল, বিরাট বিশ্বজগতের তুলনায় মানুষ তৃণাদপি ক্ষুদ্র। বিশ্বজগতে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব কিনা তা' মীমাংসার জন্যে লেখক প্রথমে বিজ্ঞানেরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন; বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপকরণ খুঁজেছিলেন ডারউইন, লাপ্লাস প্রভৃতির কাছে। কিন্তু বিজ্ঞানের পরস্পরবিরোধী মতবাদ এ প্রশ্নের উত্তরদানে অক্ষম। লেখক তাই দার্শনিক মীমাংসার পথ খুঁজলেন এবং জানলেন, জগৎ অসীমও নয়, অনাদিও নয়; মানুষই এই কাল্পনিক অনন্ত জগৎ ও অনাদি কালের সৃষ্টি ক'রে এই কাল্পনিক বৃহত্ত্বের তুলনায় আপনাকে ক্ষুদ্র মনে ক'রে প্রতারিত হয়। দার্শনিক তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলেছেন, এই জগৎ মানুষের অন্তরে। অন্তরের জগৎকে বাইরে প্রক্ষেপ ক'রে মানুষই এই জগতের সৃষ্টি করেছে। মানুষের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জগতের পরিধিও বিস্তৃততর হচ্ছে। অতএব 'কে বড়?' এই প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসাই থেকে গেল।

'পঞ্চভূত' শীর্ষক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ পাশাপাশি আলোচিত। আলোচ্য প্রবন্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, দার্শনিকদের মতে জগৎ পাঁচটি ভূতে নির্মিত। আর বৈজ্ঞানিকদের মতে জগৎ আশীটি এলিমেণ্টে নির্মিত। তাই বলে দর্শন ও বিজ্ঞানে কোনো বিরোধ নেই। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতেই শুধু পার্থক্য। উভয়েই জগৎকে বিশ্লেষণ ক'রে জগতের মূল উপাদানগুলো নির্ণয় করবার চেষ্টা করেন। আর দার্শনিকের কাছে বাহ্যজগতের যাবতীয় পদার্থ কতিপয় রূপ-রসাদির সমষ্টি মাত্র। এই রূপ-রসাদি বাদ দিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এদেশীয় দার্শনিকদের মতো ইউরোপীয় দার্শনিকরাও ভৌতিক পদার্থকে বিশ্লেষণ ক'রে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ছাড়া আর কিছুই পান না। এদিক থেকে উভয় দেশের দার্শনিকদের মধ্যে মিল রয়েছে। সাংখ্য ও বেদান্তের বিশ্লেষণপ্রণালীও প্রায় একই রকম। উভয়েই বাহ্যজগৎকে পঞ্চভূতে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের পঞ্চভূত এবং বেদান্তদর্শনের 'সূক্ষ্মভূত ও স্থূলভূত'—সবই মনঃকল্পিত সংজ্ঞা মাত্র। বাস্তবজগতে এদের কোনো অস্তিত্ব নেই। এই ধরনের মনঃকল্পিত সংজ্ঞা নিয়ে বিজ্ঞানকেও কারবার করতে হয়, লেখক একথা স্পষ্ট করেই বলতে

চেয়েছেন। বৈজ্ঞানিকের 'perfect solid,' 'perfect fluid' ইত্যাদির অস্তিত্ব বাস্তবজগতে নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানকেও এভাবে যুক্তির অসমতলে দাঁড় করাবার ফলে কোনো শাস্ত্রের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখান হয় নি বটে, তবে বৈজ্ঞানিকের এলিমেণ্টের ত্রুটি কোথায় এবং মনঃকল্পনাই বা কোনখানে তা' আরও খোলসা ক'রে বলা উচিত ছিল।

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানদর্শন এবং বৈজ্ঞানিকতত্ত্বনির্ভর দর্শন—এই তিন পর্যায়ের রচনা ছাড়া আর এক শ্রেণীর রচনা জিজ্ঞাসায় আছে। এরা বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বনিরপেক্ষ দার্শনিক প্রবন্ধ। 'জগতের অস্তিত্ব', 'আত্মার অবিনাশিতা', 'এক না দুই?', 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' এবং 'মুক্তি' এই শ্রেণীর প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলোতে বেদান্তদর্শন প্রাধান্য লাভ করলেও এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় দর্শনেই রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে 'ফলিত জ্যোতিষ' জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলোর মধ্যে কিছুটা খাপছাড়া বলেই মনে হয়। তবে এ থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। যা' প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, রামেন্দ্রসুন্দর তা'কে বিজ্ঞান বলে স্বীকার করেন নি। ফলিত জ্যোতিষ গণনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আজও পর্যন্ত সুনিশ্চিত-ভাবে কিছু বলতে পারে নি। ফলিত জ্যোতিষ তাই রামেন্দ্রসুন্দরের মতে বিজ্ঞান নয়। জ্যোতিষ নিয়ে ইতিপূর্বে রামেন্দ্রসুন্দর আরও দু'টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধ দু'টি 'প্রাচীন জ্যোতিষ' এই শিরোনামায় প্রকৃতিতে সংকলিত হয়েছে। এই দু'টি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, প্রাচীন জ্যোতিষের গাণিতিক অংশের (গণিত জ্যোতিষ) প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের শ্রদ্ধা ছিল।

'জিজ্ঞাসা' রামেন্দ্রসুন্দরের এক অনবদ্য সৃষ্টি। দার্শনিকের বিচারভূমিতে বসে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সত্যাসত্য নির্ধারণ বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর কেউ করেন নি। জগৎরহস্যের উত্তর দিতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে এরূপভাবে কাজে লাগাতেও ইতিপূর্বে আর কারও রচনায় দেখা যায় নি। শুধু ভাবের দিক থেকেই নয়, ভাষার দিক থেকেও গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জিজ্ঞাসার ভাষার গাম্ভীর্য ও বলিষ্ঠ বাঁধুনি উচ্চাঙ্গের বাংলা গদ্যের নিদর্শন। দুরূহ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশে বাংলা ভাষার যে ক্ষমতা রয়েছে, এই গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর তা' প্রতিষ্ঠিত করলেন। তা' সত্ত্বেও তত্ত্ব নয়, সাহিত্যই এখানে বড় হয়ে উঠেছে। এর মূলে ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের প্রকাশভঙ্গীর সারল্য

এবং সৌন্দর্যরসিক মন। তাই দেখা যায়, যায়গায় যায়গায় তত্ত্বাদি ছাড়িয়ে লেখকের সৌন্দর্যপ্রীতি বড় হয়ে উঠেছে। যেমন,

> "আকাশ নীল না হইয়া পীত হইলে কি ক্ষতি হইত, তত্ত্বান্বেষীরা স্থির করিয়া বলিয়া দিবেন। আমরা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সেই নীল রূপে বিশ্বসৌন্দর্যের রূপ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দসুধা পান করিতে থাকিব। এই আমাদিগের পরম লাভ।"
>
> (জিজ্ঞাসা : বর্ণতত্ত্ব)

সূক্ষ্ম বিদ্রূপের অন্তরালে বৈজ্ঞানিক সত্যের নগ্ন প্রকাশ রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য। 'প্রকৃতি'তে তা'র পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। এ বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন এখানেও মেলে। যেমন,

> "যাহাদের সুখলাভের ও দুঃখ-পরিহারের প্রবৃত্তি আছে, তাহারাই প্রকৃতির পাঠশালা হইতে পাস করিয়া আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া লক্ষ পুরুষের গলা-টেপার পর জীবের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।"
>
> (জিজ্ঞাসা : মায়াপুরী)

চার

রামেন্দ্রসুন্দরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বিচিত্র জগৎ' লেখকের মৃত্যুর পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে সংকলিত সবগুলি প্রবন্ধই ১৩২১ থেকে ১৩২৪ সালের মধ্যে ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্র জগৎ'-এর প্রবন্ধগুলির মধ্যে চিন্তার ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থে জড় থেকে প্রাণ এবং প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে লেখকের চিন্তা অভিসারে বেরিয়েছে। বিজ্ঞানবিদ্যার অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য ক'রে 'জিজ্ঞাসা'য় লেখকের মনে খট্‌কা লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিকেরা যে জগতের কল্পনা করেন, তা' প্রকৃত জগতের 'একটা মনগড়া আদর্শ বা মডেল মাত্র।' বৈজ্ঞানিকের এই মনগড়া জগতে জীবের ও জড়ের মধ্যে এবং অচেতন ও চেতনের মধ্যে 'যে প্রাচীরের ব্যবধান', তা' আজও পর্যন্ত লুপ্ত হয় নি। বিজ্ঞান আজও পর্যন্ত বিশ্বজগৎকে ঐক্যের বাধনে বাঁধতে পারে নি। 'বিচিত্র জগৎ'-এর পরিকল্পনার মূলে বিজ্ঞানবিদ্যার এই অসম্পূর্ণতাই দায়ী।

রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বৈজ্ঞানিকের জগতের স্বরূপ ব্যাখ্যা ক'রে জড় ও প্রাণের মধ্যে সম্বন্ধ কি এবং প্রাণের ধর্ম কি তা' নির্ণয় করতে চেয়েছেন। যুগে যুগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যে সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি, এখানে তার সমাধান আশা করা যায় না। কিন্তু সমস্যার সমাধানকল্পে রামেন্দ্রসুন্দর যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জগৎপ্রবাহের উৎস সন্ধানে বেরিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যে তা' অভিনব ও একক। আলোচ্য গ্রন্থে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণপ্রণালী ও সরস বিচারভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, ইংরেজী সাহিত্যেও তা'র তুলনা মেলা ভার।

'বিচিত্র জগৎ'-এ প্রথমেই রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিকের জগতের স্বরূপ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'বিজ্ঞান-বিদ্যায় বাহ্য জগৎ'-এ এই আলোচনা স্থরু করা হয়েছে 'Mental and Moral Science' নামক গ্রন্থে Bain সাহেবের একটি উক্তিকে কেন্দ্র ক'রে। উক্তিটি হোল, "In regard to the object properties, all minds are affected alike—in regard to the subject-properties, there is no constant agreement." বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের বিচিত্র দর্শনপ্রকৃতি আলোচনা ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর প্রমাণ করতে চেয়েছেন, Bain-এর এই উক্তির প্রথমাংশ অর্থাৎ, "In regard to the object properties, all minds are affected alike"—একথা স্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন, প্রকাশভঙ্গীর সরসতা এবং সূক্ষ্ম বিচার-প্রণালীর দিক থেকে তা' অনবদ্য। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে দর্শনকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন। Bain-এর উক্তির দ্বিতীয়াংশ প্রকারান্তরে তিনি মেনে নিয়েছেন।

বিজ্ঞান-বিদ্যায় বাহ্য জগতের আলোচনা করতে গিয়ে দু' ধরনের জগতের কথা রামেন্দ্রসুন্দর বললেন। এক হোল 'ব্যাবহারিক জগৎ'; অপরটি হোল 'প্রাতিভাসিক জগৎ'। পৃথিবীর সাধারণ লোক দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্যে যে জগৎকে মেনে নেয়, রামেন্দ্রসুন্দরের মতে তাই হোল 'ব্যাবহারিক জগৎ'। এই ব্যাবহারিক জগতের স্বরূপ হোল কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগতের গড়। রামেন্দ্রসুন্দর বার বার বলতে চেয়েছেন, বিজ্ঞান-বিদ্যায় এই সাধারণ বা মাঝারি মানুষদের সাক্ষ্য ও অভিজ্ঞতারই দাম বেশী। তা' ছাড়া এই মাঝারি মানুষরাই জীবনসংগ্রামে সবচেয়ে বেশী কৃতকার্য।

কবি ও ভাবুকদের অভিজ্ঞতার এখানে কোনো দাম নেই। জীবনসংগ্রামে এরা কৃতকার্য হন না। বৈজ্ঞানিকের জগতের সঙ্গে এদের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার কোনো মিলও নেই। স্বাতন্ত্র্য বর্জন ক'রে সাধারণ মানুষের সচরাচর দৃষ্ট অভিজ্ঞতা থেকেই এই ব্যাবহারিক জগতের সৃষ্টি। ব্যাবহারিক জগতে নিজস্ব অভিজ্ঞতার মূল্য নেই। নিজেদেরই সুবিধার জন্যে সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতাকে এখানে মেনে নিতে হয়। কিন্তু নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই প্রাতিভাসিক জগতের সৃষ্টি। আর যে জগৎ যা'র কাছে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হয় সে জগৎ-ই হোল তা'র পক্ষে 'প্রাতিভাসিক জগৎ'। এ জগৎ প্রত্যেকের কাছে নিজস্ব সত্য। কিন্তু ব্যাবহারিক জগৎ হোল কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতার গড়। কিন্তু এই যে 'Normal Man' বা 'Mean Man',—এর অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। পরবর্তী প্রবন্ধ 'ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ'-এ রামেন্দ্রসুন্দর একথা বোঝাতে চেয়েছেন। আমরা নিজেদের জীবনধারণের সুবিধার জন্যেই এই কাল্পনিক ব্যাবহারিক জগতের অনুবর্তী হয়ে চলি; জীবনযাত্রার সুবিধার জন্যেই ব্যাবহারিক জগতে 'Uniformity of Nature' মেনে থাকি। নিজেদের সুবিধার খাতিরেই ব্যাবহারিক জগতে এই নিয়মের বন্ধন দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। বিজ্ঞানবিদ্যা ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনাকে কতকগুলি সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই যে কার্যকারণ সম্পর্ক (causal connection), এটা প্রকৃতই আবশ্যকীয় কিনা ("অবশ্যম্ভাবী necessary বটে কি না") এ নিয়ে বহুকাল ধরে বিতর্ক চলছে। রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচনা থেকে এই বিতর্কের উপর একটা 'নূতন attitude'-এর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলতে চেয়েছেন, এই নিয়মের বন্ধন ব্যাবহারিক জগতে 'necessary' এই অর্থে যে একে না মানলে আমাদের জীবনযাত্রা চলত না। প্রাণের দায়ে এই কার্যকারণ সম্পর্ক মেনে নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি—এই অর্থে এটা 'necessary'। এই necessity-কে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন 'ব্যাবহারিক সত্য' বা 'Pragmatic Truth'। 'Causality' বা 'কার্যকারণ সম্বন্ধ' প্রকৃতই অত্যাবশ্যকীয় কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎকে পাশাপাশি রেখে উভয়ের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর এই আলোচনা থেকেও একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া

যায়। উভয় জগতের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর প্রাতি-ভাসিক বহির্জগৎ ও ব্যাবহারিক বহির্জগৎকে পাশাপাশি স্থাপন করেছেন। প্রাতিভাসিক বহির্জগৎ প্রত্যেকের কাছেই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শরূপে উপস্থিত হয়। এই জগৎ সত্য এবং প্রত্যক্ষ। আমাদের মনে হয়, যেন এই রূপ-রস ইত্যাদি বাইরে থেকে আসছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রাতিভাসিক জগৎ তার নিজস্ব। যত মানুষ, প্রাতিভাসিক জগতের সংখ্যাও তত। কিন্তু ব্যাবহারিক জগৎ হোল বহুসংখ্যক প্রাতিভাসিক জগতের গড় এবং ব্যাবহারিক জগতের সংখ্যা একটি মাত্র। রামেন্দ্রসুন্দর বার বার বোঝাতে চেয়েছেন, এই ব্যাবহারিক জগৎ কল্পিত, বৈজ্ঞানিকদের মনগড়া। প্রাতি-ভাসিক জগৎই প্রত্যক্ষলব্ধ। দৈনন্দিন জীবনে কাজ চালাবার সুবিধার জন্যে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কেটেছেঁটে আমরা এই ব্যাবহারিক জগতের সৃষ্টি করেছি। এই জগতে জীবনরক্ষার জন্যে দায়ে পড়ে আমরা কতকগুলো নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছি। এই নিয়মই হোল 'Causality বা Uniformity of Nature'। এই 'Causality' বা 'কার্যকারণ সম্বন্ধ'কে 'প্রাণের দায়ে' আমরা স্বীকার ক'রে নিই। অতএব, ব্যাবহারিক জগতে এক অর্থে এরা 'Necessary'। কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতে এরা কোনোমতেই 'Necessary,' নয়। কেননা, প্রাতিভাসিক জগতে কোনোরূপ কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। প্রাতিভাসিক জগতে নিয়মের অস্তিত্ব কোনোমতেই 'Necessary' নয়। কেননা, এই জগতে একটার পর একটা ঘটনা আসতে কোনোমতেই বাধ্য নয়। অতএব, এই জগতে 'Uniformity of Nature' বা কার্যকারণ সম্বন্ধের একান্ত অভাব। প্রাতিভাসিক জগৎই 'Real' এবং ব্যাবহারিক জগৎই 'Unreal'। বৈজ্ঞানিকের বিচারভূমিতে বসে উভয় জগতের এই পার্থক্য নির্দেশ ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে দার্শনিকদের চিরন্তন সমস্যা determinism এবং necessity-র সমাধান করতে চেয়েছেন।

'বিচিত্র জগৎ'-এ রামেন্দ্রসুন্দর যে তৃতীয় জগতের কথা বললেন তা' হোল 'বাঙ্ময় জগৎ।' বাঙ্ময় অর্থে বাক্যময় জগৎ। এ জগৎ 'concept'-এ তৈরী। 'concept'-এর কোনো বস্তুই কোনোকালে প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয় না। 'concept' মানুষের মনগড়া পদার্থ। অন্তরের প্রজ্ঞা বিভিন্ন 'concept'-এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করছে। এই হোল মনন-কর্ম। এই মনন-কর্মকে অপরের কাছে প্রকাশ করতে গেলে তা'কে বাক্যরূপে বা শব্দরূপে প্রকাশ

করতে হয়। সেই শব্দ বা বাক্য হোল 'concept'-এর সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞাগুলোকে অনেক সময় বাইরে প্রকাশের দরকার হয় না; অন্তরের মধ্যেই এরা থেকে যায়; অন্তরেই এক নতুন জগতের সৃষ্টি করে। এই জগৎ কোনোকালেই কারও প্রত্যক্ষগোচর হয় না। প্রাতিভাসিক জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থের 'প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য রূপ' আছে। ওটা 'রূপময় জগৎ'। কিন্তু এই 'conceptual world' রূপ-রস-গন্ধ বর্জিত। এ জগৎ কোনোকালেই মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির গোচর হয় না। এ জগতের পদার্থগুলো সংজ্ঞামাত্র—নামমাত্র। এই হোল 'বাঙ্ময় জগৎ'। এ জগতের সৃষ্টিকর্তা মানুষের প্রজ্ঞা। বৈজ্ঞানিক অসংখ্য লোকের সাক্ষ্যের গড় নিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের যে সাধারণ সূত্র তৈরী করেন, রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, তা'ও একটা বিবরণ বা বাক্য মাত্র। এই বিবরণ 'conceptual terms'-এ তৈরী। বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন 'concept'-এর বিভিন্ন নামকরণ করেন। 'concept' বা সংজ্ঞাগুলো হয় সংক্ষিপ্ত, সূত্রাকারে নিবদ্ধ। এই সূত্রগুলি বৈজ্ঞানিকের মনোজগতে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী এরা তাদের বাইরে প্রকাশ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বৈজ্ঞানিক যে ব্যাবহারিক জগতের সন্ধানে বের হন, তা'কে ইন্দ্রিয় দিয়ে কোনোদিনই ধরা যায় না। অগত্যা দশজন লোকের সাক্ষ্য মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক একটা মনগড়া জগতের সৃষ্টি করেন। এই জগৎ সংজ্ঞায় তৈরী, বাক্যে তৈরী—এই হোল 'বাঙ্ময় জগৎ'। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, এই অমূর্ত জগৎ নিয়েই বিজ্ঞানবিদ্যার কারবার; ইন্দ্রিয়ের অগোচর এই অপ্রত্যক্ষ জগৎকেই বিজ্ঞানবিদ্যা 'জড়-জগৎ' আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু এই জড়-জগতের সর্বত্রই ফাঁকি বা গলদ রয়েছে। 'জড় জগৎ' নামক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানবিদ্যার এই ফাঁকি ধরবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রবন্ধটিকে জিজ্ঞাসার 'মায়াপুরী' ও 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' নামক প্রবন্ধ দু'টির ক্রমপরিণতি বলা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বিজ্ঞানবিদ্যার এমন কয়েকটি অসম্পূর্ণতা নিয়ে আলোচনা করেছেন যা' বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়েছে। প্রথমেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বাহ্য জগতের 'কল্পিত প্রতিমা', যা' নিয়ে বাঙ্ময় জগৎ গঠিত, বৈজ্ঞানিকরা তা'কেই বলেন জড়-জগৎ। কিন্তু এই জগৎ একটা কৃত্রিম বস্তু। প্রত্যক্ষ জগতে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। অতএব, বিজ্ঞানবিদ্যার গোড়াতেই গলদ ধরা পড়ে। বিজ্ঞানের পরিমাপ-পদ্ধতিতেও বিরাট

ফাঁক রয়েছে। পরিমাপ-পদ্ধতিতে এই যে গলদ, এ থেকে বিজ্ঞানবিদ্যায় 'paradox'-এর সৃষ্টি। বিচারকের নিরপেক্ষ ভূমিকায় বসে বিজ্ঞানবিদ্যার এই 'paradox' নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্য যথাসম্ভব বর্জন ক'রে বাহ্য জগতের বিবরণ দিতে চেষ্টা করেন; রূপ-রস ইত্যাদির সাহায্য না নিয়ে বাহ্য জগৎকে দেখতে চান। এর কারণ, সকলের ইন্দ্রিয়ের শক্তি সমান নয়; আবার অবস্থাভেদে একই পদার্থ এক একজনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকম মনে হতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা তাই পরিমাপের উপর নির্ভর করেন। কিন্তু পরিমাপ করতে গিয়ে জড়পদার্থের যে মুখ্য লক্ষণ 'inertia', তা'র যথার্থ শক্তি নিরূপণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কোনো বস্তুর 'inertia' তা'র বেগের উপর নির্ভরশীল। বেগ বাড়লে 'inertia' বাড়ে; আবার বেগ কমলে 'inertia' কমে। অতএব, কোনো বস্তুর 'inertia' বা জড়ত্ব নির্ণয় করতে গেলে এই বেগের পরিমাণ নির্ণয় করতে হয়। আধুনিক জড়বিজ্ঞান সকল পদার্থকেই 'length'-এ পরিণত ক'রে সেই 'length'-এর পরিমাণ নির্ণয় ক'রে থাকে। কিন্তু যে বস্তুর (যেমন, 'গজকাঠি') সাহায্যে এই 'length'-এর পরিমাণ মাপা হয়, স্থানভেদে তা'র দৈর্ঘ্য ভিন্নরূপ হয়ে থাকে এবং দৈর্ঘ্যের কতটুকু পরিবর্তন হয়, তা' সঠিক জানবার কোনো উপায়ই নেই। অতএব, দৈর্ঘ্য ও দূরত্বের পরিমাপে এরূপ গলদ থাকায় বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলই শিথিল হয়ে পড়ে। কালের পরিমাপেও সমস্যা। আলোক সেকেণ্ডে প্রায় 'এক লক্ষ নব্বুই হাজার মাইল' যায়। বিজ্ঞানবিদ্যায় একেই বলা হয় 'absolute velocity'। আলোকের চেয়ে বেশী বেগ কোনো বস্তুরই হতে পারে না। কিন্তু দু'টো ইলেক্‌ট্রন—যাদের প্রতি সেকেণ্ডে গতি লক্ষ মাইল, এরা যদি পরস্পর উল্টোমুখে চলে, তবে এদের আপেক্ষিক বেগ দাঁড়াবে দু'লক্ষ মাইল। অতএব, মনে হতে পারে যে, আলোর বেগকে ইলেক্‌ট্রন ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে তা' নয়। স্থানভেদে ঘড়ির সময়ের তারতম্য হয়। যে সময়কে এক সেকেণ্ড বলে মনে হচ্ছে, আসলে সে সময়টুকু হয়তো এক সেকেণ্ডের চেয়ে দীর্ঘ। অতএব, দেশ ও কালের পরিমাণে কোনোরূপ বাঁধা 'standard' নেই। আমরা দায়ে পড়েই এই 'standard' মেনে থাকি। বিজ্ঞানবিদ্যার মূলের কথা দেশ ও কালের পরিমাপে এই গলদ দেখিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়েছেন।

পরবর্তী প্রবন্ধ 'বৈজ্ঞানিকের আকাশ'-এ রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তা আরও সম্প্রসারিত। বৈজ্ঞানিকের জগৎকে এখানে তিনি বিশ্বজগতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিকের আকাশ অর্থে বিজ্ঞানের আলোচ্য বাহ্যজগৎ; এই জগৎ আকাশ জুড়ে অবস্থিত। দর্শনের বিচারভূমিতে দাঁড়িয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, বৈজ্ঞানিকের এই আকাশ 'মনগড়া—কাল্পনিক'। বাহ্যজগৎ যে মূর্তি নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তা'ই হোল আমাদের প্রত্যক্ষ আকাশ। এই প্রত্যক্ষ আকাশ সীমাবদ্ধ ও বিষমাকার। আমরা প্রত্যেকের অনুভূতি অনুযায়ী এই আকাশকে নিজের মতো ক'রে গড়ে নিয়েছি। বিজ্ঞান অসংখ্য প্রত্যক্ষ আকাশের সাধারণ অংশ অবলম্বন ক'রে একটা আকাশ কল্পনা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, এই আকাশ বৈজ্ঞানিকের 'মনগড়া—conceptual আকাশ'। প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষমাকার আকাশকে বৈজ্ঞানিক সমাকার বলে ধরে নেন। তারপর তা'তে ইলেকট্রন ও ঈথার বসিয়ে সেই আকাশকে বিষমাকৃতি প্রদান করেন। বৈজ্ঞানিক অসংখ্য জড় দ্রব্যে আকাশকে চিহ্নিত করেন। জড় দ্রব্যের মুখ্য লক্ষণ হোল 'inertia'। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, এই inertia-ই একটা 'সংজ্ঞা বা concept'। এর কোনো 'resistance' নেই। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, 'resistance'—যা' থেকে বস্তুসত্তার অনুভূতি, তা' হোল চেতন জীবের অনুভূত সত্য পদার্থ। বৈজ্ঞানিকের কল্পনায় এই 'resistance' -এর কোনো স্থান নেই। অথচ এই 'resistance'-ই হোল প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক বা প্রত্যক্ষ জগতের অন্তর্গত সত্য বস্তু। চেতন জীবের কাছে রূপ-রসাদির অতিরিক্ত 'প্রত্যক্ষ বিরোধের' বা 'resistance'-এর অনুভূতিই জড় পদার্থের সর্বপ্রধান লক্ষণ। কিন্তু বিজ্ঞান সকল প্রকার প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে বর্জন ক'রে 'extension' এবং 'motion' এই দুই মনগড়া 'Concept'-এর সাহায্যে জড় পদার্থের বিবরণ দিয়ে থাকেন। বিজ্ঞানের বাঙ্ময় জগতে 'resistance'-এর কোনো অস্তিত্ব নেই। জড়-জগতের অস্তিত্বের মূলে তবে কি? জগৎপ্রবাহের রহস্যসন্ধানে বেরিয়ে এরও উত্তর দেবার চেষ্টা রামেন্দ্রসুন্দর করেছেন। আমাদের জীবনযাত্রায় যে প্রত্যক্ষ 'বিরোধের অনুভূতি' সেই অনুভূতিকে ভিত্তি ক'রেই বৈজ্ঞানিকের বাহ্যজগৎ ও জড়-জগতের সৃষ্টি। এই জড়জগৎ বহু জীবের অস্তিত্ব থেকে কল্পিত। জীবের পরস্পর আদানপ্রদান ও বিরোধ থেকেই এই জগতের বিষমাকৃতি। এই

বিরোধই প্রত্যক্ষ বাহ্যজগতে বস্তুরূপে কল্পিত হয়। বিরোধের মূলে রয়েছে প্রাণ। আদানপ্রদান ও বিরোধের সৃষ্টি প্রাণই ক'রে থাকে। রামেন্দ্রসুন্দর এবার প্রাণের রহস্য সন্ধানে বেরোলেন।

'প্রাণময় জগৎ'-এ তিনি প্রাণের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করেছেন। প্রাণ-পদার্থের সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী মতবাদ আলোচনা ক'রে এবং প্রাণ ও জড়ধর্মের তুলনা ক'রে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, প্রাণের এমন কোনো বিশিষ্টতা আছে কিনা, যা' স্বভাবতঃই জড়ধর্ম থেকে পৃথক। বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সাহিত্যিকের সরস বর্ণনাভঙ্গী তাঁর এই আলোচনাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

অনন্ত রহস্যাবৃত প্রাণতত্ত্বের আলোচনা রামেন্দ্রসুন্দর সুরু করেছেন একেবারে গোড়া থেকে—প্রাণিদেহের উপকরণ প্রোটোপ্লাজম্ বা প্রাণি-পদার্থ থেকে। এই প্রোটোপ্লাজম্ কি, প্রথমে তা' বুঝিয়ে তিনি বলেছেন, প্রোটোপ্লাজম্ তৈরীর ক্ষমতা শুধুমাত্র প্রাণিদেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রসঙ্গতঃ 'Vitalist' বা 'প্রাণবাদী' এবং 'Mechanist' বা 'জড়বাদী' বা যন্ত্রবাদীদের দ্বন্দ্বের কথা এসে গেছে। 'Mechanist'-রা বলছেন, প্রাণিদেহ একটা যন্ত্র মাত্র। সৌরজগৎ যেমন 'Mechanics'-এর আয়ত্ত হয়েছে, দেহযন্ত্রও হয়তো সেরূপ 'Mechanics'-এর আয়ত্তে আসবে। কিন্তু যাঁরা 'Vitalist' তাঁরা বলেন, মানুষ বুদ্ধিবলে কোনোকালেই প্রোটোপ্লাজম্ তৈরী করতে পারবে না। প্রাণ বা 'life' হোল এক অপরূপ পদার্থ; এর মূলে রয়েছে 'Vital force'; এ বস্তু কোনোকালেই প্রজ্ঞার বশ্যতা স্বীকার করবে না। প্রসঙ্গতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব (Creation) এবং অভিব্যক্তিবাদের (Evolution) বিরোধটিও রামেন্দ্রসুন্দর অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব-বাদীরা 'Nothing' থেকে 'Something'-এর উৎপত্তিতে, অভাব থেকে ভাবের উৎপত্তিতে বিশ্বাসী। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্যার আশ্রয়স্থল অভিব্যক্তিবাদের মতে অভাব থেকে ভাব হয় না। যা' ছিল, তা'ই থাকে; শুধুমাত্র মূর্তি রূপান্তরিত হয়। অভিব্যক্তিবাদকে 'নিয়তি বা Uniformity of Nature' বা কার্যকারণ সম্বন্ধের শৃঙ্খলা স্বীকার করতে হয়। বৈজ্ঞানিকরা প্রাণের সমস্যার ক্ষেত্রে কার্যকারণশৃঙ্খলা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, পূর্বে কি ঘটনাচক্রে এবং কিরূপে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল, তা' যদি একবার জানা যায়, তবে তাঁরাও প্রাণের সৃষ্টি করতে পারবেন। অর্থাৎ, প্রাণের সমস্যাকে

বৈজ্ঞানিকরা চাইছেন 'formula'-য় ফেলতে। অপরপক্ষে, 'Creation-বাদীরা' বলছেন, প্রাণতত্ত্ব কোনোকালে formula-য় আবদ্ধ হবার নয়। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যে বিচারপ্রণালী অনুসরণ করেছেন, 'attitude' বা দৃষ্টিকোণের দিক থেকে তা' অনবদ্য। তাঁর মতে, এই বিরোধের মীমাংসা করতে গেলে প্রথমেই খুঁজে দেখতে হয়, প্রাণপদার্থ পুরোপুরিভাবে 'Uniformity of Nature' মেনে চলে কি না। যদি না চলে, তবে প্রাণীর আবির্ভাবের মূলে একটা 'Creation বা Vital force' স্বীকার করতে হয়। জড়পদার্থ 'Uniformity of Nature' মেনে চলে। এখন দেখতে হয়, প্রাণে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি না, যা' জড়ধর্ম থেকে পৃথক ; যে ধর্মকে জড়পদার্থের ধর্মের ন্যায় 'formula'-য় বাঁধা যায় না। জড় ও প্রাণের ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর উভয়ের চিরন্তন বিরোধের চিত্রটি অতি সুন্দরভাবে এঁকেছেন। প্রাণ চাইছে জড় জগৎকে আত্মসাৎ ক'রে প্রাণময় জগতে পরিণত করতে। অপরপক্ষে জড় চাইছে প্রাণি-পদার্থকে জড়পদার্থে পরিণত করতে। জড়পদার্থের উপাদেয় অংশ অবিরাম প্রাণি-পদার্থে পরিণত হচ্ছে। অপরদিকে প্রাণি-পদার্থের নিয়তই জড়পদার্থে রূপান্তর ঘটছে। প্রাণকে শেষ পর্যন্ত জড়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। এই পরাজয় স্বীকারের নাম মৃত্যু। প্রাণ পরাজয় স্বীকার করলেও প্রাণের প্রবাহ কোনোকালেই লুপ্ত হয় না। জড়পদার্থের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যেও প্রাণের চেষ্টার অন্ত নেই এবং এই হোল প্রাণের একমাত্র চেষ্টা। অতএব, প্রাণ 'ঘোর স্বার্থপর।' এই স্বার্থপরতাই প্রাণের বৈশিষ্ট্য। প্রাণ চাইছে, সমস্ত জগৎকে প্রাণময় করতে ; আর জড়জগৎ চাইছে প্রাণপদার্থকে জড়পদার্থে পরিণত করতে। জড়ের সঙ্গে প্রাণের এই যে চিরন্তন বিরোধ—এইখানেই প্রাণের বিশিষ্টতা। প্রাণ যে জড়কে প্রাণপদার্থে পরিণত করতে চায়, এর মধ্যে যেন একটা লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে। যেভাবে চললে প্রাণের আত্মরক্ষার সুবিধা, প্রাণ সেভাবেই চলে। কিন্তু জড়ের আত্মরক্ষার সেরূপ কোনো চেষ্টা নেই। এ ব্যাপারে জড় একেবারে উদাসীন, লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন। এ ছাড়া প্রাণের রয়েছে ইতিহাস। অতীতের সমস্ত নিদর্শন কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণ চলে। কিন্তু জড়ের কোনো ইতিহাস নেই। জড় চিরপুরাতন। কিন্তু প্রাণ নিত্য নূতন পথে চলেছে।

প্রাণের ন্যায় জড় দ্রব্যেও পরস্পরের মধ্যে বিরোধ রয়েছে বটে। কিন্তু এই বিরোধ 'formula'-বদ্ধ—বাঁধাধরা। প্রাণীর ন্যায় জড় দ্রব্যেও বাছাই করবার একটা শক্তি দেখা যায়। এই শক্তি 'formula'-বদ্ধ; কার্যকারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। জড়ের সঙ্গে জড়ের ঘাত-প্রতিঘাতে কোনোরূপ বৈচিত্র্য নেই। এ যেন নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। এই নিয়মশৃঙ্খলার বেড়াজালে জড় চাইছে প্রাণের প্রবাহকে রুদ্ধ করতে। কিন্তু প্রাণ কোনোরূপ বাঁধাধরা নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ না হয়ে চিরন্তন বেগে বয়ে চলেছে। রামেন্দ্রসুন্দর প্রাণের এই বাঁধনহীন প্রবাহের বর্ণনা দিয়েছেন কবিত্বময় ভাষায়—

> "জড় অবিরাম নিয়মের বাঁধ বাঁধিয়া আপনার পাষাণ তটের মধ্যে প্রাণের স্রোতকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু উচ্ছ্বসিত প্রাণের প্রবাহ বাঁধ ভাঙ্গিয়া, কূল ছাপাইয়া, দুই কূল ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কখন্ কোন্ পথে চলিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রাণের এই উচ্ছ্বাস বেগবান্, তরঙ্গিত, আবর্ত্তসঙ্কুল, ফেনিল। জড়কে ইহা যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ঐরাবতের বিশাল দেহ গঙ্গার স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাইতেছে।"

পরবর্তী প্রবন্ধ 'প্রাণের কাহিনী'-তে রামেন্দ্রসুন্দর প্রাণের যে কথা বর্ণনা করেছেন তা' হোল প্রাণের বিরোধের কাহিনী—জীবনযুদ্ধের কাহিনী। এই বিরোধের উপযোগিতা স্বীকার ক'রে নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধের প্রারম্ভে রামেন্দ্রসুন্দর জগৎতত্ত্বের একটি গোড়ার প্রশ্নের জবাব দিতে চেয়েছেন। এখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী খাঁটি বৈজ্ঞানিকের।

কোষ স্বতঃই কেন আপনাকে দ্বিখণ্ডিত করছে, প্রাণি-পদার্থ একটা বিরাট দেহ ধারণ না ক'রে কেন কোটি কোটি ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করছে, এ হোল জগৎরহস্যের গোড়ার প্রশ্ন। জীবনের ইতিহাসকে একটা বিরোধের ইতিহাস বলে উল্লেখ ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর এ প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, বিরোধ আছে বলেই জীবনও আছে। প্রাণি-পদার্থ যদি কোটি কোটি খণ্ডে' বিভক্ত না হোত, তা' হলে এই বিরোধই থাকতো না। প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলে জীবনের অস্তিত্বও থাকতো না। তিনি বলতে চেয়েছেন, চেতন জীবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা আদানপ্রদানের খাতিরেই জড়জগৎ ও প্রাণজগৎ আপনাদের বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত ক'রে নিয়েছে। এই যে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিরোধ এ শুধু প্রাণী বনাম জড়েই সীমিত নয়; প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীরও চিরন্তন বিরোধ চলেছে। এই বিরোধই হোল জীবনসংগ্রাম। জীববিজ্ঞানীর চশমা চোখে পরে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলেছেন, জীবন-সংগ্রামের সুবিধার জন্যেই স্বতন্ত্র কোষগুলো জমাট বেঁধে বড় বড় প্রাণিদেহ নির্মাণ করেছে। জগৎজোড়া জীবনসংগ্রামের স্বরূপ আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর অতি প্রকটভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রাণীর সঙ্গে জড়ের বিরোধ। তা' ছাড়া বিরোধ প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর। প্রাণিজগতে বিরোধের আবার বিভিন্নতা আছে। উদ্ভিদের সঙ্গে জন্তুর বিরোধ এবং জন্তুর সঙ্গে বিরোধ জন্তুর। তা' ছাড়া একই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও চলেছে চিরন্তন বিরোধ। কিন্তু জগৎজোড়া এই বিরোধের মধ্যে থেকেও প্রাণের প্রবাহ বিনষ্ট হচ্ছে না। বংশানুক্রমের মধ্য দিয়ে 'ব্যতিক্রম' বা 'Variation'-এর সৃষ্টি ক'রে প্রাণ আপনাকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করছে। এই 'Variation' থেকেই প্রাণিজগতে বিচিত্র উপজাতির উদ্ভব। 'Variation'-কে সূত্রে বাঁধতে অনেকেই চেষ্টা করেছেন বটে; কিন্তু আজও পর্যন্ত কেউই কৃতকার্য হন নি। এখানে প্রাণধর্মের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতে হয়। প্রাণের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হোল 'irreversibility'। উদাহরণ দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বুঝিয়েছেন, খাঁটি জড় মাত্রেই 'reversible'; অর্থাৎ, জড়পদার্থের সমস্ত আচরণই পাল্টান-যোগ্য। কিন্তু প্রাণের আচরণকে পাল্টান যায় না। নব নব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি ক'রে প্রাণ অবিরাম চলছে। প্রাণ একবার যে পথে চলে সে পথে আর কোনোদিনই ফিরে আসে না। চলার পথে প্রাণ পুরাতনের সঙ্গে নূতনকে সংযুক্ত করে; অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে উৎপত্তি বা সৃষ্টি করে। প্রাণের নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে। অতীতের সমস্ত ঘটনা বয়ে নিয়ে প্রাণ নিত্য নূতন পথে চলে। চলার পথে প্রাণের রয়েছে স্বাধীনতা। কিন্তু জড়ের কোনো ইতিহাস বা স্বাধীনতা নেই। অতীতের কোনো চিহ্নই জড়পদার্থে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাণ সমস্ত চিহ্ন কুড়িয়ে নিয়ে চলে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রাণ নব নব ইতিহাস রচনা ক'রে নিত্য নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, জীবনযুদ্ধে প্রাণের যে অপচয় চোখে পড়ে, প্রাণের প্রবাহকে রক্ষার জন্যেই সে অপচয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাণ যে বিরোধের কাহিনী রচনা ক'রে চলেছে, প্রাণকে রক্ষার জন্যেই তার উপযোগিতা।

পরবর্তী রচনা 'প্রজ্ঞার জয়' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাণময় জগৎ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর মনোময় জগতে প্রবেশ করলেন। প্রাণের ধর্মই হোল বিরোধ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এই বিরোধ প্রাণীদের জ্ঞাতসারে ঘটছে কি না। প্রাণীরা সচেতন ভাবে এই বিরোধে লিপ্ত হচ্ছে কি না। বৈজ্ঞানিকের বিচারভূমিতে দাঁড়িয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এ প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে চেতন ও অচেতমের প্রশ্ন এসে পড়ে। চেতনার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর দার্শনিকের তত্ত্বান্বেষী জগতে প্রবেশ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর শুধুমাত্র নিজের চেতনাকেই বলেছেন চেতনা ; অন্যের চেতনা, যা' কল্পনা ক'রে নিতে হয়, তাকে বলেছেন 'চেতনাভাস বা জ্ঞান'। এইখানে তাঁর মৌলিকত্ব। ইংরেজীতে উভয় প্রকার চেতনাকেই বলা হয় 'Consciousness'। উভয় চেতনাকেই 'Consciousness' বলার ত্রুটি কোথায়, প্রসঙ্গতঃ কার্ল পিয়ার্সন প্রমুখ ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের উক্তি আলোচনা ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর তা' দেখিয়েছেন। এই আলোচনায় গভীর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আলোচ্য প্রবন্ধে কোথাও প্রাধান্য লাভ করে নি। এখানে প্রজ্ঞার আলোচনা করা হয়েছে জীববিজ্ঞানীর বিচারভূমিতে বসে। এই প্রজ্ঞার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমেই 'instinct' বা সংস্কারের প্রশ্ন এসে গেছে। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, পশুপক্ষীর জীবনযাত্রায় সংস্কারই প্রধান, বুদ্ধিবৃত্তির স্থান সেখানে নগণ্য। কিন্তু মানুষের বেলায় সংস্কার যেখানে পথ দেখায় না, বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে পথ নির্দেশ করে। পশুপক্ষীর কাল সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ; কিন্তু মানুষ কালকে অতীত ও ভবিতব্যের দিকে সম্প্রসারিত ক'রে দিয়েছে। মানুষের সাফল্যের মূল এইখানে। মানুষ অন্যান্য মানুষকে আত্মতুল্য মনে ক'রে তাদের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে শিখেছে। অভিজ্ঞতালব্ধ এই যে ক্ষমতা, এই ক্ষমতাই হোল মানুষের 'প্রজ্ঞা বা Reason'। এই প্রজ্ঞারই সাহায্যে মানুষ অসীম দেশ ও অনন্ত কালের রচনা করেছে ; বৈজ্ঞানিক রচনা করেছে 'বাঙ্ময় জগৎ'। জীবনযুদ্ধে মানুষের যে সাফল্য, এর মূলেও এই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাই মানুষকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্তব্য নির্ধারণে সাহায্য করে। জীবনযুদ্ধে প্রাণ আপনাকে রক্ষা করতে চায় বলেই এই প্রজ্ঞার সৃষ্টি।

'চঞ্চল জগৎ'-এ রামেন্দ্রসুন্দর জগৎপ্রবাহের আরও গভীরে প্রবেশ

করলেন। এখানে তাঁর বক্তব্য,—বাহ্যজগৎ নয়—জীবই চঞ্চল। জীবই আপন চাঞ্চল্যকে বাহ্যজগতে ছড়িয়ে দিয়ে জগৎকে চাঞ্চল্যে পূর্ণ ক'রে। আলোচ্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব। রামেন্দ্রসুন্দর প্রাণকেই প্রথম স্বীকার্য ধ'রে নিয়ে জগৎতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। জড়বাদীদের মতো জড় থেকে প্রাণীর উৎপত্তি বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। 'প্রাণি-বিদ্যার চশমা চোখে' দিয়ে তিনি জগৎপ্রবাহের সূত্র অনুসন্ধান করেছেন— 'প্রাণের সম্পর্কে জড়ের তাৎপর্য্য' বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এখানেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। আমাদের প্রত্যক্ষ দেশ কিভাবে 'ত্রিধা-বিস্তীর্ণ' হয়ে পড়েছে, আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাণিবিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে তিনি তা' বোঝাতে চেয়েছেন। আমাদের 'muscular feeling' বা 'প্রযত্ন-বুদ্ধি'র ব্যাখ্যা ক'রে প্রত্যক্ষ দেশের এই ত্রিধা-বিস্তৃতি বোঝান হয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার কালে মাংসপেশীর যে কুঞ্চন ও প্রসারণ হয়, তা' থেকে একটা 'বেদনা-বুদ্ধি' জন্মে। তিন মুখে চললে তিন রকমের বেদনা-বুদ্ধি জন্মে। রামেন্দ্রসুন্দর এই বেদনা-বুদ্ধিকেই বলেছেন 'muscular feeling' বা 'প্রযত্ন-বুদ্ধি।' দেশজ্ঞানের মুখ্য সহায়ক হিসাবে এই প্রযত্ন-বুদ্ধির উপযোগিতা বোঝাতে গিয়ে তিনি মনোবিজ্ঞানকে যুক্তির অসমতলে দাঁড় করিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, এই 'muscular feeling' বা প্রযত্ন-বুদ্ধির অনুভূতি হয়ে থাকে মানুষের চলার অনুভূতি থেকে। এই বুদ্ধির সাহায্যেই মানুষ প্রত্যক্ষ বস্তুর দূরত্ব নিরূপণ করে। তবে তাঁর মতে, মানুষের চলা বা গতিক্রিয়াটা প্রত্যক্ষ নয়, এই চলার অনুভূতি বা প্রযত্ন-বুদ্ধিই প্রত্যক্ষ। যেখানে এই অনুভূতির অভাব, সেখানে আমরা স্থির। যেখানে এই অনুভূতি বর্তমান, সেখানে আমরা চঞ্চল বা গতিশীল। বাহ্যদ্রব্যের যে অস্থিরতা বা গতি, তা' হোল মানুষেরই অস্থিরতা। মানুষেরই গতি বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে বাহ্যদ্রব্যে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং বাহ্যদ্রব্যকে গতিময়তা ও অস্থিরতা দিচ্ছে। এই বক্তব্যকে অতি সুন্দর উপমা ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার মাধ্যমে সুপরিস্ফুট করা হয়েছে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন 'muscular feeling' বা প্রযত্ন-বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয় ক'রেই পরিতুষ্টি লাভ করতে পারে নি ; প্রযত্ন-বুদ্ধির উপযোগিতা কোথায়, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই তাঁর মনে এসেছে। ইতিপূর্বে রামেন্দ্রসুন্দর বারবার বলতে চেয়েছেন, প্রাণের কাহিনী মানেই বিরোধের কাহিনী। বিরোধ আছে বলেই জীবনযাত্রা। এই বিরোধের

পরিণাম প্রাণিদেহের ক্লেশ ও ক্ষয় এবং পরিশেষে মৃত্যু। এবার তিনি দেখালেন, প্রযত্ন-বুদ্ধির মূলে ক্লেশ। কারণ, প্রাণীর গতিক্রিয়ার সময় প্রাণি-দেহের ক্লেশ ও ক্ষয় হয়ে থাকে। এই ক্লেশই যখন বিরোধের সহকারী তখন প্রযত্ন-বুদ্ধিও বিরোধের সহায়ক। এই বেদনা ও ক্লেশকে বিশ্বজগতে ছড়িয়ে দিয়ে প্রাণী বিরোধের কাহিনী রচনা করেছে; প্রাণিজগতের আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এই উপসংহারে পৌছুলেন। কিন্তু প্রাণ কেন বিরোধের কাহিনী রচনা করল, কেন বেদনাকেই কামনা বলে মেনে নিল—জগৎরহস্যের এই বিরাট জিজ্ঞাসার মুখোমুখি এসে রামেন্দ্রসুন্দর থমকে দাঁড়ালেন। বিচিত্র জগতের আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৯১৯)। তা' সত্ত্বেও বিচিত্র জগতে তিনি যতদূর আলোচনা করেছেন—জগৎপ্রবাহের যতখানি গভীরে প্রবেশ করেছেন, দৃষ্টিকোণের অভিনবত্ব, চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নতা ও অনুভূতির গভীরতার দিক থেকে তা' অনন্য। বিচিত্র জগতের আর একটি বৈশিষ্ট্য, গ্রন্থটির সরস ভাষা ও মনোরম প্রকাশভঙ্গী। যায়গায় যায়গায় চমৎকার উপমা রচনাকে আশ্চর্য রমণীয়তা দান করেছে। যেমন, 'ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশে উভয় জগতের তুলনা,

> "ব্যাবহারিক জগৎ যেন একখানা drama ;—উহার একটি plot আছে, একটা end আছে, গোড়ায় একটা design আছে,—অঙ্কের পর অঙ্ক, একটা উদ্দেশ্য purpose লইয়া আসে; কেহই নিরর্থক আসে না। আর প্রাতিভাসিক জগৎ যেন একটা Epic poem ; ঘটনাবহুল, বিচিত্র, উচ্ছৃঙ্খল; সর্ব্বত্রই একটা উলটপালট, বিপর্য্যয় ও বিপ্লবের কাণ্ড। দেখিলে তাক্ লাগে; হাসিতে হয়; কাঁদিতে হয়; অভিভূত হইতে হয়; পুলকিত হইতে হয়;—কিন্তু কোথায় কি উদ্দেশ্যে চলে, তাহা বলা যায় না।"

অন্যত্র,

> "প্রাণ একটা ছন্দোময় পদার্থ; উহার মাঝে মাঝে যতি ও বিরাম আবশ্যক;—গানের মত পদার্থ; মাঝে মাঝে তাল দিয়া, ফাঁক বসাইয়া উহার সুর রক্ষা করিতে হয়।"

(প্রাণের কাহিনী)

পাঁচ

রামেন্দ্রসুন্দরের পরবর্তী বিজ্ঞানগ্রন্থ 'জগৎ-কথা' গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থের কিছু অংশ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'জগৎ-কথার' ছাপার কাজ চলবার সময় রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যু হয়। পরে প্রধানতঃ জগদানন্দ রায়ের প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। সাময়িক-পত্রে প্রকাশের কালকে মোটামুটিভাবে আলোচ্য বিষয়বস্তুর রচনাকাল বলে ধ'রে নিলে দেখা যায়, জগৎ-কথার অধিকাংশ অংশই জিজ্ঞাসার পরবর্তী কালের এবং বিচিত্র জগৎ-এর পূর্ববর্তীকালের রচনা। জগৎ-কথায় রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিভঙ্গী খাঁটী বৈজ্ঞানিকের। এখানে তিনি জগৎকে দেখেছেন জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বিচার বা বিশ্লেষণ করার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিচয় এখানে নেই। গভীর বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টিরও এখানে একান্ত অভাব। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানসাহিত্যে আলোচ্য গ্রন্থটি খাপছাড়া। বস্তুতঃ, সাময়িক-পত্রে প্রবন্ধ-প্রকাশের কাল ধ'রে বিচার করলে, জিজ্ঞাসা থেকে বিচিত্র জগৎ পর্যন্ত (১২৯৯-১৩২৪) রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানসাহিত্যে যে বিজ্ঞানদর্শনের যুগ চলেছিল সেই যুগে আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধের রচনা (১৩১৭-১৩১৮) কিছুটা অভিনব বলেই মনে হয়।

জগৎ-কথায় প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জড় শব্দকে গ্রহণ করা হয় নি। ইংরেজীতে 'matter' বলতে যা' বোঝায় অর্থাৎ, চুনা-পাথর থেকে সুরু ক'রে জীবদেহ পর্যন্ত সব কিছুকেই জড় অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। রামেন্দ্র-সুন্দরের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে জড়বাদী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের। তবে বৈজ্ঞানিকের সীমিত জ্ঞান সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের যে সংশয় ছিল, তার পরিচয় এখানেও যায়গায় যায়গায় বিদ্যমান। বিজ্ঞানের স্থূল বিষয় নিয়ে আলোচনার কালেও রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানবিদ্যার আবিষ্কারের গণ্ডী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

জগৎ-কথায় পদার্থবিজ্ঞানেরই প্রাধান্য। তবে প্রাথমিক রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাও এতে কিছু কিছু আছে। আলোচনা সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। বিজ্ঞানের গাণিতিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই আলোচনা করা হয় নি। জড়-বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বাদি জনসাধারণ যা'তে বুঝতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা ও বিচিত্র জগৎ-এ ভাষার যে গাম্ভীর্য রয়েছে, এখানে তা' নেই। এখানে

আলোচ্য বিষয়বস্তুর অধিকাংশই বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বাদি নিয়ে। বিষয়-বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখেই লেখক এখানে অতি সরল ও সহজ ভাষায় বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশ করেছেন। জগৎ-কথায় রামেন্দ্রসুন্দরের বর্ণনাভঙ্গী গল্পের মতো সুখপাঠ্য।

ছয়

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও লিখেছিলেন। সবগুলি পুস্তকই বিজ্ঞান বিষয়ক। বাংলায় রচিত রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম[৮] বিজ্ঞানগ্রন্থ 'পদার্থবিদ্যা' ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বালকদের উদ্দেশ্যে লেখা। সহজ কয়েকটি পরীক্ষাকে কেন্দ্র ক'রে পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলতত্ত্ব এখানে আলোচিত। রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে যে আধুনিকতার সূত্রপাত করেছিলেন, তার ইঙ্গিত এই গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের পরিকল্পনায় তৎকালীন যুগের নব্যপন্থা অনুসৃত। ইতিপূর্বে বাংলায় রচিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই গ্যানোর গ্রন্থকে অবলম্বন ক'রে রচিত হয়। কিন্তু গ্যানোর ব্যাখ্যা-প্রণালী অনেক স্থলে ত্রুটিপূর্ণ। গ্যানোর গ্রন্থের ত্রুটিগুলি পরিহার ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটির পরিকল্পনায়ও আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে এই গ্রন্থে গতির নিয়ম তিনটি আলোচিত। এখানে 'বলের' ব্যাখ্যা করা হয়েছে কির্কফ্ ও অধ্যাপক টেটের প্রদর্শিত পন্থায়। 'পদার্থবিদ্যা'য় জড়পদার্থের ব্যাপ্তি, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ এবং তাপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে পরিভাষার ব্যবহারে কোনোরূপ নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয় না। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবার চেষ্টা করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের পরবর্তী পাঠ্যপুস্তক 'ভূগোল' ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন মহাদেশের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল গ্রন্থটির প্রধান আলোচ্য বিষয়। প্রথম অধ্যায়ে ভূবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা

৮ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম গ্রন্থ ইংরেজীতে লেখা 'Aids to Natural Philosophy' ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত হলেও মনোজ্ঞ। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব হোল, এখানে বিভিন্ন মহাদেশের ইতিহাস আলোচনা ক'রে প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে মানুষের ইতিহাসের সম্বন্ধ নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দর আরও দু'টি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। গ্রন্থ দু'টির নাম, 'বিজ্ঞান পাঠ, ১ম ও ২য় মান' (১৯০২) এবং 'বিজ্ঞান-কথা'।

সাত

বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধেও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বরাবরই সচেতন ছিলেন। তিনি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলি হোল, 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' (১৩০১, ২য় সংখ্যা), 'রাসায়নিক পরিভাষা' (১৩০২, ২য় সংখ্যা), 'বৈদ্যক পরিভাষা' ও 'ভৌগোলিক পরিভাষা' (১৩০৬, ৪র্থ সংখ্যা) এবং 'শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা' (১৩১৭, ৪র্থ সংখ্যা)। উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে এক-মাত্র 'ভৌগোলিক পরিভাষা' ছাড়া সবগুলি প্রবন্ধই রামেন্দ্রসুন্দরের 'শব্দ-কথা' (১৯১৭) নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই সকল প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন গ্রন্থ আলোচনা ক'রে রামেন্দ্রসুন্দরের মতে ও পথে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের ভাষা নিয়ে আলোচনা করা চলে।

রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষায় 'বাঙ্গালীর স্বভাবের উপযোগী' বিজ্ঞানের ভাষা সংকলন করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ ক'রে বাংলা বিজ্ঞানের ভাষাকে পুষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে চলিত বাংলার দাবীকেও তিনি একেবারে উপেক্ষা করেন নি। বস্তু, কাজ প্রভৃতি কতকগুলি প্রচলিত বাংলা শব্দকে নির্দিষ্ট অর্থে তিনি নিজেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পদার্থবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থে পরিভাষার ব্যবহারে তিনি গতানুগতিক রীতির প্রতিই আনুগত্য দেখিয়েছেন বলে মনে হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজী শব্দ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন বটে ; কিন্তু ইংরেজী উচ্চারণ ঠিক রেখে শুধুমাত্র শব্দগুলোর হরপ পরিবর্তন ক'রে সেগুলোকে বাংলায় ব্যবহারের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,

"বাক্যের সহিত অর্থের হরগৌরী-সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক; বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অর্থ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিজাতীয় অনাত্মীয় বাক্য আমাদের সাধারণের নিকট স্বতঃ অর্থহীন; সবিশেষ অভ্যাসসহকারে ও চেষ্টাসহকারে অর্থকে মনে টানিয়া আনিতে হয়; অর্থ আপনা হইতেই মনে আসে না। সুতরাং কেবল মাত্র ইংরেজী শব্দগুলি বাঙ্গালা হরপে বসাইয়া পরিভাষা প্রণয়নে চেষ্টা করিলে উহাতে ফলোদয় হইবে না।"

(রাসায়নিক পরিভাষা)

রামেন্দ্রসুন্দর সরলতা ও শ্রুতিমধুরতার দিকে লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিক শব্দ সংকলনের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ ক'রে প্রয়োজনবোধে আভিধানিক শব্দকে পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা বা অভিধান বহির্ভূত নূতন শব্দ সৃষ্টি করার ব্যাপারেও তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। তবে যেখানে সুন্দর ও শ্রুতিমধুর সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ বর্তমান রয়েছে, সেখানে বাংলায় নতুন শব্দ সৃষ্টি করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

"শব্দ সৃষ্টি করা দুরূহ; প্রাচীন শব্দের নূতন পারিভাষিক অর্থ দেওয়া ভিন্ন বৈজ্ঞানিক লেখকের গত্যন্তর নাই।"

(জগৎ-কথা : কঠিন পদার্থ)

তাঁর রচনায় সংস্কৃত শব্দকে নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহারের প্রচেষ্টা দেখা যায়। সংস্কৃত শব্দকে বাংলায় ব্যবহার ক'রে তিনি বিজ্ঞানালোচনার অনেক যায়গায় ভাষাবিভ্রাট এড়াতে চেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ যে কোনো বায়বীয় পদার্থ বোঝাতে সংস্কৃত 'অনিল' শব্দটির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। বাংলায় যে কোনো প্রকার বায়বীয় পদার্থকে বায়ু বলা হয়। চিরপরিচিত বাতাস থেকে সুরু ক'রে সোডাওয়াটারের বায়ু ও দাহ্য বায়ু—সবই বায়ু নামে অভিহিত। এতে ক'রে বিজ্ঞানের ভাষায় যে বিভ্রাট ঘটবার সম্ভাবনা, রামেন্দ্রসুন্দর তা' এড়াতে চেয়েছিলেন। ইংরেজীতে যে কোনো প্রকার বায়বীয় পদার্থ বোঝাতে 'গ্যাস' (Gas) শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং আমাদের চিরপরিচিত বাতাসকে ইংরেজীতে বলা হয় Air। গ্যাস-এর অনুরূপ অর্থে

রামেন্দ্রসুন্দর 'অনিল' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। বৈজ্ঞানিক শব্দ সংকলনের সময় যায়গায় যায়গায় সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হলেও রামেন্দ্রসুন্দর লক্ষ্য রেখেছেন, আহৃত শব্দগুলো যা'তে চলতি ভাষায় চলবার উপযোগী হয়। এজন্যেই তিনি সংস্কৃত 'মরুৎ' শব্দটি বাদ দিয়ে 'অনিল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তবে বিজ্ঞানালোচনার বহু ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার দ্বারস্থ হলেও রামেন্দ্রসুন্দর বরাবরই লক্ষ্য রেখেছেন, সংকলিত বিদেশী শব্দগুলো বাংলা ভাষার ধাতের সঙ্গে যা'তে বেমানান না হয়। যে কোনো প্রকার বায়বীয় পদার্থ বোঝাতে ইংরেজী 'গ্যাস' শব্দটি তাঁর মনঃপূত হয় নি বলেই তিনি সংস্কৃত ভাষার সাহায্য নিয়েছিলেন।

বিজ্ঞানের ভাষা সংকলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে সংস্কৃত ভাষার সাহায্য নিলেও কোনোরূপ গোঁড়ামির পক্ষপাতী তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্টই বলেছেন,

> "বোধ করি, কোন ভাষাতে এমন কোন শব্দ প্রচলিত নাই, সংস্কৃত ভাষার অতলস্পর্শ সমুদ্র মন্থন করিলে যাহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ না মিলিতে পারে। তথাপি বিদেশী সামগ্রী গ্রহণ করিব না, এরূপ পণ ধরিয়া বসার কোন প্রয়োজন দেখি না।"
>
> (বৈজ্ঞানিক পরিভাষা)

রামেন্দ্রসুন্দর 'স্থায়ী' বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সমর্থক ছিলেন। পরিভাষার আকস্মিক ও মৌলিক পরিবর্তন তিনি সমর্থন করেন নি। তাই বলে এই ব্যাপারে রক্ষণশীল মনোবৃত্তিকেও তিনি কোনোকালে প্রশ্রয় দেন নি। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ভাষার সংস্কার তিনি সমর্থন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য,

> "জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে বিজ্ঞানের ভাষার পরিধি ও প্রসার বিস্তৃত হয়। ভাষা নূতন ভাবে গঠিত হয়। নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হয়; নূতন শব্দের প্রণয়ন করিতে হয়।"
>
> (বৈজ্ঞানিক পরিভাষা)

পরিভাষা সংকলনের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন আধুনিক-পন্থী। প্রাচীনত্বের মোহ ত্যাগ ক'রে সর্বাপেক্ষা আধুনিক পদ্ধতিতে তিনি পরিভাষা সংকলনের

পক্ষপাতী ছিলেন। পদার্থের গুণের বা ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে পরিভাষার প্রণয়ন তিনি কোনোকালেই সমর্থন করেন নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য,—রামেন্দ্রসুন্দরের সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী যুগে বহু গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক শব্দের অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিভাষা প্রণয়ন করেছিলেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থ বোঝাতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হোত। এই ত্রুটি ইংরেজী ভাষায়ও বিদ্যমান। বিজ্ঞানের পরিভাষা সংকলনের ক্ষেত্রে এইখানেই রামেন্দ্রসুন্দরের প্রধান আপত্তি। একই অর্থে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ পরিহার এবং সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ অর্থে শব্দ-প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁর মূল কথা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

> "প্রত্যেক শব্দ একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে; সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের প্রয়োগ করিবে না। এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূল সূত্র।"
>
> (বৈজ্ঞানিক পরিভাষা)

রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক শব্দের পারিভাষিক অর্থ সম্বন্ধে বরাবরই সচেতন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

> "বৈজ্ঞানিকের ভাষা একটু স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগেই শব্দগুলির নির্দ্দিষ্ট বাঁধাবাধি অর্থ করিয়া লইতে হয়; চলিত ভাষায় যেমন এলোমেলো নানা অর্থ থাকে, সেরূপ থাকিলে চলে না; এই নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ অর্থের নাম পারিভাষিক অর্থ।"
>
> (জগৎ-কথা : স্থিতিস্থাপকতা)

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শব্দ-প্রয়োগের পূর্বে শব্দটির পারিভাষিক অর্থ তিনি নিজেই ঠিক ক'রে নিয়ে আলোচনায় এগিয়েছেন। যেমন, জিজ্ঞাসার 'পঞ্চভূত' শীর্ষক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমেই 'ভূত' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ ঠিক ক'রে নিয়েছেন। প্রাচীন পণ্ডিতেরা পাঁচটি ভূত অর্থে যে পাঁচটি মূল পদার্থ বা এলিমেণ্টকে বোঝান নি, জড়পদার্থকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন মাত্র, একথা গোড়াতেই তিনি বুঝিয়ে বলেছেন। এই গ্রন্থেরই 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' নামক প্রবন্ধে 'কাজ' শব্দটির পারিভাষিক অর্থের ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'বিচিত্র জগৎ'-এর 'প্রজ্ঞার জয়' নামক প্রবন্ধে

'চেতনা'র পারিভাষিক অর্থ নিয়ে আলোচনায় ভাষা সম্বন্ধে তাঁর পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। জগৎ-কথায় দেখা যায়, বিজ্ঞানবিত্থার স্থূল বিষয় নিয়ে আলোচনার কালে বৈজ্ঞানিক শব্দের পারিভাষিক অর্থ সম্বন্ধে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই গ্রন্থের 'বল' নামক অধ্যায়ে 'বল' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ আগেই ঠিক ক'রে নিয়ে তিনি আলোচনায় এগিয়েছেন। 'বস্তু' শীর্ষক অধ্যায়ের গোড়াতেই বস্তুর পারিভাষিক অর্থ ঠিক ক'রে নেওয়া হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, mass এবং inertia একার্থক হলেও তিনি এক্ষেত্রে ইংরেজীর ন্যায় বাংলাতেও দু'টি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। Mass-কে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন বস্তু; আর inertia-কে জড়ত্ব। 'জগৎ-কথা'র 'রাসায়নিক সম্মিলন' শীর্ষক অধ্যায়ে 'মেলা' আর 'মেশা'র পারিভাষিক অর্থের ব্যাখ্যাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, দু'টি জিনিস যখন যে কোনো ভাগে মিশ্রিত হয়, তখন বলা হয় মেশা; আর ভাগের একটা বাঁধাবাধি নিয়ম থাকলে বলা হয় মেলা বা রাসায়নিক সম্মিলন। 'জগৎ-কথা'র 'ঘর্ম্মমান' নামক অধ্যায়ে, তাপ আর উষ্ণতা এক জিনিস নয়, একথা বুঝিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর থার্মোমিটারের বাংলা 'তাপমানযন্ত্র' নামটির ত্রুটি অতি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। থার্মোমিটার দিয়ে মাপা হয় উষ্ণতা। অতএব, তাঁর মতে, এর নাম বরং উষ্ণতামান হওয়া উচিত। রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমে উষ্ণতামান নামটিরই প্রস্তাব করেছিলেন। পরে তিনি এর নামকরণ করেন 'ঘর্ম্মমান'।

কয়েকটি প্রচলিত নাম ছাড়া মূল পদার্থগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর অনুবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন মূল পদার্থ ও সেই সকল পদার্থ থেকে উৎপন্ন অসংখ্য যৌগিক পদার্থের পারিভাষিক নামগুলো বাংলায় অনুবাদে কোনোকালেই তাঁর সমর্থন ছিল না। তবে গন্ধক, লোহা, তামা প্রভৃতি যে সকল মৌলিক পদার্থের নাম বহুকাল থেকে জনসমাজে প্রচলিত, সেগুলোকে অবিকৃতভাবে তিনি নিজেই ব্যবহার করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর মূল পদার্থের বিদেশী নামগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী কিছুটা পরিবর্তন ক'রে নিয়ে বাংলা হরপে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। শব্দগুলোর শ্রুতিমধুরতা এবং সেই সকল শব্দের উচ্চারণে যাতে অসুবিধা না হয়, সেদিকেও তাঁর নজর ছিল। আবার যে সকল নাম বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও জন-সমাজে প্রচলিত হয় নি বা চলতি কথাবার্তায় স্থান পায় নি, তিনি সে সকল

নাম পরিত্যাগ ক'রে মূল পদার্থগুলোর বিদেশী নামই ব্যবহার করেছেন। অম্লজান, যবক্ষারজান, উদজান ইত্যাদি শব্দ তৎকালীন বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও কোনোকালেই চলতি কথাবার্তায় স্থান পায় নি। এজন্যেই দেখা যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ঐ শব্দগুলোর ইংরেজী নাম অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদিই ব্যবহার করেছেন। অবশ্য রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ 'পদার্থ-বিদ্যা'য় মূল পদার্থের নামকরণের ক্ষেত্রে প্রাচীন রীতিই অনুসৃত।

মোট কথা,—সুবিধা, শ্রুতিমধুরতা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে, ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ ক'রে, সুনির্দিষ্ট ও বাঁধাধরা অর্থে বিজ্ঞানের ভাষার ব্যবহারই রামেন্দ্রসুন্দরের অভিপ্রেত ছিল।

আট

বিভিন্ন প্রবন্ধপুস্তক এবং পরিভাষা সম্পর্কে রচনাগুলি ছাড়াও রামেন্দ্র-সুন্দর আরও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[৯] 'নিকলা তেস্‌লা' (সাহিত্য ও বিজ্ঞান, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩০০) শীর্ষক প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রগতিকে কেন্দ্র ক'রে রচিত। এখানে ফ্যারাডে, ম্যাক্স্‌ওয়েল, হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ্‌, হার্ৎজ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার সংক্ষেপে আলোচনার পর তেস্‌লার আবিষ্কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তবে তেস্‌লা সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই এতে আছে। ১৩০০ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত 'ফটোগ্রাফি' শীর্ষক প্রবন্ধটি শেষদিকে কিছুটা টেক্‌নিক্যাল প্রকৃতির।

জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর দু'টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার' ১৩০৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রগতিকে কেন্দ্র ক'রে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে এখানে সর্বসাধারণের উপযোগী আলোচনা করা হয়েছে। জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে অপর প্রবন্ধ 'অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার' (বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১৩০৮) টেক্‌নিক্যাল প্রকৃতির রচনা। ১৩০৮ সালের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রদীপ'-এ প্রকাশিত 'জড় ও চৈতন্য' একটি বিজ্ঞাননির্ভর দার্শনিক প্রবন্ধ।

৯ এই সকল প্রবন্ধ এতকাল বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে ছড়িয়ে ছিল। কিছুদিন আগে (চৈত্র, ১৩৬৩) এই রচনাগুলো সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় 'রামেন্দ্র-রচনাবলী—ষষ্ঠ খণ্ড' নামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এ ছাড়া 'সাহিত্য' পত্রিকায় মাঝে মাঝে রামেন্দ্রসুন্দর 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' লিখতেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছোটদের জন্যেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের অধিকাংশই শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলোর বৈশিষ্ট্য, ছোটদের জন্যে লিখিত হলেও বৈজ্ঞানিক তথ্যকে এখানে উপেক্ষা করা হয় নি। ছোটদের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে রচনা দুরূহ হয়ে পড়বার ভয়ে বিজ্ঞানের তথ্যকে অনেকেই উপেক্ষা করেন। ফলে প্রবন্ধগুলো কাহিনীর লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা এর ব্যতিক্রম। মুকুল পত্রিকায় প্রকাশিত এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'আমরা কি খাই?' (ভাদ্র, ১৩০২), 'মেরুপ্রদেশ' (আশ্বিন, ১৩০২) ও 'নিউটনের কীর্ত্তি' (ফাল্গুন, ১৩০২)।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানসাহিত্যের অধিকাংশ প্রসঙ্গই বিশ্বপ্রকৃতির অজানা ও রহস্যময় দিক নিয়ে। দর্শনের রাজপথে বিজ্ঞানকে পাথেয় ক'রে জগৎরহস্যের রাজদরবারে তিনি অভিসারে বেরিয়েছেন। জগৎরহস্যের কিনারা করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়; এই অভিসার তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের অভিসার একেবারে ব্যর্থ হয় নি। জগৎরহস্যের গোড়ায় পৌছুতে গিয়ে তিনি পথের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, বিশ্বজগতের যে রূপ ও প্রকৃতি দর্শন করেছেন, তা' তাঁর সাহিত্যে বাণীরূপ লাভ করেছে। রামেন্দ্রসাহিত্য তাই বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বোধশক্তির গভীরতা, প্রকাশভঙ্গীর সংযম এবং ভাষার লালিত্য তাঁর সাহিত্যকে একটি আশ্চর্য বিশিষ্টতা দান করেছে। রামেন্দ্র-সুন্দরের রচনার এই গুণগুলো স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা যায়, অতিকথন তাঁর রচনার প্রধান ত্রুটি। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, একই কথা বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি বারবার বলেছেন। সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে এরূপ পুনরুক্তি আপাতঃ-দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলে মনে না হলেও দু' এক যায়গায় এই ত্রুটি কিছুটা যেন বেশী বলেই প্রতীয়মান হয়। এই ত্রুটির মূলে রয়েছে এক একটি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রতি (যেমন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ) তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। এই

ত্রুটি সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, রামেন্দ্রসুন্দরই বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। ভাষার গাম্ভীর্য ও প্রকাশভঙ্গীর লালিত্যের দিক থেকেই শুধু নয়, বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের যতখানি গভীরে তিনি অনুপ্রবেশ করেছেন, অথবা বিজ্ঞানকে বাহন ক'রে জগৎরহস্যের মূলে পৌছুবার যতখানি প্রচেষ্টা তাঁর রচনায় পাওয়া যায়, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের অপর কোনো লেখকের রচনায় তা' দুর্লভ।

নব্যভারত, সাহিত্য, সাধনা ও সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা

অক্ষয়কুমার দত্তের যুগে যেমন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর যুগেও তেমনি কয়েকটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্রকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধিত হোল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত কয়েকটি উচ্চাঙ্গের সাময়িক-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে স্থান পেল। এই শ্রেণীর সাময়িক-পত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—নব্যভারত, সাহিত্য, সাধনা ও সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনায় এদের অবদান নগণ্য নয়। আধুনিক বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তীক্ষ্ণ যুক্তিজাল ও সূক্ষ্ম বিচারপ্রণালী এবং গভীর দার্শনিক দৃষ্টি এই সকল পত্রিকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দেখা গেল। এ ছাড়া মৌলিক গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং বৈজ্ঞানিকদের লেখা বিজ্ঞানসাহিত্য এই সকল পত্রিকার বৈজ্ঞানিক রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানালোচনায় দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেল নব্যভারত, নবজীবন ও সাহিত্য পত্রিকায়।

এক

নব্যভারতের বৈশিষ্ট্য পদার্থবিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক-জীবনী বিষয়ক রচনায়। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো আলোচনায় চলতি ভাষা ব্যবহারের প্রচেষ্টা দেখা গেল। এই প্রসঙ্গে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'গতি রহস্য' (ভাদ্র, ১২৯৩) শীর্ষক রচনাটি উল্লেখযোগ্য। এখানে নিরপেক্ষ গতি, নিরপেক্ষ বিশ্রাম ইত্যাদি প্রসঙ্গ কথোপকথনের মাধ্যমে বর্ণিত। বৈজ্ঞানিক সত্য কিছু কিছু থাকলেও সস্তা পরিহাসপ্রিয়তার চেষ্টা এবং যায়গায় যায়গায় গুরুচণ্ডালী দোষ রচনাটির সাহিত্যরস নষ্ট করেছে। জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল শশধর রায়ের রচনায়। এই প্রসঙ্গে 'বস্তু ও অ-বস্তু' (বৈশাখ, ১৩১৪) শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। রচনার নিদর্শন :—

বস্তু ও অ-বস্তু

…দেশ কালের অতীত সত্য কি? উহা পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে পারে না। যাহা ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, উঠিতেছে,

পড়িতেছে, তাহা নিত্য-সত্য কখনই নহে। যাহা রূপের অধীন, তাহা আজি একরূপ, কালি অন্যরূপ। যাহা ভাবের অধীন, তাহা আজি একভাব, কালি অন্যভাব। এ সকল কখনই চিরন্তন সত্য নহে। জগতের যে অংশ মানব দেখিতেছে কিম্বা বুঝিতেছে, তাহা সকলই ঐরূপ। সুতরাং উহা কখনই নিত্য-সত্য হইতে পারে না। তবে উহা কি ?

এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় যে, উহা বস্তু-পদার্থের সমষ্টি মাত্র। বস্তু বলিতে আমরা যাহা বুঝি,—কঠিন, তরল অথবা বায়ব্য, যে রূপই হউক,—সেই রূপেরই বস্তু পদার্থের সমষ্টি লইয়া (পরিদৃশ্যমান) জগৎ। বস্তু-পদার্থ রূপ-বিশিষ্ট। যাহা বস্তু, তাহার রূপ স্বীকার করা মানবের স্বভাবসিদ্ধ। ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, রূপ কল্পনা না করিয়া মানব থাকিতে পারে না। কিন্তু রূপ তো নিশ্চয়ই অনিত্য ; সুতরাং রূপ নিত্য সত্য হইতে পারে না। কাজেই রূপকে উপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু বস্তু পদার্থের রূপ গেলে আর থাকে কি ? থাকে কেবল শক্তি। যে শক্তির বশে রূপ নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, রূপ গেলে থাকে কেবল সেই শক্তি।

এই পত্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'জড়তত্ত্ব' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬), 'অণু ও পরমাণু' (মাঘ, ১৩২৩), 'জড়ের মূল উপাদান' (শ্রাবণ ১৩২৩ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত) এবং 'রঞ্জন-রশ্মি' (মাঘ, ১৩২৬)।

নব্যভারত পত্রিকার বৈজ্ঞানিক-জীবনী পর্যায়ের রচনায়ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল। বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ, এই সকল রচনার কোনো কোনোটি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের লেখা। উদাহরণস্বরূপ, ডাঃ মেঘনাদ সাহার 'আইন্‌স্টাইন্ ও বর্' (পৌষ, ১৩২৯) এবং 'অ্যাস্টন্' (ফাল্গুন, ১৩২৯) শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টি উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানসাধকের দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার ও জীবনকাহিনী এখানে চিত্রিত। তাই সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক-জীবনীতে যে উচ্ছ্বাস ও কাল্পনিকতার ছাপ থাকে, এখানে তা'র অভাব। তা' ছাড়া ডাঃ সাহার রচনাভঙ্গী সহজ ও সরল। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে

আইন্‌স্‌টাইন্‌ ও বরের আবিষ্কার ও জীবন নিয়ে আলোচনা। টেক্‌নিক্যাল বিবেচনা ক'রে রিলেটিভিটি সম্বন্ধে কিছু বলা না হলেও এখানে লেখকের বলিষ্ঠ চিন্তাধারার পরিচয় সুস্পষ্ট। 'অ্যাস্‌টন্‌' নামক প্রবন্ধে বিশ্ববিখ্যাত রাসায়নিক অ্যাস্‌টনের জীবন ও আবিষ্কার আলোচনা ক'রে ডাঃ সাহা দেখিয়েছেন, অধ্যবসায় থাকলে অতি সাধারণ প্রতিভা দিয়েও কত বড় বিরাট আবিষ্কার হতে পারে। প্রবন্ধটি তরুণ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় উদ্বোধিত করবে।

ডাঃ সাহার প্রকাশভঙ্গী সংযত।[১] মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেরই বৈশিষ্ট্য। ডাঃ সাহার রচনার নিদর্শন ঃ—

আইন্‌স্‌টাইন ও বর্‌

পদার্থবিজ্ঞানের দুইটী চক্ষু। একটী গণিত, অপরটী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। কেম্ব্রিজের অধ্যাপক সার জে, জে, টম্‌সন ছাড়া অতি অল্প সংখ্যক বৈজ্ঞানিকই এই দুইটী চক্ষু দিয়া দেখিতে পারেন। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারে পরীক্ষামূলক গবেষণা করিয়াছেন, এতদিন নোবেল্‌ প্রাইজ্‌ তাঁহাদেরই একচেটিয়া ছিল। পদার্থবিজ্ঞানে, পরীক্ষামূলক গবেষণার ন্যায়, গণিতসিদ্ধ গবেষণাও যে অতি প্রয়োজনীয় আইন্‌স্‌টাইন ও বরকে পুরস্কৃত করিয়া নোবেল কমিটি এই সত্য স্বীকার করিয়াছেন। কথিত আছে বৈজ্ঞানিক বুন্‌সেন্‌ বলিয়াছিলেন, "এক আউন্স পরীক্ষালব্ধ তথ্য এক টন্‌ থিওরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" কিন্তু আমার মনে হয় বর্‌ অথবা আইন্‌স্‌টাইনের মতবাদের ন্যায় এক ছটাক থিওরি অনেক জাহাজ বোঝাই পরীক্ষিত তথ্যসংগ্রহ অপেক্ষা ওজনে ভারী।

নব্যভারত পত্রিকার জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। জীববিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক শশধর রায়। শশধর রায়ের

১ ডাঃ সাহার কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে আশাবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিজ্ঞান ও রাজনীতি' (নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩৩২) শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে এই মনোভাব সুস্পষ্ট।

বৈজ্ঞানিক রচনায় সাহিত্যরস রয়েছে। তাঁর জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'উদ্ভিদ কি সচল' (পৌষ, ১৩১১), 'বর্ণ' (অগ্রহায়ণ, ১৩১২), 'ত্বক' (চৈত্র, ১৩১৩), 'আত্মরক্ষা' (শ্রাবণ, ১৩১৫) এবং ১৩১৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'বর্ণতত্ত্ব'।

নব্যভারতে জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যোগেশচন্দ্র রায়ের 'সৌরকলঙ্ক' (কার্তিক, ১২৯৭)। প্রবন্ধটিতে লেখকের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূবিদ্যা বিষয়ক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, প্রিয়দারঞ্জন রায়ের 'হীরকের সৃষ্টিতত্ত্ব' (ফাল্গুন, ১৩৩১)। রসায়নবিদ্যা বিষয়ক একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রিয়দারঞ্জন রায়ের 'যবক্ষারজানের জন্মান্তর রহস্য' ১৩৩১ সালের পৌষ সংখ্যা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়।

দুই

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' (প্রথম প্রকাশ-১২৯৭) পত্রিকা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকরা এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখতেন। তা' ছাড়া জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের সরস বিজ্ঞানালোচনাও এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বৈচিত্র্য, মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দার্শনিক চিন্তাধারা এই পত্রিকার বিজ্ঞানসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বৈচিত্র্য জীববিজ্ঞান বিষয়ক রচনাতেই সমধিক পরিস্ফুট। প্রাকৃতিক নির্বাচন, মানবের বিবর্তন, বংশানুক্রম ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের প্রসঙ্গ ছাড়াও শারীর, প্রাণী ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শারীর ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রধান লেখক শশধর রায়। তাঁর প্রবন্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য,—'মানবদেহের পরিণতি' (ফাল্গুন, ১৩১২), 'হস্ত ও পদ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২), 'জীববস্তু' (আষাঢ়, ১৩১৬ থেকে ধারাবাহিক), 'ক্ষুদ্র-জীব' (অগ্রহায়ণ, ১৩১৬), 'মানবের বিবর্ত্তন' (আশ্বিন, ১৩১৭), 'জীববন্ধন' (আষাঢ়, ১৩১৮), 'বংশানুক্রম' (বৈশাখ, ১৩১৯ থেকে ধারাবাহিক), 'ক্ষয়াবশেষ' (ভাদ্র,

১৩২৬)। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দুমাধব মল্লিক, জগদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকরাও এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেন। সাহিত্য পত্রিকার উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রধান লেখক যোগেশচন্দ্র রায় ও প্রবোধচন্দ্র দে। সাহিত্যে প্রকাশিত যোগেশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'ঔষধিপতি' (ফাল্গুন, ১৩০৫) ও 'উদ্ভিদ্‌নামমালা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯)। উদ্ভিদের জীবন নিয়ে প্রবোধচন্দ্র দে এই পত্রিকায় অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বৈচিত্র্যের পরিচয় থাকলেও তাঁর অধিকাংশ রচনাই নীরস। প্রবোধচন্দ্রের রচনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য,—'উদ্ভিদে আলোকের প্রভাব' (মাঘ, ১৩২০), 'উদ্ভিদ-শিশুর পরিপুষ্টি' (চৈত্র, ১৩২০), 'উদ্ভিদের সুখদুঃখ' (আষাঢ়, ১৩২১), 'উদ্ভিদের ঔদাসীন্য' (ভাদ্র, ১৩২১), 'উদ্ভিদ-জীবনের অবস্থাত্রয়' (বৈশাখ, ১৩২৪) ইত্যাদি।

রসায়নবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। তবে এই শ্রেণীর কোনো কোনো প্রবন্ধে গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। কুলভূষণ লাহিড়ীর 'হিন্দুজাতির রসায়ন' (কার্তিক, ১২৯৮) ও 'হিন্দুদিগের রসায়ন' (মাঘ, ১২৯৯) এবং গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থের 'কাচ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯) প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে প্রাচীন যুগের কয়েকটি রাসায়নিক যন্ত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে হিন্দুদের ব্যবহৃত পারদ সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা। শেষোক্ত প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতে পারদের ব্যবহার নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে।

এই পত্রিকার জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধই গতানুগতিক প্রকৃতির। তবে জগদানন্দ রায়ের কোনো কোনো প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, 'নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ' (আশ্বিন, ১৩০৪)। ভূবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় নেই বললেই হয়। নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল পদার্থবিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়। এর মূলে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 'জগৎ-কথা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও দার্শনিক চিন্তামূলক তাঁর কয়েকটি উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সাধারণ বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে জগদানন্দ রায়ও এই পত্রিকায়

লিখেছেন। কদাচিৎ জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের রচনাও এতে প্রকাশিত হোত।

তিন

'সাধনা' (প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ, ১২৯৮) পত্রিকায় ঠাকুর পরিবারের বিশ্রুত সাহিত্যিকদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত। রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখকরা এই পত্রিকায় লিখতেন। সাধনার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই জীববিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে। কবি ও কথাসাহিত্যিকরা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় হাত দিয়েছিলেন বলেই জীববিজ্ঞান ও জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব দেখান হয়েছে বলে মনে হয়।

সাধনা পত্রিকার জীববিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই সাহিত্যিক মূল্য রয়েছে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ' (চৈত্র, ১২৯৮) জীববিজ্ঞান বিষয়ক একটি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ। অভিব্যক্তিবাদ নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'অভিব্যক্তির ধারাত্রয়' (অগ্রহায়ণ, ১২৯৯) এবং 'অভিব্যক্তির ভিত্তিমূল' (পৌষ, ১২৯৯) শীর্ষক রচনা দু'টি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সরস উপমা, সহজ ভাষা এবং গভীর দার্শনিক চিন্তাধারা দ্বিজেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। জীববিজ্ঞান প্রসঙ্গে সাধনার অপরাপর লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণ ও প্রাণী' (অগ্রহায়ণ, ১২৯৮) শীর্ষক প্রবন্ধে জীবজগৎ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য' (পৌষ, ১২৯৮) শারীরবিদ্যা বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। সাধনা পত্রিকার বৈজ্ঞানিক সংবাদগুলোর অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। এই সকল সংবাদের প্রায় সবই প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে। দুরূহ বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সহজ ক'রে ব্যাখ্যা করায় কোনো কোনো সংবাদ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়' (পৌষ, ১২৯৮)। রচনার নিদর্শন :—

> "আমাদের কর্ণকুহরের এক অংশে তিনটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চোঙের মত আছে তাহার বিশেষ কার্য্য কি এ পর্য্যন্ত ভালরূপ স্থির হয় নাই। পূর্ব্বে

শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে ইহার দ্বারা শব্দের দিক নির্ণয় হইয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি দুই এক জন পণ্ডিত ইহার অন্যরূপ কার্য্য স্থির করিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন, আমরা কি করিয়া গতি অনুভব করি এ পর্য্যন্ত তাহার কোন ইন্দ্রিয়তত্ত্ব জানা যায় নাই। একটা গাড়ি যদি কোনরূপ ঝাঁকানি না দিয়া সমভাবে সরল পথে চলিয়া যায় তাহা হইলে গাড়ী যে চলিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না—পালের নৌকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু গাড়ি যদি ডাহিনে কিম্বা বামে বেঁকে অথবা থামিয়া যায় তবে আমরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি। পণ্ডিতগণের মতে কর্ণেন্দ্রিয়ের উক্ত অংশই এই গতি-পরিবর্ত্তন অনুভব করিবার উপায়। একপ্রকার রোগ আছে যাহাতে রোগী টলমল করিয়া চলে, একপাশে কাৎ হইয়া পড়ে এবং কানে শুনিতে পায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কর্ণযন্ত্রের বিকৃতিই তাহাদের রোগের কারণ। কোন্ দিকে কতটা হেলিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিলে কাজেই তাহাদের পক্ষে শক্ত হইয়া চলা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকলেই জানেন ভূমির উচ্চনীচতা মাপিবার জন্য কাঁচের নলের মধ্যে তরল পদার্থ দিয়া একপ্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, আমাদের উক্ত কর্ণপ্রণালীর মধ্যেও সেইপ্রকার তরলদ্রব্য আছে সম্ভবতঃ তাহা আমাদের গতি পরিবর্ত্তন অনুসারে আমাদের স্নায়ুকে সচেতন করিয়া দেয় এবং আমরাও তদনুযায়ী তৎক্ষণাৎ আমাদের শরীরের ভার সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত হই।"

সাধনায় 'সাময়িক সারসংগ্রহ'—এই শিরোনামায় প্রকাশিত বিজ্ঞান-সংবাদের কোনো কোনোটির লেখক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেণলজি' (আষাঢ়, ১২৯৯) একটি সরস বৈজ্ঞানিক রচনা।

এই পত্রিকার জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। ঝরঝরে ভাষা সুরেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। সাধনায় প্রকাশিত তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'জ্যোতির্বিজ্ঞান-স্পেক্ট্রোস্কোপ ও ফটোগ্রাফি' (মাঘ, ১২৯৮), 'জ্যোতির্বিজ্ঞান

—আরও দুই চারিটি কথা' (ফাল্গুন, ১২৯৮) এবং 'গ্রহমণ্ডলী' (শ্রাবণ, ১৩০০)। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও কদাচিৎ লিখতেন।

চার

বিজ্ঞানসাহিত্য প্রসঙ্গে 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা'র (প্রঃ প্রঃ শ্রাবণ, ১৩০১) সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, (১) পরিভাষা বিষয়ক রচনায় এবং (২) মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারমূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে। প্রথম বর্ষ থেকেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নিয়ে বিবিধ চিন্তাশীল প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরিভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় অংশ গ্রহণ করেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায়, অপূর্বচন্দ্র দত্ত, শশধর রায় প্রমুখ লেখকরা।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিভাষা সংকলনের ক্ষেত্রেও এই পত্রিকার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক অনুবাদিত ও সংকলিত বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার তালিকা প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও সেই সব তালিকা সম্বন্ধে সমালোচনা এই পত্রিকায় স্থান পেত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'রাসায়নিক পরিভাষা' (শ্রাবণ, ১৩০২) শীর্ষক প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র ক'রে এতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বিশেষের পরিভাষা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হোল।[২] ১৩০৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা'য় প্রবন্ধটির সমালোচনা করলেন কালিদাস মল্লিক ও যোগেশচন্দ্র রায়। ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক পরিভাষা সংকলন ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন বলীন্দ্র সিংহ দেব, যোগেশচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, রাসবিহারী মণ্ডল প্রমুখ লেখকরা। জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় আলোচনা অপেক্ষা সংকলনের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হোল। বিভিন্ন সংখ্যায় প্রাণী, উদ্ভিদ ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষার তালিকা প্রকাশ করলেন যোগেশচন্দ্র রায়, শশধর রায়, একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। পরিষদ-পত্রিকার গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষার তালিকা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তা' ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এই দু'টি বিভাগের পরিভাষা নিয়ে

২ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনাও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীই সুরু করেছিলেন (কার্ত্তিক, ১৩০১)।

আলোচনাও সুরু হোল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে। এই পত্রিকায় গণিত বিষয়ক পরিভাষার তালিকা প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছিলেন হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান দিক আলোক, চুম্বক ও তড়িৎবিজ্ঞানের পরিভাষার তালিকা প্রণয়ন করলেন অনঙ্গমোহন সাহা।

পরিষদ-পত্রিকায় প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেই বিভিন্ন লেখকের নিজ নিজ গবেষণা ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে। কোনো প্রবন্ধেই বিরাট কোনো আবিষ্কার বা দুরূহ কোনো গবেষণার ছাপ নেই। কিন্তু প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধই লেখকের নিজস্ব পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত। বিভিন্ন প্রবন্ধের মৌলিকতার মূল কারণ এখানেই। ভূবিদ্যা বিষয়ক এই ধরনের মৌলিক প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন সুরেশচন্দ্র দত্ত ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। সুরেশ-চন্দ্র দত্তের 'গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-পলিভূমির কর্দ্দম' (১ম সংখ্যা, ১৩১৯), 'সরিফপুরের লৌহমল' (২য় সংখ্যা, ১৩২০), 'পিণ্ডারীর পথে তাম্রমল' (২য় সংখ্যা, ১৩২১), 'মগরাহাটের পশ্চিমের রাঙা মাটি' (৩য় সংখ্যা, ১৩২৪), 'নিম্নবঙ্গের বিল' (২য় সংখ্যা, ১৩২৫) এবং হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের 'গঙ্গোত্রী-পথে' (৪র্থ সংখ্যা, ১৩২০), 'প্রস্‌পেক্ট পাহাড়ের ভূ-তত্ত্ব' (৩য় সংখ্যা, ১৩২৩) ইত্যাদি প্রবন্ধে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া গেল। লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গেল প্রফুল্লচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ত্ব' (৩য় সংখ্যা, ১৩০৪), দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (২য় সংখ্যা, ১৩২১) ইত্যাদি প্রবন্ধে। তবে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে গতানুগতিক প্রকৃতির প্রবন্ধও এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। যেমন, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জোয়ার ও ভাঁটা' (মাঘ, ১৩০৩)।

পরিষদ-পত্রিকার উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলোকে প্রধানতঃ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ক এবং (২) পর্যবেক্ষণ ও গবেষণামূলক। দুর্গানারায়ণ সেনের 'উদ্ভিদ্-বিদ্যার উপক্রমণিকা' (১ম সংখ্যা, ১৩১১) প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রবন্ধ। নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র' (৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৫) এবং সত্যচরণ লাহার 'পুরুলিয়ার পাখী' (৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩১ থেকে

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত) প্রভৃতি প্রবন্ধে লেখকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া গেল।

গণিত নিয়ে বহু চিন্তাশীল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই শ্রেণীর অধিকাংশ প্রবন্ধেই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘর-পূরণ' (৩য় সংখ্যা, ১৩১৯), যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের 'ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ' (১ম সংখ্যা, ১৩২৩), 'ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য' (২য় সংখ্যা, ১৩২৩), 'দশম স্বতঃসিদ্ধ' (৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৩), 'ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্য' (১ম সংখ্যা, ১৩২৪) ইত্যাদি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গণিত নিয়ে গবেষণামূলক কয়েকটি সরস প্রবন্ধ লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ দত্ত।

পরিষদ-পত্রিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত নগণ্য। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের অধিকাংশই প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান নিয়ে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর 'আর্য্যভট' (৩য় সংখ্যা, ১৩২৪) এবং যোগেশচন্দ্র রায়ের 'এ দেশে ভূভ্রমবাদ' (১ম সংখ্যা, ১৩২৬)।

পরিষদ-পত্রিকার রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়ও মৌলিক পরীক্ষা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া গেল। মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পারদ-শোধন প্রণালী' (১ম সংখ্যা, ১৩২০), প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'গন্ধতৈল-পরীক্ষা প্রণালী' (২য় সংখ্যা, ১৩২০) ইত্যাদি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই নীরস প্রকৃতির। পদার্থবিজ্ঞান নিয়েও এতে নীরস ও টেক্‌নিক্যাল প্রকৃতির প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। জগদিন্দু রায়ের 'আলোকের পরাবর্ত্তন ও তির্য্যগ্‌বর্ত্তন আলোচনায় ব্যাবর্ত্তন-তত্ত্বের প্রয়োগ' (২য় সংখ্যা, ১৩২১) এবং রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আলোকচিত্র সাহায্যে সুরের রূপ পরীক্ষা' (১ম সংখ্যা, ১৩২৮) এই ধরনের রচনা। তবে কদাচিৎ এতে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক সরস প্রবন্ধও প্রকাশিত হোত ; যেমন, যোগেশচন্দ্র রায়ের 'পবন-চক্র' (২য় সংখ্যা, ১৩২১)।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, পরিকল্পনা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে পরিষদ-পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলোর অভিনবত্ব থাকলেও সাহিত্যিক মূল্যের দিক থেকে অধিকাংশ প্রবন্ধই উচ্চাঙ্গের নয়।

স্ত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিকা : সংবাদপত্র ও মফঃস্বল পত্রিকা

সাময়িক-পত্রের মধ্যে মূলতঃ কয়েকটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপত্র আধুনিক যুগে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনে সহায়তা করল বটে, তবে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি স্ত্রীপাঠ্য, বালকপাঠ্য ও মফঃস্বল পত্রিকার অবদানও উপেক্ষণীয় নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে স্ত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিকার সংখ্যা বাড়ল এবং উভয় প্রকার পত্রিকার পরিকল্পনায়ও উন্নতি পরিলক্ষিত হোল। কিন্তু এই যুগের অধিকাংশ স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা গেল। ভাষার দিক থেকে বিচার করলে আধুনিক যুগের কোনো কোনো স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে উন্নতি দেখা গেল বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্বাচনে কোনোরূপ বৈচিত্র্য বা উচ্চাঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় অধিকাংশ পত্রিকায়ই পাওয়া গেল না। বালকপাঠ্য পত্রিকায় পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় এই যুগেও নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল। তা' ছাড়া শক্তিমান লেখকরা ছোটদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানালোচনায় হাত দেওয়ায় বালকপাঠ্য পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের উৎকর্ষতাও বাড়ল।

এক

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা এবং সাহিত্যিক মূল্যের দিক থেকে বিচার করলে আধুনিক যুগের স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকাসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) যে সমস্ত পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই বললেই হয়, (২) যে সমস্ত পত্রিকায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত; এবং তা'ও প্রাথমিক প্রকৃতির এবং (৩) যে সকল পত্রিকায় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে থাকতো। কৃষ্ণভাবিনী বিশ্বাস সম্পাদিত 'মাহিষ্য-মহিলা' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৮), অক্ষয়কুমার নন্দী ও সুরবালা দত্ত সম্পাদিত 'মাতৃ-মন্দির'[১] (প্রঃ প্রঃ আষাঢ়, ১৩৩০) এবং জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দুনিভা দাস সম্পাদিত 'সেবা ও সাধনা'[২] (প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩)

১-২ 'মাতৃ-মন্দির' এবং 'সেবা ও সাধনা'—এই দু'টি সাময়িক-পত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত।

ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ নেই বললেই হয়।

আধুনিক যুগের অধিকাংশ স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকায়ই অনিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা গেল। গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মহিলা' (প্রঃ প্রঃ শ্রাবণ, ১৩০২), বনলতা দেবী প্রবর্তিত 'অন্তঃপুর' (প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩০৪), কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' (প্রঃ প্রঃ শ্রাবণ, ১৩১৪), ডাঃ প্যারীশংকর দাসগুপ্তের সহযোগিতায় আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'ভারত-নারী' (প্রঃ প্রঃ ভাদ্র, ১৩২১) এবং কুমুদিনী বসু সম্পাদিত 'বঙ্গলক্ষ্মী' (প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) ইত্যাদি সাময়িক-পত্রে কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। 'মহিলা' পত্রিকায় অনিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে এদেশীয় নারীদের পরিচয় করিয়ে দেবার প্রচেষ্টা এই পত্রিকার প্রথম কয়েক বৎসরের কোনো কোনো সংখ্যায় দেখা যায়। ভিক্টোরিয়া কলেজে বিজ্ঞানাদি বিষয়ে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হোত, তা'র মর্মকথা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বক্তৃতা পর্যায়ের রচনাগুলোকে বাদ দিলে উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানালোচনা এই পত্রিকায় নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত 'অন্তঃপুর' নামক মাসিক পত্রিকাটিতে স্ত্রীরা লিখতেন এবং স্ত্রীদের দ্বারা পত্রিকাটি সম্পাদিত হোত। উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। এতে কদাচিৎ যে দু'একটি বিজ্ঞানালোচনা পাওয়া যায়, তাদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ না বলে বিজ্ঞান-প্রস্তাব বা বিজ্ঞান-সংবাদ আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় মাঝে মাঝে বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত। 'চন্দ্রসূর্য্যের কথা' নামক গ্রন্থের লেখক তেজেশচন্দ্র সেন এই পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। 'ভারত-নারী' পত্রিকায় শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ এদের একটিও নয়। 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায়ও কখনও কখনও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। তবে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায়ও নেই।

সরযূবালা দত্ত সম্পাদিত 'ভারত-মহিলা' (প্রঃ প্রঃ ভাদ্র, ১৩১২) এবং রাণী নিরুপমা দেবী সম্পাদিত 'পরিচারিকা' (নব পর্যায়; অগ্রহায়ণ, ১৩২৩) ইত্যাদি মাসিকপত্রে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল। জগদানন্দ রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ লেখকরা ভারত-মহিলায় লিখতেন। বঙ্গলক্ষ্মী

পত্রিকার সম্পাদিকা কুমুদিনী বসু ভারত-মহিলায় কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। উচ্ছ্বাসের আধিক্য তাঁর রচনার সর্বপ্রধান ত্রুটি। পরিচারিকা, নব পর্যায়ের প্রবন্ধগুলো প্রথম পর্যায়ের রচনাসমূহের তুলনায় অনেক বেশী সরস। নব পর্যায়, পরিচারিকার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই সার্থক ও পরিণত। তবে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের একঘেয়েমিতা নব পর্যায়, পরিচারিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সর্বপ্রধান ত্রুটি। এই পত্রিকার প্রায় সবগুলো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'সজীব জগৎ এবং অজীব জগৎ' (কার্ত্তিক, ১৩৩১)। জীবজগৎ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র বসু লাহোরে যে বক্তৃতা করেন এ প্রবন্ধটি হোল তারই সরস মর্মানুবাদ। অনুবাদ করেছিলেন অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

দুই

আধুনিক যুগের অধিকাংশ বালকপাঠ্য পত্রিকায় ছোটদের উপযোগী মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যে কয়েকটি বালকপাঠ্য পত্রিকা বেরিয়েছিল তাদের প্রায় প্রতিটিতেই সরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১২৯২), ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত 'সাথী' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০০) ও 'সখা ও সাথী (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০১), শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' (প্রঃ প্রঃ আষাঢ়, ১৩০২) এবং ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত 'প্রকৃতি' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০৭) ইত্যাদি সাময়িক-পত্র।

জ্ঞানদানন্দিনী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, এবং প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা নিয়ে ছোটদের উপযোগী সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞান-সংবাদ-সমূহ কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখতেন। ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা বালকে প্রকাশিত কয়েকটি বিজ্ঞান-সংবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রচনাভঙ্গীর সরসতায় কোনো কোনো সংবাদ গল্পের মতো মধুর। যেমন,

> "আহারান্বেষণ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশে ছদ্মবেশ ধারণ কীট পতঙ্গের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহা বোধ করি অনেকে জানেন। তাহা

ছাড়া, ফুল, পত্র প্রভৃতির সহিত স্বাভাবিক আকার সাদৃশ্য থাকাতেও অনেক পতঙ্গ আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের সুবিধা করিয়া থাকে। একটা নীল প্রজাপতি ফুলে ফুলে মধু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। পুষ্পস্তবকের মধ্যে একটি ঈষৎ শুষ্কপ্রায় ফুল দেখা যাইতেছিল। প্রজাপতি যেমন তাহাতে শুঁড় লাগাইয়াছে অমনি তাহার কাছে ধরা পড়িয়াছে। সে ফুল নহে সে একটি সাদা মাকড়সা। কিন্তু এমন এক রকম করিয়া থাকে যাহাতে তাহাকে সহসা ফুল বলিয়া ভ্রম হয়।"

'সাথী' এবং 'সখা ও সাথী' পত্রিকায় প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিকরা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। সাথী পত্রিকায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ লেখকদের রচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত। সখা ও সাথী পত্রিকার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই জীববিজ্ঞান নিয়ে। এই পর্যায়ের প্রায় সবগুলো প্রবন্ধই দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন। এ ছাড়া জগদানন্দ রায়, ভুবনমোহন রায় প্রমুখ লেখকরা এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত মুকুল পত্রিকায় ছোটদের উপযোগী উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ মনীষীরা এই পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ ছাড়া যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা জীববিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ মুকুল পত্রিকার প্রথম বৎসরে প্রকাশিত হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির হলেও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সঙ্গে গল্পরসের সংযোগ যোগীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-গুলোর বৈশিষ্ট্য।

ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত 'প্রকৃতি' নামক পত্রিকায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচিত্র ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

উল্লিখিত পত্রিকাগুলো ছাড়া বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত 'শিশু' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৯), 'সন্দেশ' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২০), 'শিশুসাথী' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২৯) ও 'রামধনু' (প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩৩৪) ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

বরদাকান্ত মজুমদার পরিচালিত 'শিশু'র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলোর প্রশংসা

করা যায় না। এই পত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধই নীরস এবং অসম্পূর্ণ প্রকৃতির।

শিশুর তুলনায় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল সন্দেশ পত্রিকায়। সন্দেশ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে অদ্ভুতত্ব এই পর্যায়ের রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ 'সাপের খাওয়া' (চৈত্র, ১৩২০), 'অদ্ভুত শিকার' (বৈশাখ, ১৩২১), 'লড়ায়ের বেলা' (অগ্রহায়ণ, ১৩২১), 'অদ্ভুত ভ্রমণকারী' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২) ইত্যাদি প্রবন্ধের নাম করা যায়।

আশুতোষ ধরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'শিশুসাথী' পত্রিকায় জগদানন্দ রায়, বীরেন্দ্রনাথ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ লেখকরা নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন।

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'রামধনু' পত্রিকার প্রথম দিকের প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। প্রবন্ধগুলো বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক নিয়ে লেখা। সংক্ষিপ্ত হলেও অধিকাংশ প্রবন্ধই সুলিখিত। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন।

বিংশ শতাব্দীর যে কয়েকটি বালকপাঠ্য পত্রিকায় অনিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সখী' (প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩০৭), 'বালক' (প্রঃ প্রঃ জানুয়ারী, ১৯১২), 'খোকাখুকু' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩৩০) ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা। বৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত সখী পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত না হলেও মাঝে মাঝে চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হোত।

রেভাঃ জে. এম্. বি. ডনক্যান সম্পাদিত ও প্রকাশিত বালক পত্রিকায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায়। প্রকাশভঙ্গীতে জড়তা এবং কৃত্রিম ভাষা এই পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রধান ত্রুটি।

এ ছাড়া সত্যচরণ চক্রবর্তী ও কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'খোকা-খুকু' পত্রিকায় মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

অতএব দেখা যাচ্ছে, কোনো কোনো পত্রিকায় অনিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও আধুনিক যুগের অধিকাংশ বালকপাঠ্য পত্রিকায়ই বিজ্ঞানসাহিত্যের একটি বিশেষ স্থান আছে।

তিন

আধুনিক যুগের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাহিত্যবিভাগেও বিজ্ঞানসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্রগুলোতে বিজ্ঞানসাহিত্যের কি স্থান ছিল তা' জানবার উপায় নেই। তার কারণ, এই যুগে প্রকাশিত 'দৈনিক' (প্রাত্যহিক—প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১২৯২), যশোহর থেকে প্রকাশিত 'সম্মিলনী' (সাপ্তাহিক—প্রঃ প্রঃ বৈশাখ ১২৯২) এবং 'বঙ্গনিবাসী' (সাপ্তাহিক—প্রঃ প্রঃ ১২৯৭), 'হিতবাদী' (সাপ্তাহিক—প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮), 'দৈনিক চন্দ্রিকা' (প্রঃ প্রঃ ১৩০৫), 'বঙ্গভূমি' (সাপ্তাহিক—প্রঃ প্রঃ আষাঢ়, ১৩০৬) ইত্যাদি প্রখ্যাত সংবাদপত্র-গুলো বর্তমানে দুর্লভ।

চার

পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় আধুনিক যুগের অধিকাংশ মফঃস্বলপত্রেও বিজ্ঞান-সাহিত্যের স্থান নগণ্য। তবে এই যুগেও কোনো কোনো মফঃস্বলপত্রে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগে বাংলাদেশের বাইরে থেকেও বাংলা সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হতে দেখা গেল।

প্রকাশস্থল অনুযায়ী আধুনিক যুগের বিভিন্ন মফঃস্বলপত্রকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই পাঁচটি শ্রেণী হোল (১) উত্তরবঙ্গ, (২) পূর্ববঙ্গ, (৩) পশ্চিমবঙ্গ ও (৪) কলিকাতা থেকে প্রকাশিত মফঃস্বলপত্র এবং (৫) বাংলাদেশের বাইরে থেকে প্রকাশিত মফঃস্বলপত্র।

উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকায় উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় রাজসাহী থেকে প্রকাশিত 'শিক্ষা-পরিচর' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১২৯৬)। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় 'আত্ম-পরিচয়ে' মন্তব্য করা হয়, 'সময়ে সময়ে সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও ইহাতে প্রকাশিত হইবে।' শিক্ষা-পরিচরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক সরস ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের আর যে সব পত্রিকায় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'উৎসাহ' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০৪), ও 'ত্রিস্রোতা' (প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩০৭)। রাজসাহী থেকে প্রকাশিত 'উৎসাহ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন জগদানন্দ রায় ও শশধর রায়। শেষোক্ত

লেখকের অধিকাংশ প্রবন্ধই হাল্কা ও লঘু প্রকৃতির। বিজ্ঞান বিষয়ক সুদীর্ঘ ধারাবাহিক রচনা এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। ১৩০৫ সালের আষাঢ় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিশ্বরচনা' শীর্ষক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে তথ্যবহুল হলেও প্রবন্ধটিতে সাহিত্যরসের অভাব। উৎসাহ পত্রিকায় জগদানন্দ রায় এবং শশধর রায়ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেন। জগদানন্দের রচনায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সঙ্গে সাহিত্যরসের সম্মিলন ঘটেছে। কিন্তু লঘু দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রচলিত বিশ্বাসে আস্থা স্থাপনের ফলে শশধর রায়ের অধিকাংশ রচনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।[৩] জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত 'ত্রিস্রোতা' পত্রিকায়ও কদাচিৎ উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। এই সকল পত্র-পত্রিকাকে বাদ দিলে দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত 'দিনাজপুর পত্রিকা'[৪] (প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২), রঙ্গপুর থেকে প্রকাশিত 'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা' (প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩১৩), মালদহ থেকে প্রকাশিত 'গম্ভীরা' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২১), এবং রাজসাহী থেকে প্রকাশিত 'পল্লীশিক্ষক'[৫] (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩৩৩) ইত্যাদি সাময়িক-পত্রের যে সকল সংখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাদের কোনোটিতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কোনো প্রবন্ধ নেই।

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রিকায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ত্রিপুরা-ব্রাহ্মণবেড়িয়া থেকে প্রকাশিত 'ঊষা' (প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩০০), ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'আরতি' (প্রঃ প্রঃ আষাঢ়, ১৩০৭), ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষা' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৩) এবং ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'পল্লিশ্রী' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২৯)। 'আরতি' পত্রিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে এই পত্রিকার পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই অসম্পূর্ণ প্রকৃতির। ত্রিপুরা

৩ ১৩০৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা উৎসাহে প্রকাশিত 'ধূমকেতু' শীর্ষক প্রবন্ধটির এক যায়গায় শশধর রায় লিখেছেন, 'সাধারণ বিশ্বাস এই যে ইহাদিগের উদয়ে পৃথিবীস্থ জীবগণের অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই বিশ্বাস একেবারে ভিত্তিহীন নহে।'

৪ দিনাজপুর পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হোত।

৫ পল্লীশিক্ষকে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত।

থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষা' পত্রিকায় জগদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকরা মাঝে মাঝে লিখতেন। 'পল্লিশ্রী'[৬] পত্রিকার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলো নীরস ও অসম্পূর্ণ প্রকৃতির। পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় আধুনিক যুগেও ঢাকা থেকে প্রকাশিত কোনো কোনো পত্রিকায় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল। আধুনিক যুগে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িক-পত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৮) এবং 'প্রতিভা' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৮)। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে উৎকৃষ্ট প্রকৃতির প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। জগদানন্দ রায় এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ঢাকা প্রতিভা কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রমুখ লেখকরা মাঝে মাঝে লিখতেন। এই পত্রিকায় জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক সরস প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ঢাকা থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ সাময়িক-পত্রে মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও কোনো কোনো পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই বললেই হয়। এই প্রসঙ্গে 'ধূমকেতু' (প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০) পত্রিকাটির নাম করা যায়।

আধুনিক যুগে পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল অঞ্চল থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রিকায়ই বিজ্ঞানসাহিত্যের স্থান নগণ্য ; তবে কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধ অধিকাংশ পত্রিকায়ই প্রকাশিত হোত। যশোহর থেকে প্রকাশিত 'হিন্দু-পত্রিকা' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০১), নদীয়া থেকে প্রকাশিত 'নদীয়াবাসী'[৭] (প্রঃ প্রঃ ভাদ্র, ১৩০২), কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত 'নদীয়াদর্পণ' (প্রঃ প্রঃ শ্রাবণ, ১৩০৪), হাবড়া থেকে প্রকাশিত 'ভক্তি' (প্রঃ প্রঃ ভাদ্র, ১৩০৯), ২৪-পরগণার গোবরডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত 'পল্লী-সখা' (প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন, ১৩২৯), হুগলী জনাই থেকে প্রকাশিত 'পল্লী-প্রদীপ' (প্রঃ প্রঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩) ইত্যাদি সাময়িক-পত্রের যে সকল সংখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাদের কোনোটিতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কোনো প্রবন্ধ নেই।[৮] তবে মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত 'কান্তি' (প্রঃ প্রঃ পৌষ, ১৩০৩),

---

৬ ময়মনসিংহের 'পল্লিশ্রী' পত্রিকায় কৃষি ও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক।

৭ 'নদীয়াবাসী' পত্রিকায় মাঝে মাঝে শিল্প বিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হোত।

৮ ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'পল্লী-স্বরাজ' (প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন, ১৩৩৫) পত্রিকায় কদাচিৎ বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত।

বীরভূম থেকে প্রকাশিত 'বীরভূমি' (প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩০৬), মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত 'সুধা' (প্রঃ প্রঃ কার্ত্তিক, ১৩০৮), কাঁথি মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত 'সুরভী' (প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩১৮), হাওড়া শিবপুর থেকে প্রকাশিত 'নন্দিনী' (প্রঃ প্রঃ আষাঢ়, ১৩১৯), নদীয়া কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত 'সাধক' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২০), বোলপুর থেকে প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২৬), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখা কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'মাধবী' (প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩২৯), নদীয়া থেকে প্রকাশিত 'পল্লীমঙ্গল' (প্রঃ প্রঃ অক্টোবর, ১৯৩০) ইত্যাদি সাময়িক-পত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হোত।

কান্তি পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছিল, 'জ্ঞানানুশীলনই কান্তির মুখ্য উদ্দেশ্য'। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হোত। তবে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ একটিও নয়। 'বীরভূমি' পত্রিকায় কদাচিৎ ভূবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই অসম্পূর্ণ প্রকৃতির। মেদিনীপুরের 'সুরভী' পত্রিকায় কদাচিৎ উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায়। শিবপুরের 'নন্দিনী' পত্রিকায় কদাচিৎ যে দু' একটি বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত তা' অসম্পূর্ণ ও নীরস প্রকৃতির। কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত 'সাধক' পত্রিকায় জগদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকরা মাঝে মাঝে লিখতেন। বোলপুর থেকে প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় জগদানন্দ রায়, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী প্রমুখ লেখকরা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত 'মাধবী' পত্রিকায় মাঝে মাঝে সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। তবে এই পত্রিকার মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলো অসম্পূর্ণ প্রকৃতির। পল্লীমঙ্গল পত্রিকার মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধেরও একই ত্রুটি।

উল্লিখিত পত্রিকাগুলো ছাড়া আধুনিক যুগের কয়েকটি সাময়িক-পত্রে প্রধানতঃ মফঃস্বলের সংবাদাদি থাকত ; কিন্তু এই সকল পত্রিকা প্রকাশিত হোত কলিকাতা থেকে। এই শ্রেণীর সাময়িক-পত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নোয়াখালী' (প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩২২), 'পল্লীবাণী' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২৫) ও 'বাঁকুড়া-লক্ষ্মী' (প্রঃ প্রঃ ১৩২৯)। এদের কোনোটিতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাদি নেই।

বাংলাদেশের বাইরে থেকে প্রকাশিত সাময়িক-পত্রের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ

পত্রিকা 'প্রবাসী'। এই পত্রিকা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এলাহাবাদ থেকে ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবাসীর প্রথম সংখ্যার 'সূচনা'য় মন্তব্য করা হয়েছিল, "বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিকপত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম"। বাংলাদেশের বাইরে থেকে প্রকাশিত সাময়িক-পত্র হিসাবেই শুধু নয়, কলিকাতার বাইরে থেকেও প্রবাসীর ন্যায় উচ্চাঙ্গের পত্রিকা অতি অল্পই প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকা-প্রকাশের সুরু থেকেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রবাসীর প্রায় প্রতি সংখ্যায়ই প্রকাশিত হোত। প্রথম সংখ্যায় যোগেশচন্দ্র রায়ের চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'জীববিদ্যা' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে জীববিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা ক'রে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া বিজ্ঞান-সংবাদকে কেন্দ্র ক'রে যোগেশচন্দ্র রায় এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি লিখতেন। গোড়া থেকেই প্রবাসী পত্রিকায় জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান এবং রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন জগদানন্দ রায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যোগেশচন্দ্র রায়, অপূর্বচন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ লেখকরা।

এইরূপে আধুনিক যুগের কয়েকটি স্ত্রীপাঠ্য, বালকপাঠ্য ও মফঃস্বল পত্রিকা বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রসার ও পরিপুষ্টিতে এবং সর্বোপরি জনপ্রিয়তা অর্জনে সহায়তা করল।

বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিকা

উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্র এবং কয়েকটি স্ত্রীপাঠ্য, বালকপাঠ্য ও মফঃস্বল পত্রিকা ছাড়াও আধুনিক যুগের বিভিন্ন প্রকৃতির সাময়িক-পত্রে বিজ্ঞানালোচনা পাওয়া গেল। এ ছাড়া আধুনিক যুগের বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে কয়েকটি বিজ্ঞানপত্রিকার অবদানও নগণ্য নয়।

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের গঠন পর্বে যেমন মূলতঃ ধর্ম-বিষয়ক পত্রিকা তত্ত্ব-বোধিনীকে কেন্দ্র ক'রে নবযুগের সূচনা হয়েছিল, এই পর্বেও তেমনি প্রধানতঃ ধর্ম-বিষয়ক সাহিত্য-পত্র 'নবজীবন'কে কেন্দ্র ক'রে বিজ্ঞানসাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হোল। আধুনিক বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রেই সাহিত্যজগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। নবজীবন ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত ধর্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক অধিকাংশ সাহিত্য-পত্রেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। 'জাহ্নবী' (আষাঢ়, ১২৯১), 'আলোচনা' (ভাদ্র, ১২৯১), 'উদ্বোধন' (মাঘ, ১৩০৫) প্রভৃতি পত্রিকার নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এক

জাহ্নবী পত্রিকায় গণিত, জীববিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। এই পত্রিকার বিজ্ঞানসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নেই। তবে উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ এতে পাওয়া গেল। গণিত ও রসায়নবিজ্ঞান সম্পর্কিত কোনো কোনো প্রবন্ধ প্রাচীন যুগের হিন্দু-বিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে। শশধর রায়, জগদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকরা কদাচিৎ এই পত্রিকায় লিখতেন।

নবজীবন পত্রিকার বৈশিষ্ট্য, দার্শনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম প্রবন্ধ 'মহাশক্তি' ১২৯১ সালের পৌষ সংখ্যা নবজীবনে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে উচ্ছ্বাসের আধিক্য থাকলেও গভীর দার্শনিক চিন্তাধারার পরিচয় সুস্পষ্ট।

দার্শনিক চিন্তামূলক উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গগনচন্দ্র হোম সম্পাদিত 'আলোচনা' পত্রিকায়ও পাওয়া গেল।

এ ছাড়া এই যুগের নব্যভারত, সাহিত্য, উদ্বোধন প্রভৃতি সাময়িক-পত্রেও দার্শনিক চিন্তামূলক উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। নিয়মিত-ভাবে না হলেও উদ্বোধন পত্রিকায় মাঝে মাঝে জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সাধারণ প্রসঙ্গ নিয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। এই পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখকদের মধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বাসুদেবানন্দ ও দুর্গাপদ মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুদ্ধানন্দ ও বাসুদেবানন্দের রচনার মধ্যে এক আধ্যাত্মিক সৌরভ পরিব্যাপ্ত। বাসুদেবানন্দ চলতি ভাষায় লিখতেন। দুর্গাপদ মিত্রের অধিকাংশ প্রবন্ধই জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে। তাঁর রচনায় তথ্যের অভাব নেই; অভাব সাহিত্যরসের। এই পত্রিকায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক-জীবনীও প্রকাশিত হোত। তবে এই শ্রেণীর প্রবন্ধের অধিকাংশই নীরস ও একঘেয়ে প্রকৃতির।

এই সকল পত্র-পত্রিকা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত অপর যে কয়েকটি সাহিত্য-পত্রিকার বিজ্ঞানালোচনায় বিশিষ্টতা দেখা গেল, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'জন্মভূমি' (পৌষ, ১২৯৭), 'দাসী' (আষাঢ়, ১২৯৯), 'পুণ্য' (আশ্বিন, ১৩০৪), 'প্রদীপ' (পৌষ, ১৩০৪), 'সাহিত্য-সংহিতা' (বৈশাখ, ১৩০৭)।

নিয়মিতভাবে না হলেও জন্মভূমি পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধ'রে জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতার উদ্ধৃতি, শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং দু' এক যায়গায় কাহিনীর অবতারণা এই পত্রিকার গোড়ার দিককার বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেরই বৈশিষ্ট্য। জন্মভূমির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম। ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধই রসায়ন-বিজ্ঞান নিয়ে। তবে কদাচিৎ তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধও লিখতেন। ত্রৈলোক্যনাথের রসায়নবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে সুরু ক'রে কাহিনী, প্রবাদ ও ঐতিহাসিক তথ্য, সব কিছুই আছে। বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের দিক থেকে কিছুটা দুর্বল হলেও রচনাগুলোর সাহিত্যিক মূল্য রয়েছে। তবে যায়গায় যায়গায় অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস কোনো কোনো রচনাকে কিছুটা লঘু ক'রে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১২৯৮ সালের মাঘ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'লৌহ' শীর্ষক প্রবন্ধটির নাম করা যেতে পারে।

ত্রৈলোক্যনাথের অপরাপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ 'ইস্পাত' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮), 'গ্যাস' (পৌষ, ১৩০০) ও 'বায়ু' (আষাঢ়, ১৩০১)। সাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে লেখা জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 'সূর্য্য-গ্রহণ' (আষাঢ়, ১৩০১) এবং ১২৯৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ভূবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ 'পাথুরে কয়লা' সুলিখিত রচনা। এই পত্রিকায় জীববিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচনে কোনোরূপ বৈচিত্র্যের পরিচয় না পাওয়া গেলেও বর্ণনাভঙ্গীর সরসতা রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্য। জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'ব্যাঘ্র' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০), 'হরিণ' (আষাঢ়, ১৩০০) ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে জন্মভূমিতে মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক-জীবনীও প্রকাশিত হোত। শ্যামলাল গোস্বামীর লেখা 'বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু' (ভাদ্র, ১৩২৭) এবং 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়' (বৈশাখ, ১৩২৮) নামক প্রবন্ধ দু'টি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দাসী' পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ খ্যাতনামা লেখকদের বৈাজ্ঞনিক রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বিজ্ঞানসাহিত্য প্রসঙ্গে পুণ্য পত্রিকার বৈশিষ্ট্য, জীববিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়। জীববিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি। রচনাভঙ্গীর সারল্য এবং গভীর ভগবৎবিশ্বাস ক্ষিতীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানালোচনার বৈশিষ্ট্য। পুণ্য পত্রিকায় প্রকাশিত ক্ষিতীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'অভিব্যক্তিবাদের আপত্তি খণ্ডন' (পৌষ, ১৩০৭), 'ভূগর্ভে অভিব্যক্তির সাক্ষ্য' (ফাল্গুন, ১৩০৭), 'বর্ণভেদে জীবরক্ষা' (বৈশাখ, ১৩০৮), 'ভূপৃষ্ঠে প্রাণসঞ্চার' (আষাঢ় ও শ্রাবণ যুক্তসংখ্যা, ১৩০৮)। এই পত্রিকার রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীর্ঘকাল পূর্বে লেখা হেমেন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়। হেমেন্দ্রনাথের ভাষা ক্ষিতীন্দ্রনাথের তুলনায় কিছুটা দুরূহ প্রকৃতির। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হেমেন্দ্রনাথের রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখ-

যোগ্য, 'রসায়নবিজ্ঞানের উপকারিতা' (আশ্বিন ও কার্তিক যুক্তসংখ্যা, ১৩০৫), 'রাসায়নিক আকর্ষণ' (আষাঢ় ও শ্রাবণ যুক্তসংখ্যা, ১৩০৮) ইত্যাদি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও এই সায়য়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানসাহিত্য প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রদীপ' পত্রিকার বৈশিষ্ট্য, জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় এবং গভীর দার্শনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে। জীববিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক যোগেশচন্দ্র রায় ও জগদানন্দ রায়। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রধান লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অধিকাংশ প্রবন্ধেই চারুচন্দ্র বৈজ্ঞানিক তথ্যকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। গভীর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেল হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ লেখকদের কোনো কোনো রচনায়।

সাহিত্য-সভার মুখপত্র 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকার বৈশিষ্ট্য, এখানে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচিন্তার কোনো কোনো দিককে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এই পত্রিকার ১ম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'সংস্কৃত বীজগণিতের সমীকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধও এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সখারাম গণেশ দেউস্করের 'ভাস্করাচার্য্য' (আষাঢ়, ১৩০৭) শীর্ষক প্রবন্ধটির নাম করা যায়। এ ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে সর্বজনবোধ্য আলোচনাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হোত।

এই সকল পত্র-পত্রিকাকে বাদ দিলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত অধিকাংশ সাহিত্য-পত্রেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের স্থান নগণ্য। এই প্রসঙ্গে 'প্রচার' (শ্রাবণ, ১২৯১), 'ভারত শ্রমজীবি' (অগ্রহায়ণ, ১২৯২), 'বিভা' (আশ্বিন, ১২৯৪), 'সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডার' (বৈশাখ, ১২৯৬), 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' (শ্রাবণ, ১২৯৬), 'প্রতিমা' (বৈশাখ, ১২৯৭), 'মিহির' (জানুয়ারী, ১৮৯২), 'ধরণী' (মাঘ, ১৩০১) প্রভৃতি সাহিত্য-পত্র এবং মূলতঃ ধর্ম বিষয়ক সাহিত্য-পত্র 'পন্থা'র (বৈশাখ, ১৩০৪) নাম উল্লেখযোগ্য।

দুই

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্র প্রকাশিত হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাদের অধিকাংশেরই জনপ্রিয়তা

অক্ষুণ্ন রইল। এ ছাড়া বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরও কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সাময়িক-পত্রের আবির্ভাব ঘটল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত যে সকল জনপ্রিয় সাহিত্য-পত্রের বিজ্ঞানসাহিত্যে বিশিষ্টতা দেখা গেল, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'বঙ্গদর্শন—নব পর্য্যায়' (১৩০৮), 'মানসী' (ফাল্গুন, ১৩১৫), 'ভারতবর্ষ' (আষাঢ়, ১৩২০), 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' (ফাল্গুন, ১৩২২) ও 'মাসিক বসুমতী' (বৈশাখ, ১৩২৯) প্রভৃতি। এই সকল পত্র-পত্রিকা ছাড়া বিভিন্ন বিজ্ঞানপত্রিকায়, কয়েকটি স্ত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিকায় এবং 'প্রবাসী' প্রভৃতি কয়েকটি উচ্চাঙ্গের মফঃস্বল পত্রিকায় মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল।

নবপর্যায়-বঙ্গদর্শনে জীববিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জগদানন্দ রায় এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে জগদানন্দের কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ছাড়াও এতে নৃতত্ত্ব নিয়ে চিন্তাশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩১৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শশধর রায়ের বিরাট ও সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'মানবের জন্মকথা' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নবপর্যায়-বঙ্গদর্শনের জীববিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ রচনাই পরিণত। তবে কোনো কোনো রচনায় সস্তা পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে সুরদাস লিখিত 'মৎস্য সমাজ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮) নামক রচনাটি উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধটির শেষদিকে লেখক কৌতুকরসের মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। নবপর্যায়-বঙ্গদর্শনের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু নির্বাচনে অভিনবত্ব এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিষয়বস্তু নির্বাচনে অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া গেল জগদানন্দ রায়ের কয়েকটি প্রবন্ধে। মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় গণিত বিষয়ক প্রবন্ধে সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে লালমোহন বিদ্যানিধির 'অঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি ও লিখনপ্রণালী' (আষাঢ়, ১৩১৫) শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকার পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো রচনায় লেখকের নিজস্ব মতবাদ ও মৌলিক চিন্তা-ধারার পরিচয় পাওয়া গেল। নিজস্ব মতবাদ ও সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিউটনের দুইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নূতন সিদ্ধান্তের ব্যবকলন' (শ্রাবণ, ১৩০৮) নামক প্রবন্ধটিতে। মৌলিক চিন্তা-ধারার পরিচয় রয়েছে জগদানন্দ রায়ের কয়েকটি প্রবন্ধে এবং চন্দ্রশেখর

সরকারের 'বিশ্বে আকর্ষণী শক্তি' (মাঘ, ১৩১৬) শীর্ষক রচনায়। নবপর্যায়-বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধই ইতিহাসধর্মী। জগদানন্দ রায়ের কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধ ও যোগেশচন্দ্র রায়ের 'হিন্দু-রসায়নের ইতিহাস' (মাঘ, ১৩০৯) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক ছাড়া সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে সর্বজনবোধ্য আলোচনাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

মানসী পত্রিকায়ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। তবে জীববিজ্ঞান এবং পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। জগদানন্দ রায়ের কয়েকটি সরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখকরা এই পত্রিকায় লিখতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখকদের রচনা এতে প্রকাশিত হয়। সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে লেখা রামেন্দ্রসুন্দরের কয়েকটি প্রবন্ধে অনন্যসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাসে ভারতবর্ষ পত্রিকার যে একটি বিশেষ স্থান আছে, তার মূলে রামেন্দ্রসুন্দরের এই সকল প্রবন্ধ। জগদানন্দের অধিকাংশ প্রবন্ধই জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান নিয়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আদীশ্বর ঘটকও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিজ্ঞানালোচনায় পৌরাণিক তথ্যাদির অবতারণা তাঁর রচনার প্রধান ত্রুটি। এই পত্রিকার ভূবিদ্যা বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধও পৌরাণিক তথ্যনির্ভর। রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধই প্রাচীন ভারতে রসায়ন-চর্চা নিয়ে। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে এই পত্রিকায় কয়েকটি সরস প্রবন্ধ লিখেছিলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে। পদার্থবিজ্ঞানের দুরূহ ও জটিল দিক আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে আলোচনা এই পত্রিকায়ই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বৈশিষ্ট্যের পরিচয় না থাকলেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্যান্য দিকে নিয়ে মাঝে মাঝে এতে রচনাদি প্রকাশিত হোত। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে কদাচিৎ বৈজ্ঞানিকদের জীবনীও পাওয়া যায়। এদেশীয় বৈজ্ঞানিকদের জীবনচরিত আলোচনা এই পর্যায়ের রচনার বৈশিষ্ট্য।

মাসিক বসুমতীর বৈশিষ্ট্য, প্রাণিবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়। প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার বিশিষ্টতার মূলে হোল পাখী নিয়ে লেখা সত্যচরণ লাহার কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ। রসায়নবিজ্ঞান নিয়েও বহু মূল্যবান প্রবন্ধ এই পত্রিকায় বেরিয়েছিল। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস নিয়ে লেখা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কয়েকটি প্রবন্ধ।

এই সকল পত্র-পত্রিকা ছাড়া বিংশ শতাব্দীর অন্যান্য যে সকল উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্রে কখনো কখনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'ভাণ্ডার' (বৈশাখ, ১৩১২), 'গৃহস্থ' (কার্ত্তিক, ১৩১৬), হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'আর্য্যাবর্ত্ত' (বৈশাখ, ১৩১৭), প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (২৫শে বৈশাখ, ১৩২১), চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' (অগ্রহায়ণ, ১৩২১) এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বঙ্গবাণী' (ফাল্গুন, ১৩২৮)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় জগদানন্দ রায়ের দু'একটি প্রবন্ধ ছাড়া বৈজ্ঞানিক রচনা নেই বললেই হয়।

'গৃহস্থ' পত্রিকায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হোত। অভিব্যক্তিবাদ নিয়ে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ এই পত্রিকায় পাওয়া যায়।

'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা নগণ্য। কদাচিৎ এতে জীববিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধারণ প্রসঙ্গ নিয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত।

আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্রিকা সবুজপত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই বললেই হয়। তবে এই পত্রিকার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী একবার তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে বাংলায় কয়েকটি বিজ্ঞানের বই লিখবার সংকল্প করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্যের মাধ্যমে এভাবে বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করা। বিভিন্ন লেখকের উপর বিজ্ঞানের বই লেখার ভার পড়েছিল। এঁদের মধ্যে সতীশচন্দ্র ঘটক, যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও গুরুদাস দত্ত—এই ক'জন সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক একটি বই লিখে শেষ করেন। এই বইটির ভূমিকা অংশটুকু ১৩২৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যা সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়। চলতি ভাষায় লেখা 'গাছ' নিয়ে এই সুদীর্ঘ রচনাটি দীর্ঘদিন ধ'রে এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে

প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক এ ধরনের সরস আলোচনা বাংলা সাময়িক-পত্রে অল্পই পাওয়া যায়। জ্যোতি বাচস্পতি এই রচনাটির কোনো কোনো অংশ লেখেন। তবে সতীশচন্দ্র ঘটকই সমগ্র আলোচনার প্রধান লেখক।

চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই বললেই হয়। তবে কদাচিৎ এতে সর্বজনবোধ্য ও সরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। উদাহরণস্বরূপ শিশিরকুমার মিত্রের 'নূতন বিজ্ঞান' (বৈশাখ, ১৩২৪) শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। শিশিরকুমার মিত্র আধুনিক যুগের বহু সাময়িক-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সহজ ক'রে বুঝিয়ে বলা তাঁর বিজ্ঞানালোচনার বৈশিষ্ট্য। শিশিরকুমারের রচনাভঙ্গীর নিদর্শন হিসাবে উল্লিখিত প্রবন্ধের 'আপেক্ষিক গতি' শীর্ষক অংশটুকু উদ্ধৃত করা হোল :—

আপেক্ষিক গতি

Relative বা আপেক্ষিকের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে গতির বেগ বা Velocity। একটা চলন্ত জিনিষের গতির বেগ নির্ভর করে আমার নিজের অবস্থার উপর। যেমন ধরা যাক, আমি চলন্ত ট্রেণে বেঞ্চের উপর বসিয়া আছি—আর আমার সাম্‌নে একটা পিঁপড়া চলিয়াছে। আমি বলিব, পিঁপড়াটা চলিতেছে সেকেণ্ডে তিন ইঞ্চি—কিন্তু train-এর বাহিরে দাঁড়াইয়া কোন লোক যদি পিঁপড়াটাকে দেখিবার সুবিধা পায় ত সে বলিবে, পিঁপড়া চলিয়াছে ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে। আবার পৃথিবীর বাহিরে সূর্য্যের উপর দাঁড়াইয়া কেহ যদি পিঁপড়াকে দেখে, সে বলিবে, পিঁপড়া আকাশের মধ্যে সেকেণ্ডে বিশ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহা হইলে পিঁপড়ার গতির বেগ বাস্তবিক কোনটা? আমার সহিত তুলনায় সেকেণ্ডে তিন ইঞ্চি, বাহিরের লোকের তুলনায় ঘণ্টায় ৪০ মাইল বা সেকেণ্ডে ১৮ ফুট আর সূর্য্যের সহিত তুলনায় সেকেণ্ডে ২০ মাইল—কোন্‌টা ঠিক? আসলে দেখা যাইতেছে যে, যেটার সহিত তুলনা করিতেছি, সেইটাই যদি গতিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে পিঁপড়ার গতির বেগ এ কথার

> কোনও অর্থই হয় না—আমার বলা উচিত, অমুক জিনিষের তুলনায় ইহার গতির বেগ এত।

'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি। তবে মাঝে মাঝে এতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের রচনা প্রকাশিত হোত।

'কল্লোল' (বৈশাখ, ১৩৩০), 'কালি-কলম' (বৈশাখ, ১৩৩৩) ও 'বিচিত্রা' (আষাঢ়, ১৩৩৪)—অতি আধুনিক যুগের এই তিনটি সাহিত্য-পত্রকে কেন্দ্র ক'রে বহু শক্তিমান লেখক সাহিত্য-জগতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনীতে এই সকল পত্রিকায় যে উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল, বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'কল্লোল' এবং মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'কালি-কলম'-এ কোনো উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকারও বিজ্ঞানসাহিত্যের দিক দুর্বল। এই পত্রিকার বিজ্ঞানসাহিত্য প্রসঙ্গে একমাত্র উল্লেখযোগ্য, শিশিরকুমার মিত্রের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ।

আধুনিক যুগের প্রগতিশীল কয়েকটি সাহিত্য-পত্রে বিজ্ঞানালোচনার কোনো উল্লেখযোগ্য স্থান দেখা গেল না বটে ; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কয়েকটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশের ধারা এই যুগেও অব্যাহত রইল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তত্ত্ববোধিনী ও ভারতী পত্রিকা। তবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনাকালে (১৮৮৪-১৯০৮) তত্ত্ববোধিনীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। তা' ছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও রচনাভঙ্গীতেও এই যুগের তত্ত্ব-বোধিনীতে উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি দেখা গেল না। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে (১৯১০-১৯১৫) তত্ত্ববোধিনীতে অপেক্ষাকৃত নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখকদের কয়েকটি মনোজ্ঞ বিজ্ঞানালোচনা এই সময়কার তত্ত্ব-বোধিনীতে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের লেখাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হোত। পরবর্তী কালের তত্ত্ববোধিনীতেও মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকায় রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি সরস প্রবন্ধ লেখেন।

বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল 'ভারতী' পত্রিকায়। ১২৯৩ সাল থেকে ভারতী বালকের সঙ্গে যুক্তভাবে প্রকাশিত হয় 'ভারতী ও বালক' নামে। এই পর্বের (১২৯৩-১২৯৯) ভারতীর বৈশিষ্ট্য জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়। জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যায়ের অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। ভাষার সারল্য এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচনে অভিনবত্ব স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞানালোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতীর পরবর্তী পর্বে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল বৈজ্ঞানিক রহস্যকাহিনীতে ও বিজ্ঞান বিষয়ক রম্য রচনায়। এ ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ এই যুগের ভারতীতে প্রকাশিত হোল। আধুনিক যুগে ভারতীর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অপূর্বচন্দ্র দত্ত, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপতিচরণ রায়, শশধর রায় প্রভৃতির নাম।

তিন

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের বিকাশ ও পুরিপুষ্টিতে সাহিত্য-পত্রের অবদানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানপত্রিকার সংখ্যা পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় আধুনিক যুগেও নগণ্য। তা' ছাড়া বৈজ্ঞানিক রচনার উৎকর্ষতার দিক থেকেও সাহিত্য-পত্রিকারই অগ্রাধিকার। তবে পূর্ববর্তী যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার বিজ্ঞানসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় নি। কিন্তু আধুনিক যুগের কোনো কোনো বিজ্ঞান-পত্রিকায় বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া গেল। এই বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায় বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কোন কোন বিজ্ঞানপত্রে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল বিজ্ঞানপত্র প্রকাশিত হয়েছিল, তা'দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলী' (আষাঢ়, ১২৯২), বিহারীলাল ঘোষ সম্পাদিত 'বিশ্বকর্ম্মা বা বিজ্ঞানরহস্য'[১] (আশ্বিন, ১২৯৩), কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত 'গণিত ও

[১] বাংলা সাময়িক-পত্র—দ্বিতীয় খণ্ড (২য় সংস্করণ)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৪৭।

বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা'[২] (১২৯৬), প্রভাতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'প্রকৃতি' (ভাদ্র, ১২৯৮) এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিজ্ঞান'[৩] (বৈশাখ, ১৩০১)। এই সকল বিজ্ঞানপত্রিকার মধ্যে 'শিল্প-পুষ্পাঞ্জলী' এবং 'প্রকৃতি' ছাড়া অবশিষ্ট পত্রিকাগুলি বর্তমানে দুর্লভ।

শিল্পপুষ্পাঞ্জলী মূলতঃ শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা হলেও এতে মাঝে মাঝে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। তবে এই শ্রেণীর রচনার অধিকাংশই নীরস ও দুর্বোধ্য প্রকৃতির।

প্রভাতচন্দ্র সেন সম্পাদিত প্রকৃতির প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়, "প্রাকৃতিক ঘটনার আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য থাকিবে। তবে জ্যোতিষ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রের যাহা কিছু প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইবে তাহারই আলোচনা আমরা করিব।" একমাত্র গণিত ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সুদীর্ঘ ধারাবাহিক রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভাষার আড়ষ্টতা এবং প্রকাশভঙ্গীতে জড়ত্ব বিভিন্ন রচনার প্রধান ত্রুটি।

ভাষায় উৎকর্ষতার এবং পরিকল্পনায় অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া গেল বিংশ শতাব্দীর দু' একটি বিজ্ঞানপত্রে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার অবৈতনিক সম্পাদক ডাঃ অমৃতলাল সরকার সম্পাদিত 'বিজ্ঞান' (জানুয়ারী, ১৯১২) পত্রিকা। ইতিপূর্বে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতায় 'বিজ্ঞানদর্পণ' নামে যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, জনসাধারণের উপযুক্ত সহযোগিতার অভাবে তা' বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। বিজ্ঞানদর্পণ প্রকাশিত হয়েছিল বিজ্ঞান ও মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে। ঠিক একই উদ্দেশ্য নিয়ে 'বিজ্ঞান' পত্রিকাটিরও আবির্ভাব। এই পত্রিকাটি বাংলার বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা পরিচালিত হোত। বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু সারগর্ভ রচনা প্রকাশিত হয়। তবে জীববিজ্ঞান এবং পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সংখ্যাই অধিক। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। তৎকালীন

২ বাংলা সাময়িক-পত্র—দ্বিতীয় খণ্ড (২য় সংস্করণ)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৪৯।

৩ " " " — " " — " " —পৃঃ ৬২।

সময়ের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাহিত্যিকরা এতে লেখেন নি। এই পত্রিকার প্রবন্ধকারদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শরৎচন্দ্র রায়, বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী, মন্মথলাল সরকার, নির্মলকুমার সেন, আশুতোষ দে প্রভৃতির নাম। শরৎচন্দ্র রায়ের অধিকাংশ প্রবন্ধই জীববিজ্ঞান নিয়ে। জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক উদ্ভিদ, প্রাণী ও শারীরবিজ্ঞান এবং বিবর্তনবাদ নিয়ে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তিনি এই পত্রিকায় লিখেছেন। এ ছাড়া ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভায় প্রদত্ত জীববিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি ইংরেজী বক্তৃতার মর্মানুবাদ এতে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেছিলেন শরৎচন্দ্র রায়। শরৎচন্দ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্যান্য দিক নিয়েও এই পত্রিকায় লিখতেন। বিভূতিভূষণ চক্রবর্তীর প্রাণী ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া গেল। এই বৈচিত্র্যের পরিচয় মন্মথলাল সরকারের রচনায়ও পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর বহু রচনাই অসম্পূর্ণ ও নীরস প্রকৃতির। নির্মলকুমার সেনের অধিকাংশ প্রবন্ধই পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে। ভাষার বলিষ্ঠতা তাঁর রচনার প্রধান গুণ। পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যরসের সম্মিলন ঘটেছে আশুতোষ দে'র রচনায়। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে অভিনবত্ব আশুতোষ দে'র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই পত্রিকার রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ রচনাই নীরস ও গতানুগতিক প্রকৃতির। তবে সবদিক মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, 'বিজ্ঞান'-এর রচনাগুলো বিজ্ঞানদর্পণের তুলনায় অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানপত্রিকা হোল সত্যচরণ লাহা সম্পাদিত 'প্রকৃতি' (দ্বৈমাসিক)। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ১৩৩১ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ যুক্তসংখ্যা হিসাবে বেরিয়েছিল। প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য মৌলিক গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে এবং পরিভাষা বিষয়ক রচনায়। গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইতিপূর্বে যে সকল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা'দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার নাম। কিন্তু পরিষদ-পত্রিকার গবেষণামূলক রচনার তুলনায় প্রকৃতির রচনাগুলো অনেক বেশী আকর্ষণীয়। এর কারণ, এ দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরা এই পত্রিকায় লিখতেন। অপরদিকে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের গবেষণামূলক রচনা পরিষদ-পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। প্রকৃতি পত্রিকাটি যে সকল বৈজ্ঞানিকের

রচনায় সমৃদ্ধ তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সহায়রাম বসু, ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও ডাঃ স্নেহময় দত্তের নাম। বৈজ্ঞানিকরা নিয়মিতভাবে লেখা সত্ত্বেও এই পত্রিকার অধিকাংশ রচনাই সর্বজনবোধ্য। টেক্‌নিক্যালিটি এড়িয়ে সরস ও সরল ভাষায় এখানে বক্তব্য বিষয় বোঝান হয়েছে। নব্যযুগের কীর্তিমান বৈজ্ঞানিকদের বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে এই পত্রিকায়ই প্রথম দেখা গেল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু উচ্চাঙ্গের রচনা প্রকৃতিতে প্রকাশিত হয়। তবে গোড়ার দিককার সংখ্যা-গুলোতে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনারই আধিক্য। তৃতীয় বৎসর থেকে এই পত্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা বাড়ল এবং প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সংখ্যা কমল।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন সাময়িক-পত্র ছাড়াও আধুনিক যুগের কোনো কোনো বিজ্ঞানপত্রিকায় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত।

পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা

আধুনিক যুগে বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞানালোচনার ভাষা ও ভাবধারায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোনো কোনো দিক নিয়ে গ্রন্থ-রচনায়ও উন্নতি সাধিত হোল। তবে এই যুগে এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার যতখানি দ্রুত গতিতে ঘটল, বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রসার ও উন্নতি ততটা দ্রুত গতিতে ঘটল না। বিদেশী ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে বিজ্ঞান-চর্চাই এর অন্যতম কারণ। এ ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বাংলা বিজ্ঞানের স্থায়ী কোনো পরিভাষা গঠিত হোল না। এর ফলে বিংশ শতাব্দীর খ্যাতিমান বিজ্ঞানসাহিত্যিকদেরও বিজ্ঞানের ভাষা-সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হোল। তবে এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও আধুনিক যুগে পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

এই যুগে সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী গণিত, প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি দেখা গেল না বটে, তবে বিজ্ঞানের এই সকল বিভাগ নিয়েও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের চিন্তাধারা ও ভাষার উন্নতির মূল কারণ, আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচিত কয়েকজন শক্তিমান লেখক বিজ্ঞানসাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্যোগী হলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। তবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের চিন্তাধারা ও রচনাভঙ্গীর যথার্থ উন্নতি পরিলক্ষিত হোল বিংশ শতাব্দীতেই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের প্রায় সবগুলোই পাঠ্যপুস্তক।

এক

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক-গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যোগেশচন্দ্র রায়ের 'সরল পদার্থ-বিজ্ঞান' (১২৯৩), কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরল পদার্থ বিদ্যা' (২য় সংস্করণ, ১২৯৮) এবং

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'পদার্থ-বিদ্যা'[১] (১৮৯৩)। উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

যোগেশচন্দ্র রায়ের 'সরল পদার্থ-বিজ্ঞান' বালক এবং বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের জন্যে রচিত। গ্রন্থটি রচনায় টিণ্ডাল, টেট্, হাক্স্‌লি প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে মোট আটটি অধ্যায়ে জড়ের গুণ, গতি ও বল, তরল ও বায়বীয় পদার্থ, শব্দ, আলোক, তাপ, চুম্বক ও তড়িৎ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। আলো ও তড়িৎ নিয়ে আলোচনা সূর্যকুমার অধিকারীর 'প্রকৃতি-বিজ্ঞান' এবং মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'পদার্থবিদ্যা'র তুলনায় অনেক বেশী তথ্যপূর্ণ। গাণিতিক প্রসঙ্গ এড়াবার উদ্দেশ্যে এখানে 'স্থিতি-বিজ্ঞান' ও 'গতি-বিজ্ঞান' নিয়ে আলোচনা করা হয় নি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি এখানে অতি সহজ পরীক্ষা ও উদাহরণ সহযোগে বোঝান হয়েছে। যোগেশচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারে যোগেশচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র প্রধানতঃ পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করেছেন। পদার্থবিদ্যায় রামেন্দ্রসুন্দরও পরিভাষার ব্যবহারে পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত বাংলা পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হোল হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম' (১৮১৯ শক)। ভাষা সরস না হলেও সর্বপ্রকার টেক্‌নিক্যালিটি এড়িয়ে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি লেখা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের লেখক হেমেন্দ্রনাথ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা। হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রধানতঃ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম' ছাড়াও হেমেন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেন[২]। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। তবে হেমেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথের বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিভিন্ন

১ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'পদার্থবিদ্যা'কে অনুসরণ ক'রে লেখা ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্তের 'পদার্থবিদ্যার প্রশ্নোত্তর' ১৩০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। জড় পদার্থের ধর্ম, গুণ ও অবস্থা এবং তাপ নিয়ে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির অনেক স্থলে রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষারও হুবহু অনুকরণ দেখা যায়।

২ 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম'—প্রকাশকের নিবেদন।

সাময়িক-পত্রে ছড়িয়ে আছে। আলোচ্য গ্রন্থটি রচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে এখানে ভার, চাপ, চুম্বক, তড়িৎ, তড়িৎ-চুম্বক, আণবিক ক্রিয়া, শব্দবিজ্ঞান, আলোক—এই কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে এক একটি বিভাগ নিয়ে দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারে সংস্কৃতানুগত্য দেখা যায়। তবে দু' এক যায়গায় হেমেন্দ্রনাথ নতুন শব্দও সৃষ্টি করেছেন। হেমেন্দ্রনাথের আলোচনা সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত হোল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ-যোগ্য, চুণীলাল বসুর (১৮৬১-১৯৩০) 'আলোক' (১৯০৯)। আলোচ্য গ্রন্থে আলোকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা ক'রে আলোকের উৎপত্তিস্থল, আলোকরশ্মি, ছায়া, আলোকের গতি, প্রতিফলন ও প্রতিসরণ, বিক্ষিপ্ত আলোক, বিভিন্ন প্রকৃতির দর্পণ, ত্রিশির কাচ (Prism), অতসী কাচ (Lens), অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং দীর্ঘ ও হ্রস্বদৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। এ ছাড়া আলোকবিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গের প্রসঙ্গগুলো এতে নেই। তা' সত্ত্বেও বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের কাছে এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ। তার কারণ, আলোকবিজ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যগুলো উদাহরণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে এই গ্রন্থে অতি সহজভাবে আলোচিত হয়েছে। লেখক চুণীলাল বসু প্রায় সর্বত্রই পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী শব্দগুলো বাংলায় অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের পাশেই ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। চুণীলালের প্রকাশভঙ্গী সরল।

চুম্বক সম্বন্ধে বাংলায় প্রথম গ্রন্থ নলিনীনাথ রায়ের 'চুম্বক বিজ্ঞান' ১৩২১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। নলিনীনাথ জয়পুর মহারাজ-কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। চুম্বকবিজ্ঞান একটি সুপরিকল্পিত গ্রন্থ। মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদে চুম্বক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রধান প্রধান কয়েকটি প্রসঙ্গ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। চুম্বক বিষয়ক উচ্চাঙ্গের দু' একটি প্রসঙ্গও এতে আছে। কিন্তু নলিনীনাথের রচনাভঙ্গীর প্রশংসা করা যায় না। তাঁর ভাষা জটিল ও দুর্বোধ্য প্রকৃতির। গ্রন্থটি টেকনিক্যাল হয়ে পড়বার আশঙ্কায় লেখক চুম্বক বিষয়ক গাণিতিক প্রসঙ্গগুলো নিয়ে পরিশিষ্টে

আলোচনা করেছেন। মূলগ্রন্থে গাণিতিক কোনো আলোচনা নেই। তবে লেখকের প্রকাশভঙ্গীর অস্বচ্ছতার জন্যে সহজ পরীক্ষাগুলোও যায়গায় যায়গায় দুরূহ হয়ে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থে চুম্বকবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ বিদেশী শব্দই বাংলায় অনুবাদিত। কিন্তু অনুবাদের প্রশংসা করা যায় না। শব্দের মাধুর্যের দিকে লক্ষ্য না রাখায় অনুবাদিত শব্দগুলো যায়গায় যায়গায় শ্রুতিকটু হ'য়ে পড়েছে।

বাংলা সাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী জগদানন্দ রায়। জগদানন্দের 'শব্দ', 'আলো', 'তাপ', 'চুম্বক', 'স্থিরবিদ্যুৎ', ও 'চলবিদ্যুৎ' ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র জগদানন্দ রায় ছাড়া আর কোনো লেখকই পদার্থবিজ্ঞানের এতগুলো বিভাগ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন নি। পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা অপরাপর ক্ষেত্রে দু' একটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

জগদানন্দের সমসাময়িক কালে বাংলা ভাষায় বিদ্যুৎ নিয়ে সারগর্ভ গ্রন্থ রচনা করলেন শৈলজাপ্রসাদ দত্ত ও সুনীলকুমার মিত্র। এই দু'জন গ্রন্থকারের লেখা 'বিদ্যুৎতত্ত্ব শিক্ষক' (১৯২৮) বিদ্যুৎ সম্বন্ধে একটি বৃহদাকার গ্রন্থ। বিদ্যুৎ নিয়ে এরূপ তথ্যবহুল গ্রন্থ বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নি। তবে এই গ্রন্থে বৈদ্যুতিকতত্ত্ব অপেক্ষা বিদ্যুতের ব্যবহারিক দিকের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। অত্যধিক তথ্যপূর্ণ হওয়ায় আলোচনা যায়গায় যায়গায় অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে।

সহজ ক'রে বক্তব্য বিষয় বোঝাবার প্রচেষ্টা দেখা গেল বীরেন্দ্রনাথ রায়ের রচনায়। বাংলা ভাষায় রচিত বেতার বিষয়ক প্রথম[৩] গ্রন্থ বীরেন্দ্রনাথের 'বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণ' ১৩৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে বেতারের ঢেউ, ভাল্‌ভ্‌, ক্রৃষ্ট্যাল ইত্যাদি সম্বন্ধে সরল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। বেতার নিয়ে লেখা বীরেন্দ্রনাথ রায়ের অপরাপর গ্রন্থ 'বেতার গ্রাহক যন্ত্র' (১৩৩৫) এবং 'বেতার রহস্য' (১৯২৯)।

৩ 'বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণ'-এর ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন, "বেতার সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্তও শুধু বাংলায় কেন, ভারতীয় কোন ভাষাতেই কোন বই বের হয় নি।"

বীরেন্দ্রনাথ রায়ের পর বেতার বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন রমেশচন্দ্র সরকার। রমেশচন্দ্রের 'রেডিও' (১৩৩৮) নামক গ্রন্থে বেতারের ইতিহাস, বেতার যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও এদের ব্যবহার প্রণালী নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

পদার্থবিজ্ঞান রচনায় রামেন্দ্রসুন্দরের প্রভাব দেখা গেল যোগেন্দ্রনারায়ণ গুহ-মজুমদার রচিত 'জড় ও শক্তি-বিজ্ঞান' (১৩৩৬) নামক গ্রন্থে। এখানে জড়পদার্থের ধর্ম এবং মাধ্যাকর্ষণ ও আণবিক শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে তথ্য সমাবেশের উপর জোর না দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। জড় ও শক্তি-বিজ্ঞানের যায়গায় যায়গায় জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন মতগুলি উদ্ধৃত। উচ্চাঙ্গের দার্শনিক চিন্তার পরিচয় স্থানে স্থানে রয়েছে। যোগেন্দ্রনারায়ণের রচনাভঙ্গীর একমাত্র ত্রুটি, যায়গায় যায়গায় অতিকথন ও পুনরুক্তি।

দুই

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা রসায়নবিজ্ঞানের অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যোগেশচন্দ্র রায়ের 'রসায়ন প্রবেশ' (১৮৯০), রামচন্দ্র দত্তের 'রসায়ন বিজ্ঞান' (১৮৯৪), চুণীলাল বসুর 'ফলিত রসায়ন' (১৮৯৫) এবং 'রসায়ন-সূত্র'—১ম (১৮৯৭) ও ২য় (১৮৯৮) ভাগ।

পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা ক'রে চুণীলাল বসু বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। চুণীলালের সর্বজনবোধ্য বিজ্ঞানগ্রন্থগুলি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা চুণীলালের প্রথম গ্রন্থ 'জল' (১৯০০) শোভাবাজার রাজবাড়ীর 'সাহিত্য-সভা'[৪] থেকে প্রকাশিত হয়। এই সাহিত্য-সভার সঙ্গে গোড়া থেকেই চুণীলাল বসুর সংযোগ ছিল। ১৩১৬ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৫]

৪ ১৩০৬ সালে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে এই সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৫ 'রসায়নাচার্য্য চুণীলাল' (১৩৪১)—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ১৩৪।

চুণীলাল বসুর 'জল' সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু বাগবাজার সাহিত্য-সভার চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল। গ্রন্থটির প্রথমদিকে জলের উপাদান ও বিশ্লেষণপদ্ধতি, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের ধর্ম ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় রাসায়নিক তথ্যাদি রয়েছে। শেষের দিকে জল পরিস্রুত করবার পদ্ধতি সরল ভাষায় আলোচিত। ক্লোরিন এবং জলের কাঠিন্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনাও তথ্যসমৃদ্ধ।

জল ছাড়া আরও কয়েকটি নিত্যব্যবহার্য বস্তু নিয়ে চুণীলাল গ্রন্থ রচনা করলেন। চুণীলালের পরবর্তী গ্রন্থ 'বায়ু' ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটিরও অধিকাংশ প্রসঙ্গই বাগবাজার সাহিত্য-সভায় পড়া হয়েছিল। ইতিপূর্বে লেখক সাহিত্য-সভায় জল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এই সভায় উপস্থিত অনেকেই লেখককে নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থ নিয়ে গ্রন্থ-রচনা করবার জন্যে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধে এবং ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'জল' নামক গ্রন্থটির সমাদরে উৎসাহিত হয়ে চুণীলাল এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বায়ুর উপাদান ও ধর্ম, বায়ুর সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ, ধূলিকণা এবং দূষিত বায়ু পরিষ্কার করবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তথ্যসমাবেশের দিক থেকে গ্রন্থটি কিছুটা দুর্বল।

চুণীলালের পরবর্তী গ্রন্থ 'কাগজ' (১৯০৬) প্রকাশের পূর্বে সাহিত্য-সভায় পড়া হয়েছিল। এই গ্রন্থে কাগজ প্রস্তুত করবার দেশী ও বিলাতী পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত। প্রাচীন যুগের কাগজ প্রস্তুতের ইতিহাস আলোচনায় চুণীলালের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লিখিত গ্রন্থগুলো ছাড়া চুণীলাল বসুর অপরাপর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'আলোক' (১৯০৯), 'খাদ্য' (১৯১০), 'শারীর স্বাস্থ্য-বিধান' (১৯১৩), 'পল্লীস্বাস্থ্য' (১৯১৬) ও 'স্বাস্থ্য-পঞ্চক' (১৯২৮)। বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ছাড়াও চুণীলাল কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে তাঁর কবিতাগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। চুণীলালের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'নীলাচল' (১৯২৬)-এর যায়গায় যায়গায় উচ্ছ্বাসের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু এই উচ্ছ্বাস তাঁর বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে সংক্রামিত হয় নি। প্রকাশভঙ্গীর সংযম চুণীলালের বিজ্ঞানসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

চুণীলাল শুধুমাত্র সাহিত্যসেবায়ই আত্মনিয়োগ করেন নি, এদেশে

বিজ্ঞানচর্চার প্রসারেও তাঁর অবদান রয়েছে। তিনি ইংরেজী ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক বহু মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছেন। এ ছাড়া ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক সহজবোধ্য কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই সকল ইংরেজী প্রবন্ধ ও বক্তৃতা তাঁর পুত্র জ্যোতিঃপ্রকাশ বসু কর্তৃক সংকলিত হয়েছিল।[৬]

চুণীলাল বসু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি এবং পরিষদের বিজ্ঞানশাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৩২৪ সালে তিনি 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু পরিষদ'-এর সভাপতি মনোনীত হন। ১৩২৯ সালে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখার সভাপতিত্ব করেন চুণীলাল। এ ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও বিজ্ঞান-সভার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল।

চুণীলাল বসুর পর বাংলা সাহিত্যে রসায়নবিজ্ঞান রচনায় অভিনবত্বের পরিচয় দিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রফুল্লচন্দ্রের 'নব্য রসায়নীবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' (১৯০৬) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে রসায়নবিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ-রচনার পথ দেখালেন প্রফুল্লচন্দ্র। দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ ইংরাজীতে লেখা 'History of Hindu Chemistry'(1902, 1904) ছাড়াও প্রাচীন যুগের হিন্দু রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে ছড়িয়ে আছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার অন্যতম পথিকৃৎ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

রসায়নবিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে লেখা আর একটি মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ পঞ্চানন নিয়োগীর 'আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন' (১ম ভাগ, ১৩১৪)। এই গ্রন্থে আয়ুর্বেদের সঙ্গে সঙ্গে রসায়নশাস্ত্রের অগ্রগতি আলোচিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ধাতু ও তাদের যৌগিক সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে কিরূপ জ্ঞান ছিল, তা' নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার হোয়েড়া গ্রামে পঞ্চানন নিয়োগীর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম শশীভূষণ নিয়োগী ও মাতার নাম সারদাসুন্দরী। তিনি রসায়নশাস্ত্রের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ও গবেষক।[৭]

৬ The Scientific and other Papers, Vols. I & II (1924—'25).

৭ বংশ-পরিচয়—(একবিংশ খণ্ড) পৃঃ ১১৪-১৯২। জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সংকলিত।

তিন

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষায় গণিত রচনায় প্রভূত উন্নতি দেখা গেল। বাংলা গদ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গণিতের ভাষারও উন্নতি সাধিত হোল। তা' ছাড়া এই যুগে রচিত গণিত বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যাও অজস্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গণিত রচনা করে যাঁরা যশস্বী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পঞ্চানন ঘোষ ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম।

'সরল শুভঙ্করী,' 'শুভঙ্করী,' 'সরল পরিমিতি' প্রভৃতির প্রণেতা পঞ্চানন ঘোষের 'সরল পাটীগণিত'-এর নূতন সংস্করণ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি একটি সুপরিকল্পিত গ্রন্থ। পাঠশালার বালক-বালিকাদের জন্যে রচিত হলেও এতে উচ্চাঙ্গের গণিত বিষয়ক কয়েকটি প্রসঙ্গ রয়েছে। 'সরল পাটীগণিত' জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থটির অষ্টাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তিন ভাগে 'সরল গণিত' রচনা করেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি। সরল গণিত, ১ম ভাগ—(পাটীগণিত) ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বীজগণিত ও জ্যামিতির প্রকাশকাল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ। পাটীগণিতের নূতনত্ব এই যে, এই গ্রন্থের কয়েক যায়গায় সংখ্যার পরিবর্তে অক্ষর প্রয়োগের দ্বারা পাটীগণিতের নিয়ম বোঝান হয়েছে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাঞ্জল ভাষায় বিভিন্ন অঙ্কের নিয়ম বুঝিয়েছেন।

পাটীগণিত ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শুভঙ্করী ও মানসাঙ্ক বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেল।

বীজগণিত রচনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিলেন মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মহেন্দ্রনাথের 'অস্থিত সমাধান' (১৮৯৫) প্রাচ্য পদ্ধতিতে লেখা প্রথম বাংলা বীজগণিত। এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রশ্ন ভাস্করাচার্যের সংস্কৃত পাটীগণিত 'লীলাবতী' থেকে এবং বিভিন্ন প্রাচীন পণ্ডিতদের পাণ্ডুলিপি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কি কি অসুবিধা পরিহার করবার উদ্দেশ্যে বীজগণিতশাস্ত্রের সূত্রপাত হয় এবং বীজগণিতের সাহায্যে কিভাবে অতি সহজেই দুরূহ গণিত বিষয়ক প্রশ্নের সমাধান হতে পারে, এই গ্রন্থে তা' নিয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বীজগণিত

রচনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরল গণিত'—২য় ভাগে বীজগণিতের কয়েকটি দুরূহ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা পাওয়া গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জ্যামিতি রচনায় যাঁরা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পঞ্চানন ঘোষ ও গুরুনাথ সেনগুপ্তের নাম। পঞ্চানন ঘোষের 'সরল পরিমিতি'[৮]তে ব্যবহারিক জ্যামিতি বিষয়ক কিছু প্রসঙ্গ রয়েছে। গুরুনাথ সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'জ্যামিতি সহায়—১ম ভাগ' (১২৯৮) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে লেখা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত জ্যামিতির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ব্রহ্মমোহন মল্লিকের 'ইউক্লিডের জ্যামিতি'—(১৩১০) এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরল গণিত—৩য় ভাগ' (জ্যামিতি)। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম চার অধ্যায় ডাঃ সিম্‌সনের গ্রন্থ থেকে অনুবাদিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায়ের শেষে ব্যাখ্যা ও পরিশিষ্ট অংশে যে জ্যামিতিক আলোচনা রয়েছে তাতে লেখকের যুক্তিপূর্ণ বিচারপ্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মমোহন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।[৯] গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে একটি ইংরেজী জ্যামিতি লিখেছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতিকে হুবহু অনুকরণ না ক'রে কিছুটা নূতন প্রণালীতে ঐ গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থটি হোল ঐ ইংরেজী জ্যামিতিরই বঙ্গানুবাদ।

আধুনিক যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হোল। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় এই যুগেও নগণ্য।

আধুনিক যুগের জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যতীন্দ্রনাথ মজুমদারের 'আকাশের গল্প' (১৩২০), কৃষ্ণলাল সাধুর 'আকাশ কাহিনী' (১৩২০) জগদানন্দ রায়ের 'গ্রহ-নক্ষত্র' (১৯১৫) ও 'নক্ষত্রচেনা' (১৯৩১) এবং প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আকাশ ও ঈথার' ১৩২৬)।

৮ 'সরল পরিমিতি'র রচনাকাল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে। কারণ, সরল শুভঙ্করীর ষষ্ঠ সংস্করণে (১৮৮৯) পঞ্চানন ঘোষকে 'পরিমিতি'র গ্রন্থকার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯ বঙ্গভাষার লেখক (১ম খণ্ড), হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৬৯৬-৬৯৭।

যতীন্দ্রনাথ মজুমদারের 'আকাশের গল্প' জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংকলনে কয়েকটি ইংরেজী গ্রন্থ এবং লেখকের মাতুল শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কয়েকটি প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দেখে দিয়েছিলেন। ভূমিকাও তাঁরই লেখা। এই গ্রন্থে সৌরজগৎ, ধূমকেতু, উল্কা ও বিভিন্ন প্রকারের নক্ষত্র নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে।

কৃষ্ণলাল সাধুর 'আকাশ কাহিনী'তে গণিত ও ফলিত—উভয় জ্যোতিষই স্থান পেয়েছে। তবে গণিত জ্যোতিষের (Astronomy) প্রসঙ্গই বিস্তারিত। জ্যোতিষের যে সকল বিষয় এখনও পর্যন্ত প্রচলিত, সেই বিষয়গুলোই এই গ্রন্থের উপজীব্য। এই গ্রন্থে গণিত জ্যোতিষের মধ্যে রয়েছে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, ধূমকেতু ও উল্কার প্রসঙ্গ। তবে গণিত জ্যোতিষের মধ্যেও যায়গায় যায়গায় ফলিত জ্যোতিষ এসে গেছে। গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি, যায়গায় যায়গায় ভাবোচ্ছ্বাস। অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাসের ফলে রচনার সাহিত্যিক মাধুর্য নষ্ট হয়েছে।

জগদানন্দের 'গ্রহ-নক্ষত্র ও 'নক্ষত্রচেনা' ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা দু'টি আকর্ষণীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ।

প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আকাশ ও ঈথার' একটি ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার মিশ্রণ ঘটেছে। তবে হাল্কা প্রকাশভঙ্গী যায়গায় যায়গায় রচনার গাম্ভীর্য নষ্ট করেছে। এই গ্রন্থের লেখক রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে কেন্দ্র ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে আক্রমণ করেছেন ঃ—

> "পশ্চিমদেশের ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটারিকে একটা 'ক্ষুধিত পাষাণ' বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন ; তাই বিজ্ঞানের দু-একজন বাউল ফকির 'সব ঝুটা হ্যায়, তফাৎ যাও' রবে হাঁকিয়া হাঁকিয়া তাহারই চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ! আমাদের রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর জ্ঞানগৌরবভারাবনত কলেবরে শুভ্র যজ্ঞোপবীত দুলাইয়া জাহ্নবীতীরে দাঁড়াইয়া তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—বিজ্ঞানের ও বিরাট পুরীটা মায়াপুরী।"
>
> [পৃঃ ১৮]

চার

আধুনিক যুগে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। তবে এদের প্রায় সব কয়টিই পাঠ্যপুস্তক। বহু গ্রন্থেই পুরাণের প্রভাব পড়লেও পূর্ববর্তী যুগে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি ভূবিজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল। আধুনিক যুগের ভূবিজ্ঞানে পুরাণের প্রভাব দেখা গেল না বটে, তবে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে ভূবিজ্ঞান লিখবার প্রচেষ্টা এই যুগে নগণ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে প্রকাশিত প্রমথনাথ বসুর 'প্রাকৃতিক ইতিহাস'-এর (১৮৮৪) আলোচ্য বিষয় প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা। ভূবিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যাদির উল্লেখযোগ্য সমাবেশ ঘটেছে এই গ্রন্থে। গ্রন্থটির লেখক প্রমথনাথ নিজেও একজন ভূতত্ত্ববিদ ছিলেন। দীর্ঘকাল ধ'রে রাজ্য সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগে চাকুরী করা ছাড়াও তিনি নিজে কয়েকটি কয়লা, লৌহ ও গ্র্যানাইটের খনি আবিষ্কার করেছিলেন।[১০] প্রাকৃতিক ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় ভূপৃষ্ঠ, ভূগর্ভ ও বায়ু। এখানে আলোচনা যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। তবে ভাষায় আড়ষ্টতা প্রমথনাথের রচনাভঙ্গীর প্রধান ত্রুটি।

প্রমথনাথ ছাড়া আধুনিক যুগে আর দু'একজন মাত্র লেখক সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে ভূবিজ্ঞান লিখেছেন।

কবিতায় ভূবিজ্ঞান লিখেছিলেন কাটাপাড়া নিবাসী মোহিতকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মোহিতকৃষ্ণের 'পদ্যভূগোলকথা' ১২৯৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় পদ্যে লিখিত ভূগোল এটিই প্রথম নয়। ১২৯২ সালের ২৮শে অগ্রহায়ণ 'বঙ্গবাসী'তে একখানি পদ্যভূগোলের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।[১১] মোহিতকৃষ্ণের গ্রন্থটি কয়েকটি প্রচলিত ভূগোল এবং মানচিত্র অবলম্বন ক'রে পয়ার ছন্দে লেখা। ছন্দে মিল রাখবার জন্যে আলোচ্য গ্রন্থে অনেক শব্দই সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ শব্দ-সংক্ষেপের ফলে রচনা যায়গায় যায়গায় শ্রুতিকটু ও দুর্বোধ্য ঠেকে।

আধুনিক যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা ভূবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের

১০ জীবনীকোষ—শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার, ৫ম খণ্ড—পৃঃ ১৪০৪-১৪০৫।

১১ পদ্যভূগোলকথা, ১ম সংস্করণ—পৃঃ /০ ; পাদটীকা।

সংখ্যা নগণ্য হলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীতে এই বিজ্ঞান নিয়ে অসংখ্য পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে লেখা পাঠ্যপুস্তকসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'প্রকৃতি বিবরণ' (১২৯৩), যোগেশচন্দ্র রায়ের 'প্রাকৃত ভূগোল' (১২৯৫) এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'ভূগোল' (১৮৯৮)।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা নিয়ে অসংখ্য ভূগোল লেখা হোল। এই সকল গ্রন্থে রাজনৈতিক ভূগোলেরই প্রাধান্য। অপরাপর ভূগোলগুলির অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক। কদাচিৎ কোনো কোনো গ্রন্থে নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে রাসবিহারী মণ্ডল অনুবাদিত 'খনিজরিপ' (১৯২১), ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের কেমিষ্ট জিতেন্দ্রকুমার গুহ প্রণীত 'ভৌগোলিক প্রকৃতি-বিজ্ঞান' (১৯৩০) ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি হোল বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের খনিজবিদ্যার অধ্যাপক ই, এচ্, রবার্টসনের ' A Manual of Mine Surveying' নামক ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ। খনি-পরিমাপ সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের তথ্যাদি এতে রয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, ভূবিদ্যা ইত্যাদি নিয়ে সুপরিকল্পিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের যে সকল ভূবৃত্তান্ত প্রকাশিত হোল তাদের মধ্যেও প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক তথ্যাদি কিছু কিছু রয়েছে।

জীববিজ্ঞান (উদ্ভিদ, প্রাণী, শারীর, অস্থিবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব), সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব

পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়াও আধুনিক যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে জীববিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয় নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় উন্নতি সাধিত হোল। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণকে কেন্দ্র ক'রে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি দেশীয় জনসাধারণের যে কৌতূহল সৃষ্টি হচ্ছিল, সেই কৌতূহলই এর মূলে। এই কৌতূহল সৃষ্টির কারণ হোল এদেশে বিজ্ঞানচর্চার প্রসার। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এদেশে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আরও ব্যাপকভাবে সুরু হোল। এর মূলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পাশ হয়। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছিল, ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া এবং উপাধি দেওয়া। ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টের ফলে ছাত্রদের জ্ঞানের উন্নতি এবং গবেষণারও ক্ষেত্র তৈরী হোল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলিতে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা ঠিকমত চলছে কিনা, তা' দেখবার দায়িত্বও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এসে পড়ল।[১] তা' ছাড়া অনুমোদিত কলেজগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হোল। এই নতুন আইনে ম্যাট্রিকুলেশন থেকে ডিগ্রী ক্লাস পর্যন্ত ছাত্রদের মাতৃভাষার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হবার পর এই নতুন আইনগুলি কার্যকরী হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বিজ্ঞান-কলেজের প্রতিষ্ঠা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ বিজ্ঞান-কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হোল। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও কলা—উভয় বিভাগেই শিক্ষাদানের সম্মতি দিলেন। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় উচ্চাঙ্গের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষিত জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট

১ Hundred years of the University of Calcutta—PP. 182-183.

হোল। কিন্তু এই যুগে বিজ্ঞানচর্চার যতখানি উন্নতি সাধিত হোল, বিজ্ঞান-সাহিত্যের ততখানি উন্নতি সাধিত হয় নি। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানচর্চাই এর প্রধান কারণ। ফলে এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার অগ্রগতি হোল বটে, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন লেখক ছাড়া বিজ্ঞানের দুরূহ ও জটিল দিক নিয়ে সর্বজনবোধ্য গ্রন্থ-রচনার প্রয়াস এই যুগেও দেখা গেল না। তবে বিজ্ঞানসাহিত্যের চাহিদা যে বেড়ে চলল, তা'র প্রমাণ পাওয়া গেল জনসাধারণের পাঠোপযোগী অসংখ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে। এই চাহিদার মূলে ছিল, বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ও অগ্রগতিকে কেন্দ্র ক'রে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের কৌতূহল।

পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও ছোটদের উদ্দেশ্যে এই যুগে বহু বিজ্ঞানগ্রন্থ রচিত হোল। জগদানন্দ রায়ের অধিকাংশ গ্রন্থই ছোটদের এবং 'অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের' উদ্দেশ্যে লেখা।

এক

আধুনিক যুগে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব' (১৩১৯), গিরিশচন্দ্র বসুর 'উদ্ভিদজ্ঞান' ১ম (১৩৩০) ও ২য় পর্ব (১৩৩২) ও মোহাম্মদ মতিয়র রহমানের 'উদ্ভিদ-রহস্য' (১৯২৬)। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের লেখক সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্টের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সরকারী কাজে গাছপালা পরিদর্শনের জন্যে লেখক আসাম যান। আসাম থেকে ফিরে আসবার পর বাংলা ভাষায় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে একটি গ্রন্থ লিখবেন বলে তিনি স্থির করেন। সেই ইচ্ছা অনুযায়ী এবং বাংলায় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের অভাব পূরণ করবার উদ্দেশ্যে লেখক এই গ্রন্থটি রচনা করেন।[২] ইতিপূর্বে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রধানতঃ নিজস্ব পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর ক'রে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উদ্ভিদবিজ্ঞান রচনা করেছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রচন্দ্রের গ্রন্থটি পুরোপুরি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা। তবে গ্রন্থটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়। তা' ছাড়া আলোচনাও প্রাথমিক প্রকৃতির এবং অসম্পূর্ণ। চার পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই

২ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব—ভূমিকা। পৃঃ ।৶০।

গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বেগুন গাছের বর্ণনা প্রসঙ্গে পাতা, ফুল ইত্যাদি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শাখাপ্রশাখা প্রসারিত হওয়ার প্রণালী এবং পত্র ও পুষ্প-সন্নিবেশ-প্রসঙ্গ আলোচিত। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় শিকড় ও 'উদ্ভিদ-কঙ্কাল বিজ্ঞান' (Plant histology)। শেষোক্ত দুই পরিচ্ছেদের আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ প্রকৃতির। প্রায় সর্বত্রই অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিক শব্দ অনুবাদ করায় রচনা যায়গায় যায়গায় শ্রুতিকটু ঠেকে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র বসুর 'উদ্ভিদ-জ্ঞান, ১ম ও ২য় পর্ব' বাংলা সাহিত্যে উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ১ম পর্বে উদ্ভিদের 'স্থূলদেহ' (Morphology) সম্বন্ধে আলোচনা। দ্বিতীয় পর্বে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ বিস্তারিতভাবে আলোচিত। এই গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক বিদেশী শব্দগুলো বাংলায় অনুবাদিত হয়েছে। তবে অর্থের দিকে অতিরিক্ত লক্ষ্য রেখে এই অনুবাদ করায় শব্দগুলো যায়গায় যায়গায় হাল্কা ও লঘু হয়ে পড়েছে। ২য় পর্বে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা সুপরিকল্পিত ও তথ্যপূর্ণ। প্রায় সর্বত্রই এদেশীয় গাছপালার প্রচুর উদাহরণ থাকায় রচনার উৎকর্ষতা বেড়েছে। গ্রন্থটির সর্বত্রই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় সুস্পষ্ট।

নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল মোহাম্মদ মতিয়র রহমানের উদ্ভিদ-রহস্যে। মতিয়র রহমান গ্রন্থরচনার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রাচীন কবিদের মতো দৈবাদেশের কথা বলেছেন। এই লেখক ইতিপূর্বে 'পুষ্প রহস্য' নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'উদ্ভিদ-রহস্য' বাজিতপুর 'মোছলেম যুবক সমিতি'র সম্পাদক ছেরাজুল হক কর্তৃক প্রকাশিত হয়। উদ্ভিদ-রহস্য রচনার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থটির সূচনায় প্রাচীন কবিদের মতো লেখক বলেছেন,

"এ গ্রামের দক্ষিণাংশে জলাশয়-তীরে,
রম্য এক জম্বুবৃক্ষ ছায়াদান করে।
একদা নিদাঘ-তাপে হইয়া তাপিত,
দৈববসে তথা আমি হ'নু উপনীত।

অকস্মাৎ মক্ষিকা ও ভ্রমর-গুঞ্জন,
আকর্ষিল ত্বরা মোর চিন্তাক্লিষ্ট মন।
পঞ্চবর্ষ পূর্ব্বে এরা ঐশিক আদেশে,
বলেছিল 'পুষ্প-তত্ত্ব' বসি মোর পাশে।
সেইকালে বলেছিল ভ্রমর সুজন,
'উদ্ভিদ-রহস্য' তাকে করিবে জ্ঞাপন।
আগ্রহ হইল তাই হৃদয়ে আমার,
জানিতে ও জানাইতে রহস্য খোদার।"

সমগ্র গ্রন্থটি দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগের ছয়টি পরিচ্ছেদে উদ্ভিদের জাতি-বিভাগ, উদ্ভিদের কার্য, বংশ-বিস্তার, উদ্ভিদের আত্মরক্ষা ও উপকারিতার প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচিত। দ্বিতীয় ভাগে দ্রব্যগুণ নিয়ে চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা। ১ম ভাগের আলোচনা-পদ্ধতি কৌতূহলোদ্দীপক। মাছি ও ভ্রমরের উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে এখানে বক্তব্য বিষয় বর্ণিত। আলোচনা সবত্রই প্রাথমিক প্রকৃতির এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

আধুনিক যুগে ছোটদের উদ্দেশ্যেও বহু উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে এদের অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক। উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে লেখা গ্রন্থগুলোর মধ্যে শিশুসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে জগদানন্দ রায়ের 'গাছপালা' (১৯২১), সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'উদ্ভিদের চেতনা' (১৩৩৬) এবং হেমেন্দ্র-কুমার ভট্টাচার্যের 'গাছপালার গল্প' (১৩৩৬)।

জগদানন্দ রায়ের 'গাছপালা' ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'উদ্ভিদের চেতনা' নামক গ্রন্থটির বিষয়বস্তু 'বিচিত্রা' 'আত্মশক্তি', 'শিশুসাথী' প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছে চার বৎসর ধরে যে শিক্ষালাভ করেছিলেন, এই গ্রন্থে তা' লিপিবদ্ধ হয়েছে। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সহকারী অধ্যক্ষ নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু অংশ সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থে প্রাণী ও উদ্ভিদ, গাছের চেতনা, রস-আকর্ষণ ও রস-সঞ্চালন, উদ্ভিদের আলোক-তৃষ্ণা, উদ্ভিদের স্নায়ু ও উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন—মোট এই ছয়টি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি সরস। লেখক জগদানন্দের ন্যায় ভাষায় বিবিধ চলতি শব্দ

ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থটিতে উদ্ভিদজগতের প্রতি লেখকের গভীর মমত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে যায়গায় যায়গায় এই মমত্ব উচ্ছ্বাসে পর্যবসিত। যেমন,

> "উদ্ভিদ্জাতিটাও তেমনি খোকার মত একটি প্রাণী। আঘাত কর—কাঁপিয়া উঠিবে, জড়সড় হইয়া পড়িবে, সঙ্কুচিত হইয়া এতটুকু হইয়া যাইবে; কণ্ঠ নাই—চীৎকার করিয়া উঠিতে পারিবে না। ব্যথা-বেদনায় বুক ফাটিয়া গেলেও কথায় জানাইবার উপায় নাই; তাই, আমরা উদ্ভিদের প্রতি এমন নির্দ্দয় হইতে পারিয়াছি। তাহাদের ব্যথার কথা যে প্রাণ দিয়া বুঝিতে হয়, কান দিয়া শুনিবার নহে।"

কথোপকথনের মাধ্যমে রচিত হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের 'গাছপালার গল্প'তে (১৯২৯) সচরাচর-দৃষ্ট গাছপালা এবং বিভিন্ন সহজ পরীক্ষার সাহায্যে সরল ভাষায় বক্তব্য বিষয় বোঝান হয়েছে। হেমেন্দ্রকুমার ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন।

আধুনিক যুগে শিশু ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক বহু পাঠ্য-পুস্তক রচিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উদ্ভিদ-বৃত্তান্ত' (১৩১০), গিরিশচন্দ্র বসুর 'গাছের কথা' (১৩১৭) ইত্যাদি।

দুই

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যে সকল প্রাণিবিজ্ঞান রচিত হয়েছিল তাদের একটিও উচ্চাঙ্গের নয়। মথুরানাথ বর্ম, কমলকৃষ্ণ ও জগৎকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ লেখকরা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রাণিবিজ্ঞান লিখতে গিয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর 'হস্তীতত্ত্ব'ও (১৩০১) একটি ব্যর্থ রচনা। হস্তী সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় এই গ্রন্থে বর্ণিত। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ একে বলা যায় না। তবে গ্রন্থটির প্রথম দিকে হস্তীর উৎপত্তি, জাতিপ্রভেদ, দেশভেদে হস্তীর আকৃতি, প্রকৃতি ও বর্ণভেদ নিয়ে আলোচনায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদি কিছু কিছু আছে। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু বিভিন্ন সংস্কৃত, ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। তবে সংস্কৃতের প্রভাবই এতে

বেশী। বাংলা ও সংস্কৃত—উভয় প্রকার নামই এখানে ব্যবহৃত। কয়েক যায়গায় সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে শ্লোকও উদ্ধৃত করা হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের রচনাভঙ্গী আড়ষ্ট।

বিংশ শতাব্দীতে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের রচনারীতি ও পরিকল্পনায় প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হোল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'সরল প্রাণিবিজ্ঞান' (১৩০৯)। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, এখানে তুলনামূলক সমালোচনার মাধ্যমে প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ বর্ণিত। শ্রীবাসচন্দ্র চট্টরাজের 'প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত বা প্রাণীরাজ্য' (১৩১০) নামক গ্রন্থটিতেও সুপরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া গেল। এই গ্রন্থে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগে বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত। শ্রীবাসচন্দ্রের রচনারীতিও প্রাঞ্জল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা সাহিত্যে অভিব্যক্তিবাদ নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে গ্রন্থরচনার সূত্রপাত হোল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯৩৭) লিখিত 'অভিব্যক্তিবাদ' (১৩০৯)। অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী। তবে ক্ষীরোদচন্দ্রের গ্রন্থে অভিব্যক্তিবাদের একটি অংশ, শুধুমাত্র মানব-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ক্ষিতীন্দ্রনাথের গ্রন্থটির পরিকল্পনা আরও বিস্তৃত। এই গ্রন্থে অভিব্যক্তিবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, জীবনসংগ্রাম, পরিবৃত্তি (অন্তর্হিত শক্তিপ্রভাবে প্রাণীদের পরিবর্তন), মানব-শরীরের অভিব্যক্তি, ভূগর্ভে অভিব্যক্তির সাক্ষ্য, বর্ণভেদে জীবরক্ষা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত। তবে অভিব্যক্তিবাদের মূল তত্ত্বগুলোর মধ্যেই এই গ্রন্থের আলোচনা সীমিত। বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বা গভীর কোনো দিক নিয়ে আলোচনা এখানে নেই। গ্রন্থকার প্রথমে তাঁর পিতৃব্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশে অভিব্যক্তিবাদ আলোচনা করতে আরম্ভ করেন। পরে বঙ্গসাহিত্যে অভিব্যক্তিবাদ বিষয়ক গ্রন্থের অভাব লক্ষ্য ক'রে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থ-রচনায় সহায়তা করেছিলেন লেখকের বন্ধু বনওয়ারিলাল চৌধুরী। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু অংশ সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন। অভিব্যক্তিবাদ রচনায় ডারউইন, ওয়ালেস, হাক্স্লী প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়। তবে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে রচিত হলেও গ্রন্থটির যায়গায় যায়গায় ভারতীয় পৌরাণিক বিশ্বাস এবং ধর্ম ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রাধান্য লাভ

করেছে। দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র এবং হেমেন্দ্রনাথের পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথের চিন্তায় ধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার যে প্রভাব পড়েছিল, সেই প্রভাবই এখানে কার্যকরী হয়েছে বলে মনে হয়। ক্ষিতীন্দ্রনাথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সংস্করণের সম্পাদনা করেন এবং অধ্যাত্মধর্ম ও অজ্ঞেয়বাদ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্যে তিনি তত্ত্বনিধি উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তা' ছাড়া তিনি ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্ণধার। অভিব্যক্তিবাদে ক্ষিতীন্দ্রনাথ বিদেশী পরিভাষা যথাসম্ভব বর্জন করেছেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের রচনারীতি বলিষ্ঠ ও প্রাঞ্জল।

ক্ষিতীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে লেখা নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর 'জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি' (১৩১২) মূলতঃ একটি দার্শনিক চিন্তামূলক গ্রন্থ। তবে এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি'তে কিছুটা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক বিবর্তনবাদের সমর্থক হলেও কয়েকক্ষেত্রে 'বিজ্ঞান-সম্মত ক্রম-বিকাশ-নীতি' মেনে নেন নি। নরেন্দ্র-নারায়ণের রচনায় উচ্ছ্বাসের আধিক্য। তা' ছাড়া তাঁর ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা।

আধুনিক যুগে জীবনপ্রবাহের গূঢ় রহস্য নিয়ে মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক আলোচনা পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ডাঃ অমৃতলাল সরকারের 'জীবন প্রহেলিকা' (১৯১৭)। এই গ্রন্থটি হোল ডাঃ সরকারের "Life—What is it ?" নামক ইংরেজী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক শরৎচন্দ্র রায়। 'জীবন প্রহেলিকা' একটি গভীর চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক আলোচনা। মূল দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য থাকলেও রচনারীতির গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে এই প্রবন্ধটির তুলনা করা যায়। প্রবন্ধটি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভার প্রাথমিক অধিবেশনে ডাঃ অমৃতলাল সরকার ইংরেজীতে পাঠ করেন। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তা' ছাড়া ডাঃ চুণীলাল বসু, ডাঃ সি. ভি. রমন প্রমুখ মনীষীরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত সুধীদের সকলেই ডাঃ সরকারের বক্তৃতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।[৩] এই আলোচনার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, প্রাণতত্ত্বের

৩ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই আলোচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, "আমি এই সদুপদেশ-পূর্ণ বক্তৃতার জন্য বক্তাকে অভিনন্দিত করিতেছি। তাঁহার বক্তব্যের আধ্যাত্মিক অংশ ব্যাখ্যাত

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এখানে বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সম্মিলন ঘটেছে। বক্তৃতার মূল কথা এই যে, কি চেতন, কি অচেতন সর্বত্রই প্রাণ বিদ্যমান; অচেতন স্ফটিক থেকে সুরু ক'রে মানুষ পর্যন্ত সর্বত্রই প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। বক্তৃতাটির বঙ্গানুবাদ প্রশংসনীয়। অনুবাদক দুরূহ শব্দগুলো যথাসম্ভব ব্যাখ্যা ক'রে দিয়েছেন।

শুধুমাত্র অভিব্যক্তিবাদ ও প্রাণপ্রবাহ নিয়েই নয়, প্রাণিজগৎ নিয়েও আধুনিক যুগে কয়েকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, সত্যচরণ লাহার 'পাখীর কথা' (১৩২৮)। সত্যচরণ লাহা নিজে পাখী পুষতেন এবং বিভিন্ন দেশের পাখী সংগ্রহ করতেন। 'পাখীর কথা'র বিষয়বস্তু 'প্রবাসী', 'মানসী', 'ভারতবর্ষ', 'সুবর্ণবণিক সমাচার' প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটি হোল সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। 'পাখীর কথা' তিন ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগে খাঁচার পাখী সম্বন্ধে আলোচনা। এই ভাগে পাখীপালনের উৎপত্তি ও ইতিহাস আলোচনা ক'রে পাখীর খাঁচা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। এরপর পাখী পোষার পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনার পর এই ভাগ সমাপ্ত। দ্বিতীয় ভাগে 'Economic Ornithology' কি তা' বুঝিয়ে পাখীর 'Sanctuary' সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে মানবের উপকারিতায় পাখীর অবদান অতি সুন্দরভাবে আলোচিত। তৃতীয় ভাগের বিষয়বস্তু 'কালিদাস-সাহিত্যে বিহঙ্গ-পরিচয়।' এখানে কালিদাসের মেঘদূত ও ঋতুসংহার, এই দু'টি কাব্য আলোচনা ক'রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধরনের পাখীর সঙ্গে কালিদাসের কিরূপ পরিচয় ছিল তা' বোঝান হয়েছে। ১ম ভাগে খাঁচার পাখী সম্বন্ধে আলোচনায় রয়েছে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ। আর কালিদাস-সাহিত্যে পাখী নিয়ে আলোচনায় রয়েছে পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিচয়। সত্যচরণ লাহার ভাষা শ্রুতিমধুর। উৎকৃষ্ট শব্দপ্রয়োগ তাঁর রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট্য।

বাংলা ভাষায় লেখা পাখী সম্বন্ধে আর একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সুরেন্দ্রনাথ

হওয়ায় বাস্তবিক বক্তৃতাটি অমূল্য হইয়াছে। ডাক্তার সরকার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ যদি বিজ্ঞানের জড়মূলক অংশ আধ্যাত্মিক অংশের সহিত পাশাপাশি অবস্থান করে তাহা হইলে বাস্তবিকই আমরা প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারি।"

সেনের 'পাখীর কথা' (১৩২৮)। এই গ্রন্থের প্রায় সকল প্রবন্ধই 'প্রতিভা' ও 'ঢাকা রিভিউ'তে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। ক্ষুদ্রকায় হলেও 'পাখীর কথা' একটি সারগর্ভ ও সরস গ্রন্থ। এতে পাখীর বংশ-পরিচয়, পালকের বর্ণ ও বিন্যাস, পুরুষ ও স্ত্রী পাখীর বর্ণবিভেদ, রক্ষক-বর্ণ (Protective Colouration) এবং পাখীর জীবনধারণ পদ্ধতি ও বিচিত্র প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার কালে লেখক দেশী ও বিদেশী, উভয় প্রকার পাখীর কথাই উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, লেখকের উৎকৃষ্ট বর্ণনাভঙ্গী এবং স্বল্পপরিসরের মধ্যে পক্ষিজগতের বিচিত্র তথ্যের মূল্যবান সমাবেশ।

পাখী নিয়ে জগদানন্দ রায়ও গ্রন্থ রচনা করেন। জগদানন্দের 'বাংলার পাখী' (১৯২৪) এবং 'পাখী' (১৩৩১) ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা সরস বিজ্ঞানগ্রন্থ। জগদানন্দের প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর গ্রন্থ 'পোকা-মাকড়' (১৩২৬) এবং 'মাছ ব্যাঙ্ সাপ' (১৯২৩) ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা।

জগদানন্দ রায় ছাড়া আধুনিক যুগে ছোটদের জন্যে প্রাণিবিজ্ঞান লিখে খ্যাতি অর্জন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুরে দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ব্রজকিশোর বসু। দ্বিজেন্দ্রনাথ বি. এ. অবধি অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারেন নি। বিজ্ঞান ও সাহিত্যে বরাবরই তাঁর অনুরাগ ছিল। ছাত্রজীবন শেষ ক'রে কিছুকাল তিনি শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহকারী কর্মাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তা' ছাড়া জাতীয় মহাসমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর নিকট সংযোগ ছিল। 'সখা', 'সখা ও সাথী' প্রভৃতি বিভিন্ন শিশুপাঠ্য পত্রিকায় তিনি প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবে লিখতেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ 'জীবজন্তু' ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে স্তন্যপায়ী জন্তুদের কয়েকটি শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। উপক্রমণিকায় জীবজগতের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা সরস ও তথ্যপূর্ণ। তা' ছাড়া আলোচনার স্থানে স্থানে কাহিনীর অবতারণা করায় বর্ণনীয় বিষয়বস্তু ছোটদের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবার অবকাশ পেয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'চিড়িয়াখানা'য় (১৩১৮) বিভিন্ন ধরনের বানর, মাংসাশী পশু ও খুরওয়ালা জন্তুদের আকৃতি, প্রকৃতি ও আবাসস্থল সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। এই লেখকের সর্বশেষ গ্রন্থ 'কীট-পতঙ্গ' লেখকের মৃত্যুর পর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে[৪] প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল কীটপতঙ্গ, পাখী, সরীসৃপ প্রভৃতি বিভিন্ন জীবের জীবনবৃত্তান্ত লিখবার।[৫] এই উদ্দেশ্যে তিনি 'সন্দেশ' পত্রিকায় কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে লিখতে স্বরু করেন। কিন্তু কীটপতঙ্গ বিষয়ক রচনা সমাপ্ত হবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের উৎসাহে এবং লেখকের ভাগিনেয় প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কীটপতঙ্গ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মাছি, পিঁপড়া ও মৌমাছি বিষয়ক আলোচনার লেখক প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। এই আলোচনা লিখতে গিয়ে প্রভাতচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথের নোট বই থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ চলতি ভাষায় লিখবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দু' এক যায়গায় গুরুচণ্ডালী দোষ তার রচনাভঙ্গীর প্রধান ত্রুটি। তবে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গী খুবই সরল। গ্রন্থের প্রারম্ভে কীটপতঙ্গ বলতে কি বোঝায় তা' নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বিভিন্ন বর্গের কীটপতঙ্গের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কীটপতঙ্গের শ্রেণীবিভাগ সুপরিকল্পিত। গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, বর্ণনাভঙ্গীর সরসতা। গল্পের মতো সরস ভাষায় অতি পরিচিত কীটপতঙ্গের কথা এখানে আলোচিত। তা' ছাড়া যায়গায় যায়গায় লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা থাকায় রচনা ছোটদের কাছে কোথাও দুরূহ বা একঘেয়ে হয়ে ওঠে নি।

যশস্বী শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছোটদের জন্যে কয়েকটি সরস বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেন। এই লেখকের 'পশু-পক্ষী' (১৩১৮) বালক-বালিকাদের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। 'পশুপক্ষীর' বিষয়বস্তু 'Royal Natural History', 'Cassell's Concise Natural History' প্রভৃতি বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ, রামব্রহ্ম সান্যালের 'Hours with Nature', আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'সরল প্রাণিবিজ্ঞান' এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ

---

৪ Appendix to the Calcutta Gazette, Thursday, Nov-19, 1925.

৫ কীটপতঙ্গ—দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। প্রকাশকের নিবেদন

বসুর 'জীবজন্তু' থেকে নেওয়া হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থ-রচনায় সাহায্য করেছিলেন। এই গ্রন্থে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পাঁচটি প্রধান শ্রেণীর মধ্যে দু'টি শ্রেণী, স্তন্যপায়ী ও পাখী সম্বন্ধে মোটামুটি বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথের ভাষা সরল ও মনোহর। দুরূহ শব্দ তিনি যথাসম্ভব বর্জন করেছেন। তাঁর বাক্যও নাতিদীর্ঘ। যায়গায় যায়গায় চলতি শব্দের প্রয়োগ যোগীন্দ্রনাথের রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট্য।

'ছোটদের চিড়িয়াখানা' (নূতন সংস্করণ, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ) জীবজগৎ নিয়ে চলতি ভাষায় লেখা একটি সরস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তথ্য অপেক্ষা গল্প ও কাহিনীরই প্রাধান্য। তবে জীবজন্তুর শ্রেণীবিভাগে এখানেও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও যোগীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও বহু গ্রন্থকার জগদানন্দের সমসাময়িক যুগে ছোটদের জন্যে প্রাণিবিজ্ঞান রচনা করেন। নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতি গ্রন্থকারদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ব্যাঙের আত্মকথা' (১৩২৬) একটি কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ। এখানে চলতি ভাষায় গল্প ও রূপকথার আকারে বক্তব্য বিষয় বর্ণিত। তবে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক কিছু কিছু তথ্যাদিও এই গ্রন্থে রয়েছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'জানোয়ারের মেলা' (নূতন সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৩৬) চলতি ভাষায় লেখা একটি সরস বিজ্ঞানগ্রন্থ। নগেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথের গ্রন্থের তুলনায় হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের 'জীবজগৎ' (১৩৩৮) অপেক্ষাকৃত সারগর্ভ ও সুপরিকল্পিত। হেমেন্দ্রকুমার ইতিপূর্বে 'গাছপালার গল্প' লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন জীবজগতের বৈচিত্র্য ও ক্রমবিবর্তনের ধারা, উভয় দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি রচিত। পরিভাষায় অনেক যায়গায় লেখক নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন। আবার কয়েক যায়গায় ইংরেজী শব্দই ব্যবহৃত।

উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় এই যুগেও পাঠ্যপুস্তকের তুলনায় জনসাধারণের জন্যে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা নগণ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে ফেলিক্স্ কেরী, রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী প্রমুখ লেখকরা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে শারীরবিজ্ঞান রচনার চেষ্টা

করেছিলেন। কিন্তু রচনাভঙ্গীর দুরূহতা উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি। আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে শারীরবিজ্ঞান রচনায় উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি দেখা গেল না। ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও এই যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই তথ্যসমাবেশের দিক থেকে দুর্বল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, খৃষ্টান লিটারেচার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'আমার আশ্চর্য্য বাস-গৃহ' (১৯০২)। আশ্চর্য বাস-গৃহ অর্থে মানবশরীর। খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে মানবশরীরের প্রধান প্রধান অংশগুলি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। 'আমার আশ্চর্য্য বাস-গৃহ' একটি ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ। এতে আছে অস্থি, মাংসপেশী, রক্ত, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ইত্যাদি নিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এই গ্রন্থে সর্বপ্রকার টেক্‌নিক্যালিটি এড়িয়ে বক্তব্য বিষয়কে যথাসম্ভব সহজ ক'রে বলবার প্রচেষ্টা রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি, তথ্যের অভাব। টেক্‌নিক্যালিটি এড়াবার উদ্দেশ্যে শারীরবিদ্যা বিষয়ক অনেক প্রয়োজনীয় নামেরও এখানে উল্লেখ করা হয় নি। ফলে আলোচ্য বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত লঘু এবং বালকপাঠ্য রচনার মতো হয়ে পড়েছে। গ্রন্থটির ভাষায় দু' এক যায়গায় গুরুচণ্ডালী দোষ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপদেশ দেবার চেষ্টাও দেখা যায়। অপ্রয়োজনীয় কথার অবতারণা এবং অবান্তর উচ্ছ্বাস এই গ্রন্থের আর একটি বড় ত্রুটি। আধুনিক যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ রাজেন্দ্রলাল সুরের 'অস্থিতত্ত্ব' (২য় সংস্করণ, ১৯০৮) এবং 'শরীরতত্ত্ব' (৪র্থ সংস্করণ, ১৩২৬), মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'নরদেহ পরিচয়' (১৩২৯) এবং কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর 'দেহতত্ত্ব'—১ম (১৩৩১) ও ২য় খণ্ড (১৩৩৩)। ভাষায় কৃত্রিমতা রাজেন্দ্রলালের রচনার সর্বপ্রধান ত্রুটি। মহেশচন্দ্রের গ্রন্থে মানবশরীরের বিভিন্ন অংশ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলো বাংলায় অনুবাদিত।

দেহতত্ত্বের লেখক ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর রচনায় নূতন পরিভাষা সৃষ্টি না ক'রে যথাযথ অর্থ নির্ণয়ের পর প্রাচীন পারিভাষিক শব্দগুলোকে ব্যবহারের প্রচেষ্টা দেখা যায়। দেহতত্ত্বে ব্যবহৃত শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক

নামগুলোর জন্যে লেখক প্রখ্যাত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেনের নিকট ঋণী। গণনাথ সেন 'প্রত্যক্ষ-শারীর' নামে সংস্কৃত ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ঐ গ্রন্থে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি তিনি বেদ, তন্ত্র ও আয়ুর্বেদ গ্রন্থাদি থেকে সংগ্রহ করেন। পরিভাষার কিছু কিছু শব্দের নামকরণ গণনাথবাবু নিজেও করেছিলেন। দেহতত্ত্বে ব্যবহৃত অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক শব্দই গণনাথবাবুর গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। ডাঃ বসুর এই গ্রন্থটিতে মানবশরীরের বিভিন্ন অংশ নিয়ে মোটামুটিভাবে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। কার্ত্তিকচন্দ্রের রচনায় সাহিত্যরস নেই। তবে তিনি বক্তব্য বিষয় যথাসম্ভব সহজ ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

আধুনিক যুগে রচিত অস্থি ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য রাধাগোবিন্দ করের 'সংক্ষিপ্ত শারীর তত্ত্ব' (১৮৯৩)। ফেলিক্স্ কেরীর বিদ্যাহারাবলীর পর শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক এ ধরনের বিরাট গ্রন্থ বাংলায় আর রচিত হয় নি। প্রধানতঃ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লেখা হলেও জনসাধারণও যা'তে বুঝতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি রচিত। আধুনিক যুগে শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'য়্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জেন' কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্ত রচিত 'নরদেহতত্ত্ব' (১৮৮৬), নীলরতন অধিকারী সংকলিত ও অনুবাদিত 'নব-শরীর-বিধান', (১৮৮৭), ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র সংকলিত 'শরীর-ব্যবচ্ছেদ ও শরীর-তত্ত্বসার' (১৮৯৪) এবং অক্ষয়কুমার বসু লিখিত 'সজীব মানবদেহ বিজ্ঞান' (১৯১৩) ইত্যাদি।

তিন

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নৃতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় কোনোরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় নৃতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা এই যুগেও নগণ্য। প্রাচ্য তথ্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে এই যুগে বাংলায় নৃতত্ত্ব রচিত হোল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে উচ্চাঙ্গের কোনো নৃতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এই যুগেও রচিত হয় নি।

নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১২৫৪-১৩৩৪) 'মানবজীবন'-এ (১৯০৯) জীবনের বৈজ্ঞানিক দিক নিয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ নৃতত্ত্ব বিষয়ক

গ্রন্থ একে বলা যায় না। এই গ্রন্থটির তুলনায় শশধর রায়ের 'মানব-সমাজ' (১৩২০) অনেক বেশী তথ্যপূর্ণ ও সরস। এই গ্রন্থে মানব-সমাজের কথা আলোচিত হয়েছে আধুনিক জীববিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে। যোগেশচন্দ্র রায় ও গিরিজামোহন রায় রচিত 'বাঙ্গালী এবং বৈদ্যজাতি'তে (১৯২৭) নৃতত্ত্ব বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি কিছু কিছু রয়েছে।

চার

ভাষা ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে অভিনবত্ব এবং সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী তথ্যসমাবেশের দিক থেকে বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয় নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় আধুনিক যুগে প্রভূত উন্নতি সাধিত হোল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত বিচিত্র প্রকৃতির গ্রন্থগুলো বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের জনপ্রিয়তায় সহায়তা করল। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয় নিয়ে লেখা গ্রন্থগুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা প্রধানতঃ পাশ্চাত্য তত্ত্বনির্ভর, (২) প্রাচীন গ্রন্থ থেকে আহৃত তথ্যপ্রধান, (৩) প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়মূলক, (৪) বিজ্ঞান ও ধর্ম, (৫) দার্শনিক চিন্তামূলক এবং বিজ্ঞান ও দর্শন (৬) বিজ্ঞাননির্ভর উপকথা, (৭) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও জীবনী এবং (৮) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক নিয়ে লেখা শিশু ও কিশোর-সাহিত্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত পাশ্চাত্য তত্ত্বনির্ভর সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সূর্যকুমার অধিকারীর 'বিজ্ঞান কুসুম' (১২৯৪), এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'প্রকৃতি' (১৮৯৬) ও 'জগৎকথা' (১৯২৬)। সূর্যকুমার অধিকারীর বিজ্ঞান কুসুমে সংকলিত বিভিন্ন প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন, বান্ধব, নব্যভারত ইত্যাদি সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লিখিত পত্রিকাগুলো ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সূর্যকুমার অধিকারী নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। আলোচ্য গ্রন্থে 'পঞ্চভূত', 'আকাশ', 'বিপুল ব্রহ্মাণ্ড', 'ধূমকেতু ও উল্কাপাত', 'মৃন্ময়ী', 'সূর্য্য' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলো স্থান পেয়েছে। কোনো কোনো প্রবন্ধে দার্শনিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়; যেমন, 'পঞ্চভূত'। কোথাও বা উচ্ছ্বাসের আধিক্য এবং ঐতিহাসিক তথ্যের ছড়াছড়ি; যেমন, 'আকাশ'। 'ধূমকেতু

ও উল্কাপাত' নামক প্রবন্ধে শাস্ত্র ও বিভিন্ন কবিতা থেকে লেখক যে উদ্ধৃতিগুলো দিয়েছেন, তা' সুনির্বাচিত। সূর্যকুমারের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সারগর্ভ। এ ছাড়া তাঁর ভাষাও প্রাঞ্জল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'প্রকৃতি' বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন। নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কিভাবে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য-যবনিকা উন্মোচিত ক'রে দিচ্ছে, এই গ্রন্থে প্রধানতঃ তা' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো গ্রন্থের লেখক চেয়েছেন আলোচ্য বিষয়ের বিরাটত্ব ফুটিয়ে তুলতে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বিশ্ববৈচিত্র্য' (১৯০৭) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জল, স্থল ও আকাশ, সকল প্রসঙ্গই এতে আছে। তথ্য-সমাবেশের দিক থেকে গ্রন্থটি দুর্বল।

আধুনিক যুগে সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে সরল ও সুখপাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করলেন জগদানন্দ রায়। জগদানন্দের সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'প্রকৃতি পরিচয়' (১৩১৮), 'প্রাকৃতিকী' (১৯১৩) ও 'বৈজ্ঞানিকী' (১৩২০)।

প্রাচীন প্রাচ্য গ্রন্থাদি থেকে আহৃত তথ্যের উপর নির্ভর ক'রেও এই যুগে সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত ও হীরালাল ঢোল সম্পাদিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুম--১ম খণ্ড' (১২৯৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাকল্পদ্রুম—১ম খণ্ড 'আর্য্য-প্রতিভা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আর্য ঋষিদের জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'আর্য্য-প্রতিভা'য় সংকলিত বিষয়বস্তুর অধিকাংশই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব', 'আর্য্যদর্শন', 'বান্ধব', 'নব্যভারত', 'ভারতী' প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সকল পত্র-পত্রিকা ছাড়াও কালীবর বেদান্তবাগীশ বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে নিয়মিত-ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি লিখতেন। 'আর্য্য-প্রতিভা'র মুখবন্ধে কালীবর বলেছেন, "পক্ষ প্রতিপক্ষের সামঞ্জস্যকারক, এই ক্ষুদ্র পুস্তক নবীন প্রাচীন মতের মধ্যস্থ স্বরূপ। এই ক্ষুদ্র পুস্তকরূপ মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া পাঠক পাঠিকা নূতন পুরাতন দুই দিক দেখিতে পাইবেন, এবং কোন্ দিক কিরূপ নতাবনত (ওজন ভারি) তাহা বুঝিতে পারিবেন······।" লেখকের এই উক্তি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। মধ্যস্থ হতে গেলে যে নিরপেক্ষ

দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, এখানে তা'র একান্ত অভাব। উদাহরণস্বরূপ আকাশ সম্বন্ধে আলোচনার কথা বলা চলে। এখানে লেখক আধুনিক মতবাদকে প্রথম থেকেই যুক্তির অসমতলে দাঁড় করিয়ে আলোচনায় এগিয়েছেন। বস্তুতঃ, প্রাচীন মতবাদের প্রতিই লেখকের পক্ষপাতিত্ব। এই ত্রুটি সত্ত্বেও কালীবরের রচনার বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন প্রাচীন মতবাদগুলিকে পাশাপাশি স্থাপন ক'রে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা। অনেকক্ষেত্রে রূপক বিশ্লেষণ ক'রে প্রাচীন মতবাদকে আধুনিক ছাঁচে ঢালবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। তবে এই প্রচেষ্টায় দু'এক যায়গায় সুযুক্তির পরিচয় থাকলেও কষ্টকল্পনার ছাপ অনেক স্থলেই প্রকট। যেমন, পৃথিবী কূর্মপৃষ্ঠে এবং বাসুকির মাথার উপর স্থাপিত, পুরাণের এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনার কালে লেখক কূর্ম ও বাসুকিকে স্তর হিসাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন।

আধুনিক যুগের কয়েকটি গ্রন্থে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার-প্রণীত 'ভূত ও শক্তি' (সংবৎ ১৯৫৮)। বস্তু ও শক্তি (matter and force) সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা যায়। প্রাচীন ঋষিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় গ্রন্থটিতে সুস্পষ্ট। তবে অনেকক্ষেত্রেই এই শ্রদ্ধা অন্ধ বিশ্বাসের রূপ নিয়েছে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মূলতঃ কোনো বিরোধ নেই, আলোচ্য গ্রন্থের যায়গায় যায়গায় লেখক তা' বোঝাতে চেয়েছেন। বিজ্ঞান ও দর্শনে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট। তবে অত্যধিক তথ্য-সন্নিবেশের ফলে গ্রন্থটি তথ্যভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা মন্মথমোহন বসুর 'নূতন ও পুরাতন বিজ্ঞান'-এ (১৯১৩) দেখা যায়। ধর্ম ও পুরাণের উক্তির সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব' (১৯৩১) নামক গ্রন্থটিতেও সুস্পষ্ট।

আধুনিক যুগে রচিত সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো গ্রন্থে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য, ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরীর 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান' (১৩২২)। রচনাটি

১৮৩৭ শকাব্দের পৌষ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, লেখক এখানে তা' বোঝাতে চেয়েছেন। উচ্চাঙ্গের আলোচনা একে বলা যায় না। দিলীপকুমার রায়, বীরবল ও অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'পত্রাবলী। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান' (১৯৩১) একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। নতুন পদার্থবিজ্ঞান প্রাচীন বিজ্ঞানের ভিত টলিয়েছে,—একথা উল্লেখ ক'রে দিলীপকুমার রায় প্রথমে বীরবল ও অতুলচন্দ্র গুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নব্যবিজ্ঞানের চিন্তাধারার সঙ্গে বীরবল ও অতুলবাবুর পূর্বপরিচয় ছিল। তাঁরা এ নিয়ে দিলীপবাবুর সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেন। বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে উত্তর-প্রত্যুত্তরের আকারে এঁদের যে চিঠিগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, তা'রই সংকলন হোল এই গ্রন্থটি। চলতি ভাষায় লেখা এঁদের চিঠিগুলো সরস ও শ্রুতিমধুর বাংলা গদ্যের নিদর্শন। দর্শনের বিচারভূমিতে বসে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সত্যাসত্য নির্ধারণের এরূপ সুচিন্তিত প্রয়াস রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদীর পরে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ দেখান নি। আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দার্শনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হোল। এর মূলে রয়েছে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অবদান। রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪) ও 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০) বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

দার্শনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাড়াও দর্শন ও বিজ্ঞানের ধর্ম এবং স্বরূপনির্ণয়ের প্রচেষ্টা আধুনিক যুগের কোনো কোনো গ্রন্থে দেখা গেল। মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের 'দর্শন ও বিজ্ঞান' (১৩০৮) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের দার্শনিক মতবাদ অনুকরণের প্রচেষ্টা আধুনিক যুগে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নলিনীমোহন সান্যালের 'সৃষ্টি রহস্য' (১৩৩৩) নামক গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে সংকলিত 'জীবের উৎপত্তি' ও 'জীবের নিত্যতা'—এই দু'টি প্রবন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ অনুসৃত হয়েছে। এই যুগের কোনো কোনো গ্রন্থকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থাপিত করেছেন। এই আপত্তি দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত। এই প্রসঙ্গে 'বিজ্ঞানে বিরোধ'—১ম (১৩৩৮) ও ২য় (১৩৩৮) খণ্ডের লেখক যতীন্দ্রনাথ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া আধুনিক যুগে বিজ্ঞানাশ্রিত কয়েকটি উপকথা বাংলায় অনুবাদিত

হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল আচার্য জুলে ভার্ণির বিজ্ঞানাশ্রিত কয়েকটি গল্পগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। জুলে ভার্ণের 'Journey to the centre of the Earth'-এর অনুবাদ 'পাতালে' (১৩২৩), 'From the Earth to the Moon'-এর অনুবাদ 'চন্দ্রলোকে যাত্রা' (১৩৩১) ইত্যাদি গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক-জীবনী ও আবিষ্কারকাহিনী নিয়ে গ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত হোল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের লেখা 'জীবনচরিত'-এ বৈজ্ঞানিক-জীবনীর উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। এ ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সাময়িক-পত্রেও বৈজ্ঞানিক-জীবনী ও আবিষ্কার নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এ বিষয়ে সুপরিকল্পিতভাবে কোনো গ্রন্থ-রচনার প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে হয় নি। বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক-জীবনী ও আবিষ্কারকাহিনী নিয়ে কয়েকটি সর্বজনবোধ্য গ্রন্থ রচিত হোল। এর মূলে প্রধানতঃ দু'টি কারণ। প্রথমতঃ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বিজ্ঞানের যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হোল, তা' বৈজ্ঞানিকদের জীবন এবং আবিষ্কার সম্বন্ধে জনসাধারণ ও লেখকদের কৌতূহল বাড়িয়ে দিল। দ্বিতীয়তঃ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এ বিষয়ে অনেকখানি সহায়তা করল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক-জীবনী ও আবিষ্কারকাহিনী বিষয়ক গ্রন্থের অধিকাংশই এই দু'জন বৈজ্ঞানিককে নিয়ে লেখা। জগদানন্দ রায় লিখিত 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' (১৩১৯) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকাহিনী নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা গ্রন্থ। জগদীশচন্দ্রের জীবন নিয়ে লেখা অন্যান্য গ্রন্থ হোল, ফণীন্দ্রনাথ বসুর 'আচার্য জগদীশচন্দ্র' (১৯২৬), অনিলচন্দ্র ঘোষের 'আচার্য্য জগদীশ' (১৯৩১) এবং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত 'আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু' (১৯৩৮) ও 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' (১৩৫০)। এই সকল গ্রন্থে জগদীশচন্দ্রের জীবনকথা ও আবিষ্কার নিয়ে সর্বজনবোধ্য আলোচনা করা হয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত রচনা করেন ননীগোপাল ঘোষ, ফণীন্দ্রনাথ বসু ও অনিলচন্দ্র ঘোষ। প্রফুল্লচন্দ্রের স্বগ্রামবাসী ননীগোপাল ঘোষের লেখা 'প্রফুল্ল-চরিত' (১৩২৬) ক্ষুদ্রকায় হলেও একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মভূমি ও বংশপরিচয় বর্ণনা ক'রে তাঁর বাল্যজীবন, ছাত্রজীবন, গবেষণা, কর্মজীবন এবং জীবনাদর্শের কথা আলোচিত।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসুর লেখা 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র' (১৩৩৩) প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। অনিলচন্দ্র ঘোষের 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র' ১৩৩৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের জীবনচরিত ছাড়াও আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিকদের জীবনী ও আবিষ্কার নিয়ে আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য পঞ্চানন নিয়োগী লিখিত 'বৈজ্ঞানিক জীবনী—১ম ভাগ' (১৯১৫)। এই গ্রন্থে ভারতীয় ও ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে রয়েছেন সুশ্রুত, নাগার্জুন ও আর্যভট্ট ; আর ইউরোপীয়দের মধ্যে আছেন গ্যালিলিও, ল্যাভোয়াসিয়ে, মাইকেল ফ্যারাডে, নিউটন ও ডারউইন। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, লেখক এখানে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে আধুনিক আবিষ্কারের পাশাপাশি স্থাপন করবার চেষ্টা করেছেন। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের জীবনী আলোচনার সময়েও যায়গায় যায়গায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারের প্রাচীনত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্ছ্বাসের আধিক্য এবং যায়গায় যায়গায় নীতি ও উপদেশের অবতারণা গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'নব্যবিজ্ঞান' (১৩২৫) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকাহিনী নিয়ে লেখা একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সুরু ক'রে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

'আচার্য জগদীশ', 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক অনিলচন্দ্র ঘোষের 'বিজ্ঞানে বাঙালী' ১৩৩৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের জীবনী নিয়ে আলোচনা রয়েছে। জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। 'বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর' শীর্ষক প্রবন্ধটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অসম্পূর্ণ প্রকৃতির। 'নব্যবাংলার বৈজ্ঞানিক' পর্যায়ে তৎকালীন বাংলার উদীয়মান বৈজ্ঞানিকদের জীবন ও আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার প্রধান ত্রুটি, এ থেকে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা বাদ পড়েছেন।

গ্রন্থটির শেষদিকে বাংলার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা ক্ষুদ্রকায় হলেও তথ্যপূর্ণ।

আধুনিক যুগে সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে ছোটদের উপযোগী অনেকগুলো বিজ্ঞানগ্রন্থ রচিত হোল। জগদানন্দ রায় লিখিত 'বিজ্ঞানের গল্প' (১৯২০) ও 'ছুটির বই' (২য় সংস্করণ, ১৩৩৯) এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য।

গল্পের আকারে ছোটদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করলেন নরেন্দ্রকুমার মিত্র। নরেন্দ্রকুমারের 'বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে' (১৯২০) নামক গ্রন্থটিতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের অবদান নিয়ে গল্পের ভঙ্গীতে আলোচনা করা হয়েছে। তবে বিজ্ঞানের দান নিয়ে আলোচনা আবিষ্কারের গল্পের মতো চিত্তাকর্ষক নয়।

আধুনিক যুগে সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা ছোটদের উপযোগী গ্রন্থ রচনা করেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেনের নামও উল্লেখযোগ্য। এই লেখকের 'উড়োজাহাজ' (১৩২৭) ছোটদের উপযোগী একটি সরস বিজ্ঞান-গ্রন্থ। উড়োজাহাজ নিয়ে লেখা আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ক্ষিতীশচন্দ্র বাগচীর 'পুষ্পরথ' (১৩৩৩)। এখানে বেলুন আবিষ্কার থেকে স্থরু ক'রে উড়োজাহাজের ক্রমোন্নতির ইতিহাস ও কয়েক ধরনের উড়োজাহাজ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু নির্বাচনে বৈচিত্র্য ছোটদের জন্যে লেখা সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলোর বৈশিষ্ট্য। সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'ভূতের গল্প' (১৩৩৪) নামক গ্রন্থটিতে মাটি, জল ও আকাশ নিয়ে ছোটদের উপযোগী আলোচনা করা হয়েছে।

যোগেন্দ্রনাথ রায় লিখিত 'বিজ্ঞানের বাহাদুরি' (১৩৩৬) ছোটদের উদ্দেশ্যে চলতি ভাষায় লেখা একটি স্থখপাঠ্য গ্রন্থ। এতে উড়োজাহাজ, ক্যামেরা, বায়োস্কোপ, গ্রামোফোন ইত্যাদি নিয়ে গল্পের মতো সরস আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বও অতি সহজভাবে ব্যক্ত।

আধুনিক যুগে ছোটদের উপযোগী বিজ্ঞানগ্রন্থ ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি লিখে যশস্বী হয়েছেন ক্ষিতীন্দ্রনারারণ ভট্টাচার্য। তাঁর রচিত 'বিজ্ঞান-বুড়ো' (১৩৩৮) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকাহিনী নিয়ে লেখা একটি সরস বিজ্ঞানগ্রন্থ। বিজ্ঞানের আশ্চর্য শক্তির কথা স্মরণ ক'রে লেখক এখানে বিজ্ঞানকে

'রূপকথার শুভ্রকেশ যাদুকর' রূপে কল্পনা করেছেন। এজন্যেই গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে 'বিজ্ঞান-বুড়ো'।

সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে লেখা এই সকল বিচিত্র প্রকৃতির গ্রন্থ ছাড়াও আধুনিক যুগে এমন কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া গেল, যা'দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ ছাড়াও অপরাপর বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, শ্রীচরণ চক্রবর্তীর 'জ্ঞানকুসুম' (১৮৯৭)। এই গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো রচনায় বিজ্ঞানের অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাহায্য করেছিলেন। জ্ঞানকুসুমের কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই উচ্চাঙ্গের নয়। যোগেশচন্দ্র রায়ের 'ক্ষুদ্র ও বৃহৎ' ১ম (১৯১৯) ও ২য় (১৩৩৩) খণ্ডে বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। ১ম খণ্ডে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'ক্ষুদ্র ও বৃহৎ'। এতে সূর্য থেকে সুরু ক'রে ক্ষুদ্রতম প্রাণী পর্যন্ত 'ক্ষুদ্র ও বৃহৎ'-এর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। ২য় খণ্ডের 'জন্ম ও মৃত্যু' জীববিজ্ঞানের তথ্যসমন্বিত একটি উৎকৃষ্ট রসরচনা। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' (১৩২৮) বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। এতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য রচনাও সংকলিত হয়েছে।

পাঁচ

সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়া আধুনিক যুগে মনোবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় মনস্তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনায়ও উন্নতি সাধিত হোল। পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় এই যুগেরও কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানে প্রাচ্য দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল বটে, তবে অধিকাংশ গ্রন্থই রচিত হোল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিকে কেন্দ্র করে। এ ছাড়া ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায়ও এই যুগে প্রবণতা দেখা গেল।

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্যের 'মেস্‌মেরিজম বা শক্তিচালনবিদ্যা—১ম খণ্ড' (১৮৮৭)। রোগচিকিৎসার জন্যে মেস্‌মেরিজমের যতটুকু জানা দরকার, শুধুমাত্র তা' নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। কুঞ্জবিহারীর প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রাজেন্দ্র-

নারায়ণ চৌধুরীর 'বস্তুপরিচয় ও ইন্দ্রিয় পরীক্ষা' (১৯১৩), হিপ্‌নোটিষ্ট রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'হিপ্‌নোটিজম শিক্ষা বা সম্মোহন বিদ্যা' (১৩৩০) এবং মনোবিজ্ঞান ও গুপ্তবিদ্যাদির অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ রুদ্রের 'চিন্তা-পঠন বিদ্যা' (১৩৩০) ও 'ইচ্ছাশক্তি' (১৩৩৪)। রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'হিপ্‌নোটিজম শিক্ষা'য় হাতে-কলমে হিপ্‌নোটিজম্‌ শিক্ষা দেবার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাব গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি। রাজেন্দ্রনাথ রুদ্রের 'চিন্তা-পঠন বিদ্যা' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৩০ সালের ভাদ্র মাসে। ১ম খণ্ড এর কয়েকমাস পূর্বে প্রকাশিত হয়। চিন্তা-পঠনের কয়েকটি ব্যবহারিক দিক নিয়ে এই গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। রাজেন্দ্রনাথ রুদ্রের[৬] আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ইচ্ছাশক্তি' ১৩৩৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি হোল Will-power বা ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে লেখা বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ। রাজেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে 'Will-power : How to develop and exert it' (১৯১২) নামক একটি ইংরেজী গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটির অনেকেই প্রশংসা করেন এবং অনেকেই এটিকে বাংলায় অনুবাদ করবার জন্যে লেখককে অনুরোধ করেন। কিন্তু লেখক ইংরেজীতে লেখা এই গ্রন্থটির দোষত্রুটির কথা স্মরণ করে অনুবাদের কাজে হাত দেন নি। ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে লেখা। গ্রন্থ-রচনায় সাহায্য করেছিলেন রংপুর কারমাইকেল কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্ত। এই গ্রন্থে ইচ্ছাশক্তি ও তার কার্যকারিতা, ইচ্ছাশক্তি বাড়াবার উপায় ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যাদির উল্লেখযোগ্য সমাবেশ ঘটেছে। রাজেন্দ্রনাথের রচনারীতি প্রাঞ্জল।

আধুনিক যুগে প্রকাশিত প্রাচ্য তথ্যনির্ভর মনোবিজ্ঞানের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য, রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহের 'নিদ্রা' (১৩১০) ও কৃষ্ণানন্দ স্বামীর 'স্বপ্ন-তত্ত্ব' (৩য় সংস্করণ, ১৩২১)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় নগণ্য। তা' ছাড়া সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে রয়েছে একটানা উচ্ছ্বাস। শেষোক্ত গ্রন্থটির নাম 'স্বপ্নতত্ত্ব' হলেও আধ্যাত্মিক জগতের আলোচনার উপরেই এখানে

৬ "সম্মোহনবিদ্যা" (১৯২৩) নামে রাজেন্দ্রনাথ রুদ্র মনোবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। স্বপ্ন যে অমূলক চিন্তামাত্র নয়, লেখক শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির সাহায্যে এখানে তা' বোঝাতে চেয়েছেন। দু' এক যায়গায় অতি সাধারণ উদাহরণ ও কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। তবে প্রায় সর্বত্রই যুক্তি অপেক্ষা বিশ্বাসের প্রাধান্য।

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞান রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, চারুচন্দ্র সিংহ, নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য, সরসীলাল সরকার ও গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রমুখ লেখকরা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের 'মনের বিবর্ত্তন' (১৩২৫) পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান নিয়ে লেখা একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। খগেন্দ্রনারায়ণের প্রকাশভঙ্গী মনোজ্ঞ; ভাষা বলিষ্ঠ। যায়গায় যায়গায় সুন্দর উপমা তার রচনার একটি বৈশিষ্ট্য। খগেন্দ্রনারায়ণ মনস্তত্ত্ব বিষয়ক বিদেশী শব্দগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলায় অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের সময় সর্বত্রই শব্দের শ্রুতিমধুরতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

অনুবাদে শ্রুতিমধুরতার অভাব দেখা গেল চারুচন্দ্র সিংহের 'মনোবিজ্ঞান' (১৩২৬) নামক গ্রন্থে। চারুচন্দ্র সিংহ পাটনা কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। স্থানে স্থানে কবিতা উদ্ধৃত ক'রে বক্তব্য বিষয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস চারুচন্দ্রের রচনাভঙ্গীর একটি বৈশিষ্ট্য।

বাংলা ভাষায় মনস্তত্ত্ব বিষয়ক আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নলিনাক্ষ ভট্টাচার্যের 'মনোবিজ্ঞান' (১৩২৮)। মূলতঃ পাশ্চাত্য বিচারপ্রণালী অনুসৃত হলেও আলোচ্য গ্রন্থে প্রাচ্য দার্শনিক তথ্যাদির উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে মন সম্বন্ধে যে সকল বিচার-বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে তা'র উল্লেখ রয়েছে। পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারেও সংস্কৃতের প্রভাব বিদ্যমান।

নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল সরসীলাল সরকারের 'মনের কথা'[৭] নামক গ্রন্থে। মনস্তত্ত্বের কতকগুলো রহস্য নিয়ে এই গ্রন্থে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। মনের অজ্ঞাত ইচ্ছাসমূহ কি ক'রে আত্মপ্রকাশ করে,

৭ 'মনের কথা'র প্রথম প্রকাশকাল সঠিক জানা যায় না। তবে লেখকের ভগ্নী স্বলেখিকা সরলাবালা সরকার ও পুত্র শ্রীসুধাংশুলাল সরকারের মতে গ্রন্থটি ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকবে।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদাহরণ সহযোগে লেখক তা' বোঝাতে চেয়েছেন। অরুচিকর হবার ভয়ে মনের গভীর স্তরে লুক্কায়িত কামজ ইচ্ছাগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয় নি ; উপরের স্তরের অজ্ঞাত ইচ্ছা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মনোবিজ্ঞান রচনায় সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন গিরীন্দ্রশেখর বসু। 'স্বপ্ন' (১৩৩৫) গিরীন্দ্রশেখরের[৮] সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। সাহিত্যরস এবং মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য। ফ্রয়েড স্বপ্নকে যেভাবে বুঝিয়েছেন, মূলতঃ তারই বিশ্লেষণ ও আলোচনা এখানে করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ অপরাপর চিন্তানায়কদের মতামত এবং লেখকের নিজস্ব মন্তব্যও রয়েছে। অজ্ঞাত ইচ্ছা সম্বন্ধে আলোচনায় লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। সার্বজনীন স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনায়ও যায়গায় যায়গায় লেখকের নিজস্ব অভিমতই ব্যক্ত। তা' ছাড়া স্মৃতিবিভ্রমের বিশ্লেষণে গিরীন্দ্রশেখরের মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় সুস্পষ্ট। বিভিন্ন রোগীকে দেখে লেখক যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তা'রও কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ এই গ্রন্থে রয়েছে। সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা গিরীন্দ্রশেখরের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য।

এইরূপে আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলায় কয়েকখানা মনোবিজ্ঞান রচিত হোল বটে ; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও জটিল দিকগুলো নিয়ে উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ-রচনার উল্লেখযোগ্য কোনো প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে দেখা গেল না।

৮ গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত 'মনোবিদ্যার পরিভাষা' ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরিভাষা প্রণয়নে সাহায্য করেছিলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ

বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য ঃ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয় নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় উন্নতি দেখা গেল বটে, কিন্তু রচনাভঙ্গীর যে বিশিষ্টতার গুণে বিজ্ঞানকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করা যায়, বিজ্ঞানসাহিত্যে সে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের রচনায় পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও জগদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকদের নাম। প্রথমোক্ত দু'জন লেখক বৈজ্ঞানিক। এঁদের রচিত বিজ্ঞানালোচনাকে তাই 'বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান-সাহিত্য' এই বিশেষ নামে অভিহিত করা যায়।

সর্বদেশের সর্বকালের বৈজ্ঞানিকই তাঁদের আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করেন সাংকেতিক ভাষায়। বিজ্ঞানের এই ভাষা জটিল সূত্র ও ফর্মুলার বাঁধনে আবদ্ধ। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের সঙ্গে এর কোনো সংযোগ নেই; বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্ব ভেদ ক'রে এ থেকে তা'রা কোনো রস আহরণ করতে পারে না। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক তাঁ'দের সাংকেতিক ভাষা পরিত্যাগ ক'রে সর্বসাধারণের উপযোগী সহজবোধ্য ভাষায় নিজ নিজ আবিষ্কারের কথা বর্ণনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক যখন এভাবে সাংকেতিকতা পরিহার ক'রে জনসাধারণের উপযোগী সরল ও সরস ভাষায় বিজ্ঞানের কথা বাণীবদ্ধ করেন, তখন তা' হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য। সাধারণ বিজ্ঞানসাহিত্যের সঙ্গে এর তফাৎ আছে। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্যে লেখকের যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং নিজস্ব গবেষণা ও অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় সাধারণ বিজ্ঞানসাহিত্যে তার অভাব।

বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে টিণ্ডাল, হেলম্‌হোল্‌ৎজ (১৮২১-১৮৯৪), কেল্‌ভিন্ (১৮২৪-১৯০৭), হাক্স্‌লি (১৮২৫-১৮৯৫) টেইট্ (১৮৩১-১৯০১), ক্লিফোর্ড (১৮৪৫-১৮৭৯) প্রমুখ বৈজ্ঞানিক-দের রচনায়। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর (১৮৫৮-১৯৩৭) নাম। জগদীশচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে অপর যে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসাহিত্য

রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের (১৮৬১-১৯৪৪) নামও বিশেষভাবে স্মরণীয়। তবে জগদীশচন্দ্রের রচনায় বৈজ্ঞানিকের যে নিজস্ব অনুভূতি ও মৌলিক আবিষ্কারকাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়, প্রফুল্লচন্দ্রের রচনায় তা'র অভাব। এর কারণ, বৈজ্ঞানিক-জগতে মৌলিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের স্থান প্রফুল্লচন্দ্র অপেক্ষা অনেক উচ্চে। জগদীশচন্দ্র বর্ণনা করেছেন নিজস্ব আবিষ্কারের কথা। আর প্রফুল্লচন্দ্র প্রধানতঃ প্রাচীন সংস্কৃত রসগ্রন্থাদি থেকে তথ্য আহরণ ক'রে সেগুলোকে রাসায়নিকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করেছেন। আধুনিক যুগের বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনার কালেও প্রফুল্লচন্দ্র প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানের কথা ভুলে যান নি; যায়গায় যায়গায় তিনি প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাই প্রফুল্লচন্দ্রের রচনায় রয়েছে গভীর মনীষা ও পাণ্ডিত্যের ছাপ। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের রচনায় তথ্য অপেক্ষা সত্যেরই প্রাধান্য। সারা জীবনের বিজ্ঞানসাধনার মধ্য দিয়ে তিনি যে বৈজ্ঞানিক সত্যকে পরীক্ষা ও দর্শন করেছেন, তা'রই পরিচয় রয়েছে এই বৈজ্ঞানিকের রচনায়। তাই জগদীশচন্দ্রের রচনা পাঠ করবার কালে পাঠক একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিকের কঠোর অধ্যবসায় ও অনুশীলনের পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়, অপরদিকে তেমনি অতি সরল ভাষায় লেখা বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারগুলোর সঙ্গে অনুভব করে একটি অন্তরঙ্গতার স্বর। কঠোর অনুশীলনের ছাপ প্রফুল্লচন্দ্রের রচনায়ও রয়েছে। কিন্তু তা' মূলতঃ ইতিহাস-ধর্মী। জগদীশচন্দ্রের রচনার মতো নব নব আবিষ্কারের প্রভায় তা' ভাস্বর নয়।

এক

বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' (১৩২৮)। এই গ্রন্থটি হোল জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি প্রবন্ধ ও ও বক্তৃতার সংকলন। অব্যক্তের কয়েকটি প্রবন্ধ সাহিত্য, দাসী, মুকুল, প্রবাসী ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির অব্যক্ত নামকরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ জগতের অনেক কিছুই মানুষের কাছে অব্যক্ত। অনেক ধরনের আলোকই আমরা দেখতে পাই না। অনেক শব্দই আমরা শুনি না। আবার যে উদ্ভিদ আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে

বিজড়িত, সেই উদ্ভিদজগতের জীবনধারণপদ্ধতিও আমাদের কাছে অব্যক্ত। এ ছাড়া স্নায়ুর ভিতরে উত্তেজনাপ্রবাহের যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃতিও আমাদের জানা নেই। প্রকৃতির এই অব্যক্ত দিকগুলোকে ব্যক্ত করবার জন্যেই জগদীশচন্দ্রের সমগ্র বিজ্ঞানসাধনা। উল্লিখিত বিষয়গুলো আলোচ্য গ্রন্থেরও উপজীব্য। জগদীশচন্দ্র এখানে অদৃশ্য আলোক, নির্বাক উদ্ভিদজীবন এবং উদ্ভিদস্নায়ুতে উত্তেজনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ, আপাতঃ-দৃষ্টিতে যা' অজ্ঞাত ও রহস্যাবৃত তা'ই হোল গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়। এই হিসাবে এর অব্যক্ত নামকরণ সার্থক।

অব্যক্তে আচার্য জগদীশচন্দ্রের উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট। একনিষ্ঠ এই বিজ্ঞানসেবীর সাহিত্যজগতে পদক্ষেপের মূলে ছিল মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের বি. এ এবং লণ্ডন ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও জগদীশচন্দ্রের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বাংলা পাঠশালায় এবং তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত ফরিদপুরের বাংলা স্কুলে। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ শৈশবেই তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তাই দেখা যায়, পরবর্তী কালে তিনি তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা মাতৃভাষায় প্রকাশ করেছেন। যন্ত্রাদির নামেও তিনি প্রথমে স্বদেশী শব্দই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের ছিল নিবিড় বন্ধুত্ব। কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এই ধরনের বন্ধুত্ব অন্যান্য দেশেও বিরল নয়। বিশ্রুত ইংরেজ কবি স্যামুয়েল টেলার কোল্‌রিজ (১৭৭২-১৮৩৪) ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাম্‌ফ্রে ডেভির (১৭৭৮-১৮২৯) অন্তরঙ্গ বন্ধু।[১] প্রবাসে থাকবার সময়েও রবীন্দ্রনাথের লেখা জগদীশচন্দ্র নিয়মিতভাবে পড়তেন। শরৎচন্দ্রের রচনাও তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। তা' ছাড়া প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সাময়িক-পত্রের তিনি ছিলেন নিয়মিত পাঠক।[২] শুধুমাত্র সাহিত্যই নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিও ছিল তাঁর গভীর নিষ্ঠা।[৩]

১ Literature and Science (1954)—Benjamin Ifor Ivans.—P. 62.

২ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৯৩৮) : চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ; পৃঃ ৭৬।

৩ An Indian Pioneer of Science : The life and work of Sir Jagadish Chandra Bose (1920)—Petric Geddes. PP. 16-17.

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতি জগদীশচন্দ্রের এই নিষ্ঠার পরিচয় অব্যক্তের বিভিন্ন রচনায় সুপরিস্ফুট। এই গ্রন্থের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক রচনায় অনুরণিত হয়েছে ঐক্যের সুর। এই ঐক্যের সাধনা প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা একদিন করেছিলেন। গ্রন্থটিতে সংযোজিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আলোচনা করলে দেখা যায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র অণু-পরমাণু থেকে সুরু ক'রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র একই মহাশক্তির বিকাশ অনুভব করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রকৃত কোনো বিভেদ নেই। 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' শীর্ষক অভিভাষণে তিনি স্পষ্টই বলেছেন,

> "কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক্ না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।"

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ঐক্যের যে সূত্র জগদীশচন্দ্র অনুভব করেছিলেন, তা' সত্য হয়ে উঠেছিল তাঁর নিজের জীবনসাধনার মধ্যেই। তিনি পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা, বিজ্ঞানের এই দু'টি বিভাগেই মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কার করেছিলেন।[৪]

ঐক্য ও মঙ্গলের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ছিল বলেই জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী আশাবাদীর। তাই তিনি সৃষ্টির অনন্ত উন্নতিতে বিশ্বাসী। 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ' শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেছেন,

> "জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব! এ কথা সর্ব্ব সময়ের জন্য ঠিক নয়। যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মনুষ্যে উন্নত করিয়াছে, যাহার

৪ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার মূলে ছিল অজানাকে জানবার জন্যে দুরন্ত স্পৃহা। 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র বলেছেন, "দৃশ্য আলোকের বাহিরে যে অদৃশ্য আলোক আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অনন্তের মধ্যে প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন রাজ্যের বাহিরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে তাহাকে বোধগম্য করিলে আমাদের অনুভূতি আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে পায়।"

উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশূন্য হইতে এই বহুরূপী জগৎ ও তদ্বৎ বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজিও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ঊর্দ্ধাভিমুখেই সৃষ্টির গতি; আর সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রসারিত।"

জগদীশচন্দ্রের আশাবাদী দৃষ্টির মূলে এই বিশ্বাসই একমাত্র কারণ নয়। মানুষের অন্তরে যে এক অদৃশ্য শক্তি রয়েছে, যা'র বলে সে বাইরের জগতের নিরপেক্ষ হ'তে পারে, তা'র বৈজ্ঞানিক প্রমাণও তিনি পেয়েছিলেন। তাই তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছেন,

"মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে। তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে যাহার দ্বারা সে বহির্জ্জগতের নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছানুসারে বাহির-ভিতরের প্রবেশ দ্বার কখনও উদ্‌ঘাটিত কখনও অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এইরূপে দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার উপর সে জয়ী হইবে। যে ক্ষীণবার্ত্তা শুনিতে পায় নাই তাহা শ্রুতিগোচর হইবে, যে লক্ষ্য সে দেখিতে পায় নাই তাহা তাহার নিকট জাজ্জ্বল্যমান হইবে। অন্যপ্রকারে সে বাহিরের সর্ব্ব বিভীষিকার অতীত হইবে। অন্তর রাজ্যে, স্বেচ্ছাবলে সে বাহিরের ঝঞ্ঝার মধ্যেও অক্ষুব্ধ রহিবে।"

বিশ্বমানবের ভবিষ্যৎ মঙ্গলময়—একথা বিশ্বাস করলেও জগদীশচন্দ্র মনেপ্রাণে অনুভব করেছেন, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অপূর্ণতা। শত শত বৎসরের ঐকান্তিক সাধনায় মানুষের জ্ঞানের পরিধি তিলে তিলে বেড়ে উঠছে সত্য; কিন্তু বিশ্বজগতের অনেক কিছুই এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে মানুষের অধ্যবসায় ও সাধনার বলে একদিন এই অজ্ঞানান্ধকার দূর হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। গহন আঁধারের মধ্যেও তাই তিনি আশার আলোকরেখা দেখতে পেয়েছেন। 'অদৃশ্য আলোক' শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে এই মনোভাব সুস্পষ্ট।

"আঁধার লইয়া আরম্ভ, আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই একটী ক্ষীণ আলোরেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায়বলে ঘন কুয়াসা অপসারিত হইবে এবং একদিন বিশ্বজগত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিবে।"

যে সমন্বয় ও ঐক্যের সুর এবং যে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অব্যক্তের বৈজ্ঞানিক রচনাগুলিকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছে, রচনাগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষতার কাছে সে বৈশিষ্ট্যও ম্লান। বস্তুতঃ, সাহিত্যিক ঔজ্জ্বল্যই অব্যক্তের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র এখানে সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে স্ব-আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো বর্ণনা করবার সময় তিনি বৈজ্ঞানিকের সাংকেতিকতা পরিহার ক'রে সাহিত্যিকোচিত সরল ও মনোরম ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। তাই অব্যক্তের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় রচনাগুলিতে বিজ্ঞানের গাম্ভীর্য ততটা নেই, যতটা রয়েছে সাহিত্যিক মাধুর্য।

বৈজ্ঞানিক রচনা ছাড়াও জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য কয়েকটি রচনা অব্যক্তে স্থান পেয়েছে। অব্যক্তের বৈজ্ঞানিক রচনাগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, (২) ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, (৩) দার্শনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, (৪) বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অভিভাষণ এবং (৫) বৈজ্ঞানিক রহস্যকাহিনী।

সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হোল (ক) 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ', (খ) 'অদৃশ্য আলোক', (গ) 'নির্ব্বাক জীবন' এবং (ঘ) 'স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ'। প্রথমোক্ত প্রবন্ধের সূচনায় জগতের অসংখ্য ঘটনাবলীর মূলে যে তিনটি কারণ—'পদার্থ, শক্তি ও ব্যোম' বিদ্যমান, তা' উল্লেখ ক'রে শক্তি কিভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়, তা' বোঝান হয়েছে। শক্তির সঞ্চালন সম্বন্ধে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা মনোজ্ঞ। শক্তির সঞ্চালন বোঝাতে গিয়ে জড়পদার্থের কম্পন ও তা' থেকে উদ্ভূত সুরের কথা এবং আকাশতরঙ্গ ও বিদ্যুৎতরঙ্গের কথা আলোচিত হয়েছে। তাপ ও আলোক যে আকাশেরই স্পন্দন মাত্র, তা' ব্যাখ্যা ক'রে সেই স্পন্দন দেখা ও শোনার ব্যাপারে আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি কতখানি সীমাবদ্ধ, লেখক এখানে তা' বোঝাতে গিয়ে অতি অল্প কথায় পাঠকের বিস্ময়বোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। আবার এই যে আকাশ-স্পন্দন, তাপ ও আলো যা'র মূলে, এই স্পন্দন যে বিক্ষিপ্ত নয়, জগৎজোড়া এই স্পন্দনের মূলে যে একটি নিগূঢ় ঐক্যের সম্বন্ধ রয়েছে, লেখক পৃথিবীর গাছপালা ও জীবজন্তুর সঙ্গে সূর্যের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ ক'রে চমৎকারভাবে তা' বুঝিয়েছেন। আকাশ-স্পন্দনের এই ঐক্যের তাৎপর্য

বুঝিয়ে জগদীশচন্দ্র যে উপসংহারে পৌছুলেন তা' হোল এই, বিশ্বজগতের মূলে দু'টি কারণ বিদ্যমান। প্রথম কারণ, আকাশ ও তাহার স্পন্দন। দ্বিতীয় কারণ, জড়বস্তু। আবার জড়পদার্থও আবর্ত মাত্র। আকাশেরই আবর্ত জগৎরূপে আকাশসাগরে ভেসে আছে। জড়পদার্থের বিনাশ নেই। বিনাশ শক্তিরও নেই। শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপ নেয় মাত্র। এরই ফলে জগতের অহরহ এই বাহ্যিক পরিবর্তন। এবার জীবজগতের কথা আলোচনা ক'রে জগদীশচন্দ্র বললেন, জীবনের পরিবর্তনও বাহ্যিক। প্রতি জীবনে দু'টি ক'রে অংশ। একটি অমর, অজর, একে বেষ্টন ক'রে আছে নশ্বর দেহ। জীবনপ্রবাহ চিরন্তন। বর্তমান কালের জীবের পেছনে রয়েছে যুগযুগান্তরব্যাপী ইতিহাস ; আর সম্মুখে রয়েছে অন্তহীন ভবিষ্যৎ। বিবর্তনের ফলে জীবের ক্রমোন্নতিরই নিদর্শন হোল আজকের মানবসমাজ।

পরবর্তী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'অদৃশ্য আলোক'-এ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় ও কর্ণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতার কথা বর্ণনা ক'রে অদৃশ্য আলোককে কিভাবে ধরা যায়, তা' নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। লেখক এখানে বলতে চেয়েছেন, দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি মূলতঃ একই ; আমাদের দৃষ্টিশক্তির অসম্পূর্ণতাহেতু এদের বিভিন্ন বলে মনে হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে কয়েকটি অদ্ভুত পরীক্ষার বর্ণনা দিয়ে এই আলোক যে অন্য বর্ণের লেখক তা' প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এরপর বিভিন্ন বস্তুর ঔজ্জ্বল্য বা আলো সংহত করবার ক্ষমতা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনার পর অদৃশ্য আলোক কিভাবে ধরা যায়, তা' নিয়ে উদাহরণ সহযোগে গল্পের মতো সুখপাঠ্য আলোচনা করা হয়েছে। অদৃশ্য আলোকের আলোচনা করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র তার-হীন সংবাদের কথাও সংক্ষেপে বলেছেন। প্রবন্ধটির শেষদিকে বেতারের শক্তি সম্বন্ধে আলোচনায় জগদীশচন্দ্রের আবেগ ও সাহিত্যিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে অতি সুন্দরভাবে। তবে জগদীশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হোল 'নির্ব্বাক জীবন'। আলোচ্য প্রবন্ধে উদ্ভিদজগতের প্রাণের কাহিনী সরস ভাষায় আলোচিত। সরল প্রকাশভঙ্গী, উদ্ভিদজগতের প্রতি লেখকের গভীর মমত্ববোধ ও যায়গায় যায়গায় সূক্ষ্ম ব্যঙ্গরস প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য প্রবন্ধে বৃক্ষজীবনের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করতে গিয়ে প্রথমেই জগদীশচন্দ্র আলোচনা করেছেন বৃক্ষের সাড়া দেবার পদ্ধতি এবং সাড়ালিপির কথা। এরপর একে একে বৃক্ষের 'অনুভূতি

সময়', 'সাড়ার মাত্রা', 'বৃক্ষে উত্তেজনা প্রবাহ', 'স্বতঃস্পন্দন' ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিবিধ পরীক্ষার মাধ্যমে লেখক এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে উদ্ভিদপেশীও স্পন্দনশীল। বন-চাঁড়াল গাছের সাহায্যে লেখক উদ্ভিদের এই স্পন্দনশীলতা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রবন্ধটির একেবারে শেষদিকে 'মৃত্যুর সাড়া' সম্বন্ধে আলোচনায় বৃক্ষের অন্তিম মুহূর্ত বর্ণনা করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র যে সাহিত্যিকোচিত গভীর অনুভূতি ও মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, বর্ণনাভঙ্গীর গুণে তা' এক অনুপম গাম্ভীর্যে অভিষিক্ত হয়েছে। জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী এবং সাহিত্যপ্রতিভার নিদর্শন হিসাবে প্রবন্ধটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হোল।

মৃত্যুর সাড়া।

"পরিশেষে উদ্ভিদের জীবনে এরূপ সময় আইসে যখন কোন এক প্রচণ্ড আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দিবার শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত, মৃত্যুর আঘাত। কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্ত্তে গাছের স্থির স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ম্লান হয় না। হেলিয়া পড়া, কিম্বা শুষ্ক হইয়া যাওয়া অনেক পরের অবস্থা। মৃত্যুর রুদ্র-আহ্বান যখন আসিয়া পৌছে, তখন গাছ তাহার শেষ উত্তর কেমন করিয়া দেয়? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাই অন্তিম মুহূর্ত্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ মুহূর্ত্তের জন্য মুমূর্ষ বৃক্ষ-গাত্রে তীব্রবেগে ধাবিত হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের লেখার গতি পরিবর্ত্তিত হয়—উর্দ্ধগামী রেখা নিম্ন দিকে ছুটিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। এই সাড়াই বৃক্ষের অন্তিম সাড়া।

এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে, তাহাদের গভীর মর্ম্মের কথা তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত করিল। জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হইয়াছিল তাহা দূরীকৃত হইল। কল্পনারও অতীত অনেক-

গুলি সংবাদ আজ বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বহুত্বের ভিতরে একত্ব প্রমাণ করিল।"

'স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিকের লেখা বিজ্ঞান-সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বাইরের ও ভিতরের শক্তি যে প্রকৃতপক্ষে একই, আলোচ্য প্রবন্ধে পরীক্ষালব্ধ সত্যের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র তা' বোঝাতে চেয়েছেন। প্রবন্ধটির সূচনায় জগদীশচন্দ্র বুঝিয়েছেন, দু' প্রকারের শক্তি দ্বারা জীব কিভাবে উত্তেজিত হয়। এরপর ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বস্তু কিরূপে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে তা' নিয়ে এবং বাইরের শক্তিকে প্রতিরোধ করবার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র যে জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করেছেন, প্রকাশভঙ্গীর অভিনবত্বে তা' গল্পের মতো সুখপাঠ্য। পরীক্ষামূলকভাবে স্নায়ুর ভিতরে উত্তেজনাপ্রবাহের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় জগদীশচন্দ্র নিজেই সুদীর্ঘ বিশ বৎসরকাল গবেষণা করেছিলেন। প্রথমে তিনি পরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন উদ্ভিদ নিয়ে। এই প্রসঙ্গে তাঁর গবেষণার মর্মকথা—অর্থাৎ, উদ্ভিদেরও যে স্নায়ুসূত্র আছে, এই সত্যটি এখানে অতি অল্পকথায় তিনি বলেছেন। প্রসঙ্গতঃ ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ কোথায়—তা' অতি সংক্ষেপে বোঝান হয়েছে। এরপর আণবিক সন্নিবেশ অনুযায়ী উত্তেজনাপ্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা। প্রবন্ধের এই অংশটির আলোচ্য বিষয় অপেক্ষাকৃত দুরূহ। কিন্তু সহজবোধ্য উদাহরণ ও নিজস্ব পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে আলোচনা করায় বক্তব্য বিষয় অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের কাছেও সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জগদীশচন্দ্র এখানে বোঝাতে চেয়েছেন, স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনাপ্রবাহ ইচ্ছা অনুযায়ী কমান অথবা বাড়ান যেতে পারে। ভিতরের শক্তির বলে মানুষ বাইরের জগতের নিরপেক্ষও হতে পারে। জগদীশচন্দ্রের এই চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে সেতু রচনা করেছে। তা' ছাড়া পরীক্ষামূলক সত্যের উপর নির্ভর করে বাইরের ও ভিতরের শক্তিকে একই মহাশক্তির দু'টি বিভিন্ন রূপ হিসাবে কল্পনা করায় পাঠকদের মনে এক নিঃসীম বিস্ময়বোধ জেগে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তা' সত্ত্বেও পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক সত্য বা কোন মতবাদ এখানে বড় হয়ে ওঠে নি। সাহিত্য-রসই এখানে প্রধান।

ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিতেও সাহিত্যরস প্রাধান্য লাভ করেছে। ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা তিনটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অব্যক্তে স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধ তিনটি হোল,—'গাছের কথা', 'উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু' এবং 'মন্ত্রের সাধন'। অতি সরল ও সহজ ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীতে আন্তরিকতা রচনাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথম দু'টি প্রবন্ধে উদ্ভিদ-জগতের প্রতি লেখকের গভীর ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ ও উদ্ভিদের জীবনযাত্রায় সমধর্মিতা জগদীশচন্দ্র এখানে উজ্জ্বল ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রকাশভঙ্গীর অন্তরঙ্গতার গুণে উদ্ভিদজগৎ এখানে যেন মানব-জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। শেষোক্ত প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মানুষের সাধনার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে উড়োজাহাজ আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণিত।

অব্যক্তের অধিকাংশ প্রবন্ধেরই উপজীব্য বিজ্ঞান-বিষয়ক আবিষ্কার-কাহিনী। তবে দার্শনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও এই গ্রন্থে আছে। 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' (১৮৯৪) শীর্ষক রচনাটি দার্শনিক চিন্তামূলক একটি উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। এই রূপকাশ্রিত প্রবন্ধটির সূচনা হয়েছে এক দুর্জ্ঞেয় দার্শনিক জিজ্ঞাসা দিয়ে। জগদীশচন্দ্র কল্পনায় এখানে অভিযানে বেরিয়েছেন। কল্পলোকের এই অভিযান একজন আজীবন বিজ্ঞানসেবীর। তাই স্বাভাবিকভাবেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি এখানে এসে গেছে। তবে বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব এখানে বড় হয়ে ওঠে নি। বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের অন্তরালে একটি আধ্যাত্মিক সৌরভ সমগ্র প্রবন্ধটিতে পরিব্যাপ্ত। মনোজ্ঞ উপমা, বর্ণনায় কবিত্ব ও চিত্রধর্মিতা এবং সর্বোপরি মনোহর প্রকাশভঙ্গী প্রবন্ধটিকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। প্রবন্ধটির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, পুরাণ-নির্ভর উত্তরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যের অবতারণা। তাই দেখা যায়, শৈশবে যে জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, 'মহাদেবের জটা' থেকেই ভাগীরথীর উৎপত্তি, পরিণত বয়সে তিনি এই পৌরাণিক বিশ্বাসের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে। এই উত্তরে জগদীশচন্দ্রের কবিত্ব ও কল্পনাবিলাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও এর অন্তরস্থ বৈজ্ঞানিক সত্যের সুরটিকে অস্বীকার করা যায় না। তবে এই বৈজ্ঞানিক সত্য জগদীশচন্দ্রের পৌরাণিক বিশ্বাসকে এখানে সুদৃঢ় করেছে মাত্র। প্রবন্ধটির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, বর্ণনায় কবিত্বময় চিত্রধর্মিতা। যেমন,

"ক্রমে দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উর্ম্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে 'তিষ্ঠ' বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখানি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, বহুদূর প্রসারিত সেই পর্ব্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্য্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখর-তুষার নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিমগতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।"

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাড়াও অব্যক্তে জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি মূল্যবান অভিভাষণ সংকলিত হয়েছে। অভিভাষণগুলো থেকে জগদীশচন্দ্রের কর্মস্পৃহা, স্বদেশপ্রীতি এবং সর্বোপরি তাঁর বিজ্ঞানসাধনার ও সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে প্রদত্ত 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' (১৯১১) শীর্ষক অভিভাষণটি। উল্লিখিত অভিভাষণের সূচনায় কবিতা ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র যে সূক্ষ্ম রসবোধ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার এক প্রোজ্জ্বল নিদর্শন। কবি ও বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র বলেছেন,

"কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্ত্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌছায় সেখান

> হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য, প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন, এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।"

কবিতা ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র 'অদৃশ্য আলোক' ও উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কারের কয়েকটি মূল কথা সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে বর্ণনা করেছেন।

বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে প্রদত্ত 'নিবেদন' (১৯১৭) শীর্ষক অভিভাষণটিতে সাহিত্যরস অপেক্ষা সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁর বিজ্ঞানসাধনা ও অদম্য নিষ্ঠার পরিচয়ই বেশী ক'রে ফুটে উঠেছে। জগদীশচন্দ্রের আত্মবিশ্বাস ও স্বদেশপ্রীতিও এখানে দেদীপ্যমান।

'আহত উদ্ভিদ' এই শিরোনামায় প্রকাশিত অভিভাষণটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত (১৯১৯) হয়। উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার-কাহিনী এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত। এই অভিভাষণে বৃক্ষজীবনের ইতিহাস বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদবিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের ক্রমপরিণতি বোঝান হয়েছে। সূক্ষ্ম ব্যঙ্গরস, সরস ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীতে দরদ ও সহানুভূতির গুণে সমগ্র অভিভাষণটি সাহিত্যরসোত্তীর্ণ।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং অভিভাষণ ছাড়াও অব্যক্তে স্থান পেয়েছে 'পলাতক তুফান' শীর্ষক একটি বৈজ্ঞানিক রহস্যকাহিনী। বৈজ্ঞানিকতত্ত্বকে কেন্দ্র ক'রে জগদীশচন্দ্র এখানে গল্পরস পরিবেশন করেছেন। বিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে কাহিনী রচনার সুবিধা এই যে, বৈজ্ঞানিক রহস্যটি সাবধানে বলতে পারলে, অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য কাহিনীর মধ্যেও পাঠকের মন একটা বাস্তবতার স্বাদ অনুভব করে। বৈজ্ঞানিক সত্যে বিশ্বাসের জন্যেই সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য জগতের মধ্যে ফাঁকিটি পাঠকের কাছে তখন ধরা পড়ে না। বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে ঐ বিশ্বাসটুকু গোড়া থেকেই পাঠকের মনে সম্বদ্ধ ক'রে দেওয়ার দায়িত্ব হোল লেখকের। এই দায়িত্ব পালনের দিক থেকে বৈজ্ঞানিক রহস্যকাহিনী রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এইচ্, জি, ওয়েল্স্ প্রমুখ লেখকরা। ওয়েল্স্-এর লেখা বৈজ্ঞানিক কাহিনীর মধ্যে

এমন একটি বাস্তবতার সুর ধ্বনিত হয় এবং সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য জগতের সীমারেখাটি তিনি এমন চাতুর্যের সঙ্গে বর্ণনা করেন যে পাঠকের মন ক্ষণকালের জন্যে হলেও অলৌকিক রাজ্যের অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলোকে বাস্তব বলে স্বীকার করে নেয়। এই স্বীকৃতির মূলে হোল, বিজ্ঞানের ক্ষমতা ও বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্ভাব্যতার প্রতি পাঠকের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটুকু উদ্রিক্ত না হলে, বৈজ্ঞানিক রহস্য পাঠ ক'রে পাঠকের মন শিহরিত হয়ে ওঠে না। বৈজ্ঞানিক রহস্যের প্রতি এই বিশ্বাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র এখানে পুরোপুরি সাফল্যলাভ করেন নি বলেই মনে হয়। রচনাটির কাহিনী বিশ্লেষণ করলে এই অসাফল্যের কারণ নজরে পড়ে। বঙ্গোপসাগরে ঝড় উঠবে বলে সংবাদপত্র এবং হাওয়া অফিস ঘোষণা করল। কোলকাতায়ও ঝড় উঠবে বলে ঘোষণা করা হোল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ঝড় হোল না। এদিকে ঝড় নিয়ে যখন সর্বত্র আলোচনা চলছে, তখন লেখক সমুদ্রবক্ষে প্রচণ্ড এক ঝড়ের মুখোমুখি হলেন। বিরাট এক ঢেউ তাঁ'দের জাহাজটিকে গ্রাস করবার জন্যে এগিয়ে আসছিল। এমন সময় লেখক সমুদ্রজলে সন্ন্যাসীর স্বপ্নলব্ধ 'কুন্তলকেশরী' তেল নিক্ষেপ ক'রে ঢেউ তথা ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। আলোচ্য কাহিনীতে ঝড়ের পূর্বাভাষের বর্ণনায় এবং সমুদ্রবক্ষে ঝড়ের চিত্র অঙ্কনে লেখক পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। তা' ছাড়া ঝড় না হবার কারণ সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের 'নেচার' নামক কাগজ এবং জনৈক জার্মান অধ্যাপকের ব্যাখ্যাটিও বৈজ্ঞানিক রহস্যকাহিনীর দিক থেকে মনোজ্ঞ। কিন্তু এক শিশি তেল নিক্ষেপ ক'রে লেখক সমুদ্রবক্ষে প্রচণ্ড এক ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পেলেন, একথা কোনো বুদ্ধিমান পাঠকই সহজে মেনে নিতে পারেন না। তেল চঞ্চল জলকে মসৃণ করে সত্যি ; তাই বলে 'সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্ব্বত-প্রমাণ ফেনিল এক মহা উর্ম্মি' এক শিশি তেলের প্রভাবে শান্ত হয়ে গেল, একথা কোনো যুক্তিবাদী পাঠক মেনে নিতে পারেন না। জগদীশচন্দ্র এখানে বিজ্ঞান অপেক্ষা দৈবকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। এ ছাড়া কুন্তলকেশরীর আবিষ্কারকাহিনীতে সন্ন্যাসী এবং দৈবের অবতারণা করায় বৈজ্ঞানিক রহস্যের গল্পরস ব্যাহত হয়েছে। তবে সমগ্র কাহিনীটি জগদীশচন্দ্র কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে রহস্যচ্ছলে লিখেছিলেন, একথা স্মরণে রাখলে এই ত্রুটিকে আরও লঘু ক'রে দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে

বিচার করলে দেখা যায়, আলোচ্য কাহিনীতে ঘটনাসন্নিবেশ, সুললিত বর্ণনাভঙ্গী এবং কবিত্ব ও ব্যঙ্গরসের মধ্য দিয়ে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

দুই

সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বৈজ্ঞানিক রচনায়ও সুস্পষ্ট। তবে প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক রচনা জগদীশচন্দ্রের রচনার মতো সরস নয়। সাহিত্যিক মূল্যও জগদীশচন্দ্রের রচনারই অধিক।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বরাবরই প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরাগ ছিল।[৫] বাংলা ছাড়া শ্রেষ্ঠ বিদেশী লেখকদের রচনাও তাঁর প্রিয় ছিল।[৬] তিনি সেক্সপীয়ার, কার্লাইল, এমার্সন্, ডিকেন্স্ প্রভৃতির রচনা পড়তে ভালবাসতেন। এ ছাড়া বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলন ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৩৩৫ সালে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মীরাট অধিবেশনে এবং ১৩৪৪ সালে পাটনা অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও তিনি সদস্য ছিলেন।[৭]

বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগের মূলে প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষার ভিত্তিও অনেকখানি সহায়তা করেছিল। পরবর্তী কালে ইংরেজী স্কুলে ও ইংল্যাণ্ডে শিক্ষালাভ করলেও জগদীশচন্দ্রের মতো প্রফুল্লচন্দ্রেরও শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তাঁরই গ্রামের বাংলা স্কুলে।

রচনার ধর্ম অনুযায়ী প্রফুল্লচন্দ্রের সমগ্র বিজ্ঞান-সাহিত্যকে প্রধানতঃ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) সাধারণ বিজ্ঞানসাহিত্য এবং (২) বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য। সাধারণ বিজ্ঞানসাহিত্য পর্যায়ের রচনায় প্রফুল্লচন্দ্রের মৌলিক গবেষণার পরিচয় নেই। বিজ্ঞান নিয়ে গতানুগতিক-ভাবে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। 'সরল প্রাণিবিজ্ঞান' এই শ্রেণীর

৫ প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনচরিতকার, তাঁর স্বগ্রামনিবাসী ননীগোপাল ঘোষ লিখেছেন, "সুকবি নিধুবাবুর ভাষায় প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রায়ই বলিতে শুনিয়াছি, 'নানান্ দেশের নানান্ ভাষা, বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি তৃষা?'—প্রফুল্ল-চরিত (১৩২৬)—ননীগোপাল ঘোষ। পৃঃ ১৮।

৬ Essays and Discourses by Dr. Prafulla Ch. Ray (1918)-P. IX.

৭ 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র'—সন্তোষকুমার দে। পৃঃ ৩১-৩৩।

গ্রন্থ। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান-সাহিত্য পর্যায়ের রচনার মধ্যে পড়ে 'History of Hindu Chemistry' (Part I & II), 'নব্য রসায়নী বিদ্যা' ইত্যাদি গ্রন্থ। প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণা ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় এই শ্রেণীর রচনাতেই পাওয়া যায়।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'সরল প্রাণিবিজ্ঞান' ১৩০৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আকারে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরে মেরুদণ্ডবিহীন প্রাণীদের নিয়ে লেখকের গ্রন্থ-রচনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। আলোচ্য গ্রন্থটির পরিকল্পনা তৎকালীন সময়ে প্রচলিত বাংলা প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি থেকে কিছুটা পৃথক প্রকৃতির। এই গ্রন্থে তুলনামূলক সমালোচনার মাধ্যমে প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ বর্ণিত। এইখানেই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য। 'প্রাণি-বিজ্ঞান'-এর আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারে সংস্কৃতানুগত্য। বিজ্ঞান বিষয়ক ইংরেজী শব্দগুলোর পাশে ও সংস্কৃত বা বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞানসাহিত্যে প্রফুল্লচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি দুই খণ্ডে লেখা ইংরেজী গ্রন্থ 'A History of Hindu Chemistry'। গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৯০২ ও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন হিন্দুদের রসায়নজ্ঞান সম্বন্ধে লেখা এই গ্রন্থটি বিশ্বের বিভিন্ন যায়গায় খ্যাতি অর্জন করে। এই গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্রের কঠোর গবেষণা এবং গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় রয়েছে। অতীত যুগে রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধে হিন্দুদের কিরূপ ধারণা ছিল, রাসায়নিক দৃষ্টি দিয়ে বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা ও বিচার ক'রে প্রফুল্লচন্দ্র এখানে তা' দেখিয়েছেন।

পৃথিবীর প্রাচীন জাতিরা রসায়নশাস্ত্রে কিরূপ জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা' জানবার জন্যে চিরকালই তাঁর কৌতূহল ছিল। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই টম্‌সন্, কপ্ প্রভৃতি মনীষীদের গ্রন্থ তাঁর প্রিয় সঙ্গী ছিল। সেই সময় থেকেই ভারতবর্ষের রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করবার স্পৃহা তাঁর মনে জেগে ওঠে।

হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস রচনায় তিনি সর্বাধিক অনুপ্রেরণা পেয়ে-ছিলেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক 'মঁসিয়ে বার্থেলো'র কাছ থেকে। বার্থেলো হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল, তা' জানবার জন্যে আগ্রহান্বিত

হয়ে এ বিষয়ে গবেষণা করবার জন্যে প্রফুল্লচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। এই অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে 'রসেন্দ্রসার সংগ্রহ' নামক গ্রন্থের উপর ভিত্তি ক'রে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং প্রবন্ধটি বার্থেলোর নিকট পাঠান। বার্থেলো ঐ প্রবন্ধটির সমালোচনা ক'রে তাঁর লেখা মধ্যযুগের রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস (তিন খণ্ড) প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে উপহার পাঠালেন। ঐ গ্রন্থ পাঠ করবার পর প্রাচীন যুগের হিন্দু রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনার বাসনা প্রফুল্লচন্দ্রের মনে আরও দৃঢ় হয়।[৮-১১] এরপর ক্রমশঃ মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, বারাণসী, কাঠমুণ্ড, তিব্বত প্রভৃতি যায়গা থেকে প্রাচীন পুঁথিসকল আনা হোল এবং প্রফুল্লচন্দ্র গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হলেন। হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস রচনা করতে প্রফুল্লচন্দ্রের বার বৎসরেরও অধিককাল সময় লেগেছিল। এজন্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজও অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১২]

দীর্ঘদিন পরে প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র ভবেশচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এই গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত আকারে 'হিন্দু রসায়নী বিদ্যা' (১৩৫০) নামে বাংলা ভাষায় অনুবাদিত ও সংকলিত হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় 'নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' নামক গ্রন্থটি থেকে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে রসায়নশাস্ত্রের অগ্রগতির ইতিহাস এবং এই শাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি গোড়ার কথা এই গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচিত। গ্রন্থটির পরিকল্পনা সম্বন্ধে লেখক ভূমিকায় বলেছেন,

> "পাঠকগণ মনে রাখিবেন রসায়ন-শাস্ত্রের উৎপত্তি আলোচনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তবে প্রসঙ্গক্রমে এই শাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ

---

৮ 'A History of Hindu Chemistry'—Preface to the first edition.

৯ 'হিন্দু রসায়নী বিদ্যা' (১৩৫০)—প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত ভূমিকা।

১০ 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র' (১৩৩৮)—অনিলচন্দ্র ঘোষ। পৃঃ ১৪-১৭।

১১ 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী'—১ম খণ্ড (১৯২৭)—পৃঃ ।/০-।৶০।

১২ 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র'—ফণীন্দ্রনাথ বসু। পৃঃ ৫৩-৫৯।

কতকগুলি মূল তাৎপর্য্য সাধারণকে বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।”

নব্য রসায়নী বিদ্যায় সংযোজিত বিভিন্ন প্রবন্ধ আলোচনা করলে লেখকের এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম চারটি অধ্যায়ে ক্যাবেণ্ডিস, প্রীষ্ট্‌লী, লাভোয়াসিয়ে, ডাল্‌টন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার আলোচনা ক'রে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, কিভাবে নব্য রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হোল। আধুনিক রসায়নবিজ্ঞানের আদিগুরুদের আবিষ্কারের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই এসে গেছে রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি মূল প্রসঙ্গ ; যেমন, অম্লজান, বায়ু, জল, ক্ষার ইত্যাদি। লেখক জটিল সূত্র ও টেক্‌নিক্যালিটি এড়িয়ে সর্বসাধারণের উপযোগী সহজবোধ্য ভাষায় এই প্রসঙ্গগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার প্রায় সর্বত্রই প্রাচীন রসায়নবিজ্ঞানের উল্লেখ থাকায় প্রবন্ধগুলি বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান। পঞ্চম অধ্যায়ে 'ইউরোপে বিজ্ঞান-চর্চ্চা' শীর্ষক অধ্যায়ে ইংলণ্ডের রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা ক'রে লেখক দেখিয়েছেন, কিভাবে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা রফ্‌ফোর্ড, ডেভি প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায় নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হ'তে লাগল। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংকলিত 'নব্যতর রসায়নীবিদ্যা' নামক রচনাটি প্রফুল্লচন্দ্রের সহকারী বিধুভূষণ দত্তের লেখা। উনবিংশ শতাব্দীতে রসায়নবিজ্ঞানের অগ্রগতিই প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয়। রঞ্জেন, বেকারেল, কুরী-দম্পতি, বুন্‌সেন, কার্কফ, রাম্‌সে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার সংক্ষেপে আলোচনা ক'রে লেখক এখানে দেখিয়েছেন, নব্যতর রসায়নবিজ্ঞানের এরাই হলেন অগ্রদূত। প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে প্রফুল্লচন্দ্রের আলোচ্য বিষয় ছিল প্রধানতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর রসায়নবিজ্ঞান। বিধুভূষণের প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর রসায়নবিজ্ঞানের অগ্রগতি আলোচিত হওয়ায় গ্রন্থমধ্যে প্রবন্ধটি সংযোজনের যুক্তিবত্তা ও উপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায়ে সংযোজিত 'জ্ঞানোন্নতি ও ভারতের অধঃপতন' শীর্ষক রচনাটি গ্রন্থের মূল প্রসঙ্গের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কবিহীন। এখানে কোপারনিকস্‌, গ্যালিলিও, রজার বেকন প্রমুখ মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ঋষি কপিল, চার্বাক, নাগার্জুন, চক্রপাণি প্রভৃতির চিন্তাধারা

আলোচিত। কিন্তু যে ভারতবর্ষে ৬০০ থেকে ৭০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একদিন অশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল, কালক্রমে সেই ভারতবর্ষের কেন এবং কিভাবে অধঃপতন হোল তা' নিয়ে এখানে বিশেষ কিছু বলা হয় নি; শুধু জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করা হয়েছে মাত্র। তবে অধঃপতনের কারণ[১৩] সম্বন্ধে নিজে কোনো উত্তর না দিলেও প্রফুল্লচন্দ্রের এই জিজ্ঞাসা থেকে কৌতূহলী পাঠকের মনে গবেষণার স্পৃহা উদ্রিক্ত হবার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

'নব্য রসায়নী বিদ্যা'র বিভিন্ন প্রবন্ধ আলোচনা করলে দেখা যায়, সমসাময়িক যুগের বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রফুল্লচন্দ্র বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'ফ্লজিষ্টনবাদ ও নূতন বায়ুর আবিষ্কার' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রীষ্টলির আবিষ্কার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক তৎকালীন যুগে দহনপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে জনসাধারণ ও পণ্ডিতদের কিরূপ ধারণা ছিল, তা' আগে বুঝিয়ে বলেছেন। পরমাণুবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে জন ডাল্টনের আবির্ভাব-সময়ের বর্ণনাটিও তৎকালীন যুগের বৈজ্ঞানিক মতবাদের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে।

নব্য রসায়নী বিদ্যার বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রাচীন যুগের হিন্দু রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্যাদি রয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই লেখক বিভিন্ন দেশের রসায়নশাস্ত্র বিষয়ক প্রাচীন মতবাদগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফ্লজিষ্টনবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আরবদেশীয় মতবাদের সঙ্গে হিন্দুদের পঞ্চভূতবাদের এবং ইউরোপীয় মতবাদের সাদৃশ্য দেখান হয়েছে। তবে প্রাচীন রসায়নবিজ্ঞানের ত্রুটিও এখানে আলোচিত। যেমন, অম্লজান আবিষ্কারের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে রসার্ণব তন্ত্রে উল্লিখিত ব্যবস্থার ত্রুটি প্রদর্শন। এই ত্রুটি আলোচনা প্রসঙ্গে কোথাও বা বিভিন্ন দেশের প্রাচীন মতবাদসমূহের মধ্যে পার্থক্যও দেখান হয়েছে।

১৩ বহুদিন পরে 'হিন্দু রসায়নী বিদ্যা'র ভূমিকায় প্রফুল্লচন্দ্র এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন—"যেদিন হইতে সমাজের বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোকেরা শিল্পবিজ্ঞানের চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া তাহার ভার অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর অর্পণ করিলেন সেইদিন হইতে আমাদের অধঃপতন আরম্ভ হইল। নাপিতের হস্তে অস্ত্রচিকিৎসা ও বেদের হস্তে উদ্ভিদবিজ্ঞানের আলোচনার ভার ন্যস্ত করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত মনে পরলোকচিন্তায় ব্যস্ত হইলাম।"

কিন্তু এই পার্থক্য সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। যেমন, ক্ষার সম্বন্ধে আলোচনায় গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদের ত্রুটির কথা উল্লেখ ক'রে হিন্দু ঋষিদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কিন্তু গ্রীকদের মতবাদটি কি এবং তা'র ত্রুটি কোথায়, সে সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলা হয় নি; আভাস দেওয়া হয়েছে মাত্র।

গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি, নব্য রসায়নশাস্ত্রের আলোচনা করা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও দু'একটি অধ্যায়ে প্রাচীন রসায়নবিজ্ঞানের উপর যেন অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে। এমনকি, কোনো কোনো স্থলে নব্য রসায়নের আলোচনা কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'কণাদ-মুনি, জন ডাল্টন ও পরমাণুবাদ' শীর্ষক অধ্যায়ে ডাল্টনের আবিষ্কৃত তথ্য অপেক্ষা প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। আলোচ্য অধ্যায়ের মাঝামাঝি যায়গায় ডাল্টনের আবির্ভাবকালের বর্ণনা চমকপ্রদ হলেও অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে প্রাচীন ভারতের রসায়নবিজ্ঞানের আলোচনার মধ্যে নব্যযুগের রসায়নবিজ্ঞানী ডাল্টন কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে আহৃত বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় এ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "যাহাতে আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রোক্ত শব্দগুলির পুনরুদ্ধার হইয়া প্রচারিত হয় এমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।" রসায়নীবিদ্যা নামকরণের[১৪] মধ্যেই প্রাচীন গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দের প্রতি আনুগত্য দেখান হয়েছে। তা' ছাড়া এই গ্রন্থে এবং অপরাপর বৈজ্ঞানিক রচনায়ও প্রফুল্লচন্দ্র নতুন শব্দ সৃষ্টি না ক'রে বা প্রচলিত পারিভাষিক শব্দগুলো গ্রহণ না ক'রে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে আহৃত শব্দই যথাসম্ভব ব্যবহার করেছেন। এর মূলে ছিল প্রাচীন সংস্কৃত রস-গ্রন্থাদির সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকালের পরিচয় এবং স্বদেশ ও স্বদেশীভাষার[১৫] প্রতি শ্রদ্ধা।

তা' ছাড়া প্রফুল্লচন্দ্রের বহু রচনারই উৎসমূল হোল তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও

১৪ 'নব্য রসায়নী বিদ্যা'র ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন, "রুদ্রযামলান্তর্গত 'ধাতুক্রিয়া' নামক তন্ত্রে এই বিদ্যা রসায়নীবিদ্যা নামে উক্ত হইয়াছে। আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম।"

১৫ বাংলা বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র 'রাসায়নিক পরিভাষা' (১৩১৯) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "বাঙ্গালী মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রচার না করিলে কখনই ভাষার ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইবে না।"

স্বাজাত্যবোধ। তাঁর স্বাজাত্যবোধের পরিচয় বৈজ্ঞানিক রচনায়ও দুর্লভ নয়। উদাহরণস্বরূপ, খ্রীষ্টলীর আবিষ্কার প্রসঙ্গে সমাজে জাতিভেদপ্রথার উদাহরণটি উল্লেখযোগ্য।

প্রফুল্লচন্দ্র চিরদিনই সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। জীবন সম্বন্ধে সমুন্নত এক নীতিবোধ তাঁর কর্মে ও কথায় চিরকালই অনুরণিত। আজীবন তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। এই আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনায়ও পাওয়া যায়। 'ইউরোপের বিজ্ঞান-চর্চা' শীর্ষক অধ্যায়ের উপসংহারে বৈজ্ঞানিক ডেভির সঙ্গে ধনী ও বিলাসী সমাজের সৌহৃদ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র মন্তব্য করেছেন,

> "জ্ঞানান্বেষীর পক্ষে আর্য্যঋষিগণের আদর্শই অনুকরণীয়। চালচলন সাদাসিদে, তপস্বীর মত হইবে, এমন মন উচ্চ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিবে, ইহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।"

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে নীতিকথার অবতারণা অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই নীতিবোধ ও আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই পূতচরিত্র জ্ঞানতপস্বী প্রফুল্লচন্দ্রের স্বরূপটি ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রেও প্রফুল্লচন্দ্রের অবদান নগণ্য নয়। তাঁরই নির্দেশে প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ এবং হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস থেকে পরিভাষা সংকলন করেন। এই সংকলিত পরিভাষা পরে 'রাসায়নিক পরিভাষা' (১৩১৯) নামে প্রফুল্লচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে প্রফুল্লচন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন 'দেশী রং' (১৩২৯)। গ্রন্থটি গবেষণামূলক। লেখকের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর দু'জন ছাত্র দেশী রং সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন, তারই ফল এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছে। দেশীয় রঞ্জন-শিল্পের পুনরুদ্ধারই গ্রন্থটি রচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

অতি আধুনিক কালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারে যে সকল বৈজ্ঞানিক উদ্যোগী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষভাবে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র, ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের নাম।

জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ

অতি আধুনিক যুগে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জগদানন্দ রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম।

এক

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যখন খ্যাতির মধ্যগগনে, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে তখন জগদানন্দ রায়ের আবির্ভাব। বিজ্ঞানসাহিত্যে জগদানন্দ রামেন্দ্রসুন্দরের আদর্শ অনুসরণ করলেও উভয়ের মূল দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য বিদ্যমান। রামেন্দ্রসুন্দর নিজস্ব বুদ্ধি ও বিচারের মাপকাঠিতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে যাচাই করেছেন ; জগৎপ্রবাহের উৎস সন্ধানে বেরিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সত্যাসত্য নির্ধারণ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা তাই গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। কিন্তু জগদানন্দের রচনায় এরূপ গভীরতার একান্ত অভাব। রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় বিজ্ঞানকে তিনি কোথাও যাচাই করেন নি ; দর্শন ও বিজ্ঞানকে পাথেয় ক'রে জগৎরহস্যের গভীরে প্রবেশ করবার কোনো প্রচেষ্টা তাঁর রচনায় দেখা যায় না। বিজ্ঞানসমুদ্রের বাহ্যিক শোভা দেখেই তিনি সন্তুষ্ট। সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় শুক্তি আহরণের চেষ্টা তাঁর নেই।

মূল দৃষ্টিভঙ্গীতে উভয়ের এই পার্থক্য সত্ত্বেও বিজ্ঞানসাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দরই জগদানন্দের পথপ্রদর্শক। জগদানন্দ লিখেছিলেন,

> "ত্রিবেদী মহাশয়কে আমি গুরুতুল্য জ্ঞান করি। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চায় তিনিই আমাকে পথ দেখাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে অনেক শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করিয়াছি।"[১]

রামেন্দ্রসুন্দর ও জগদানন্দ, উভয়ের রচনাতেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সাহিত্য হয়ে উঠেছে। আর এই সাহিত্য রচিত হয়েছে 'অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের' উদ্দেশ্যে। অতএব দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতার দিক থেকে বিরাট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানসাহিত্যের আদর্শ উভয়েরই মূলতঃ এক। উভয়েই সাহিত্য

১ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জগৎ-কথা'য় (১৯২৬) জগদানন্দ রায় লিখিত ভূমিকা।

রচনা করেছেন সর্বসাধারণের জন্যে। এ ছাড়া বিজ্ঞানবিদ্যার আদর্শ সম্পর্কেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী যায়গায় যায়গায় মিলে গেছে। রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় জগদানন্দও জগতের ঘটনাগুলোর মধ্যে ঐক্যের সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন,

> "প্রাচীরের এখানে একটা, ওখানে একটা দরজা ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু জগদ্‌যন্ত্রের মডেল এখনও নানা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত রহিয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে শিকল দিয়া জোড়া লাগাইবার উপায় এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।"
>
> [জিজ্ঞাসা : মায়াপুরী]

জগদানন্দ লিখেছেন,

> "জগদীশ্বর যে সোনার তারে ক্ষুদ্র বৃহৎ এবং সম্পর্কিত-অসম্পর্কিত ঘটনাগুলির মধ্যে যোগসাধন করিয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যন্ত্রবৎ চালাইতেছেন, তাহার সন্ধান করিতে পারিলেই বিজ্ঞানালোচনা সার্থক হইবে, এবং মানব ধন্য হইবে।"
>
> [প্রকৃতি-পরিচয় : আকাশের বিদ্যুৎ]

রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় জগদানন্দও বিজ্ঞানকে প্রাত্যহিক জীবনের কাজকর্মের মধ্যে টেনে আনবার পক্ষপাতী নন। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন,

> "এই কল্পিত মায়া-পুরীতে বদ্ধ জীব যদি ব্যাবহারিক জগতের সম্পর্কে থাকিয়াও পূর্ণ ভূমানন্দের পূর্ব্বাস্বাদলাভে অধিকারী হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উৎস হইতে যে আনন্দ-প্রবাহ বিগলিত হইতেছে, তাহাকে ব্যাবহারিক জীবনের সুখ-দুঃখের কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া পঙ্কিল করিও না।"
>
> [জিজ্ঞাসা : মায়াপুরী]

জগদানন্দের মতে,

> "কোন বিশেষ আবিষ্কার দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম্মের কতটা সুবিধা হইল ইহাই বিবেচনা করিয়া আবিষ্কারের মূল্য নির্দ্ধারণ করা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, তাহাকে বিজ্ঞানের মানদণ্ড বলিয়া স্বীকার করা যায় না। স্বীকার করিলেই

বিজ্ঞানের প্রতি অবিচার করা হয়, এবং তাহাকে অসম্ভব খাটো করিয়া দেখা হয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে জ্ঞান প্রকৃতির সহিতই পরিচয় স্থাপন করাইয়া মানুষকে জগদীশ্বরের এই অনন্ত সৃষ্টির মহিমা দেখায়, তাহাই বিজ্ঞান।"

[প্রকৃতি-পরিচয় : আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ]

বিজ্ঞানবিদ্যার আদর্শ সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে সাদৃশ্য থাকলেও বিশ্বজগৎকে দু'জন দু'ভাবে দেখেছেন। জগদানন্দের ছিল ভগবানের করুণাময়ত্বে আস্থা। তাঁর বহু প্রবন্ধেরই উপসংহারে ভগবানের প্রতি অপার বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক যায়গায়ই দেখা যায়, বিশ্বজগৎ জগদানন্দের কাছে সুন্দর ও আনন্দময়। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর জগৎকে দেখেছেন ডারুইন-পন্থী জীববিজ্ঞানীর চশমা চোখে দিয়ে। প্রাণিসমাজে জীবনসংগ্রাম ও রক্তপাতের ভয়াবহ রূপ তাই তাঁর কাছে প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই রামেন্দ্রসুন্দরের মতে,

"সমস্ত জগৎটাই একটা বিরোধের ক্ষেত্র। গোড়ায় বিরোধ—প্রাণের সহিত জড়ের ; তাহার উপরে বিরোধ প্রাণীর সহিত প্রাণীর ; তাহার মধ্যে বিরোধ উদ্ভিদের সহিত জন্তুর এবং জন্তুর সহিত জন্তুর।"

[বিচিত্র জগৎ : প্রাণের কাহিনী]

কিন্তু ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে আস্থা রাখায় প্রাণিজগতের এই বিরোধের চিত্রটি জগদানন্দের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তাই জগদানন্দ মনে করেন,

"যে জগদীশ্বর সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সুনিপুণ হস্তে অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক কীটেরও শ্বাসপ্রশ্বাস, আহারনিদ্রার সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। এই কারণেই জগৎ এত সুন্দর এবং আনন্দময়। জীবনরক্ষা এবং আনন্দের জন্য যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, প্রত্যেক প্রাণী তাহা নিয়তই অযাচিতভাবে পাইতেছে। ইহাই বিধাতার আশীর্ব্বাদ।"

[বৈজ্ঞানিকী : শ্বাসযন্ত্রের বৈচিত্র্য]

বিজ্ঞানবিদ্যার অপূর্ণতার কথা বার বার বললেও মানুষের প্রজ্ঞার উপর রামেন্দ্রসুন্দরের আস্থা ছিল। আর এই আস্থা ছিল বলেই জগৎপ্রবাহের গভীরে যাত্রা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন,

> "হয়ত এক দিন মানুষের প্রজ্ঞা জয়ী হইবে ;—নূতন পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রাণিদেহের নূতন মূর্ত্তিদানে সমর্থ হইবে—প্রাণের প্রবাহকে ইচ্ছামত পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবে।"
>
> [বিচিত্র জগৎ : প্রাণময় জগৎ]

মানুষের প্রজ্ঞার উপর এই বিশ্বাস ছিল বলেই রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্বরহস্যের উৎস-অনুসন্ধানে বের হ'তে সাহসী হয়েছিলেন। এই সাহসের জন্যেই তাঁর রচনায় অনন্তের সুর ধ্বনিত। কিন্তু মানুষের শক্তি সম্বন্ধে গোড়া থেকেই জগদানন্দের সংশয় ছিল। জগদানন্দ স্পষ্টই বলেছেন,

> "প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রণালী আবিষ্কার করা কঠিন নয়, কিন্তু যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এবং যে অপরিমিত শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতি জগতের কার্য্য চালাইয়া থাকেন, তাহার অনুকরণ করা মানব-বিশ্বকর্ম্মার সাধ্যাতীত।"
>
> [প্রাকৃতিকী : পরশপাথর]

গোড়াতেই মানুষের শক্তির এই অক্ষমতাকে স্বীকার ক'রে নেওয়ায় জগদানন্দ কোথাও জগৎরহস্যের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন নি। বিজ্ঞান-বিদ্যার বাহ্যিক রূপকে নিয়েই তাঁর বিজ্ঞানসাহিত্য।

১২৭৬ সালের আশ্বিন মাসে কৃষ্ণনগরে জগদানন্দ রায়ের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম অভয়ানন্দ রায়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জগদানন্দ বি এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি দীর্ঘকাল ধরে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানে তাঁর অনুরাগ ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

> "বাল্যকাল হইতে বিজ্ঞান-চর্চ্চায় আমার বড় আমোদ, এজন্য বহু চেষ্টায় কতকগুলি বিজ্ঞানগ্রন্থ এবং পুরাতন-দ্রব্য-বিক্রেতার দোকান হইতে দুই চারিটি জীর্ণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও সংগ্রহ করিয়াছিলাম।"
>
> [প্রাকৃতিকী : শুক্র-ভ্রমণ]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভারতী, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), প্রবাসী, মানসী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সাময়িক-পত্রকে কেন্দ্র ক'রে জগদানন্দের সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি-পরিচয়' ১৩১৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), প্রবাসী ইত্যাদি বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচিত্র প্রকৃতির প্রবন্ধ প্রকৃতি-পরিচয়ে স্থান পেয়েছে। সূক্ষ্ম বিচারপ্রণালী বা গভীর দৃষ্টির পরিচয় কোনো প্রবন্ধেই নেই। তবে সহজ ও সরস ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে এখানে সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে লেখা হয়েছে। ভাষার শ্রুতিমধুরতা ও বর্ণনাভঙ্গীর সরসতার দিক থেকে বিচার করলে প্রকৃতি-পরিচয়ের রচনাগুলি সাহিত্যিক উৎকর্ষতার দাবী রাখে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে এবং পরবর্তী দু'টি গ্রন্থ 'প্রাকৃতিকী' ও 'বৈজ্ঞানিকী'তে বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখে জগদানন্দ আলোচনায় এগিয়েছেন। এখানে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য। এঁদের উভয়েই আধুনিক মতবাদের 'অভিব্যক্তির সূত্র'টি বোঝাবার জন্যে বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রারম্ভে 'অপ্রচলিত প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি' নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রকৃতি-পরিচয়ের রচনাগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, উপমা নির্বাচনে অভিনবত্ব। যেমন,

> "প্রহরীর সংখ্যা না বাড়াইয়া কয়েদির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে, জেলখানা হইতে দু'চারিজন কয়েদির পলায়নের সম্ভাবনা দেখা যায়। পরমাণুমাত্রেই ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ সমান, কিন্তু ইহা যে সকল অতিপরমাণুকে প্রহরীর ন্যায় আবদ্ধ রাখে, তাহাদের সংখ্যা পদার্থ ভেদে কখন অধিক এবং কখন অল্প দেখা গিয়া থাকে। কাজেই যে সকল পরমাণুতে অতিপরমাণুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক তাহা হইতে, মাঝে মাঝে দুইদশটা অতিপরমাণু ধনাত্মক বিদ্যুতের বাধা অতিক্রম করিয়া যে বাহির হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!"
>
> [প্রকৃতি-পরিচয় : পদার্থের মূল উপাদান]

অন্যত্র,

> "অতিথিবেশে প্রবেশ করিয়া শেষে গৃহস্বামীর অনুগ্রহে পরিবারভুক্ত হইয়া পড়া, আমাদের ক্ষুদ্র গার্হস্থ্যজীবনের খুব সুলভ ঘটনা নয়।

কিন্তু সূর্য্যের বৃহৎ পরিবারে এই ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। অতিথি ধূমকেতুগুলির যখন যাত্রাকাল উপস্থিত হয়, সূর্য্য বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের কতকগুলিকে নিজের পরিবারভুক্ত করিয়া লয়।"

[প্রকৃতি-পরিচয় : হ্যালির ধূমকেতু]

মনোজ্ঞ উপমার প্রয়োগ জগদানন্দের অন্যান্য গ্রন্থেরও বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃতি-পরিচয়ের পর সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা জগদানন্দের অপরাপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' (১৩১৯), 'প্রাকৃতিকী' (১৯১৩) ও 'বৈজ্ঞানিকী' (১৩২০)। 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার'-এ আচার্য জগদীশের সমগ্র আবিষ্কারকাহিনী নেই। তাঁর আবিষ্কারের কয়েকটি স্থূল তত্ত্ব সহজ ভাষায় এখানে আলোচিত। আলোচ্য গ্রন্থে সংযোজিত অধিকাংশ প্রবন্ধই 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'উপাসনা' প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্রের একান্ত অভাব। গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি এখানেই। 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং তৃতীয় খণ্ডে জড় ও জীব সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কারের কথা আলোচিত। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের মূল তত্ত্ব এখানে সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে সহজ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

জগদানন্দের পরবর্তী গ্রন্থ 'প্রাকৃতিকী'র অধিকাংশ প্রবন্ধই বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ—পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে কতকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বৈজ্ঞানিকের জীবন নিয়ে উৎকৃষ্ট আলোচনাও এই গ্রন্থে আছে। 'লর্ড কেলভিন' শীর্ষক প্রবন্ধটি স্বল্পপরিসর হলেও এ থেকে এই বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের সমগ্র জীবনসাধনার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দু'একটি প্রবন্ধের নামকরণে অভিনবত্ব রয়েছে; যেমন, 'পরশপাথর'। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এক পদার্থের অপর পদার্থে রূপান্তরের কাহিনী। এখানে র‍্যাম্‌জে, কুরী, টম্‌সন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা ও আবিষ্কার নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ঊনবিংশ

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো রামেন্দ্রসুন্দরের মতো জগদানন্দকেও গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। জগদানন্দের 'প্রাকৃতিকী' ও 'বৈজ্ঞানিকী'র বহু স্থানেই এর সুস্পষ্ট নিদর্শন মেলে। 'বৈজ্ঞানিকী'র বৈশিষ্ট্য জীববিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায়। জীববিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'মনুষ্যে পশুত্ব', 'বংশের উন্নতি বিধান' ও 'অব্যক্ত জীবন'। 'মনুষ্যে পশুত্ব' একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ। মানুষের দেহে এবং চলাফেরায় 'পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বর্ব্বরতা ও ইতর সংস্কারের যে সকল চিহ্ন' আজও দেখা যায় তা' নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। 'বংশের উন্নতি বিধান' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা আধুনিক জীববিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে। বংশের উন্নতি-অবনতিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কিভাবে দেখছেন, তা' নিয়ে এখানে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। 'অব্যক্ত জীবন' একটি নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি যে এক অস্পষ্ট জীবন আছে, যেখানে জীবনের সাধারণ লক্ষণগুলি ধরা পড়ে না, তা' নিয়ে এখানে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করা হয়েছে। ভূবিদ্যা বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'প্রাচীন ভূ-তত্ত্ব', 'আধুনিক ভূ-তত্ত্ব', 'ভূ-গর্ভ' ইত্যাদি। ভূবিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদ সম্বন্ধে জগদানন্দ যে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন তা'র পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের যে প্রচেষ্টা রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় পাওয়া যায়, এখানে তা'র একান্ত অভাব।

জগদানন্দ রায় সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে ছোটদের জন্যেও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'বিজ্ঞানের গল্প' (১৯২০)। এই গ্রন্থে সূর্য, সূর্যের তাপ, আলো ও শব্দের উৎপত্তি, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও জীববিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রসঙ্গ ছোটদের উপযোগী সরল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে।

জগদানন্দ রায়ের 'ছুটির বই' (২য় সংস্করণ—১৩৩৯) ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা একটি সরস বিজ্ঞানগ্রন্থ। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, একেবারে সাধারণ ঘটনা দিয়ে আলোচনা সুরু ক'রে লেখক ধীরে ধীরে মূল বক্তব্যের অবতারণা করেছেন।

এ ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে বিষয়বস্তু ক'রে জগদানন্দ

রায় ছোটদের উদ্দেশ্যে দু'টি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। গ্রন্থ দু'টি হোল, 'বিজ্ঞান-পরিচয়' (১৯২৫) ও 'বিজ্ঞান-প্রবেশ' (১৯২৫)।

ছোটদের জন্যে জগদানন্দ রায় আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। জগদানন্দের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা 'গ্রহ-নক্ষত্র' (১৯১৫) ও 'নক্ষত্র-চেনা' (১৯৩১) ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা। এই দু'টি গ্রন্থ ছাড়াও নক্ষত্র নিয়ে জগদানন্দ রায় বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এর মূলে ছিল শৈশব থেকেই নক্ষত্রের প্রতি তাঁর অদম্য কৌতূহল। নক্ষত্র-চেনার 'নিবেদন'-এ তিনি বলেছেন,

> "মনে পড়ে যখন বয়স অল্প ছিল, তখন এক সময়ে নক্ষত্র-চেনার বাতিক এত প্রবল হইয়াছিল যে, সমস্ত রাত্রি খোলা মাঠের মাঝে দাঁড়াইয়া নক্ষত্র চিনিতাম। এই রকমে অনেক অনিদ্র রজনী কাটাইয়াছি। পঞ্জিকায় লিখিত রাশি ও নক্ষত্রগুলিকে যখন আকাশ-পটে প্রত্যক্ষ দেখিতাম, তখন যে আনন্দ হইত তাহা অতুলনীয়। কত পুরাণ-কথা, এবং বেদ, উপনিষদ্ ও সংহিতার কত তত্ত্ব এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক-বিন্দুর সহিত হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জড়িত রহিয়াছে, মনে করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতাম। আমার নৈশ অভিযানের সহায় ছিল একখানি ক্ষুদ্র ইংরেজি নক্ষত্র-পট এবং কালো কাপড়ে ঢাকা একটি ছোট লণ্ঠন। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে পটে-আঁকা নক্ষত্রদের সঙ্গে আকাশের নক্ষত্রদের মিলাইয়া লইতাম।"

'গ্রহ-নক্ষত্রে' সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা, নক্ষত্র ও নীহারিকা সম্বন্ধে সরস ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির দু' এক যায়গায় প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যায় লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রেই পরিচিত জিনিসের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বক্তব্য বিষয় বোঝান হয়েছে। সরস উপমা গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য। 'নক্ষত্র-চেনা'য় কয়েকটি চিত্রের সাহায্যে লেখক বিভিন্ন নক্ষত্রের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। গ্রন্থটিতে যায়গায় যায়গায় পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা ক'রে ছোটদের কৌতূহল সৃষ্টি করবার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

জগদানন্দ রচিত জীববিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সবগুলিই প্রধানতঃ ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা। 'পোকা-মাকড়' (১৩২৬), 'গাছপালা' (১৯২১), 'মাছ ব্যাঙ্ সাপ্' (১৯২৩), 'বাংলার পাখী' (১৯২৪) ও 'পাখী' (১৩৩১) এই পর্যায়ের গ্রন্থ। প্রথমোক্ত গ্রন্থ 'পোকা-মাকড়'-এ সচরাচর-দৃষ্ট পোকা-মাকড়দের নিয়ে আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থটির গোড়ার দিকে প্রাণীর সংখ্যা, বংশবৃদ্ধি, প্রাণিহত্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুধু ছোটদের কাছেই নয়, বড়দের কাছেও কৌতূহলোদ্দীপক। টেক্‌নিক্যালিটির মধ্যে না গিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ করবার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা এই গ্রন্থে রয়েছে। পৃথিবীর সমগ্র পোকা-মাকড়কে সাতটি প্রধান শাখায় বিভক্ত ক'রে বিভিন্ন শাখার প্রাণীদের আকৃতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, শরীরগঠনের অভিনবত্ব ও চালচলন সহজ ভাষায় এখানে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রাণীর বৈচিত্র্যগুলোর পরিচয় দেবার চেষ্টাই লেখক বেশী ক'রে করেছেন। কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। গ্রন্থটির দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে কীটপতঙ্গের প্রসঙ্গ। এই শাখার প্রাণীদের অন্তর্গত চিংড়ীমাছ ও পতঙ্গের শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা তথ্যপূর্ণ।

'গাছপালা'[২] নামক গ্রন্থটিতে টেক্‌নিক্যালিটির মধ্যে না গিয়ে সরল ভাষায় লেখক গাছের শিকড়, গুঁড়ি, গাছের বৃদ্ধি, ডাল, পাতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া এই গ্রন্থে এমন দু' একটি প্রসঙ্গ আছে যা' বালকবালিকাদের পক্ষে একান্ত কৌতূহলোদ্দীপক; যেমন, 'গাছের ঘুম', 'পোকাখেগো গাছ', 'ব্যাঙের ছাতা' ইত্যাদি। গ্রন্থটির শেষদিকে গাছপালার শ্রেণীবিভাগ, ভারতবর্ষের প্রাচীন উদ্ভিদ্-শাস্ত্র ও প্রাচীন ভারতে গাছপালার শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনায় তথ্যের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, ভাষায় লেখকের অন্তরঙ্গ সুর। এ ছাড়া অসংখ্য সুন্দর উপমা দিয়ে লেখক বক্তব্য বিষয়কে গল্পের মতো সরস ক'রে তুলেছেন। যেমন, 'Root Cap' সম্বন্ধে এক যায়গায় বলা হয়েছে,

২ 'গাছপালা' ছাড়াও জগদানন্দ রায় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। গ্রন্থটির নাম 'পর্য্যবেক্ষণ শিক্ষা'। ছোটরা যা'তে হাতেকলমে উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যগুলো জানতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি লেখা।

"সেলাই করিবার সময়ে পাছে আঙ্গুলে ছুঁচের খোঁচা লাগে, এই ভয়ে আমরা আঙ্গুলে আঙ্গ্-স্ত্রাণা লাগাইয়া তবে সেলাই করি। পাছে ইট পাথর কাঁকরের খোঁচা মাথায় লাগে এই ভয়ে শিকড়-গুলিও মাথায় টুপি লাগাইয়া মাটির তলায় চলে। এই টুপিকে বৈজ্ঞানিকরা মূলত্রাণ (Root Cap) নাম দিয়াছেন।"

জগদানন্দের প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 'মাছ ব্যাঙ্ সাপ'। 'মাছ ব্যাঙ্ সাপ' ছাড়াও এই গ্রন্থে কুমীর, কচ্ছপ, টিক্‌টিকি প্রভৃতি সরীসৃপ জাতীয় কয়েকটি প্রাণীর জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। তবে মাছ সম্বন্ধে আলোচনাই অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। মাছের শরীরের বিভিন্ন অংশের উপযোগিতা ও কার্যপ্রণালী বোঝাতে গিয়ে প্রায় সর্বত্রই মানবদেহের সঙ্গে তুলনা করায় আলোচনা কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠেছে। মাছের বর্গবিভাগে লেখক সচরাচর-দৃষ্ট মাছগুলোর মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ব্যাঙ্, কচ্ছপ ও কুমীর সম্বন্ধে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও যায়গায় যায়গায় বেশ উপভোগ্য।

'বাংলার পাখী' জগদানন্দ রায়ের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পাখী নিয়ে ইতিপূর্বেও বাংলায় গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সত্যচরণ লাহার 'পাখীর কথা' (১৩২৮) এবং সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'পাখীর কথা' (১৩২৮) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলা দেশের পাখীর সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা এঁদের কেউই করেন নি। জগদানন্দ রায়ের এই গ্রন্থটি বাংলা দেশে সচরাচর-দৃষ্ট পাখীদের নিয়ে লেখা। এইখানেই গ্রন্থটির অভিনবত্ব। এই গ্রন্থে বাংলাদেশের বিভিন্ন পাখীর অবস্থানক্ষেত্র, আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আবশ্যকবোধে দু'এক যায়গায় একই জাতীয় পাখীর বিভিন্ন শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে পাখী সম্বন্ধে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, লেখক বিভিন্ন পাখীর সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, এদের আবাসস্থল ও চালচলনের নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে। পরিচয়ের সুবিধার জন্যে অনেক যায়গায় বিভিন্ন পাখীর স্থানীয় প্রচলিত নামগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। একই জাতীয় পাখীর বিভিন্ন শ্রেণীর আলোচনা প্রসঙ্গে যে সকল পাখী সচরাচর বাংলাদেশে চোখে পড়ে শুধুমাত্র

তাদের নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। অপরাপর পাখীর শুধুমাত্র নামোল্লেখ ক'রেই লেখক ক্ষান্ত হয়েছেন। গ্রন্থটির যায়গায় যায়গায় জগদানন্দের সৌন্দর্যরসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাখী নিয়ে লেখা জগদানন্দের অপর গ্রন্থ 'পাখী' বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনসাধারণ এবং বালকবালিকাদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়। গ্রন্থটির প্রারম্ভে অতি সংক্ষেপে প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করবার পর বিভিন্ন অধ্যায়ে পাখীর আকৃতি, ইন্দ্রিয়-বৈচিত্র্য, জীবনধারণ-পদ্ধতি এবং শারীরবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পাখীর বাসা নিয়ে আলোচনা ছোট-বড় সকলের কাছেই উপভোগ্য। পাখীর শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক বর্ণনাও বেশ সরস। ভাষায় প্রচলিত চলতি কথার ব্যবহার এবং বর্ণনাভঙ্গীর সারল্য আলোচ্য বিষয়বস্তুকে রমণীয় ক'রে তুলেছে। বিভিন্ন পাখীর আকৃতি, বাসা ইত্যাদির নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে এখানেও লেখক বিভিন্ন পাখীর সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। দু'এক যায়গায় বর্ণনায় চিত্রধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, সকাল বেলায় পাখীদের কলরবের বর্ণনা :—

> "...তখন শালিকের কিচির-মিচির, চড়াইয়ের চড়্-চড়্ শব্দ, হাঁড়ি-চাঁচার সেই ভাঙা গলায় কাঁচর-মেচর আওয়াজ, চিলের চি-হি-হি ডাক সবে মিলিয়া আকাশটা যেন ভরিয়া তোলে। কাহারো বিশ্রাম নাই,—একদল গো-শালিক বাগানের একপাশে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিল, হঠাৎ পুঁই-ই শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। দু'টা কাক বাদাম গাছের ডালে বসিয়া ঠোঁট দিয়া পালক আঁচ্ড়াইতেছিল, কয়েকটা ফিঙে চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দ করিয়া তাহাদিগকে ঠোকর দিতে গেল; অমনি তাহারা যে কে কোথায় উড়িয়া গেল, তাহা বুঝা গেল না।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে জগদানন্দ রায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব পদার্থবিজ্ঞান রচনায়। একমাত্র জগদানন্দ রায় ছাড়া পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান বিভাগগুলো নিয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আজও পর্যন্ত কোনো লেখক বাংলায় গ্রন্থ রচনা করেন নি। জগদানন্দের পূর্ববর্তী লেখকদের রচিত অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল জড়ের সাধারণ ধর্ম।

কোনো কোনো গ্রন্থে জড়ের সাধারণ ধর্ম আলোচনার পর আলো, তাপ, বিদ্যুৎ ও শব্দ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হোত বটে, কিন্তু এদের মধ্যে শুধু-মাত্র একটি প্রসঙ্গ—যেমন, আলো বা তাপকে বিষয়বস্তু ক'রে বিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলাভাষায় কোনো গ্রন্থ রচিত হয় নি। পদার্থবিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা আলোককে বিষয়বস্তু ক'রে বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন চুণীলাল বসু। চুণীলাল বসুর 'আলোক' ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর শুধুমাত্র চুম্বক নিয়ে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ লিখলেন নলিনীনাথ রায়। এই লেখকের 'চুম্বক বিজ্ঞান' ১৩২১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পদার্থবিজ্ঞানের এক একটি প্রধান শাখা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করলেও চুণীলাল বসু বা নলিনীনাথ রায়ের প্রয়াস এক একটি মাত্র গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ। পদার্থবিজ্ঞানের প্রায় সবগুলো প্রধান বিভাগের এক একটিকে বিষয়বস্তু ক'রে বাংলায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করলেন জগদানন্দ রায়। জগদানন্দের পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ হোল 'শব্দ' (১৩৩১), 'আলো' (১৯২৬), 'তাপ' (১৯২৮), 'চুম্বক' (১৯২৮), 'স্থিরবিদ্যুৎ' (১৯২৮) ও 'চলবিদ্যুৎ' (১৯২৯)।

জগদানন্দ রায়ের 'শব্দ' শব্দবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শব্দবিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলো সহজ ভাষায় আলোচিত। লেখক এখানে যন্ত্রপাতির উল্লেখ ক'রে পরীক্ষার সাহায্যে শব্দবিজ্ঞান বোঝান নি। যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনায় শব্দবিজ্ঞান বোঝবার সুযোগ রয়েছে সেই ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র ক'রে শব্দবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। 'শব্দ' প্রধানতঃ ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা। এই গ্রন্থে শব্দের ঢেউ, শব্দের বাহন, বেগ, প্রতিধ্বনি, বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র, সুর ইত্যাদি প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচিত। বর্ণনাভঙ্গী খুবই সরল।

সাধারণ পাঠক ও বালকবালিকাদের উদ্দেশ্যে রচিত জগদানন্দের 'আলো' নামক গ্রন্থটির পরিধি মোটামুটি বিস্তৃত। আলোর উৎপত্তি, বেগ, প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ ছাড়া উচ্চাঙ্গের আলোকবিজ্ঞান বিষয়ক দু' একটি প্রসঙ্গও এতে আছে; যেমন, 'Interference'। জগদানন্দের অপরাপর গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থটিরও বৈশিষ্ট্য, রচনা কোথাও টেক্‌নিক্যাল হয়ে ওঠে নি। লেখক দু'এক যায়গায় আলোকবিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করেছেন; অথচ বক্তব্য বিষয় বোঝাবার জন্যে কোনো ফর্মুলার অবতারণা করেন নি। অতি সহজ ও সরল ভাষায় বিবিধ উপমার মাধ্যমে তিনি

বক্তব্য বিষয়কে সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী ক'রে তুলেছেন। এই গ্রন্থে বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা নামগুলোই ব্যবহৃত। অনুবাদের সময় অনেক ক্ষেত্রেই লেখককে নতুন শব্দের সৃষ্টি করতে হয়েছে। ভাষার সৌকর্যের দিকে দৃষ্টি রেখে এই অনুবাদ করায় নামগুলি প্রায় সর্বত্রই হয়েছে শ্রুতিমধুর। কিন্তু ভাষার শ্রুতিমধুরতার দিকে অতিরিক্ত নজর দেওয়ায় বিজ্ঞানের ভাষার যে সাংকেতিকতা ও কাঠিন্য দরকার তা' যায়গায় যায়গায় ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

প্রধানতঃ বালকবালিকাদের উদ্দেশ্যে রচিত জগদানন্দের 'তাপ' গ্রন্থটির কিয়দংশ 'শিশুসাথী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাপবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রাথমিক প্রকৃতির প্রসঙ্গ নিয়ে এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। গাণিতিক প্রসঙ্গও দু'এক যায়গায় আছে। কিন্তু তা' এত সহজ ও প্রাথমিক প্রকৃতির যে অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণেরও বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না।

জগদানন্দ রায়ের 'চুম্বক' অবৈজ্ঞানিক পাঠক সাধারণ ও বালক-বালিকাদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়। ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকে এই গ্রন্থটি নলিনীনাথ রায়ের 'চুম্বক বিজ্ঞান' অপেক্ষা অনেক বেশী উৎকৃষ্ট। এই গ্রন্থে চুম্বকের ধর্ম, শক্তি, চুম্বক প্রস্তুত-প্রণালী, বৈদ্যুতিক চুম্বক, পৃথিবীর চুম্বক শক্তি, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তথ্যের দিক থেকে বিচার করলে এই গ্রন্থটিকে উচ্চাঙ্গের বলা যায় না। কিন্তু রচনাভঙ্গীর সরসতা এবং চুম্বক সম্বন্ধীয় প্রাথমিক তথ্যাদির অতি স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা গ্রন্থটিকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

বাংলা ভাষায় স্থির-বিদ্যুৎকে বিষয়বস্তু ক'রে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করলেন জগদানন্দ রায়। তাঁর 'স্থির-বিদ্যুৎ'-এ স্থির-বিদ্যুতের ধর্ম ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কথা সরল ভাষায় আলোচিত। একেবারে প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ একে বলা যায় না। স্থির-বিদ্যুৎ বা Statical Electricity-র মূল প্রসঙ্গগুলো এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'বৈদ্যুৎ শক্তি' (Potential), 'বৈদ্যুৎ যন্ত্র' (Electrical Machines), 'লীডেন জার' (Leyden Jar) প্রভৃতি নিয়ে আলোচনাও এখানে আছে; কিন্তু লেখক টেক্‌নিক্যালিটি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। স্থির-বিদ্যুতের কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বর্ণনা-পদ্ধতি গল্পের মতো সরস।

জগদানন্দ রায়ের 'চল-বিদ্যুৎ' বাংলা ভাষায় Current বা Voltaic

Electricity সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ।[৩] ইতিপূর্বে প্রকাশিত ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ক কোনো কোনো গ্রন্থে বিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনা থাকতো বটে; কিন্তু বিদ্যুতের মূল তত্ত্বগুলো নিয়ে জগদানন্দ রায়ই সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করলেন। এই গ্রন্থে 'বিদ্যুৎ কোষ', 'বিদ্যুতের শক্তি', 'তাপ ও প্রবাহ' ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছাড়াও বিদ্যুতের ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একেবারে প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ একে বলা যায় না। তবে বর্ণনাভঙ্গীর সরসতার গুণে বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনসাধারণেরও গ্রন্থটি বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। পরিভাষায় প্রধানতঃ বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হলেও বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় যে সকল বিদেশী নাম এদেশে পরিচিত সেগুলোর পরিভাষা গঠন না ক'রে হুবহু সেই শব্দগুলোকেই ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জগদানন্দের মতে বাংলা বিজ্ঞানের পরিভাষা কিরূপ হওয়া উচিত এবং জগদানন্দ নিজে কিরূপ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তা নিয়ে আলোচনা করা চলে।

জগদানন্দ বহু ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের পরিভাষায় চলতি বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'মাছ ব্যাঙ সাপ' নামক গ্রন্থে জীববিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা নামগুলো ব্যবহার করবার সময় লেখক প্রচলিত সহজ নামগুলোই বেছে নিয়েছেন। যেমন, পটকা (Air Bladder), কান্‌কো[৪] (Gill) ইত্যাদি। আবার অনেক ক্ষেত্রে তিনি চলতি বাংলা শব্দকে অবিকৃত অবস্থায় বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'গাছপালা' নামক গ্রন্থে মুট, ঘাস, গুঁড়ি ইত্যাদি চলতি বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পরিভাষায় নতুন শব্দ সৃষ্টি করবার সময় জগদানন্দ সংস্কৃত ভাষার সাহায্য যথাসম্ভব পরিহার ক'রে চলেছেন। তবে পরিভাষা গঠনের সময় সকল ক্ষেত্রেই শব্দের শ্রুতিমধুরতার দিকে অতিরিক্ত নজর দেওয়ায় যায়গায় যায়গায় বিজ্ঞানের ভাষার গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছে। যেমন, 'আলো' নামক গ্রন্থে Interference-এর বাংলা করা হয়েছে 'আলোয় আলোয় অন্ধকার'। যে সকল বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের নাম এদেশে কিছুটা

---

৩ বাংলা ভাষায় চল-বিদ্যুৎ সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ শৈলজাপ্রসাদ দত্ত ও সুনীলকুমার মিত্রের 'বিদ্যুৎ-তত্ত্ব শিক্ষক' (১৯২৮)। কিন্তু এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বিদ্যুতের ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪ 'বৈজ্ঞানিকী'তে এই শব্দটির 'কানকা' নাম ব্যবহৃত। (বৈজ্ঞানিকী-১ম সংস্করণ পৃঃ ১২)।

পরিচিত, জগদানন্দ সেই শব্দগুলোকে যথাসম্ভব অবিকৃত অবস্থায়ই বাংলায় ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'চল-বিদ্যুৎ' নামক গ্রন্থে 'রিওষ্টাট্', 'সণ্ট্স্', 'ট্রান্স্‌ফরমার' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ।

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রয়োগে নিয়মের যে বাঁধাবাঁধি দেখা যায়, জগদানন্দের রচনায় তার একান্ত অভাব। অনেক ক্ষেত্রে একই বৈজ্ঞানিক শব্দকে বোঝাতে জগদানন্দ বিভিন্ন যায়গায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন, বৈজ্ঞানিকীর 'চক্ষু ও আলোক' শীর্ষক প্রবন্ধে Protoplasm-এর বাংলা জগদানন্দ একবার লিখেছেন 'কোষস্থিত জীবসামগ্রী'। আবার, এই গ্রন্থেরই 'ভবিষ্যতের আহার্য' শীর্ষক প্রবন্ধে Protoplasm এই বিদেশী নামটিই তিনি বাংলা হরফে ব্যবহার করেছেন। বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দকে বাংলা বিজ্ঞানে ব্যবহার সম্পর্কে জগদানন্দ রায় মন্তব্য করেছিলেন,

> "জার্ম্মান পণ্ডিতেরা যে-পরিভাষার গঠন করিয়াছেন, ইংরেজ বৈজ্ঞানিকরা তাহা অসঙ্কোচে ব্যবহার করেন ; আবার ইংরেজেরা যে-সকল পরিভাষা রচনা করিয়াছেন, সেগুলিকে ফরাসী, জাপানী বা রুশ বৈজ্ঞানিকেরা ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহা দেখা যাইতেছে। সুতরাং বিশেষ বিশেষ বিদেশী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আমরা কেন আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকে ব্যবহার করিব না, তাহার কোনো হেতু পাওয়া যায় না। সংস্কৃত-ভাষামূলক কটমটো দেশী পরিভাষা বৈদেশিক পরিভাষার চেয়ে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে করি।"[৫]

কিন্তু জগদানন্দের সমগ্র বিজ্ঞানসাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায়, বিদেশী শব্দ বাংলায় ব্যবহার অপেক্ষা সেই সকল শব্দ সহজ ও চলিত বাংলায় অনুবাদের দিকেই তাঁর প্রবণতা ছিল বেশী।

দুই

লেখক হিসাবে যাঁরা জগদানন্দ রায়ের সমসাময়িক, অথচ যাঁদের বিজ্ঞান-সাহিত্যের অধিকাংশই জগদানন্দের সাহিত্য-জীবনের পরবর্তী কালে রচিত,

৫ 'চল-বিদ্যুৎ'—নিবেদন

এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক রবীন্দ্রনাথ বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যকেও সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন।

'বালক', 'সাধনা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানালোচনায় প্রথম উদ্যোগী হন। উল্লিখিত দু'টি পত্রিকারই অধিকাংশ বিজ্ঞান-সংবাদ তাঁর লেখা। রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শে অধিকাংশ সংবাদই এখানে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের প্রথম ধারাবাহিক রচনা বিজ্ঞান-সংবাদকে কেন্দ্র ক'রে।

রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক রচনা 'পাঠপ্রচয়' নামক গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঠপ্রচয়—২য় ভাগের (১৩৩৬) 'সূর্য্যের কথা', 'একটি অপূর্ব্ব বাড়ি', 'বৃষ্টি' এবং ৩য় ভাগের (১৩৩৬) 'রোগশত্রু' ও 'ছায়াপথ'। ছোটদের জন্যে লেখা হলেও রচনাগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্যসমন্বিত এবং সুখপাঠ্য। তবে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান 'বিশ্ব-পরিচয়' (আশ্বিন, ১৩৪৪)। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন এই গ্রন্থটি।

লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-চর্চার উপযোগিতা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। লোকশিক্ষারই উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হোল।[৬] বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ সিরিজের প্রথম গ্রন্থ 'বিশ্ব-পরিচয়'। গ্রন্থটি রচনার ভার প্রথমে পড়েছিল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্তের উপর। প্রমথনাথ বিশ্বপরিচয়ের খসড়া তৈরী ক'রে রবীন্দ্রনাথকে দেখালেন। খসড়ার কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করা আবশ্যক, এই বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-পরিচয়কে নতুন ক'রে লিখবার মনস্থ করলেন। গ্রন্থটি রচনায় রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন প্রমথনাথ সেনগুপ্ত ও ডক্টর বশী সেন। প্রমথনাথ পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। আর ডক্টর বশী সেন দীর্ঘকাল ধ'রে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন।

হিমালয়ের নিভৃত পরিবেশে আলমোড়ায় বসে (১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-পরিচয়ের খসড়া নতুন ক'রে লিখলেন। ঐ সময় বশী সেন কবির কাছে

---

৬ 'রবীন্দ্রজীবনী'—চতুর্থ খণ্ড (১৩৬৩), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৮-৮৯।

ছিলেন। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বাদি নিয়ে অনেক সময় কবি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্ব-পরিচয় রচনা করেন, তখন তিনি জীবনসায়াহ্নে উপনীত। পরিণত বয়সে বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনায় হাত দিলেও বিজ্ঞান-চর্চার প্রস্তুতি তাঁর জীবনে শৈশবকাল থেকেই চলছিল। বিশ্ব-পরিচয়ের ভূমিকা থেকে কবির এই বিজ্ঞানপ্রীতির কথা জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালক-কাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধ করি তখন নয় দশ বছর, মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ দত্ত মহাশয়। আজ জানি তাঁর পুঁজি বেশি ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অতি সাধারণ দুই একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন আমার মন বিস্ফারিত হয়ে যেত।"

'আগুনে বসালে তলার জল গরমে হাল্‌কা হয়ে উপরে ওঠে আর উপরের ঠাণ্ডা জল নিচে নামতে থাকে, জল ফুটতে থাকার এই কারণটা' সেদিনের বালক রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রথম স্থাপিত হোল নিঃস্তব্ধ ডালহৌসী পাহাড়ের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে। পাহাড়ঘেরা নির্জন শৈলাবাসে যখন সন্ধ্যার আলো-আঁধারি ঘনিয়ে আসত, পিতা দেবেন্দ্রনাথ তখন কিশোর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের পরিচয় করিয়ে দিতেন; একে একে বলে যেতেন নক্ষত্রের কথা—গ্রহদের কক্ষপথের কাহিনী, সূর্যপ্রদক্ষিণের কাহিনী। কিশোর রবীন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে শুনতেন সে সব কথা। সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,[৭]

> "সমস্ত দিন ঝাঁপানে ক'রে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাক-বাংলোয়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত।"

৭ বিশ্ব-পরিচয়: ভূমিকা—পৃঃ ।০।

এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা 'জীবন-স্মৃতি'তেও (১৩১৯) রয়েছে।[৮] কিশোর কবির সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই যে প্রথম পরিচয়, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এ পরিচয় ক্রমেই নিবিড় হয়ে উঠল। কবি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইংরেজী বই পড়তে লাগলেন। প্রথমে সুরু করলেন সহজবোধ্য বই দিয়ে। এরপর ক্রমে ক্রমে পড়ে নিলেন অপেক্ষাকৃত দুরূহ বইগুলো। স্যার রবার্ট বল, নিউকোম্বস্, ফ্লামরিয় প্রভৃতির বই তাঁকে আনন্দ দিল। প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে লেখা হাক্স্লির মনোজ্ঞ প্রবন্ধগুলো তাঁকে আকৃষ্ট করল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণিবিজ্ঞান, বিজ্ঞানের এই দু'টি দিকই রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ রচনা করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে। 'বালক' আর 'সাধনা'য় লেখা তাঁর বিজ্ঞান-সংবাদের অধিকাংশই প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে। এ ছাড়া তাঁর কবিতায়ও জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণিবিজ্ঞানের প্রভাবই বিশেষভাবে নজরে পড়ে। মহাকাশ জোড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের উদার ক্ষেত্রে ও চিররহস্যে ঘেরা প্রাণিতত্ত্বের মধ্যে হয়তো বা কবি বিস্ময় আর কল্পনার খোরাক খুঁজে পেয়েছিলেন। বিশ্ব-পরিচয়ের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন,

> "জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণিবিজ্ঞান কেবল এই দু'টি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে।"

বিশ্ব-পরিচয়ের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে পাঁচ দরজা থেকে এর সংগ্রহ"। কবির এই উক্তির কথা স্মরণে রেখেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সব কিছু মিলিয়ে কবি এখানে যা' সৃষ্টি করেছেন, তা' হয়ে উঠেছে প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানসাহিত্য।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে উৎসর্গীকৃত এই গ্রন্থের ভূমিকাটি সবিশেষ মূল্যবান। শ্রুতকীর্তি বৈজ্ঞানিকের কাছে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে কবি এখানে এমন কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছেন, যা' থেকে সমগ্র বিজ্ঞানবিদ্যার প্রতি তাঁর মনোভাবের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানবিদ্যার প্রসারে সাহিত্যের উপযোগিতা ভূমিকার গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে,

৮ জীবন-স্মৃতি (১৩৪৪ সংস্করণ)—পৃঃ ২১।

> "শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই, বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই।"

শিক্ষার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, আজকের দিনে প্রতিটি মানুষেরই বিজ্ঞান-সাধনার অগ্রগতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে কিছু না কিছু ধারণা থাকা দরকার। বিশ্ব-পরিচয়ের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

> "মানুষ সহজ শক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা। প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ ক'রে বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য কেবলি অবারিত করছে। যে সাধনায় এটা সম্ভব হয়েছে তার সুযোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই নেই। অথচ যারা এই সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হোলো তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্তদেশে একঘরে হয়ে রইল।"

বিজ্ঞান-চর্চার মধ্য দিয়ে পরিবর্ধিত হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। জাতীয় জীবনে কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপযোগিতার কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, —

> "বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্ত-ভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও লাভবান হয়েছিলেন। বিশ্ব-পরিচয়ের ভূমিকায় এর স্বীকৃতি রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন, তা'র প্রমাণ পাওয়া যায় বিশ্ব-পরিচয়ে। আলোচ্য গ্রন্থে 'পরমাণুলোক', 'নক্ষত্রলোক', 'সৌরজগৎ', 'গ্রহলোক' ও 'ভূলোক' মোট এই পাঁচটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির মূল্যবান সমাবেশ ঘটেছে এই সকল প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথ সহজ ভাষায় বিজ্ঞানোলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই বলে তত্ত্বের দিক থেকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকে দুর্বল করার সমর্থক তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। এই সম্বন্ধে বিশ্ব-পরিচয়ের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলেছেন,

> "তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ করার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না।"

বস্তুতঃ, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির সুনিপুণ সন্নিবেশ বিশ্ব-পরিচয়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্কতা সত্ত্বেও তথ্য এখানে কোথাও বোঝা হয়ে ওঠে নি। যথাযথ তথ্যসন্নিবেশ রচনার উৎকর্ষতাই এখানে বাড়িয়াছে।

এই গ্রন্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির অতি দ্রুত অবতারণা। একের পর এক রবীন্দ্রনাথ এখানে বৈজ্ঞানিক সত্যকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর ফলে রচনা কোথাও শ্লথ হয়ে পড়ে নি; স্বল্পপরিসরের মধ্যে অতি দ্রুত বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশনের ফলে রচনা এখানে গতিশীল হয়ে উঠেছে। যেমন,

> "শনিগ্রহের পরের মণ্ডলীতে আছে য়ুরেনস নামক এক নতুন-খবর-পাওয়া গ্রহ।
>
> এ গ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু জানা সম্ভব হয় নি। এর ব্যাস পৃথিবীর ৬৪ গুণ বেশী। সূর্য থেকে ১৭৮ কোটি ২৮ লক্ষ মাইল দূরে থেকে সেকেণ্ডে চার মাইল বেগে ৮৪ বছরে একবার তাকে প্রদক্ষিণ করে। এত বড়ো এর আয়তন, কিন্তু খুব দূরে আছে ব'লে দূরবীন ছাড়া একে দেখাই যায় না। যে জিনিসে এ গ্রহ তৈরী তা জলের চেয়ে একটু ঘন, তাই পৃথিবী থেকে ৬৪ গুণ বড়ো হোলেও, এর ওজন পৃথিবীর ১৫ গুণ মাত্র।

১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে এ গ্রহ একবার ঘুরপাক খাচ্ছে। চারিটি উপগ্রহ নিজ নিজ পথে ক্রমাগত একে প্রদক্ষিণ করছে।"

বিশ্ব-পরিচয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর সরল ভাষা। অতি সহজ ভাষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এখানে বৈজ্ঞানিক সত্যকে বাণীবদ্ধ করেছেন ; তবে পরিভাষার ব্যবহারে কোনোরূপ বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলেন নি। বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা সম্বন্ধে তিনি এখানে মন্তব্য করেছেন,

> "বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্বাজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করেই যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।"

বিশ্ব-পরিচয়ের পরিভাষার দিকে তাকালে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যাথার্থ্য নজরে পড়ে। যেমন, Prism-এর বাংলা করা হয়েছে তিনপিঠওয়ালা কাচ। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সহজ পরিভাষার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত হোল বৈদ্যুৎ (electricity), কিরীটিকা (corona), গ্রহিকা (asteroids), ক্ষুব্ধ স্তর (troposphere), স্তব্ধ স্তর (stratosphere) ইত্যাদি।

বিজ্ঞানের ভাষাকে সহজ করবার দিকে লক্ষ্য রাখলেও প্রয়োজনবোধে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী নামই গ্রহণ করেছেন। মৌলিক পদার্থগুলোর বেলায় প্রায় সর্বত্রই বিদেশী নাম ব্যবহৃত। যেমন, অক্‌সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি। কয়েকটি ক্ষেত্রে বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রয়োগও এই গ্রন্থে দেখা যায়। যেমন, পজিটিভ, নেগেটিভ, ইলেকট্রন, প্রোটন, আল্‌ফা, পেনাম্ব্রা ইত্যাদি।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, পরিভাষার খুঁটিনাটি নয়, সাহিত্যরসই বিশ্ব-পরিচয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সুনির্বাচিত উদাহরণ, মনোজ্ঞ ভাষা এবং আশ্চর্য স্বচ্ছ ও গভীর দৃষ্টি নীরস বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বকেও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরসে অভিষিক্ত করেছে। যেমন,

> "অতি-পরমাণুদের দুরন্ত চাঞ্চল্য পজিটিভ নেগেটিভে সন্ধি করে সংযত হয়ে আছে তাই বিশ্ব আছে শান্তি। ভালুকওয়ালা বাজায় ডুগডুগি, তারি তালে ভালুক নাচে, আর নানা খেলা দেখায়।

> ডুগডুগিওয়ালা না যদি থাকে, পোষমানা ভালুক যদি শিকল কেটে স্বধর্ম পায় তা হোলে কামড়িয়ে আঁচড়িয়ে চারদিকে অনর্থপাত করতে থাকে। আমাদের সর্বাঙ্গে এবং দেহের বাইরে এই পোষমানা বিভীষিকা নিয়ে অদৃশ্য ডুগডুগির ছন্দে চলছে সৃষ্টির নাচ ও খেলা। সৃষ্টির আখড়ায় দুই খেলোয়াড় তাদের ভীষণ দ্বন্দ্ব মিলিয়ে বিশ্বচরাচরের রঙ্গভূমি সরগরম করে রেখেছে।"

কোথাও বা সবকিছু ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি। তার দৃষ্টি কোথাও বা সৃষ্টির আদিযুগে সম্প্রসারিত। যেমন, 'ভূলোক' শীর্ষক অধ্যায়ে আদিম পৃথিবীর বর্ণনায়।

সব দিক মিলিয়ে বিচার করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সমগ্র বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের একটি স্বর্ণোজ্জ্বল নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব-পরিচয়'।

তিন

জগদানন্দের সমসাময়িক যুগে যারা লিখতে সুরু করেন, অথচ যাঁদের বিজ্ঞানসাহিত্যের অধিকাংশই জগদানন্দের পরবর্তী যুগে রচিত, এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র চারুচন্দ্র আধুনিক যুগের একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞান-সাহিত্যিক। সরস বর্ণনাভঙ্গী এবং অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে সচেতনতা তাঁর রচনাকে একটি বিশিষ্টতা দান করেছে।

দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে জগদানন্দের সঙ্গে চারুচন্দ্রের কিছুটা মিল রয়েছে। জগদানন্দের মতো চারুচন্দ্রের রচনায়ও পড়েছে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব। যেমন,

> "...বিশ্বমানবের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করিতে ভারতবর্ষ যাহা দিয়াছে, তাহার একটি বিশেষত্ব দেখা যায় এই যে উহা বহুর মধ্যে একের সন্ধানে ফিরিতেছে।
>
> ...বাহিরের শক্তি শুধু জড়ের উপর কিরূপ কার্য্য করে দেখিয়া ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক থামিলেন না, জীবের উপরও উহার ক্রিয়া লক্ষ্য করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে যে ঐক্য, যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত

করিলেন, তাহাতে মানবের চিরদিন-পোষিত জীবনের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।"

(নব্যবিজ্ঞান : পৃঃ ১১০)

মানুষের সীমিত জ্ঞান সম্বন্ধে জগদানন্দের ন্যায় চারুচন্দ্রও বরাবরই সচেতন। যেমন,

"কিন্তু জীবদেহ সৃষ্টি করিতে পারিলেও যে জীবন সৃষ্টি করা হইল না, বিজ্ঞান এ কথা বুঝে এবং ক্ষুদ্র কীটাণুকীটের জীবন-প্রবাহের বৈচিত্র্য দেখিয়া সে আজও বিস্ময়ে আপ্লুত হয় এবং এক বৃহৎ অজ্ঞাত শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া নিজের ক্ষুদ্রত্বে অভিভূত হইয়া পড়ে।"

(নব্যবিজ্ঞান : পৃঃ ১৩)

চারুচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'নব্যবিজ্ঞান' ১৩২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞান বিষয়ক অগ্রগতি নিয়ে এখানে সরস আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি এবং পরবর্তী গ্রন্থ 'বাঙালীর খাদ্য' (১৯২৬) চারুচন্দ্র প্রায় সর্বত্রই বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলো অবিকৃত অবস্থায় বাংলায় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা 'বিশ্বের উপাদান' (১৩৫০) ও 'তড়িতের অভ্যুত্থান' (১৩৫৫)-এ বৈজ্ঞানিক শব্দ বাংলায় অনুবাদের প্রচেষ্টা দেখা যায়।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে কেন্দ্র ক'রে চারুচন্দ্র দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থ দু'টি হোল 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু' (১৯৩৮) ও 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' (১৩৫০)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে জগদীশচন্দ্রের বাল্য-জীবন ও ছাত্রজীবন আলোচনা ক'রে শিক্ষাব্রতী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক জগদীশচন্দ্রের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ হিসাবে গ্রন্থটি মূল্যবান। শেষোক্ত গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার অন্তর্গত। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এবং জড়, জীব ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

চারুচন্দ্রের আর একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ 'বিশ্বের উপাদান' (১৩৫০)। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের উপাদান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের

ধারণা ক্রমশঃ কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, লেখক অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি এবং শক্তি ও তড়িৎ নিয়ে আলোচনা ক'রে তা' দেখিয়েছেন।

পরবর্তী গ্রন্থ 'তড়িতের অভ্যুত্থান' (১৩৫৫)-এ তড়িৎ ও চুম্বকের আবিষ্কার থেকে স্বরু ক'রে মাইকেল ফ্যারাডে পর্যন্ত তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিহাস মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত। চারুচন্দ্রের অপরাপর গ্রন্থাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ব্যাধির পরাজয়' (১৩৫৬), বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্ থেকে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান প্রবেশ', ১ম (১৯৪৯) ২য় (১৯৪৯) ও ৩য় খণ্ড (১৯৫০) ৷ 'পদার্থবিদ্যার নবযুগ' (১৩৫৮) এবং 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী' (১৯৫৩) চারুচন্দ্রের অপর দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

জগদানন্দের সমসাময়িক যুগে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোপালচন্দ্রের ভাষা সরস ও মনোরম। এ ছাড়া তাঁর অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই নিজস্ব গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর ক'রে লেখা। প্রবাসী, প্রকৃতি, বঙ্গশ্রী প্রভৃতি সাময়িক-পত্রের মাধ্যমে তিনি সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। এই সকল পত্র-পত্রিকায় উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর বহু মৌলিক প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখলেও তাঁর অধিকাংশ বিজ্ঞান-গ্রন্থই প্রকাশিত হয় অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। গোপালচন্দ্রের গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'আধুনিক আবিষ্কার' (১৯৪৪), 'বাংলার মাকড়সা' (১৩৫৫) এবং 'ক'রে দেখ'—১ম (১৯৫৩) ও ২য় (১৯৫৬) খণ্ড। বর্তমানে ইনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' (জানুয়ারী, ১৯৪৮) পত্রিকার সম্পাদক।

অতি আধুনিক যুগে কয়েকজন শক্তিমান লেখক বিজ্ঞানালোচনায় অগ্রণী হয়েছেন। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যকে ক্রমেই সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, অতি আধুনিক যুগের বিজ্ঞানালোচনার দিকে লক্ষ্য রেখে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

পরিশিষ্ট

কারিগরী বিজ্ঞান

(চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞান)

কারিগরী বিজ্ঞান

চিকিৎসা, কৃষি, ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞান

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বাংলা ভাষায় কারিগরী বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হোল। বাংলায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় পথপ্রদর্শক ছিলেন প্রধানতঃ ইউরোপীয়েরা। কিন্তু কারিগরী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয়রাও এগিয়ে এলেন। তা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তুলনায় কারিগরী বিজ্ঞান রচনায় ক্রমোন্নতি সাধিত হোল অপেক্ষাকৃত ধীর ও মন্থরগতিতে। কারিগরী বিজ্ঞানের প্রতি দেশীয় জনসাধারণের কৌতূহল সৃষ্টিতে বিলম্বই এর অন্যতম কারণ। এর অপর কারণ হোল, কারিগরী বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদের হস্তক্ষেপ। বিভিন্ন যুগের খ্যাতিমান সাহিত্যিকরা গ্রন্থ লিখেছেন প্রধানতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে। কারিগরী বিজ্ঞানের যান্ত্রিক ও জটিল দিকগুলো এঁদের আকর্ষণ করে নি। এর ফলে স্বভাবতঃই বিজ্ঞানের এই অপেক্ষাকৃত নীরস দিকটি সঙ্গত কারণেই আরও নীরস ও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

এক

কারিগরী বিজ্ঞানের মধ্যে সর্বাগ্রে রচিত হোল চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতি দেশীয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে লাগল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বৈদ্য নিন্দা'য় দেশীয় প্রাচীন পদ্ধতির চিকিৎসাপ্রণালীকে নিন্দা করা হোল।[১] ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হোল রামকমল সেনের 'ঔষধ সার সংগ্রহ'। এই গ্রন্থে ৫৬টি ঔষধের নাম, উদ্ভব, উপকার ও প্রয়োগপদ্ধতি বর্ণিত হোল।

এদিকে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি ভার্ণাকুলার মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল।[২] এর ফলে মেডিক্যাল শিক্ষার প্রতি এদেশের কোনো

১ A Descriptive Catalogue of Bengali Works (1855) : Rev. J. long.

২ Transactions of the First Indian Medical Congress (1895) :— PP.4-5.

কোনো শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হোল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। ডাঃ ব্রিটন-এর লেখা 'ওলাওঠা বিবরণ' (১৮২৬) নামক গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত হোল। ডাঃ ব্রিটন ইতিপূর্বে 'Vocabulary of Medical Terms' নামে সংস্কৃত, পার্শী ও বাংলায় আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই সময়ে আয়ুর্বেদ থেকে বিষয়বস্তু নিয়েও কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের[৩] লেখা 'রত্নাবলী'।[৪] এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হোল কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তৎকালীন চিকিৎসা বিদ্যালয়-গুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে এবং ভারতে প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতির সংশোধন ও উন্নতি করবার জন্যে একটি কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটি ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতি বাতিল করে প্রাচীন রীতিতে চিকিৎসা-বিদ্যার ক্লাশ অবিলম্বে বন্ধ করবার কথা জানালেন। তাঁরা সুপারিশ করলেন, ভারতীয়দের জন্যে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হোক এবং ঐ প্রতিষ্ঠানে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হোক।[৫] শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজী, হিন্দুস্থানী বা বাংলা ভাষা। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কমিটির সুপারিশের প্রায় সবটাই গ্রহণ করলেন। কেবলমাত্র শিক্ষার মাধ্যম হোল ইংরেজী ভাষা। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হোল। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে দেশীয় জনসাধারণের মনে আগ্রহের সঞ্চার হয়। মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবসে ডাঃ ব্রাম্লী (Dr. Bramly) যে বক্তৃতা দেন, তার মর্মার্থকে বিষয়বস্তু ক'রে প্রকাশিত হোল 'ব্রাম্লী বক্তৃতা' (Bramly Baktrita—1836)। গ্রন্থটি জনসমাদর লাভ করেছিল। এই সময়ে এদেশীয়রাও পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞান রচনায় উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করলেন। এই

৩ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। গ্রন্থটির নাম 'প্রাণকৃষ্ণৌষধাবলী'। এতে আয়ুর্বেদ, তন্ত্র, ইংরেজী ও হাকিমী চিকিৎসাপদ্ধতি স্থান পেয়েছে। ১২৯৪ সালে গ্রন্থটির ৮ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৪ A Descriptive Catalogue of Bengali Works (1855) : Rev. J. long.

৫ Centenary of Medical College Bengal (1835-1934) PP. 7-9.

প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, মেডিক্যাল কলেজের বাংলা বিভাগের অস্থি-বিদ্যার অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্তের নাম। মধুসূদন গুপ্ত প্রণীত 'লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় ঔষধকল্পাবলী'র (১৮৪৯) বিষয়বস্তু 'The London Pharmacopœia' (1836) থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হয়। 'The London Pharmacopœia' ইতিপূর্বে হিন্দীতে অনুবাদিত হয়েছিল। হিন্দী অনুবাদের ন্যায় লেখক এখানেও বিভিন্ন ঔষধের ইংরেজী ও লাটিন নাম আগে দিয়েছেন। পরে ঐ সকল ঔষধের নাম বাংলায় দিয়েছেন। যে সকল দ্রব্যের নাম বাংলায় নেই, সেগুলোর বিদেশী নামই ব্যবহার করা হয়েছে। যায়গায় যায়গায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। সংস্কৃতে মধুসূদন গুপ্তের পাণ্ডিত্য ছিল। কিছুকাল ধরে তিনি গভর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কলেজের ঔষধবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে মধুসূদন গুপ্ত বিভিন্ন ঔষধ ও তাদের রাসায়নিক উপাদানের প্রস্তুত প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। মধুসূদনের রচনা দুর্বোধ্য প্রকৃতির। ভাষা অনুবাদগন্ধী ও শ্রুতিকটু। ছেদচিহ্নের ব্যবহারও যথাযথ নয়।

মধুসূদন গুপ্তের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি গ্রন্থ 'চিকিৎসা-সংগ্রহ' ঔষধকল্পাবলীর কিছুকাল পরে প্রকাশিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আরও দু'একজন লেখক পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞান রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পি. কুমার ও এস. সি. কর্মকারের নাম। মেডিক্যাল কলেজের বাংলা ক্লাশের ঔষধবিজ্ঞানের অধ্যাপক পি. কুমারের 'ঔষধব্যবহারক' ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রেষ্ঠ কয়েকজন ইংরেজ লেখকের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ থেকে এ বইটির বিষয়বস্তু বাংলায় অনুবাদিত হয়েছিল। এস. সি. কর্মকারের 'ঔষধ প্রস্তুত বিদ্যা' ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে প্রাচ্য চিকিৎসাবিদ্যা (আয়ুর্বেদ) নিয়েও অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতি বর্ণিত হোল রোজারিও এণ্ড কোম্পানী থেকে প্রকাশিত 'Bachelor's Medical Guide' (১৮৫৪)-এ।

এদিকে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ থেকে মেডিক্যাল কলেজে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। অতএব প্রয়োজনের তাগিদেই এই সময় থেকে বাংলা ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক

রচিত হতে লাগল। এ ছাড়া জনসাধারণের পাঠোপযোগী চিকিৎসাবিজ্ঞান রচনায়ও উন্নতি পরিলক্ষিত হোল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান দিক—অস্ত্রচিকিৎসা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, বালকচিকিৎসা, ধাত্রীবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব, ঔষধবিজ্ঞান ও অসুখবিশেষের চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেল।

এই যুগে বাংলা ভাষায় অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখলেন রাজনারায়ণ দাস। রাজনারায়ণ প্রণীত 'সর্জ্জরী অর্থাৎ অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালী'[৬] অসম্পূর্ণ প্রকৃতির গ্রন্থ হলেও এতে যায়গায় যায়গায় অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। রচনাভঙ্গী দুরূহ প্রকৃতির। চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী শব্দ এখানে বাংলা হরফে ব্যবহৃত।

অস্ত্রচিকিৎসার সমগ্র নিয়মাবলী নিয়ে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্তের। কাশীচন্দ্রের 'অস্ত্র-চিকিৎসা প্রণালী' ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্ত গভর্ণমেণ্টের ভ্যাক্‌সিনেশন বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি এই গ্রন্থটি লেখেন মেডিক্যাল কলেজের বাংলা ক্লাশের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে। এই গ্রন্থের সর্বত্রই চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী নামের পাশে দেশীয় নাম দেওয়া আছে। কিন্তু কাশীচন্দ্রের পরবর্তী গ্রন্থ 'অপ্‌থ্যাল্‌মিক সার্জরি অর্থাৎ অক্ষিতত্ত্ব'-তে (১৮৭৭) দৃষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী শব্দ বাংলা হরফে ব্যবহৃত। এই গ্রন্থে চোখের গঠন, চোখ পরীক্ষা করার রীতি, বিভিন্ন প্রকার চক্ষুরোগ ও তাদের পরীক্ষার কথা বিস্তারিতভাবে আলোচিত। কাশীচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গী প্রাঞ্জল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের গোড়া থেকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, শিবচন্দ্র দেব সংগৃহীত 'শিশুপালন—১ম ভাগ' (১৮৫৭)। শিশুপালন সম্বন্ধে হিন্দুনারীদের অজ্ঞতা দূর করবার জন্যেই লেখক এই গ্রন্থটি রচনা করেন। Andrew Combe-এর 'Treatise on the Physiological and Moral Management of Infancy' নামক বই থেকে শিশুপালনের বিষয়বস্তু সংগৃহীত

৬ গ্রন্থটির একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিটি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লেখা। তবে অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালী পরে ছাপা হয়েছিল বলে মনে হয়। পরবর্তী অস্ত্রচিকিৎসাবিজ্ঞান-লেখক কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্ত তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এই গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন।

হয়েছিল। তবে তুরূহতা এড়াবার উদ্দেশ্যে Andrew Combe-এর বইটির কিছু কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়। কি কি কারণে শিশুদের রোগ ও মৃত্যু হয়ে থাকে এবং কিভাবে শিশুদের লালন-পালন করতে হয়, আলোচ্য গ্রন্থে তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। শিবচন্দ্রের ভাষা বেশ সরল। শিশুপালন জনসমাদর লাভ করেছিল। সংশোধিত আকারে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে।

এই সময়ে রচিত স্বাস্থ্য বিষয়ক কোনো কোনো গ্রন্থে শাস্ত্রীয় তথ্যাদির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। গৌরীনাথ সেন প্রণীত 'শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান' (১২৬৯) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেখকের যুগের দেশ, কাল ও পাত্রাদির দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হলেও গ্রন্থটির আগাগোড়া সংস্কৃত গ্রন্থেরই প্রভাব। প্রকাশভঙ্গীতে জড়ত্ব গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি।

উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও রচিত হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'স্বাস্থ্য-রক্ষা' (১৮৬৪) ও ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'শরীর পালন' (১৮৬৮)।

উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম দশকে বালকচিকিৎসা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য প্রসন্নকুমার মিত্রের 'বালচিকিৎসা' (১৮৬২)। এই পর্যায়ের পরবর্তী গ্রন্থকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মির আসরফ্ আলি ও হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। মির আসরফ্ আলির 'বাল-চিকিৎসা' ১২৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখক কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রী-চিকিৎসা ও শিশু-চিকিৎসার অধ্যাপক ছিলেন। বালকচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের অভাব দূর করবার জন্যে এবং বালকদের অকালমৃত্যু রোধ করবার উদ্দেশ্যে লেখক এই গ্রন্থটি রচনা করেন। মেডিক্যাল স্কুলের বাংলা শ্রেণীর ছাত্র এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ইংরেজী বই থেকে বাল-চিকিৎসার বিষয়বস্তু সংকলিত হয়। যে সকল পীড়ায় আমাদের দেশের বালকরা সচরাচর আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাদের নিয়েই এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে শিশুদের স্বাস্থ্য ও শারীরবিজ্ঞান এবং বিভিন্ন প্রকার শিশু-রোগ ও তাদের প্রতিকার নিয়ে আলোচনা বেশ প্রাঞ্জল। গ্রন্থটির সর্বত্রই ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা প্রতিশব্দও ব্যবহৃত।

বালকচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের আর একজন উল্লেখযোগ্য লেখক ডাঃ হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লেখা 'বালচিকিৎসা'[৭] ১ম খণ্ড পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। এতে শিশুদের স্নায়ুরোগ, চক্ষু-রোগ, কর্ণ ও চর্মরোগ এবং অঙ্গবিকৃতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা রয়েছে। মির আসরফ্ আলির গ্রন্থের তুলনায় এ বইটি অনেক বেশী বিস্তৃত ও তথ্যবহুল। তবে হরিনারায়ণের ভাষা একেবারেই নীরস ও শ্রুতিকটু।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাংলা ভাষায় ধাত্রীবিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হোল। বাংলায় ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার পথপ্রদর্শক ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'ধাত্রী-শিক্ষা এবং প্রসূতি-শিক্ষা'র ১ম ও ২য় খণ্ড যথাক্রমে ১২৭৪ ও ১২৭৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে দুই খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। আলোচ্য গ্রন্থে কথোপকথনের মাধ্যমে ধাই ও প্রসূতিদের প্রতি উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

বাংলা ভাষায় ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের পরবর্তী লেখক 'চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব' রচয়িতা ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। গঙ্গা-প্রসাদের 'মাতৃশিক্ষা' ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৮] গ্রন্থটির পরিকল্পনায় হুবহু পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুকরণ করা হয় নি। এদেশীয় আবহাওয়া ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি লেখা।

এই সময়ে ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকও রচিত হতে দেখা গেল। মেডিক্যাল স্কুলের বাংলা ক্লাশের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লেখা ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীরের 'মানব-জন্মতত্ত্ব, ধাত্রীবিদ্যা, নবপ্রসূত শিশু ও স্ত্রীজাতির ব্যাধি-সংগ্রহ' (২য় সংস্করণ—১৮৭৮) একটি বিরাট গ্রন্থ।

অস্ত্রচিকিৎসা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, বালক-চিকিৎসা ও ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলো নিয়ে এই যুগে গ্রন্থ রচিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দুই খণ্ডে লেখা ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

---

৭ হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত চিকিৎসা' (১৮৭৬) নামে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন।

৮ সংশোধিত আকারে 'মাতৃশিক্ষা'র ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে। সংশোধন ও সম্পাদনা করেন লেখকের পুত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

'চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব'। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড[৯] ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। চিকিৎসক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লেখা এই বিরাট গ্রন্থের ২য় খণ্ডে এদেশে প্রচলিত পীড়াগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির নূতনত্ব হোল, চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল সংস্কৃত নাম পীড়ার নিদানতত্ত্বের সঙ্গে অসংলগ্ন নয়, সেই সকল নাম প্রয়োজনবোধে লেখক গ্রহণ করেছেন। বাংলা ভাষায় পীড়ার এই নতুন নামগুলো ব্যবহার করবার সময় লেখক উইলিয়াম্‌স্‌, উইল্‌সন, বেন্‌ফি, কোল্‌ব্রুক প্রভৃতি মনীষীদের ইংরেজী-সংস্কৃত ও সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান এবং রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম থেকে সাহায্য নিয়েছেন।

বিভিন্ন ঔষধ ও এদের প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে পাশ্চাত্য মতে গ্রন্থ লিখলেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ দুর্গাদাস কর। এই লেখকের 'ভৈসজ্য রত্নাবলী'[১০](১২৭৪) মেডিক্যাল কলেজের বাংলা ক্লাশের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। দুর্গাদাস কর পাশ্চাত্য মতে ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন সম্বন্ধে 'ভিষগ্বন্ধু' নামে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে তাঁর পুত্র দুর্গাদাস করের উদ্যোগে ১২৭৮ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

বিশেষ কোনো অসুখের চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত করলেন অমৃতলাল ভট্টাচার্য। অমৃতলালের 'জ্বর-চিকিৎসা' (১৮৭৮) ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের গোড়া থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থ রচিত হোল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক-পত্র ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত হয় নি। অবশ্য ইতিপূর্বে আয়ুর্বেদ নিয়ে কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।[১১]

বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম

৯ ১ম খণ্ড পাওয়া যায় না।

১০ পরে দুর্গাদাস করের পুত্র রাধাগোবিন্দ কর কর্তৃক গ্রন্থটি পরিবর্ধিত ও পুনর্লিখিত হয়ে প্রকাশিত হয়। পরিবর্ধিত চতুর্দশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালে।

১১ 'আয়ুর্বেদ দর্পণঃ' (জুন, ১৮৪০), 'চিকিৎসা রত্নাকর' (১৮৫৩) ও 'আয়ুর্বেদ পত্রিকা'র (১৮৬৩) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সাময়িক-পত্রের নাম 'চিকিৎসক'। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হতে লাগল বটে, কিন্তু প্রাচ্য চিকিৎসাপদ্ধতির আলোচনা কমবেশী পরিমাণে অধিকাংশ চিকিৎসা-পত্রিকায়ই থাকত। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চিকিৎসা সংগ্রহ' (আশ্বিন, ১২৭৬)। এই পত্রিকায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের চিকিৎসাপ্রণালী, শারীরবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব, অস্ত্রচিকিৎসা ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছাড়াও এতে চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন ইংরেজী সাময়িক-পত্র ও গ্রন্থ থেকে অনুবাদ ও উদ্ধৃতি প্রকাশিত হোত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক অনেকগুলো সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চিকিৎসা দর্পণ' (বৈশাখ, ১২৭৮)। পত্রিকাটি চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত হয়।[১২] এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ডাঃ হরিশ্চন্দ্র শর্মা সম্পাদিত 'অণুবীক্ষণ' (শ্রাবণ, ১২৮২)। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ছাড়াও এতে পদার্থবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সুচিন্তিত রচনাদি প্রকাশিত হোত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হোল। তা' ছাড়া এই সময়কার চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো গ্রন্থেও নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। এই সময়ে খাদ্যবিজ্ঞান, শুশ্রূষা বা নার্সিং নিয়ে গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হোল। তা' ছাড়া অসুখবিশেষ ও অঙ্গবিশেষের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব ও ঔষধবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে অভিনবত্বের পরিচয় মিলল। এই যুগে অবনতি ও দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া গেল অস্ত্রচিকিৎসা, বালক-চিকিৎসা ও ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে অসুখবিশেষ নিয়ে আলোচনার পরিধি বিস্তৃততর হোল। এই যুগে বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ নিয়ে গ্রন্থ

১২ ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় 'চিকিৎসা কল্পদ্রুম' (১২৮৫) নামে আর একটি চিকিৎসা পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। (বাংলা সাময়িক-পত্র—২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ—পৃঃ ২৬)।

রচিত হতে দেখা গেল। অসুখবিশেষ নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য গৃহস্থ ও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে লেখা ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সরল জ্বর চিকিৎসা'। গ্রন্থটি তিন ভাগে ১২৮৭ থেকে ১২৯১ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অমৃতলাল ভট্টাচার্যের 'জ্বর-চিকিৎসা'র তুলনায় এই গ্রন্থটি অনেক বেশী প্রাঞ্জল ও তথ্যসমৃদ্ধ।

জ্বর-চিকিৎসা ছাড়াও কয়েকটি সংক্রামক রোগ নিয়ে এই সময়ে গ্রন্থ রচিত হোল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বসন্তরোগ ও টীকা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, শেরপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার হরচরণ সেনের 'ব্যাকসিনেশন এবং বসন্ত রোগের সহজ চিকিৎসা' (১২৮৮), এদেশীয় টীকাদারদের উদ্দেশ্যে লেখা শ্রীধর দাসগুপ্তের 'সংক্ষিপ্ত ভ্যাকছিনেশন পদ্ধতি' (১৮৯১) এবং গভর্ণমেণ্ট ভ্যাক্সিনেশন বিভাগের কর্মচারী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভ্যাক্সিনেশন দর্পণ ও সরল বসন্ত চিকিৎসা' (১৩০১)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে প্লেগ রোগের ইতিহাস, লক্ষণ ও উপসর্গ এবং চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রাধাগোবিন্দ করের 'প্লেগ' (১৮৯৮) এবং অমৃতকৃষ্ণ বসুর 'প্লেগ-তত্ত্ব' (১৮৯৯)। এই যুগে অঙ্গবিশেষের চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে গ্রন্থ লিখলেন ডাঃ ফজলুর রহমান। তাঁর লেখা 'বক্ষঃপীড়া'য় (১৮৮৬) শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধীয় পীড়ার কথা বর্ণিত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে প্রকাশিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা। তবে কয়েকটি স্কুলিখিত পাঠ্যপুস্তকও এই সময়ে প্রকাশিত হয়। সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রনাথ বসুর 'গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি' (১২৯৪) এবং ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের 'স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান' (১৮৯৬)। দু'টি গ্রন্থই সরল ভাষায় লেখা। শেষোক্ত গ্রন্থে ব্যক্তিগত ও সাধারণ—উভয় প্রকার স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

এই যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিয়ে লেখা অধিকাংশ গ্রন্থেই এলোপ্যাথিক, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথিক ও হাকিমী—সর্বপ্রকার চিকিৎসা-পদ্ধতি বর্ণিত। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অম্বিকাচরণ

গুপ্তের[১৩] 'চিকিৎসা-তত্ত্ব-বারিধি' (১২৯৫) ও 'চিকিৎসা-তত্ত্ব-কৌমুদী' (১২৯৯), রামচন্দ্র মল্লিকের 'বিশ্বচিকিৎসক' (১২৯৬), দ্বারকানাথ বিদ্যারত্নের 'চিকিৎসা-রত্ন—১ম খণ্ড' (১২৯৬), নফরচন্দ্র দত্ত সংগৃহীত 'চিকিৎসা কল্পতরু—১ম ভাগ' (১৮৯২) ইত্যাদি।

এ ছাড়া এই সময়কার বহু গ্রন্থে পাশ্চাত্য-চিকিৎসার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে যায়গায় যায়গায় প্রাচ্য চিকিৎসাপদ্ধতিও বর্ণিত হোল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শশিভূষণ ঘোষালের 'চিকিৎসা, ১ম খণ্ড' (১৮৯৫), চুনিলাল দাসের 'চিকিৎসা-বিধান' (১৮৯৫) ও রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের 'চিকিৎসা-প্রণালী'—নূতন সংস্করণ (১৩০৬)। অভিনব প্রকৃতির একটি গ্রন্থ হোল কথোপকথনের মাধ্যমে লেখা কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেন ও ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের 'কবিরাজ-ডাক্তার সংবাদ' (১৮৯২)। কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানকে এখানে পাশাপাশি দেখান হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে লেখা অধিকাংশ গ্রন্থেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতিই আলোচিত হোল বটে ; তবে এই সময়ে পুরোপুরি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেও কয়েকটি সর্বজনবোধ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রামচন্দ্র মল্লিকের 'পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান—১ম ভাগ' (১২৯৩) ও ডাঃ নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক চিকিৎসাবিধান—১ম ভাগ' (২য় সংস্করণ, ১৮৮৯)।

এই যুগে ঔষধবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের পরিকল্পনার পরিধি বিস্তৃততর হোল। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া অবলম্বনে দু'টি বিরাট গ্রন্থ লিখলেন ডাঃ ভোলানাথ বসু ও ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর। কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ডাঃ ভোলানাথ বসুর 'ভৈষজ্য তত্ত্ব' (১৮৯৩) নামক গ্রন্থে বিভিন্ন ঔষধের প্রয়োগ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করা হোল। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া অবলম্বনে ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর[১৪] লিখলেন 'সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব বা মেটিরিয়া মেডিকা সার-সংগ্রহ' (২য় সংস্করণ, ১৮৯৭)।

---

১৩ অম্বিকাচরণ গুপ্ত সংগৃহীত আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'চিকিৎসক' (১২৯৬)। এতে বিভিন্ন প্রকার রোগের ঔষধব্যবস্থা বর্ণিত।

১৪ ঔষধবিজ্ঞান নিয়ে লেখা ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের আর একটি বিরাট গ্রন্থ 'ভিষক-সুহৃদ' (৪র্থ সংস্করণ, ১৮৯৫)।

বালকচিকিৎসা বা ধাত্রীবিজ্ঞান নিয়ে এই যুগে উল্লেখযোগ্য কোনো গ্রন্থ নেই। অস্ত্রচিকিৎসা নিয়েও সর্বজনবোধ্য কোনো গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা এই সময়ে দেখা গেল না। তবে কদাচিৎ অস্ত্রচিকিৎসা নিয়ে পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশিত হোল। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ জহিরুদ্দিন আহ্‌মদের লেখা 'অস্ত্র-চিকিৎসা বা সার্জ্জারী'[১৫] (২য় সংস্করণ, ১৮৯৩) নামক গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী শব্দকে সরল বাংলায় অনুবাদের প্রচেষ্টা দেখা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা ভাষায় খাদ্যবিজ্ঞান এবং শুশ্রূষা বা নার্সিং বিষয়ক গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হোল। খাদ্য সম্বন্ধে বাংলায় প্রথম গ্রন্থ ভুবনচন্দ্র বসাকের 'খাদ্যবস্তুর দ্রব্যগুণ' (১৮৮৫)। এই গ্রন্থে এদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আহার্য দ্রব্যের স্বাদ, উপকারিতা ও অপকারিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র উল্লেখ ক'রেই লেখক ক্ষান্ত হয়েছেন। ফলে কোনোরূপ সাহিত্যরস এতে দানা বাঁধতে পারে নি।

বাংলা ভাষায় খাদ্য বিষয়ক প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লিখলেন ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দেবেন্দ্রনাথের 'খাদ্য-বিচার' (১২৯৭) নামক গ্রন্থে ইংরেজী ও আয়ুর্বেদ মতে দেশীয় খাদ্যের দোষগুণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'খাদ্য-বিচার' বিভিন্ন সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—খাদ্য সম্বন্ধে উভয় দেশীয় মতবাদই এখানে আলোচিত; তবে প্রাচ্য মতেরই প্রাধান্য। প্রকাশভঙ্গীতে জড়ত্ব গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত শুশ্রূষা বা নার্সিং বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা। ডাঃ ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের[১৬] 'শুশ্রূষা-প্রণালী'তে (১৩০৩) রোগী-পরিচর্যা সম্বন্ধে সর্বজনবোধ্য আলোচনা

১৫ 'অস্ত্রচিকিৎসা বা সার্জ্জারী' সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় (২য় সংস্করণের ভূমিকা)।

১৬ 'শুশ্রূষা-প্রণালী'র ভূমিকা থেকে জানা যায়, ডাঃ ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে 'স্বাস্থ্যকৌমুদী', 'সন্তান-সুহৃদ', 'স্বাস্থ্যসোপান', 'স্বাস্থ্যশিক্ষা', চিকিৎসাঙ্কুর' প্রভৃতি আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছিলেন।

পাওয়া গেল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে শুশ্রূষাবিজ্ঞান নিয়ে সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্যামাচরণ দে'র 'শুশ্রূষা—১ম ভাগ' (১৮৯৭) এবং ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের 'রোগি-পরিচর্য্যা' (১৮৯৭)।

খাদ্যবিজ্ঞান ও শুশ্রূষা বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি সাময়িক-পত্রের পরিকল্পনায় নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চিকিৎসাদর্শন'-এর (বৈশাখ ১২৯৪) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকায় দেশবিদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদাদি এবং চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকার সারমর্ম নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত। এই সময়কার কোনো কোনো চিকিৎসাপত্রে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরা প্রবন্ধ লিখলেন। এদের রচনায় সর্বজনবোধ্য ভাষার মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের তথ্যাদি পরিবেশিত হোল। এর ফলে বাংলা চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের উৎকর্ষতা সাধিত হোল। এই উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় ডাঃ জহিরুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 'ভিষক্-দর্পণ' (জুলাই, ১৮৯১) পত্রিকায়। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, ডাঃ নীলরতন সরকার প্রমুখ খ্যাতনামা চিকিৎসকরা এতে লিখতেন। পত্রিকা-পরিকল্পনায় অভিনবত্ব ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলা ভাষায় প্রথম স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'স্বাস্থ্য' (কার্ত্তিক, ১৩০৪) প্রকাশিত হোল। পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত। 'স্বাস্থ্য'-তে প্রধানতঃ পাশ্চাত্য তথ্যাদিই স্থান পেত। তবে যায়গায় যায়গায় এতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশীয় মতবাদও বর্ণিত হয়েছিল।

দেশীয় মতবাদের প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক-পত্রের ন্যায় এই সময়কার সাময়িক-পত্রেও দেখা গেল। এই যুগের কয়েকটি পত্রিকায়ই এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজী ও হাকিমী—সর্বপ্রকার চিকিৎসাপদ্ধতি স্থান পেল। এই প্রসঙ্গে ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীর ও অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন সম্পাদিত 'চিকিৎসা-সম্মিলনী' (বৈশাখ, ১২৯১), 'চিকিৎসা লহরী' (বৈশাখ, ১২৯৭), এবং ডাঃ সত্যকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত 'চিকিৎসক ও সমালোচক' (মাঘ, ১৩০১) ইত্যাদি পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল পত্র-পত্রিকা ছাড়াও এই যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক আরও কয়েকটি সাময়িক-পত্র

প্রকাশিত হয়।[১৭] অভিনবত্বের পরিচয় মেলে বিনোদবিহারী রায় সম্পাদিত 'চিকিৎসক' (মাঘ, ১২৯৬) নামক পত্রিকায়। মূলতঃ আয়ুর্বেদ পত্রিকা হ'লেও অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে 'উত্তমোত্তম ব্যবস্থা সংগ্রহ' ক'রে 'আয়ুর্ব্বেদের পুষ্টিবর্দ্ধন' করা এর উদ্দেশ্য ছিল।

বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কয়েকটি সাময়িক-পত্র ছাড়াও চিকিৎসাবিদ্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু সর্বজনবোধ্য গ্রন্থ রচিত হোল। অস্ত্র-চিকিৎসা, চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, ঔষধবিজ্ঞান ও শুশ্রূষা বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় এই যুগে অবনতি ঘটল বটে, তবে উন্নতির পরিচয় পাওয়া গেল ধাত্রী-বিজ্ঞান ও শিশুচিকিৎসা, অসুখবিশেষের চিকিৎসা এবং খাদ্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থ রচনায়।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বালকচিকিৎসা ও ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার সূচনা হয়েছিল বটে; তবে এই শতাব্দীরই শেষদিকে এই শ্রেণীর গ্রন্থ-রচনায় ভাটা পড়ে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ধাত্রীবিজ্ঞান, বালকচিকিৎসা ও শিশুপালন বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হ'তে লাগল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের লেখা 'সরল ধাত্রী-শিক্ষা' (১৩০৮)। ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ধাত্রী-শিক্ষা এবং প্রসূতি-শিক্ষা'র তুলনায় এই গ্রন্থটি যুগোপযোগী ক'রে লেখা। অল্প-শিক্ষিত স্ত্রীলোকদের বোধগম্য করবার উদ্দেশ্যে আলোচ্য বিষয়বস্তু এখানে কথোপকথন ও গল্পের মাধ্যমে বর্ণিত। সরল ধাত্রী-শিক্ষা চলতি ভাষায় লিখিত হয়েছিল।

শিশুচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'চিকিৎসা-প্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ হালদার সংকলিত 'প্রসূতি ও শিশু-চিকিৎসা' (১৩১৬), ঢাকা ইডেন হাই স্কুলের হাইজিন্ লেকচারার এন. ই. কলিন্স্ লিখিত 'শিশুপালনের উপদেশ' (১৯১৮) এবং স্ত্রীলোকদের উদ্দেশ্যে লেখা জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'সন্তান-পালন' (১৩০৮) ইত্যাদি।

---

১৭ এই সকল পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আশু চিকিৎসা পদ্ধতি' (বৈশাখ, ১২৯৮), 'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ' (আশ্বিন, ১৩০০), 'মেডিক্যাল ইণ্টেলিজেন্সার' (বৈশাখ, ১৩০২), 'নব চিকিৎসা বিজ্ঞান' (আশ্বিন, ১৩০৫), 'মেডিকেল জার্ণাল' (বৈশাখ, ১৩০৬) ইত্যাদি।

বিংশ শতাব্দীতে জ্বর এবং সংক্রামক রোগ নিয়ে গ্রন্থ রচনায় জোয়ার এল। সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ সম্বন্ধে দেশীয় জনগণের সচেতনতাই এর মূল কারণ। ম্যালেরিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কালাজ্বর প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি নিয়ে এই যুগে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়। ম্যালেরিয়া নিয়ে লেখা গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজকৃষ্ণ মণ্ডলের 'বঙ্গে ম্যালেরিয়া' (১৩১৫) এবং ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর 'ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ ও আত্ম-চিকিৎসা' (১৩৩২)। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি লেখকের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। বৈজ্ঞানিক তথ্যের স্বল্পতা এর প্রধান ত্রুটি। ডাঃ বসুর গ্রন্থে ম্যালেরিয়ার প্রকৃতি ও প্রতিবিধান সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও সারগর্ভ।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে গ্রন্থ লিখলেন বাংলার স্যানিটারী কমিশনার ডাঃ চার্লস. এ. বেণ্ট্‌লী। ডাঃ বেণ্ট্‌লীর 'ইনফ্লুয়েঞ্জা'য় (১৯২০) অতি সংক্ষেপে এই রোগের কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কালাজ্বর বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কালাজ্বর চিকিৎসা' (১৩৩১) ও ডাঃ অনিলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'কালাজ্বর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা' (১৯২৪)। শেষোক্ত গ্রন্থটি ডাঃ মুইর, ডাঃ ব্রহ্মচারী প্রমুখ খ্যাতনামা চিকিৎসকদের মতবাদ অবলম্বনে লেখা।

বিংশ শতাব্দীতে কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক রোগ নিয়ে গ্রন্থ রচনায়ও প্রবণতা দেখা গেল। কলেরা বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ হালদারের 'কলেরা চিকিৎসা' (১৩১৫), ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সচিত্র কলেরা চিকিৎসা' (১৩৩০) এবং অভয়কুমার সরকারের 'ওলাওঠা রোগের চিকিৎসা ও প্রতিকার' (১৩৩৫)। সব কয়টি গ্রন্থই পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা।

বসন্তরোগ ও টীকা নিয়ে লেখা সর্বজনবোধ্য দু'টি গ্রন্থ হোল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'পাবলিক ভ্যাকসিনেটার্স গাইড' (১৯২১) ও ডাঃ অভয়কুমার সরকারের 'বসন্তরোগ ও তাহার চিকিৎসা' (১৯২৫)। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর ক'রে লেখা।

সংক্রামক রোগ নিয়ে লেখা আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার' (১৩৩৬)। এতে যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে যাবতীয় প্রসঙ্গ সরল ভাষায় আলোচিত।

বিশেষ বিশেষ সংক্রামক রোগ ছাড়াও সাধারণভাবে সংক্রামক রোগ নিয়ে

এই যুগে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর[১৮] 'সংক্রামক রোগ' (১৩৩১) এবং ডাঃ অনিলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধতত্ত্ব'—১ম ও ২য় খণ্ড (১৩৩৪)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে কলেরা, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থে রোগ-সংক্রমণ ও বিভিন্ন রোগ সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ প্রকৃতির।

বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসাগ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল খাদ্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থে। এই শ্রেণীর গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্যই এই উৎকর্ষতার মূল কারণ। খাদ্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য চুণীলাল বসুর অবদান।

চুণীলাল বসুর 'খাদ্য' বাগবাজার সাহিত্যসভার গ্রন্থ-প্রচার বিভাগ থেকে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-সভার অধিবেশনে এবং রাঁচী ইউনিয়ন ক্লাবে এই গ্রন্থটির অধিকাংশ বিষয় পাঠ করা হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থে স্বাস্থ্যের সঙ্গে খাদ্যের সম্বন্ধ আলোচনার পর খাদ্য কি তা' বুঝিয়ে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, পরিপাক প্রণালী, উপাদান ও গুণ এবং নিত্যব্যবহার্য খাদ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। খাদ্য সম্বন্ধে এরূপ মনোজ্ঞ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে বিরল। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সম্পর্কে দেশীয় লোকের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত। লেখক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা ক'রে এই সকল ধারণা দূর করতে চেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্যের দোষগুণ বিচার করা হয়েছে দেশীয় খাদ্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে। চুণীলালের প্রকাশভঙ্গী সরস। তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনায় সাহিত্যরস রয়েছে। এখানে তাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য হোল, তিনি কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হন নি ; সরল ও সরস ভাষার মাধ্যমে নীরস বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেও সর্বসাধারণের কাছে মনোজ্ঞ ক'রে তুলেছেন। রচনার নিদর্শন—

খাদ্য কাহাকে বলে ?

আমরা যাহা কিছু খাই, তাহাকে যে খাদ্য বলা যাইবে, এমত নহে। চা, কফি, কোকো প্রভৃতি পদার্থ খাদ্যরূপে পরিগণিত হইতে

১৮ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'জ্বর' (১৯২৪)।

পারে না। আমাদের দেশে পান খাওয়া প্রচলন আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া পান একটী খাদ্যদ্রব্য নহে। অনেক স্ত্রীলোকে পোড়া মাটী যথেষ্ট পরিমাণে খাইলেও উহা খাদ্য নামে অভিহিত হইতে পারে না।

যাহা আমরা খাই এবং যাহা দ্বারা আমাদিগের শরীরের পুষ্টি সাধন হয়, তাহাই যথার্থ খাদ্য। এরূপ কতকগুলি খাদ্য আছে, যেগুলি স্বাভাবিক অবস্থাতেই শরীর পোষণের উপযোগী হইয়া থাকে, যেমন দুগ্ধ, সুপক্ক ফল ইত্যাদি। অপরগুলি রন্ধনাদি কৃত্রিম উপায়ে পরিবর্ত্তিত না হইলে ব্যবহারের উপযোগী হয় না, যথা চাল, ডাল, ময়দা, মৎস্য, মাংস, তরকারী ইত্যাদি। মানব-সমাজে সভ্যতার অভ্যুদয়ের সহিত বহু প্রাচীনকাল হইতে রন্ধনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আদিম মনুষ্যগণ পশুবৎ অপক্ক মাংস ও ফল-মূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করিত। এখনও ভারতবর্ষের সন্নিকটস্থ কোন কোন দ্বীপে এবং আফ্রিকা মহাদেশের স্থানে স্থানে কতিপয় অসভ্য জাতি আমমাংস ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে। মাংসাদি খাদ্য সিদ্ধ হইলে অপেক্ষাকৃত গুরুপাক হয় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমমাংস ভোজনের প্রথা সভ্যসমাজে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা নিতান্ত উপহাসাস্পদ। অপরন্তু চাল, ডাল, ময়দা প্রভৃতি শ্বেতসার (starch) ঘটিত পদার্থ সুসিদ্ধ না হইলে মনুষ্যের পক্ষে সুপাচ্য হয় না। রন্ধন সভ্যতার একটী অঙ্গ এবং কলা-বিদ্যার অন্তর্গত। যে স্ত্রীলোকে ভালরূপে রন্ধন করিতে পারেন, কি স্বদেশী, কি বিদেশী, সকল সমাজেই তিনি সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

বাংলা ভাষায় খাদ্যবিজ্ঞান বিষয়ক পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নিবারণচন্দ্র চৌধুরীর 'খাদ্য-তত্ত্ব' (১৯১৩)। নিবারণচন্দ্র বিহার কৃষিবিভাগের কর্মচারী ছিলেন। চুণীলালের তুলনায় তাঁর গ্রন্থটি নিকৃষ্ট। চুণীলালের ন্যায় এই লেখক খাদ্যের রাসায়নিক গুণ এবং শরীর ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে খাদ্যের সম্বন্ধের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি লেখেন নি। তিনি জোর দিয়েছেন প্রধানতঃ বিচিত্র প্রকৃতির খাদ্যের উপর। এর মূলে ছিল খাদ্য সম্বন্ধে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর

পার্থক্য। চুণীলালের মতে খাদ্য চিকিৎসা-শাস্ত্র ও রসায়নবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।[১৯] অপরদিকে নিবারণচন্দ্র মনে করেন, 'খাদ্য সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিষয় কৃষিবিজ্ঞানের অন্তর্ভূত'।[২০] তবে চুণীলালের ন্যায় নিবারণচন্দ্র আয়ুর্বেদ মতে খাদ্যের ব্যবস্থাকে একেবারে উপেক্ষা করেন নি।

চুণীলাল বসু ও নিবারণচন্দ্র চৌধুরীর পর সবসাধারণের পাঠোপযোগী খাদ্যবিজ্ঞান রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাস। চারুচন্দ্রের লেখা 'বাঙ্গালীর খাদ্য' (১৯২৬) একটি মনোজ্ঞ বিজ্ঞানগ্রন্থ। প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাসের 'খাদ্য-বিজ্ঞান' (১৯৩৬) দেশীয় জনসাধারণ ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লেখা। কোনো মতবাদকে প্রাধান্য না দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় নিরপেক্ষভাবে খাদ্যবিজ্ঞান নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের রাসায়নিক তত্ত্ব বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক শারীরবিজ্ঞানও এখানে আলোচিত।

সাধারণভাবে খাদ্যবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা ছাড়াও খাদ্যবিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-রচনার প্রবণতা বিংশ শতাব্দীতে দেখা গেল। রজনীকান্ত রায় দস্তিদার প্রণীত 'মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যৎকিঞ্চিৎ' (১৩২২) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মাংসভক্ষণ যে অস্বাস্থ্যকর, বড় বড় ডাক্তারদের মত উদ্ধৃত ক'রে লেখক এখানে তা' প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

খাদ্য ছাড়াও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে কয়েকটি সুলিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান রচনার সূচনা উনবিংশ শতাব্দীতেই হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর স্বাস্থ্যগ্রন্থে অপেক্ষাকৃত পরিণত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া গেল বটে; তবে কোনো কোনো প্রাচ্য মতবাদকে গ্রহণ করবার প্রচেষ্টা এই যুগেও দেখা গেল। এই যুগে সরল ভাষায় সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে যাঁরা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, সতীশচন্দ্র লাহিড়ী এবং চুণীলাল বসুর নাম। সতীশচন্দ্র লাহিড়ীর 'স্বাস্থ্য ও শতায়ু' (১৩১৯) সরল ভাষায় সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা একটি সুপরিকল্পিত গ্রন্থ। চুণীলাল বসুর

১৯ খাদ্য—১ম সংস্করণ, পৃঃ ৶০

২০ খাদ্যতত্ত্ব—মুখবন্ধ।

'শারীরস্বাস্থ্য-বিধান' (১৯১৩) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশীয় নারী ও জনগণের অজ্ঞতা দূর করবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়। এই গ্রন্থের যায়গায় যায়গায় পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীর সঙ্গে আয়ুর্বেদোক্ত মতের সামঞ্জস্য দেখান হয়েছে। যে সকল পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যপদ্ধতি এদেশের উপযোগী নয়, তাদের বর্ণনা পরিহার করা হয়েছে। আবার যে সকল স্বাস্থ্যবিধি আমাদের সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত এবং যেগুলো বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, সেই সকল বিধানকেও লেখক উপেক্ষা করেন নি।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়ে লেখা চুণীলাল বসুর অপর দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হোল 'পল্লীস্বাস্থ্য' (১৯১৬) এবং 'স্বাস্থ্য-পঞ্চক' (১৩৩৫)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না ক'রে পল্লীগ্রামে নানা অসুবিধার মধ্যে বাস ক'রেও কিভাবে স্বাস্থ্য-রক্ষা করতে পারা যায় তা' নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থটি হোল 'বার্ষিক বসুমতী', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'মাতৃমন্দির' প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত লেখকের পাচটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধের সংকলন।

চুণীলাল বসুর সমসাময়িক যুগে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান রচনায় অভিনবত্বের পরিচয় দিলেন রাধাকিশোর কর। রাধাকিশোরের 'শরীর-পালন-বিধি' (১৯১৪) আগাগোড়া কবিতায় লেখা। লেখকের অগ্রজ ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর প্রথমে বইটি লিখতে সুরু করেন। রাধাগোবিন্দের সময়াভাব হেতু বইটি সমাপ্ত করবার ভার পড়ে রাধাকিশোরের উপর। যা'তে জনসাধারণ, স্ত্রী ও শিশুরা বুঝতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে যুক্তাক্ষর বর্জন ক'রে এই গাথাখানি প্রচার করা হয়। গ্রন্থটিকে জনপ্রিয় করে তুলবার বাসনায় গাথায় বর্ণিত স্বাস্থ্যবিধানকে দেবাদেশ বলে লেখক সর্বত্রই উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাভঙ্গী যায়গায় যায়গায় কৌতূহলোদ্দীপক।

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অম্বিকাচরণ দত্ত ও ক্ষিতিনাথ ঘোষের 'স্বাস্থ্যবিজ্ঞান' (পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯১৮), ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর 'স্বাস্থ্য-নীতি' (১৯১৯) এবং চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর 'স্বাস্থ্য' (১৩৩১)। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি পুরোপুরি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা। তবে সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপযোগী ক'রে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী এখানে বর্ণিত। ডাঃ বসুর 'স্বাস্থ্য-নীতি' স্বাস্থ্য-সমাচার পুস্তকাবলীর প্রথম গ্রন্থ। স্বাস্থ্য-নীতির ভাষা প্রাঞ্জল,

তবে সরস নয়। চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর 'স্বাস্থ্য'-তে ব্যক্তিগত ও সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা নীরস ও অসম্পূর্ণ প্রকৃতির।

চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর আর একটি উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ 'খাদ্য ও স্বাস্থ্য' (১৩৩১)। নাম খাদ্য ও স্বাস্থ্য হলেও এই গ্রন্থে প্রধানতঃ খাদ্য সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। যুগ্মভাবে খাদ্য ও স্বাস্থ্যকে বিষয়বস্তু ক'রে লেখা অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাসন্তীচরণ সিংহের 'খাদ্য ও স্বাস্থ্য' (১৩৩৪) এবং স্কুমাররঞ্জন দাসের 'খাদ্য ও স্বাস্থ্য' (১৩৩৬)।

অস্ত্রচিকিৎসা, চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, ঔষধবিজ্ঞান এবং নার্সিং বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় বিংশ শতাব্দীতে অবনতি ঘটল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার অভাবই এর মূল কারণ। অস্ত্রচিকিৎসা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো গ্রন্থ এই যুগে রচিত হয় নি। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব এবং ঔষধবিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থ এই যুগে পাওয়া গেল বটে; তবে এদের কোনোটিই উচ্চাঙ্গের নয়।

সুধীরচন্দ্র মজুমদারের 'প্রাথমিক প্রতিবিধান' (১৯১৬) নামক গ্রন্থে 'ফাষ্ট এডের' কয়েকটি মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রচনাভঙ্গী একেবারেই নীরস। চিকিৎসা ও ঔষধবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ এস, সি, দাস সংকলিত 'সহজ ডাক্তারী শিক্ষা' (নব সংস্করণ, ১৩৩৮) এবং দেবপ্রসাদ সান্যালের 'সরল চিকিৎসা-বিধান' (১৩৩৮)। উনবিংশ শতাব্দীর চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থের মতো এই দু'টি গ্রন্থেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতিই বর্ণিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নার্সিং বা শুশ্রূষা বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। ঐ সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই বিভাগটি নিয়ে কয়েকটি সর্বজনবোধ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে নার্সিং নিয়ে বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কোনো গ্রন্থ রচিত হয় নি। বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত নার্সিং বা শুশ্রূষা বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'পরিচর্য্যা শিক্ষা' (১৩১৬)। এতে ডাক্তারী, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি—সর্বপ্রকার শুশ্রূষাপ্রণালীই আলোচিত।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, ঔষধবিজ্ঞান এবং শুশ্রূষা বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় এই যুগে অবনতি দেখা গেল বটে; তবে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি সুপরিকল্পিত সাময়িক-পত্র এই সময়ে প্রকাশিত হোল। উনবিংশ

শতকের ন্যায় এই শতকেরও অধিকাংশ সাময়িক-পত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য —উভয় প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতির আলোচনা পাওয়া গেল।

পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পরিকল্পিত সাময়িক-পত্রের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য নদীয়া থেকে প্রকাশিত 'চিকিৎসা-প্রকাশ' (বৈশাখ, ১৩১৫)। পত্রিকাটি মূলতঃ চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়। চিকিৎসা-প্রকাশের ১ম সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছিল,

> 'চিকিৎসকগণ যাহাতে সহজেই চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়েই নিত্য নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যেই চিকিৎসা-প্রকাশ মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল।'

এই পত্রিকায় চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন ইংরেজী পত্রিকার সারমর্ম, বহুদর্শী চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতার কথা এবং বিশেষ বিশেষ রোগের বিস্তৃত বিবরণ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত।

পাশ্চাত্য ধরনে পরিকল্পিত চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি উল্লেখ-যোগ্য সাময়িক-পত্র হোল ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ ও ডাঃ ক্ষীরোদলাল দে সম্পাদিত 'আধুনিক চিকিৎসা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩)। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হোত।

পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্য তথ্যনির্ভর দু'একটি পত্রিকা এই যুগে পাওয়া গেল বটে; তবে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিকাংশ পত্রিকায়ই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতিই বর্ণিত হোল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কবিরাজ বিনোদলাল দাশগুপ্ত ও ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান' (বৈশাখ, ১৩১৯)। 'পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসাপ্রণালীর' আলোচনা এতে স্থান পেত।

বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ স্বাস্থ্যপত্রিকায়ও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসা-প্রণালী পাশাপাশি আলোচিত হোল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'স্বাস্থ্য সমাচার' (বৈশাখ, ১৩১৯) এবং 'স্বাস্থ্য' (ফাল্গুন, ১৩২৯)।

খগেশচন্দ্র বসু সম্পাদিত 'স্বাস্থ্য ও শিল্প' (ভাদ্র, ১৩৩৪) পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা নয়। এতে স্বাস্থ্য, শিল্প ও কৃষি—সকল প্রকার আলোচনাই প্রকাশিত হোত।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে

যেমন বিংশ শতাব্দীতেও তেমনি চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক-পত্র প্রকাশের ধারা অব্যাহত রইল। কিন্তু অস্থচিকিৎসা, ঔষধবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব প্রভৃতি দিক নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় এই যুগে কোনো উন্নতি তো হোলই না, পরন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো কোনো দিক (যেমন, অস্থচিকিৎসা) নিয়ে গ্রন্থ-রচনার ধারাই প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার অভাবই এর মূল কারণ। বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা-গ্রন্থের পরিকল্পনায় এই বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান দিক অবহেলিত হোল বটে, কিন্তু খাদ্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতি চিকিৎসাবিজ্ঞানের কয়েকটি শাখা নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় এই যুগে উন্নতির পরিচয় পাওয়া গেল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এদের সাহিত্যরস।

দুই

চিকিৎসাবিজ্ঞানের তুলনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার সূচনা হয়েছিল অপেক্ষাকৃত ধীর ও মন্থর গতিতে। বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট ও দেশীয় জনসাধারণের উদাসীনতা এবং পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞান চর্চায় বিলম্বই এর কারণ। এদেশে কৃষিসংস্থা গঠিত হয়েছিল বহু পূর্বেই। কিন্তু পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এদেশে হয় নি।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়মের মিলিটারী বোর্ডের সেক্রেটারী কর্ণেল রবার্ট কিডের উদ্যোগে কলিকাতার উপকণ্ঠে 'বটানিক গার্ডেন' স্থাপিত হোল।[২১] বটানিক গার্ডেন থেকে পাওয়া দু'একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হোল 'Agricultural and Horticultural Society of India.' এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২০ খৃষ্টাব্দ। উইলিয়ম কেরী এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি ছিলেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্যে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রেই হয়েছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে 'Agri-Horticultural Society'-র উদ্যোগে প্রকাশিত হোল কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ

২১ The 150th Anniversary Volume of the Royal Botanic Garden, Calcutta. pp. 2-6.

Mashnabad।[২২] গ্রন্থটি তিসি বা মসীনার চাষ সম্বন্ধে লেখা। এই সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল জে, মার্শম্যানের বিশ্রুত গ্রন্থ Khetra Bhaganbibaran। 'Agri-Horticultural Society'-র উদ্যোগে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির ১ম ও ২য় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৩১ ও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[২৩] এ ছাড়া সোসাইটির মুখপত্র Transactions ও Journal থেকে ইংরেজী প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদের উদ্দেশ্যে একটি অনুবাদ-সমিতি গঠিত হয়েছিল। 'ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ' নামক সাময়িক-গ্রন্থটি এই সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের[২৪] (১৮১৪-১৮৮৩) সম্পাদনায় ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থটির বিভিন্ন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এতে সহজ ভাষায় কৃষিবিজ্ঞানের জনপ্রিয় প্রসঙ্গাদি নিয়ে আলোচনা থাকতো। পুস্তক প্রকাশ ছাড়াও এদেশে কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য 'Agri-Horticultural Society' নানাভাবে চেষ্টা করে। কৃষিপ্রদর্শনী, বৈজ্ঞানিক উপায়ে এদেশে কৃষি-ব্যবস্থার প্রবর্তন, কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন জনহিতকর কাজে দীর্ঘকাল ধ'রে এই সোসাইটি আত্মনিয়োগ করে।[২৫] কিন্তু সুপরিকল্পনা ও গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতার অভাবে সোসাইটির অধিকাংশ উদ্যোগই ফলপ্রসূ হয় নি। তাই দেখা যায়, উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কৃষিবিজ্ঞান রচনার প্রয়াস কয়েকটি বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমিত।

বাংলায় সুপরিকল্পিতভাবে প্রথম কৃষিবিজ্ঞান লিখলেন হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। এই লেখকের 'কৃষিদর্পণ—১ম ও ২য় ভাগ' যথাক্রমে ১২৬৬ ও ১২৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। ১ম ভাগের ভূমিকাটি মূল্যবান। লেখক এখানে বলেছেন,

> 'এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণ গভর্ণমেণ্ট আনুকূল্য প্রাপ্তে নানা বিষয়ক পুস্তকাদি রচনা করত এক্ষণে বঙ্গভাষার উন্নতি বৃদ্ধি করিতেছেন। কিন্তু কৃষিকার্য্য যাহা এতদ্দেশীয় অধিকাংশ

২২-২৩ A Descriptive Catalogue of Bengali Works (1855)—J. Long.

২৪ প্যারীচাঁদ মিত্রের কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধগুলো ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২৫ Report of the Agricultural and Horticultural Society of India for 1882—PP. xxxiv-xxxvi.

লোকের উপজীবিকা তৎসম্বন্ধীয় কোন পুস্তক অদ্যাবধি প্রকাশ না পাওয়াতে এতদ্দেশে কৃষিকার্য্য পূর্ব্ববৎ অবস্থাবস্থিত আছে। শ্রীল শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের বটানিক উদ্যান সংস্থাপিত হওয়াতে নানাবিধ বৈদেশিক বৃক্ষ চারা এতদ্দেশে রোপিত হওয়াতে কৃষিকার্য্যের উন্নতির সোপান হইয়াছে বটে, কিন্তু যে সকল কৌশল দ্বারা উক্ত উদ্যানের কার্য্য পরিচালন হইয়া থাকে তাহা দেশে প্রচারিত হয় নাই, এই নিমিত্ত আমরা বহু যত্নে ঐ সকল কৌশল সংগ্রহ করিয়া এতদ্দেশীয় সামান্যরূপ কৃষিকার্য্যের সহিত সংমিলন পূর্ব্বক এই কৃষিদর্পণ নামক সন্দর্ভ রচনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম।'

কৃষিদর্পণ—১ম ভাগে উদ্ভিদের প্রকৃতি, স্থলজ উদ্ভিদ এবং জল, বায়ু ও মাটির সঙ্গে উদ্ভিদের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ২য় ভাগের প্রধান আলোচ্য বিষয় চারা রোপণপ্রণালী ও উদ্যান। পাশ্চাত্য তথ্যনির্ভর হলেও দেশীয় কৃষির দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি রচিত।

এইভাবে দু'একটি গ্রন্থ-রচনার মধ্য দিয়ে কৃষিসাহিত্য ও কৃষিব্যবস্থাকে উন্নত করবার প্রচেষ্টা কোনো কোনো লেখকের রচনায় দেখা গেল বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত ভারত গভর্ণমেণ্ট এদেশে বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রসার সম্বন্ধে কোনোরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন না। সন্দেহ নেই যে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় কৃষিবিভাগ সৃষ্টি করবার প্রথম প্রস্তাব হয়েছিল;[২৬] কিন্তু শাসনকর্তাদের মধ্যে মতৈক্য না হওয়ায় ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো কৃষিবিভাগ গঠনের প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করেন; কিন্তু এই প্রস্তাবটিও শেষ পর্যন্ত নামঞ্জুর হয়। তবে কৃষিবিভাগে একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন।[২৭]

এদিকে সরকারী কৃষিবিভাগ প্রতিষ্ঠা নিয়ে গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলবার কয়েক বছর আগে থেকেই কলিকাতা, আলিপুর, বর্ধমান প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি কৃষি-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল।[২৮] এই

---

২৬ ভারতবর্ষে কৃষি-উন্নতি (১৩২৪)—নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পৃঃ ২-৩।

২৭ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এই সেক্রেটারীর পদটি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

২৮ Agriculture and Agricultural Exhibitions in Bengal (1865)—K. C. Mittra : PP. 17-23.

সকল প্রদর্শনীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আলীপুরে অনুষ্ঠিত (১৮৬৪) কৃষি-প্রদর্শনী। কৃষিবিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার কাজে এই সময়কার বিভিন্ন প্রদর্শনী কিছুটা সহায়তা করেছিল বটে ; তবে তখনও পর্যন্ত পাশ্চাত্য-পদ্ধতিতে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এদেশে হয় নি। তাই উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকেও কৃষিগ্রন্থ সম্বন্ধে দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে কোনোরূপ আগ্রহ দেখা গেল না।

কৃষিদর্পণ ছাড়া এই যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কালীময় ঘটকের[২৯] 'কৃষি-শিক্ষা' (১২৮৫)। কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব অনুসন্ধান ও পরীক্ষার পরিচয় এই গ্রন্থে রয়েছে। গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন উদ্ভিদবিদ ও রাসায়নিক যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। কৃষিশিক্ষায় বিভিন্ন শস্যাদি নিয়ে সরল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে।

উনিশ শতকের সপ্তম ও অষ্টম দশকে এইভাবে মাঝে মাঝে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হোল বটে, কিন্তু কৃষি বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ সাময়িক-পত্র ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত হয় নি। ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ'কে সাময়িক-পত্র না বলে সাময়িক-গ্রন্থ বলাই বোধ করি সঙ্গত।

বাংলা ভাষায় কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাময়িক-পত্র 'কৃষিতত্ত্ব' বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশী ও বিলেতী—নানাপ্রকার গাছ উৎপাদন, রোপণ ও রক্ষণপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হোত। তবে ভাষা ও রচনা-ভঙ্গীর দিক থেকে অধিকাংশ আলোচনাই ছিল নীরস ও শ্রুতিকটু।

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে কদাচিৎ দু'একটি কৃষিগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-সাময়িক-পত্র প্রচারের উদ্যোগও দেখা গেল বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষার অভাবে তখনও পর্যন্ত কৃষি-সাহিত্য দানা বেঁধে উঠবার অবকাশ পেল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকেও কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নিষ্ক্রিয়তাই পরিলক্ষিত হয়। এদেশে কৃষি-

২৯ কালীময় ঘটক 'কৃষিপ্রবেশ' নামে আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে।

শিক্ষার অভাব লক্ষ্য ক'রে 'Indian Agricultural Gazette'[৩০](1885) পত্রিকা মন্তব্য করেন,

> 'If any country needs agricultural education and that most badly, India does; and although the British Government has lately turned its attention towards the important question of agricultural improvement, little or nothing has been done for educating the children of the soil in that branch of knowledge which is almost the only means of securing their livelihood.'

'Agricultural Gazette' পত্রিকার এই উক্তিকে অনুসরণ ক'রে বলা যায়, বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা না করলেও এই সময়ে ভারত ও বাংলা গভর্ণমেণ্ট এদেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় কৃষিবিভাগ গঠন করবার প্রস্তাব ভারত গভর্ণমেন্টের কাছে পুনরায় উত্থাপিত হোল। এই প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত কার্যকরী না হলেও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ডাঃ ভোয়েলকার নামক রয়েল কৃষি সমিতির জনৈক পণ্ডিত ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা অনুসন্ধান করবার কাজে নিযুক্ত হলেন। ডাঃ ভোয়েলকারের রিপোর্টকে কেন্দ্র ক'রে কৃষি-বিভাগ সম্বন্ধে নতুন ক'রে আলোচনার সূত্রপাত হোল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ভারতসচিব কৃষি-রসায়নে বিশেষজ্ঞ এক সহকারীকে নিয়ে ভারতবর্ষে এলেন। এইভাবে ভারত গভর্ণমেন্টের প্রচেষ্টায় যখন এদেশে বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য প্রসারের উদ্যোগ চলছিল, তখন বাংলার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টও কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরেজের অধীনে তিন জন দেশীয় যুবককে নিযুক্ত ক'রে বাংলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ পুনর্গঠিত হোল। এ ছাড়া এই সময়ে গভর্ণমেণ্টের পরিচালনায় কয়েকটি কৃষিক্ষেত্রও স্থাপিত হয়েছিল। এদিকে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হোল কলিকাতার Bengal Veterinary College।[৩১]

৩০ Vol. 5 : P. 114.

৩১ Agricultural Research in India—Institutes and Organisation (1958)—By Dr. M. S. Randhawa—(Introduction).

এক দিকে কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগ-আয়োজন, অপর দিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি দেশীয় জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ— এই উভয় কারণে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বাংলা কৃষি-সাহিত্যে উন্নতি পরিলক্ষিত হোল। কৃষি বিষয়ক কয়েকটি সাময়িক-পত্র ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কৃষিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় প্রবণতা দেখা গেল। সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান (Agriculture in general), কৃষির বিষয়বিশেষ এবং কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিককে বিষয়বস্তু ক'রে এই যুগে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। তা' ছাড়া বাংলা ভাষায় এই যুগেই প্রথম প্রকাশিত হোল মৎস্য চাষ (Fishery) ও পশুপালন বিষয়ক গ্রন্থ।

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য নীলকমল লাহিড়ীর 'কৃষিতত্ত্ব' (১২৮৭)। নীলকমল লাহিড়ী রঙ্গপুর-নলডাঙ্গার জমিদার ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে কৃষিবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলতত্ত্ব আলোচনার পর বিভিন্ন প্রকার লতা, শস্য, ফলমূল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় লেখকের নিজস্ব অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের পরিচয় সুস্পষ্ট। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক সংস্কৃত নামের ব্যবহার এবং যায়গায় যায়গায় আয়ুর্বেদীয় তথ্যাদির সমাবেশ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য।

এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ উমেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'কৃষিপদ্ধতি' (১৮৮২)। উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হলেও উদ্যানই আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। নীলকমলের তুলনায় উমেশচন্দ্রের ভাষা প্রাঞ্জল।

উমেশচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে যাঁরা সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, হারাধন মুখোপাধ্যায়, ভুবনচন্দ্র কর ও গিরিশচন্দ্র বসুর নাম। প্রবোধচন্দ্র দে'র কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ 'কৃষিক্ষেত্র' (১৩০১) এই যুগেই প্রকাশিত হয়েছিল বটে; তবে প্রবোধ-চন্দ্রের সাহিত্য-জীবন প্রধানতঃ বিংশ শতাব্দীতেই সীমিত। এই সকল লেখকদের প্রচেষ্টা ছাড়াও কৃষিবিজ্ঞান রচনায় কয়েকটি অক্ষম প্রয়াস উনিশ শতকের শেষভাগে দেখা গেল। উদাহরণস্বরূপ কালীপ্রসন্ন চট্টো-

পাধ্যায়ের 'আদর্শ কৃষক' (২য় সংস্করণ, ১২৯৪) শীর্ষক গ্রন্থটির নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাব এবং অসম্পূর্ণ প্রকৃতির আলোচনা গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি।

এই ত্রুটি 'কৃষিতত্ত্ব' পত্রিকার সম্পাদক নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষিসংগ্রহ' (১২৯০) নামক গ্রন্থেও রয়েছে। এখানে কৃষি সম্বন্ধে বার মাসের কর্তব্য-কার্য সম্বন্ধে আলোচনা যায়গায় যায়গায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এ ছাড়া উচ্ছ্বাসের আধিক্য নৃত্যগোপালের রচনাভঙ্গীর প্রধান ত্রুটি।

রচনায় যুক্তি এবং তথ্যসন্নিবেশে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া গেল আগড়পাড়া নিবাসী হারাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কৃষি-তত্ত্ব' (১২৪৩ সংবৎ) নামক গ্রন্থে। ইতিপূর্বে গ্রন্থটির কিছু অংশ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। পূর্ণাঙ্গ না হলেও ভারতীয় কৃষিবৃত্তান্তের একটি সামগ্রিক পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা এখানে রয়েছে। এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা ১২ খণ্ডে লেখা ভুবনচন্দ্র করের 'কৃষিপ্রণালী'। কৃষিপ্রণালীর বিভিন্ন খণ্ড ১২৯৯ থেকে ১৩১০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। লেখক ভুবনচন্দ্র দীর্ঘকাল ধ'রে কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষিকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে দেশীয় কৃষিপ্রণালীর আলোচনায় তাঁর এই সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিচয় রয়েছে। কৃষিপ্রণালীর যায়গায় যায়গায় পাশ্চাত্য কৃষিপ্রণালীর কথাও বর্ণিত। আলোচ্য গ্রন্থটি আগাগোড়া গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে লেখা। ভুবনচন্দ্রের রচনাভঙ্গীর প্রশংসা করা যায় না। তাঁর ভাষায় যায়গায় যায়গায় গ্রাম্যতার ছাপ রয়েছে।

কৃষিসাহিত্যে এই যুগের আর একজন বিশিষ্ট গ্রন্থকার বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু। গিরিশচন্দ্রের 'কৃষিদর্শন-১ম ভাগে' (১৩০৪) কৃষি-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষভাগে প্রকাশিত সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই জনসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা। তবে বালকদের উদ্দেশ্যেও কয়েকটি গ্রন্থ এই যুগে প্রকাশিত হয়েছিল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য, গিরিশচন্দ্র বসুর 'কৃষিসোপান' (১২৯৫) এবং 'চারুবার্ত্তা' সম্পাদক কামিনীকুমার চক্রবর্তীর 'কৃষক' (১৩০০)।

সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও উনিশ শতকের শেষভাগে কৃষির বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত হোল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশী ও বিলাতী শাকসবজী নিয়ে লেখা কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'সবজী-বাগান' (১৮৮৫), রেশমের ইতিহাস ও রেশমকীট নিয়ে লেখা রমানাথ সেনের 'রেশম তত্ত্ব' (১২৯৩), সুসঙ্গ-দুর্গাপুর থেকে প্রকাশিত কমলকৃষ্ণ সিংহের 'আম্র' (১২৯৮), কৃষিবিজ্ঞানের লেখক নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'রেশম-বিজ্ঞান' (১৮৯৪), গুরুনাথ চক্রবর্তীর 'চা'র চাষ আবাদ ও প্রস্তুতপ্রণালী' (১৮৯৫) এবং প্রবোধচন্দ্র দে'র 'সবজীবাগ' (২য় সংস্করণ-১৩০৬)।

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ কোনো কোনো দিককে নিয়ে গ্রন্থ-রচনার প্রচেষ্টাও এই যুগে দেখা গেল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কৃষিতত্ত্বের সম্পাদক বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'কলম-প্রণালী' (১২৯৭)। এই গ্রন্থে কয়েকটি ফলের কলমপ্রস্তুত প্রণালী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক এই সকল গ্রন্থ ছাড়াও উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলা ভাষায় পশুপালন ও মৎস্য-চাষ (Fishery) বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার সূচনা হোল। কমলকৃষ্ণ সিংহের 'গোপালন' (১৮৮২) এবং নিধিরাম মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'মৎস্যের চাষ' (১৮৮৭) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত গ্রন্থের দু'এক যায়গায় লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটি দু'খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে গো-প্রতিপালন সম্বন্ধে আলোচনা। দ্বিতীয় খণ্ডে গো-চিকিৎসার কথা আলোচিত। প্রধানতঃ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা হলেও যায়গায় যায়গায় লেখক গো-পালন ও গো-জীবন সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতবাদ উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের ভাষায় বহুস্থলেই পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণের ছাপ বিদ্যমান।

কৃষিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থ-রচনা ছাড়াও সাময়িক-পত্রের মাধ্যমে কৃষি-সাহিত্যকে জনপ্রিয় ক'রে তুলবার প্রচেষ্টা এই যুগে দেখা গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হোল। এই যুগের পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিষয়ক পত্র-পত্রিকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'কৃষিপদ্ধতি' (অগ্রহায়ণ, ১২৯০), ঢাকা থেকে কালীকুমার মুন্সীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সচিত্র কৃষি শিক্ষা' (ভাদ্র, ১২৯৪) এবং নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'কৃষিতত্ত্ব-নবপর্য্যায়' (মাঘ, ১৩০৬)। উৎকর্ষতার দিক থেকে শেষোক্ত পত্রিকাটিই শ্রেষ্ঠ। এতে কৃষি সম্বন্ধে সাধারণভাবে জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই প্রকাশিত হোত।

পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিষয়ক পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের কয়েকটি কৃষিপত্রিকায় শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হতে দেখা গেল। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের 'কৃষিতত্ত্ব', উমেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'কৃষিপদ্ধতি' প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ কৃষিপত্রিকা আশানুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। তাই পরবর্তী কয়েকটি পত্রিকায় শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সমাবেশ ঘটিয়ে কৃষি-সাহিত্যকে জনপ্রিয় ক'রে তুলবার চেষ্টা করা হোল। এই শ্রেণীর পত্রিকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গিরিশচন্দ্র বসু সম্পাদিত 'কৃষি গেজেট' (বৈশাখ, ১২৯২), নবীনচন্দ্র সাহা সম্পাদিত 'সচিত্র কৃষিতত্ত্ব ও ভারতবন্ধু' (মাঘ, ১৩০১) এবং নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার সম্পাদিত 'কৃষক' (আশ্বিন, ১৩০৭)। কৃষি গেজেট পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পশুচিকিৎসা, আবহাওয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়েও রচনাদি প্রকাশিত হোত। সচিত্র কৃষিতত্ত্ব ও ভারতবন্ধুতে শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা নিয়মিতভাবে স্থান পেত। কৃষক পত্রিকার ১ম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্টই মন্তব্য করা হয়,

> 'এই নাটক-নভেল-প্লাবিত বঙ্গদেশে কেবল কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় পত্রিকা যে কতদূর আদৃত হইবে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ভূতপূর্ব্ব দুই একটী কৃষি-পত্রিকার অদৃষ্ট ইহার বিশেষ পরিচায়ক। আমরা তজ্জন্যই কৃষি প্রবন্ধাদি ভিন্ন অপরাপর সহজপাঠ্য প্রবন্ধ ও সংবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব।'

'কৃষক'-এ কৃষিবিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত বটে; তবে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়ই এই পত্রিকার উৎকর্ষতা। প্রবোধচন্দ্র দে প্রমুখ লেখকরা এতে নিয়মিতভাবে লিখতেন।

বিংশ শতাব্দীতে কৃষি-সাময়িক প্রকাশের ধারা অব্যাহত রইল। এই যুগের কৃষিপত্রিকার পরিকল্পনায় ও কৃষিপ্রবন্ধের ভাষা এবং রচনাভঙ্গীতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেল। এই উন্নতির পরিচয় কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থেও সুস্পষ্ট। ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকেই শুধু নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও এই যুগের কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলোতে সংক্ষেপে কৃষিবিজ্ঞানের সামগ্রিক পরিচয় না দিয়ে এই বিজ্ঞানের এক একটি দিককে নিয়ে সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত আলোচনা করা হোল। এর মূলে ছিল কৃষিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি সম্বন্ধে লেখক ও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান

আগ্রহ ও সচেতনতা। তাই দেখা যায়, বিংশ শতাব্দীতে সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে যে পরিমাণ গ্রন্থ লেখা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক গ্রন্থ লেখা হয়েছে কৃষির বিষয়বিশেষ ও কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিককে নিয়ে। বিংশ শতাব্দীতে কৃষি-রসায়ন রচনার সূত্রপাত হোল। তা' ছাড়া পশুপালন ও পশুচিকিৎসা নিয়েও ছোট-বড় অনেকগুলো গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। বিংশ শতাব্দীতে কৃষি-সাহিত্যের এই উন্নতির মূলে রয়েছে কৃষিশিক্ষার প্রসার এবং কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কার্যকরী প্রচেষ্টা। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন যখন ভারতীয় কৃষিবিভাগের সংস্কার করলেন, তখন বাংলার প্রাদেশিক কৃষিবিভাগও নতুন ক'রে গঠিত হোল। এদেশে বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তনে গভর্ণমেণ্ট এতদিনে কার্যকরী প্রচেষ্টা দেখালেন। এই সময়েই (১৯০৫) লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় বিহারের পুসা নামক স্থানে 'Agricultural Research Institute' স্থাপিত হোল।[৭২] এই প্রতিষ্ঠান ভারতে বৈজ্ঞানিক কৃষির পত্তন করলেন। কৃষি-বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থও এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, কৃষির বিষয়বিশেষ এবং কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিককে নিয়ে লেখা গ্রন্থসমূহ। এই শ্রেণীর গ্রন্থ-রচনায় সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন প্রবোধচন্দ্র দে। প্রবোধচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সুরু হয়।

প্রবোধচন্দ্র ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ থেকে কৃষিবিজ্ঞানকে উপজীবিকারূপে গ্রহণ করেন। তিনি লণ্ডনের 'Royal Horticultural Society'-র ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রবোধচন্দ্র কিছুকাল ধ'রে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করেছিলেন। কাশীপুর Horticultural Institute-এও কিছুকাল তিনি তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করেন।

কৃষিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব এবং কয়েকটি ফসলকে কেন্দ্র ক'রে লেখা 'কৃষিক্ষেত্র' (১৩০১) নামক গ্রন্থটির মাধ্যমে তিনি সাহিত্য-জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রবোধচন্দ্রের ভাষা প্রাঞ্জল; রচনাও যুক্তিধর্মী। তাঁর রচনায় পাশ্চাত্য

৭২ Agricultural Research In India—Institutes and Organisation (1958)—Introduction :—Dr. M. S. Randhawa.

বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আবশ্যকমতো ব্যবহৃত। ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দকে অনুবাদ না ক'রে অনেক ক্ষেত্রেই প্রবোধচন্দ্র ঐ সকল শব্দ হুবহু ব্যবহার করেছেন।

প্রবোধচন্দ্র দে'র দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সব্‌জীবাগ' (২য় সংস্করণ, ১৩০৬)। 'কৃষিক্ষেত্র' জনসমাদর লাভ করায় প্রবোধচন্দ্র এই গ্রন্থটি রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। দেশী ও বিলেতী উভয় প্রকার সবজীর কথাই এতে স্থান পেয়েছে। সব্‌জী-বাগের অধ্যায়বিভাগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত।

কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিক ও কৃষির বিষয়বিশেষ নিয়ে প্রবোধচন্দ্র অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। কৃষির বিষয়বিশেষকে নিয়ে লেখা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'পশুখাদ্য' (১৩০৮),[৩৩] 'কার্পাস-কথা' (১৩১৫) এবং গোলাপ ফুল নিয়ে লেখা 'গোলাপ বাড়ী' (১৩১৫)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে পশুদের খাদ্যের উপযোগী কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ফসলের কথা আলোচিত। তবে আলোচনা সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। প্রবোধচন্দ্রের 'কার্পাস-কথা'য় কার্পাসের জাতিবিচার ও ভারতে কার্পাস-কৃষির অবস্থা আলোচনার পর কার্পাসের মৃত্তিকা, সার, বীজ ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে। স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষ্য ক'রে এই যুগে বঙ্গবাসী, হিতবাদী, অনুশীলন প্রভৃতি সংবাদপত্রে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া কার্পাস-চাষ নিয়ে এই সময়ে কয়েকটি গ্রন্থও রচিত হয়। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, নিবারণচন্দ্র চৌধুরীর 'কার্পাস-চাষ',[৩৪] দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'তুলার চাষ' (১৯০৬) এবং নিকুঞ্জবিহারী দত্তের 'কার্পাস প্রসঙ্গ' (১৯০৬)। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রবোধচন্দ্রের কার্পাস-কথাই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

কার্পাস-কথার পরে প্রকাশিত প্রবোধচন্দ্রের প্রায় সবগুলো গ্রন্থই কৃষি-বিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিককে নিয়ে লেখা। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে

৩৩ 'পশুখাদ্যে'র পর এবং 'কার্পাস-কথা'র পূর্বে প্রবোধচন্দ্র 'ফলকর' নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ফলের জমি, চারা-নির্বাচন, বীজ, কলমপ্রণালী ও কয়েকটি ফল নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রবোধচন্দ্র ফলকে বিষয়বস্তু ক'রে দু'টি ইংরেজী গ্রন্থও রচনা করেন। গ্রন্থ দু'টির নাম 'A Treatise on Mango' এবং 'Potato Culture'.

৩৪ ভূমিকা : কার্পাস-কথা—প্রবোধচন্দ্র দে।

উল্লেখযোগ্য 'মৃত্তিকা-তত্ত্ব' (১৩১৬), 'ভূমিকর্ষণ' (১৩১৯), 'উদ্ভিদখাদ্য' (১৩২০) এবং 'উদ্ভিজ্জীবন' (১৯১৫)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে কৃষিবিজ্ঞান প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য মৃত্তিকা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভূমিকর্ষণে মৃত্তিকা ও উদ্ভিদখাদ্য, ভূমির উর্বরতা, কর্ষণপদ্ধতি, সারের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে সর্বজনবোধ্য আলোচনা করা হয়েছে। ভূমিকর্ষণ প্রকাশিত হবার অল্পদিন পরেই 'উদ্ভিদখাদ্য' নাম দিয়ে প্রবোধচন্দ্র সার নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে একটি গ্রন্থ লিখলেন। বিচিত্র ধরনের উদ্ভিদসার নিয়ে এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সারের বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের ব্যাখ্যাও প্রাঞ্জল।

উদ্ভিদসার ও উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'কৃষক' প্রভৃতি পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ সকল পত্রিকা থেকে উদ্ভিদ বিষয়ক প্রবন্ধগুলো সংকলিত ক'রে 'উদ্ভিজ্জীবন' প্রকাশিত হয়। যাঁরা উদ্ভিদ পালন ক'রে থাকেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে এ বইটি লেখা। এতে উদ্ভিদের বর্ণ, জন্ম ও জীবনধারণপ্রণালী এবং উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশ নিয়ে প্রাঞ্জল আলোচনা করা হয়েছে।

এইভাবে সহজ ও সরল কৃষিবিজ্ঞান রচনার মধ্য দিয়ে প্রবোধচন্দ্র দে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে গেলেন। কৃষি বিষয়ক আলোচনাকে প্রবোধচন্দ্র সাহিত্যের একটি অত্যাবশ্যকীয় বিভাগ বলে মনে করতেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

> 'সাহিত্যের সকল বিভাগ বা অঙ্গকে উপেক্ষা করিতে পারি, কিন্তু কৃষিকে পারি না। আর যে সাহিত্য কৃষিবিহীন তাহাকে অসম্পূর্ণ মনে করা অসঙ্গত নহে।'[৩৫]

কৃষিসাহিত্যের প্রতি প্রবোধচন্দ্রের এই আকর্ষণের মূলে ছিল তাঁর দেশপ্রীতি। এই দেশপ্রীতির পরিচয় প্রবোধচন্দ্রের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে—

৩৫ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি (২য় সংস্করণ,১৩২১)—পৃ: ৩। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও আসলে এটি একটি প্রবন্ধ। কৃষির সঙ্গে সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ, গার্হস্থ্য কৃষি, বৈজ্ঞানিক কৃষি, কৃষিশিক্ষা, উদ্যান-চর্চা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। ১৩১৯ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞানশাখার অধিবেশনে প্রবোধচন্দ্র এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

'সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে, দেশকে অর্থশালিনী করিতে হইলে কৃষির উন্নতি-বিধান করিতেই হইবে এবং তদুপলক্ষে কৃষি-সাহিত্যকে শক্তি প্রদান করিতে হইবে।'[৩৬]

প্রবোধচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে কৃষির বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন নিবারণচন্দ্র চৌধুরী ও চারুচন্দ্র ঘোষ। নিবারণচন্দ্রের 'কৃষি-রসায়ন' (১৯০৪) বাংলায় কৃষিসংক্রান্ত রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সাধারণ রসায়নবিজ্ঞানের তত্ত্বের দিক ও কৃষিসংক্রান্ত রসায়নবিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রধান প্রধান কয়েকটি মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের বিবরণ দিয়ে কৃষি-রসায়ন এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত। এই গ্রন্থের যায়গায় যায়গায় লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণিত। লেখক এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, বঙ্গীয় কৃষিবিভাগে কাজ করবার সময়।

চারুচন্দ্র ঘোষও বঙ্গীয় কৃষিবিভাগে কাজ করতেন। চারুচন্দ্রের প্রবণতা দেখা গেল, কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায়। এই লেখকের প্রথম গ্রন্থ 'ফসলের পোকা' (১৩১৭) এইচ্. ম্যাক্সয়েল্-লেফ্রয় সাহেবের 'ইণ্ডিয়ান ইন্সেক্ট পেষ্টস্' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা। ইতিপূর্বে নিবারণচন্দ্র চৌধুরী 'কৃষক' পত্রিকায় কীটতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারাবাহিক-ভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তবে শুধুমাত্র ফসলের কীট নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থ-প্রকাশের প্রচেষ্টা এই প্রথম। কি ধরনের পোকা শস্যাদি নষ্ট করে, এরা কি খায়, কিভাবে জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধি করে, প্রধানতঃ তা' নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। পোকার শরীরের গঠন-বৈচিত্র্যের উপর জোর না দিয়ে এদের আচরণের উপরেই এখানে জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। কি কি উপায় অবলম্বন করলে পোকার কবল থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়, এখানে তা' স্পষ্টভাবে বোঝান হয়েছে। কৃষকরা যা'তে পোকা চিনে নিয়ে যথাযথ প্রতিবিধান করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে বইটি লেখা। এজন্যেই পোকার বৈজ্ঞানিক নাম এই গ্রন্থে পরিত্যক্ত হয়েছে।

চারুচন্দ্র ঘোষের 'মৌমাছি পালন' (১৯১৮) বাংলা কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক

৩৬ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি—পৃঃ ৭

আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি পুষা 'Agricultural Research Institute'-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। মৌমাছিদের স্বভাব ও আচরণ বর্ণনা ক'রে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের মৌমাছি-পালন-পদ্ধতি এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটি সুপরিকল্পিত এবং সারগর্ভ।

বিংশ শতাব্দীর পশুপালন বিষয়ক কোনো কোনো গ্রন্থেও এই সুপরি-কল্পনার পরিচয় পাওয়া গেল বটে ; তবে বিষয়বস্তু নির্বাচনে একঘেয়েমিতা[৩৭] এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি। পশুপালন বিষয়ক প্রায় সবগুলো গ্রন্থেরই উপজীব্য গো-পালন ও গো-চিকিৎসা। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, কিশোরগঞ্জ নিবাসী গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'গো-ধন' (১৩২১), বঙ্গীয় জীবদয়া প্রসারিণী সমিতির[৩৮] অবৈতনিক সম্পাদক নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও হাওড়ার রামেশ্বর মালিয়া ভেটারিনারী হাসপাতালের ডাক্তার খেলাতচন্দ্র মৈত্রের 'গো-পালন ও গো-চিকিৎসা' (১৯১৯), গভর্ণমেণ্টের ভেটারিনারী বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জেন্ হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের 'গার্হস্থ্য গো-চিকিৎসা' (১৯২২), বাণেশ্বর সিংহের 'গো-পালন শিক্ষা' (১৩৩৪) এবং বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ দিবাকর দে'র 'গো-পালন ও চিকিৎসা' (১৩৩৪)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় রীতিই অনুসৃত। নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও খেলাতচন্দ্র মৈত্রের 'গো-পালন ও গো-চিকিৎসা'র ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। গ্রন্থটির কিছু কিছু অংশ ইতিপূর্বে সাহিত্য-সংবাদ, এডুকেশন গেজেট, বিজ্ঞান প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। 'গো-পালন' ও 'গো-চিকিৎসা' জনসমাদর লাভ করে। হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের 'গার্হস্থ্য গো-চিকিৎসা' এবং বাণেশ্বর সিংহের 'গো-পালন শিক্ষা'র বৈশিষ্ট্য, অধ্যায়বিভাগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিবাকর দে'র 'গো-পালন ও চিকিৎসা'য় আরও পরিণত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের তুলনায় এই যুগে প্রকাশিত সাধারণ কৃষি-বিজ্ঞান বা কৃষির মূলতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা নগণ্য। এই যুগের সাধারণ

৩৭ কদাচিৎ কোনো কোনো গ্রন্থে বিভিন্ন পশু নিয়ে আলোচনা পাওয়া গেল। যেমন, পি. এস. ভট্টাচার্যের 'বৃহৎ পশু-চিকিৎসা' (১৩১৭)। আলোচ্য গ্রন্থে কয়েকটি গৃহপালিত পশুর চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলেও গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। এতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় তথ্যাদি রয়েছে।

৩৮ এই সমিতি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে হাওড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই অকিঞ্চিৎকর, তবে কদাচিৎ দু' একটি গ্রন্থে সুপরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, অম্বিকাচরণ সেনের 'কৃষি-প্রবেশ' (১৩১৭)। এই গ্রন্থে কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকা নিয়ে আলোচনার পর বৃক্ষদেহ, মৃত্তিকার উৎকর্ষ সাধন, বীজের উন্নতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে বৈজ্ঞানিক তথ্যের স্বল্পতা এবং সুপরিকল্পনার অভাব এই যুগের সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থেরই প্রধান ত্রুটি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গরীব শায়ের প্রণীত 'কৃষক-বন্ধু' (১৩১৭), মেডিক্যাল নার্শারীর ডাইরেক্টার হেমচন্দ্র দেবের 'ব্যবহারিক কৃষি-দর্পণ'—১ম খণ্ড (১৩১৮) এবং পাইকপাড়া নার্শারীর স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষি-সখা—১ম ভাগ' (১৩৩১)। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি পয়ার ছন্দে লেখা। বর্ণনায় একঘেয়েমিতা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অভাব গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি। কৃষকদের প্রতি উপদেশ দেবার কালে যায়গায় যায়গায় এখানে ইসলাম ধর্মের জয়গান করা হয়েছে। ব্যবহারিক কৃষি-দর্পণে ভারতবর্ষের কৃষি ছাড়াও বিভিন্ন বিদেশী কৃষির চাষ বর্ণিত। আলোচ্য গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তথ্যাদির সংমিশ্রণ ঘটেছে।

বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কোনো কোনো গ্রন্থে কদাচিৎ প্রাচ্য তথ্যাদিও স্থান পেল বটে; তবে এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞান ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। তাই পূর্ণাঙ্গ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার সংখ্যা এই যুগে বাড়ল। কৃষিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তাশীল প্রবন্ধও এই যুগের কয়েকটি পত্রিকায় পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, নিশিকান্ত ঘোষের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'কৃষি-সমাচার' (বৈশাখ, ১৩১৭)। এই পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষি-শিল্প ছাড়াও বিচিত্র প্রকৃতির কৃষি-সংবাদ প্রকাশিত হোত। এ ছাড়া উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে বহু সুলিখিত প্রবন্ধও এতে পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর পত্র-পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'কৃষি-সম্পদ' (বৈশাখ, ১৩১৭), প্রভাসচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'কৃষি-সংবাদ' (বৈশাখ, ১৩২৪), ঢাকা বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'কৃষি-সমাচার' (মার্চ, ১৯২১) এবং বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চাষবাস' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) ইত্যাদি। প্রথমোক্ত পত্রিকায় প্রবোধচন্দ্র দে প্রমুখ লেখকরা নিয়মিতভাবে লিখতেন। কৃষি-সংবাদ পত্রিকায় দেশী ও বিদেশী কৃষি ও কৃষকের কথা, কৃষিসংবাদ এবং সাধারণ

কৃষি সম্বন্ধে রচনাদি প্রকাশিত হোত। কৃষি-সমাচারে কৃষিপ্রবন্ধ ও সংবাদাদি ছাড়াও সরকারী কৃষিক্ষেত্র ও প্রদর্শনীর বিবরণ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত। চাষবাস নামক পত্রিকাটি হোল নিখিল ভারত কৃষি-সমিতির মুখপত্র। বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রতি দেশীয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সাময়িক-পত্র থেকে কৃষি-বিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ চাষবাসে সংকলিত হোত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় বিংশ শতাব্দীতে পূর্ণাঙ্গ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার সংখ্যা বাড়ল বটে, তবে কদাচিৎ এই যুগেরও দু'একটি পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর প্রসঙ্গ স্থান পেল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শরচ্চন্দ্র দেব সম্পাদিত 'সচ্চাষী-সুহৃদ' (ফাল্গুন, ১৩১৮) এবং মাখনলাল সাউ সম্পাদিত 'সচ্চাষী সেবক' (ফাল্গুন, ১৩৩৪)। প্রথমোক্ত পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদিও স্থান পেত। শেষোক্ত পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞান ছাড়াও শিল্প, সমাজ, সাহিত্য ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত।

সমগ্র কৃষিসাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ধীর ও মন্থরগতিতে বাংলা ভাষায় কৃষিবিজ্ঞান রচনার সূত্রপাত হয়। এই শতাব্দীর শেষভাগে বৈজ্ঞানিক কৃষি সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কৃষিসাহিত্যেরও উন্নতি হতে থাকে। এই সময়ে কৃষিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই কৃষিবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় প্রবণতা দেখা গেল। তা' ছাড়া প্রবোধচন্দ্র দে প্রমুখ লেখকদের প্রচেষ্টায় কৃষিসাহিত্যের ভাষা ও রচনারীতিতেও উন্নতি সাধিত হোল। এই যুগে স্থূলভাবে সমগ্র কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা না ক'রে এই বিজ্ঞানের বিশেষ এক-একটি দিককে নিয়ে সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত আলোচনা হলে লাগল। এর মূলে ছিল পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা। দেশীয় কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্টের কাযকরী উদ্যোগ ও পাশ্চাত্য কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা এই জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন বাংলা ভাষায় এককালে বিরাট ও সারগর্ভ গ্রন্থ-রচনায় প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, কৃষিবিজ্ঞানের বেলায় তা' কোনোকালেই দেখা যায় নি। বাংলা ভাষার মাধ্যমে কৃষি-

বিজ্ঞান চর্চার অভাবই এর মূল কারণ। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি গভর্ণমেণ্ট ও দেশীয় জনসাধারণের দৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিল। তা' ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থাও হয়েছিল এবং এই ব্যবস্থা চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে নি। পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট ও দেশীয় জনসাধারণের সচেতনতা দেখা গেল এর অনেক পরে। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এদেশে পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই হয় নি। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে পাশ্চাত্য কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা হোল বটে, কিন্তু শিক্ষার বাহন হোল ইংরেজী ভাষা। ফলে বিংশ শতাব্দীতে বাংলা কৃষি-সাহিত্যের উন্নতি ঘটলেও কৃষিবিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব ও জটিল দিক নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ-রচনার প্রচেষ্টা দু' একটি মাত্র ক্ষেত্রেই সীমিত থেকে গেল।

তিন

বাংলা কৃষিসাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা যায়, কৃষির সঙ্গে এদেশীয় জনসাধারণের রয়েছে একটা নাড়ীর সম্পর্ক। ভারতবর্ষ বরাবরই কৃষিপ্রধান দেশ। বৈজ্ঞানিক কৃষির ব্যবস্থা বিলম্বে হলেও কৃষি সম্বন্ধে স্বাভাবিক একটা আগ্রহ জনসাধারণের মধ্যে বরাবরই ছিল। তাই দেখা যায়, বিংশ শতাব্দীর পূর্বে পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা না হওয়া সত্ত্বেও বাংলা কৃষিসাহিত্য নেহাত নগণ্য নয়। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং বা যন্ত্রবিজ্ঞানকে ভারতবর্ষ সহজে আপন বলে গ্রহণ করতে পারে নি। যন্ত্রবিজ্ঞান এদেশীয় সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি কোনোদিনই। এজন্যেই কৃষিবিজ্ঞানের বহু পূর্বেই যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও কারিগরী বিজ্ঞানের এই দিকটি নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় কোনোরূপ প্রবণতা বাংলায় দেখা গেল না। বস্তুতঃ, চিকিৎসা ও কৃষিবিজ্ঞানের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের এই দিকটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় যন্ত্রবিজ্ঞান লিখবার প্রয়াস মুষ্টিমেয় দু'একটি প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বাংলা ভাষায় ইঞ্জিনীয়ারিং বা যন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ডব্লিউ. রবিনসনের 'ভূমি পরিমাণ বিদ্যা' (১৮৪৬) বা 'ক্ষেত্রাদির মাপ এবং চিত্রকরণের প্রাথমিক শিক্ষোপযোগি গ্রন্থ'। 'ইংলণ্ডীয় গ্রন্থের তাৎপর্য্যাবলম্বনে স্বদেশীয়

নিয়মের সংশোধন পূর্ব্বক' এটি সংগৃহীত হয়। গ্রন্থটির ইংরেজী নাম 'Elements of Land Surveying, on the Anglo-Indian plan'। রবিনসনের রচনাভঙ্গীর প্রশংসা করা যায় না। ভাষায় কৃত্রিমতা এবং বারবার একই ধরনের শব্দ দিয়ে বাক্য-গঠনের ফলে তাঁর রচনা শ্রুতিকটু ও একঘেয়ে হয়ে পড়েছে।

এদিকে উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে সুপরিকল্পিতভাবে এদেশে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা হোল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি বিভাগ ছিল—Arts, Law, Medicine ও Engineering। তখন ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ছিল দু'টি মাত্র প্রতিষ্ঠান। একটি হোল The Thomason Civil Engineering College, Roorkee এবং অপরটি হোল The Government Engineering College, Sibpur।[৩৯] ১৮৫৬ থেকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রুড়কী, পুনা, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় চারটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়।[৪০]

এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এদেশে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা হোল বটে, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে কোনোরূপ আগ্রহ দেখা গেল না। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও বাংলা ভাষায় ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রন্থ প্রকাশের উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা হোল না। তবে এই যুগে বাংলা ভাষায় স্থপতিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হোল। সিভিল ইঞ্জিনীয়ার দুর্গাচরণ চক্রবর্তীর 'বিশ্বকর্ম্মা'র (১২৯৩) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি ঘরবাড়ী, পুল, রাস্তা ইত্যাদি প্রস্তুতের উপকরণ ও গঠনপদ্ধতি (Building materials and construction) নিয়ে লেখা। আলোচ্য গ্রন্থের একেবারে শেষদিকে ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ক কতকগুলি বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। গ্রন্থটি তথ্যপূর্ণ এবং আলোচনা সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; তা সত্ত্বেও আলোচনা কোথাও টেক্‌নিক্যাল হয়ে পড়ে নি।

৩৯ Engineering Education in the British Dominions (1891) PP. 59—61.

৪০ Development of Modern Indian Education (1955)—Bagwan Dayal—PP. 430—431.

ইঞ্জিনীয়ারিং-এ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও যা'তে বুঝতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে বইটি লেখা। তবে দুর্গাচরণের রচনাভঙ্গীর প্রশংসা করা যায় না। নীরস ভাষা তাঁর রচনাকে প্রাণহীন ক'রে তুলেছে। 'স্থপতি-বিজ্ঞান—১ম ভাগ' নাম দিয়ে 'বিশ্বকর্ম্মা'র ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে। দুই বৎসর পর 'স্থপতিবিজ্ঞান—২য় ভাগ' (১৩১৭) নাম দিয়ে দুর্গাচরণ চক্রবর্তীর আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ২য় ভাগের আলোচনা যায়গায় যায়গায় টেকনিক্যাল। উনবিংশ শতাব্দীর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বরদাদাস বসুর[৪১] 'জরিপ শিক্ষা' (১৮৯৩)। লেখক বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। রবিনসনের 'ভূমি পরিমাণ বিদ্যা'র তুলনায় আলোচ্য গ্রন্থে সার্ভেইং সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। ব্যবহারিক জরিপ নিয়েও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। বরদাদাসের রচনাভঙ্গী দুর্গাচরণ চক্রবর্তীর তুলনায় প্রাঞ্জল।

উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ণাঙ্গ ইঞ্জিনীয়ারিং পত্রিকা কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাময়িক-পত্র বিহারীলাল ঘোষ সম্পাদিত 'কারিকর-দর্পণ' (আশ্বিন, ১২৯৩)।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রন্থ-রচনায় উন্নতি পরিলক্ষিত হোল। সার্ভে ও স্থপতিবিজ্ঞান ছাড়াও এই যুগে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, খনিবিজ্ঞান (Mining) প্রভৃতি নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হতে দেখা গেল। এই যুগে রচিত সার্ভে ও স্থপতিবিজ্ঞান[৪২] বিষয়ক কোনো কোনো গ্রন্থ সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর মূলে ছিল ঢাকা, রাজসাহী রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সার্ভে স্কুল ও শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ঢাকা ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের স্থপতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্থপতি বিজ্ঞান—১ম ভাগ' (১৩২৭) একটি সুলিখিত গ্রন্থ। স্থপতিবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শৈলেশ্বর সান্যালের 'সরল গঠন-তত্ত্ব'

৪১ 'গুপ্তকালি কষা' (১৮৯২) নাম দিয়ে বরদাদাস বসু সার্ভে বিষয়ক আর একটি বই লিখেছিলেন।

৪২ কুঞ্জবিহারী চৌধুরীর 'সরল পূর্ত্ত শিক্ষা' বিভিন্ন সার্ভে স্কুল ও শিল্প-বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়েছিল। অল্পকালের মধ্যেই গ্রন্থটির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ভাষায় গুরুচণ্ডালী দোষ কুঞ্জবিহারীর রচনার প্রধান ত্রুটি।

(১৩৩০)। গ্রন্থটি বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে কিছুটা টেক্‌নিক্যাল ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দেশীয় ইঞ্জিনীয়ারদের উদ্যোগে ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাও গঠিত হোল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগের কিছুসংখ্যক কর্মচারী ও কয়েকজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ারের উদ্যোগে এবং কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'The Institute of Civil Engineers in India'[৪৩] প্রতিষ্ঠিত হয়। যন্ত্রবিজ্ঞান, বিশেষতঃ পূর্ত-বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।[৪৪] কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যন্ত্রবিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার কোনো চেষ্টা এই সমিতি করলেন না; যন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার ওপরেই এঁরা জোর দিলেন।

যন্ত্রবিজ্ঞানের একটি দিক সার্ভেইং বা জরীপবিজ্ঞান বিশেষভাবে প্রভাবিত হোল বাংলার প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের সংশোধনের ফলে। ১৯০৭ ও ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধিত হয়েছিল। এই আইন অনুযায়ী বাংলায় সেটেলমেণ্টের কাজ সুরু হলে সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায় জোয়ার এল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সাব-ডেপুটি কালেক্টর শশীভূষণ বিশ্বাসের 'সারভে ও সেটেলমেণ্ট দর্পণ' (১৯০৭) ও 'পরিমাপ-পদ্ধতি' (১৯০৮), হুগলীর সেটেলমেণ্ট অফিসার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'সারবে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি ও সরল জরিপ প্রণালী' (১৩১৭), সাঁকরাইল এষ্টেটের ম্যানেজার হেমন্তকুমার সেন মজুমদারের 'জরিপ ও স্বত্বলিপি' (১৩১৯), ঢাকা জজকোর্টের উকিল মহেন্দ্রকুমার দত্ত নিয়োগীর 'সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট পরিচয়' (১৯১২), ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত মহেশচন্দ্র বিশ্বাসের 'সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট বিজ্ঞান' (১৯১৩), যশোহরের পাণিঘাটা গ্রাম নিবাসী মহম্মদ আবদুল জব্বার লিখিত 'সহজ আমিনী শিক্ষা' (১৩২৪), এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর কোর্টের উকিল নলিনাক্ষ ভারতীর 'সরল সেটেলমেণ্ট সহচর' (১৩২৮) ইত্যাদি। উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর

৪৩ Proceedings of the Institute of Civil Engineers in India—Vol. II, P. 6.

৪৪ ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই থেকে এই সমিতি 'The Indian Society of Civil Engineers' নামে পরিচিত হতে থাকে।

কোনোটিতেই জরীপবিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের কোনো আলোচনা নেই। শুধুমাত্র আশু প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই বইগুলো লেখা।

প্রয়োজনের খাতিরেই বিংশ শতাব্দীতে ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত হোল। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এদেশে ইলেক্‌ট্রিসিটির প্রচলন ক্রমেই বাড়ছিল। তা' ছাড়া বহুসংখ্যক লোক ইলেক্‌ট্রিকের কাজ ক'রে জীবিকা নির্বাহ করছিল। এই সময়ে এদেশের 'ইংরাজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের' উদ্দেশ্যে নীরদাচরণ মিত্র লিখলেন 'বাঙ্গালা ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং' (১৯১১)। উচ্চাঙ্গের না হলেও এই গ্রন্থে বিদ্যুতের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক—উভয় দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। ভাষার কৃত্রিমতা নীরদাচরণের রচনাভঙ্গীর প্রধান ত্রুটি। শুধু টেক্‌নিক্যাল শব্দই নয়, অনেক যায়গায় সাধারণ ইংরেজী শব্দও এবং ইংরেজী হরফে ব্যবহার করার ফলে রচনার সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে। বাক্যগঠনে জড়ত্ব নীরদাচরণের রচনার অন্যতম ত্রুটি। রচনার নিদর্শন :—

> অনেক স্থলে কারেণ্টের ইনসুলেশন insufficient হইয়া থাকে এবং কনডক্টর তারের উপর দিয়া অযথা অতিরিক্ত কারেণ্ট চালিত হইয়া থাকে এইরূপ হইলে তার সদা সর্ব্বদাই উত্তপ্ত হইয়া থাকে ও তারের ইনসুলেসন অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। বাড়ীওয়ালাদের উচিং কনট্রাক্টর নিযুক্ত করিবার সময় যাহাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মালমসলা অর্থাং material ও অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা কাজ সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা। এবং কাজ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে experienced professional লোক দিয়া test করান, তাহা হইলে ইলেক্‌ট্রিসিটি হইতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই।

নীরদাচরণ মিত্রের প্রভাব দেখা গেল ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগীর 'ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং'-এ (১৩৩০)। কি আলোচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে, কি ভাষায় —সর্বত্রই এই প্রভাব বিদ্যমান। নীরদাচরণের মতো ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের ভাষাও কৃত্রিম। যেমন,

> ভোল্টমিটার (volt meter)—যে পরিমাপক যন্ত্র দ্বারা ইলেক্‌ট্রিক চাপকে মাপ করা হয় তাহাকে ভোল্ট মিটার বলে। ইহা লাইনের সহিত কনেক্‌সন করিতে হইলে প্যারাল্যালে কনেক্‌সন করিতে হয়।

স্থপতিবিজ্ঞান ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ছাড়াও এই যুগে মোটর-বিজ্ঞান, খনিবিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। বাংলা ভাষায় মোটরবিজ্ঞান নিয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন শৈলজাপ্রসাদ দত্ত। শৈলজা-প্রসাদ নিজে একজন কৃতী ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। মোটরবিজ্ঞান-শিক্ষার্থী দেশীয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে তিনি 'সচিত্র মোটর শিক্ষক' (১৩২৪) রচনা করেন। নীরদাচরণ ও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের মতো এই লেখকও ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দ হুবহু ব্যবহার করেছেন। তবে শৈলজাপ্রসাদের রচনারীতি অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। যন্ত্রবিজ্ঞানের জটিল দিক নিয়ে আলোচনা করলেও রচনা এখানে কোথাও টেক্‌নিক্যাল হয়ে ওঠে নি। পরবর্তী গ্রন্থ 'বিদ্যুৎ-তত্ত্ব শিক্ষক'-এ আলোচনা যায়গায় যায়গায় কিছুটা টেক্‌নিক্যাল হয়ে পড়েছে।[৪৫] সুনীলকুমার মিত্রের সহযোগিতায় লেখা এই গ্রন্থটি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

খনিবিজ্ঞান নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ হোল বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের খনিবিদ্যার অধ্যাপক ই এইচ. রবার্টনের 'কয়লাখনিবিদ্যা' (১৯২৩) —'A manual of Coal Mining'। এই গ্রন্থে ভূতত্ত্ব, খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান-পদ্ধতি, বিস্ফোরক পদার্থ, খনিসংক্রান্ত রসায়নবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা সর্বত্রই সারগর্ভ; কিন্তু সাহিত্যরসের অভাব গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, চিকিৎসা ও কৃষির তুলনায় বাংলা সাহিত্যের ইঞ্জিনীয়ারিং বা যন্ত্রবিজ্ঞানের দিকটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। শুধুমাত্র গ্রন্থ-প্রকাশের ক্ষেত্রেই নয়, সাময়িক-পত্রের ক্ষেত্রেও এই দুর্বলতা বিশেষভাবে নজরে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সুরু ক'রে বাংলা ভাষায় চিকিৎসা ও কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক অনেকগুলো সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং নিয়ে উৎকৃষ্ট কোনো সাময়িক-পত্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে তো নয়ই, এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও পাওয়া গেল না। তা' ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চিকিৎসা ও কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিককে নিয়ে সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত আলোচনার প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং বা যন্ত্রবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ

৪৫ শৈলজাপ্রসাদ দত্তের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ডিসেল ইঞ্জিন শিক্ষক' (১৩৬১)।

লিখবার প্রচেষ্টা বিংশ শতাব্দীতেও দু'একটি মাত্র ক্ষেত্রেই সীমিত থেকে গেল। শুধুমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং-এর যে দিকটি ভূমির মাপজোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কৃষিপ্রধান বাংলায় সেই সার্ভেবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায়ই প্রবণতা দেখা গেল। সার্ভে বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার মূলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা অপেক্ষা জমির মালিকানা ও স্বত্ব সম্বন্ধে সচেতনতাই বেশী কাজ করেছিল। তাই এই শ্রেণীর গ্রন্থে আশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার্ভেবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো উচ্চাঙ্গের আলোচনা নেই। এদিকে বিংশ শতাব্দীতেও বাংলায় যন্ত্রবিজ্ঞানের কোনো পরিভাষা গড়ে উঠল না। ফলে, যে দু'একজন লেখক যন্ত্রবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় এগিয়ে এলেন, তাঁদের অনেকের ভাষায়ই কৃত্রিমতা এসে গেল। অত্যধিক ইংরেজী শব্দ প্রয়োগের ফলে কোথাও বা রচনা হয়ে উঠল দুর্বোধ্য।

চার

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ন্যায় অতটা দুর্বোধ্য না হলেও রচনায় সাহিত্যরসের অভাব বাংলা শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থেরই প্রধান ত্রুটি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে। ইতিপূর্বে রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ দু'একজন লেখক শিল্পবিজ্ঞান রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন বটে,[৪৬] কিন্তু এই বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো একটি দিককে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ-রচনার প্রচেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে দেখা যায় নি। শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক-পত্রও এই যুগেই প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ন্যায় শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট সাময়িক-পত্রও বাংলা সাহিত্যে নেই বললেই হয়। বস্তুতঃ, চিকিৎসা ও কৃষির তুলনায় বাংলা সাহিত্যের শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার দিকটি দুর্বল। এই দুর্বলতার দিক থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। এই সাদৃশ্যের মূল কারণ হোল, যন্ত্রবিজ্ঞানের ন্যায় শিল্পবিজ্ঞানও এদেশে প্রসার লাভ করে নি। বিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিজ্ঞানের কিছুটা প্রসার ঘটল বটে, কিন্তু তা' প্রধানতঃ ছোটখাট শিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেল। বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের

৪৬ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'শিল্পিক দর্শন'-এর (১৮৬০) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য

মতো 'ভারী শিল্প' (Heavy Industries) এদেশে গড়ে উঠল না। ফলে, যন্ত্রবিজ্ঞানের ন্যায় শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায়ও কোনোরূপ উৎসাহ দেখা গেল না।

তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যন্ত্রবিজ্ঞানের তুলনায় শিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই সময়ে শিল্পবিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়ে কয়েকটি সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়। তা' ছাড়া শিল্পবিজ্ঞানের একটি প্রধান দিক 'ফটোগ্রাফী' নিয়ে গ্রন্থ-রচনার সূচনাও এই যুগেই হয়েছিল। এই যুগের যে সকল পত্র-পত্রিকায় শিল্পবিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 'শিল্প কৃষি পত্রিকা'[৪৭] (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২) ও 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলী' (আষাঢ়, ১২৯২)। প্রথমোক্ত পত্রিকাটি তাহিরপুর থেকে শশীশেখরেশ্বর রায়ের পরিচালনায় প্রকাশিত হোত। শিল্পপুষ্পাঞ্জলির সম্পাদক ছিলেন অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।[৪৮] এই পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। অধিকাংশ রচনাই সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী ক'রে লেখা। এই দু'টি সাময়িক-পত্র ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত অন্যান্য যে সকল পত্র-পত্রিকায় শিল্পবিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, শশিভূষণ বিশ্বাস সম্পাদিত 'ভারত শ্রমজীবী' (২য় পর্যায়, অগ্রহায়ণ, ১২৯২), ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শিল্পশিক্ষা' (ফাল্গুন, ১৩০৪)। এ ছাড়া দু'টি স্বতন্ত্র পত্রিকা 'শিল্পতত্ত্ব' ও 'পুষ্পাঞ্জলী'[৪৯] (মাঘ, ১৩০৩) একত্রে প্রকাশিত হোত। প্রথমোক্ত পত্রিকাটি শিল্প বিষয়ক; দ্বিতীয়টি সাহিত্য সম্বন্ধীয়।

সাময়িক-পত্রে শিল্পবিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া ছাড়াও এই যুগে বাংলা ভাষায় ফটোগ্রাফী বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার সূচনা হোল। বাংলা ভাষায় ফটোগ্রাফী নিয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন আদীশ্বর ঘটক। এই লেখকের 'ফটোগ্রাফী শিক্ষা বা Elements of Dry Plate Photography in Bengali' ১৩০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি রচনায় বিভিন্ন

৪৭ বাংলা সাময়িক-পত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৪৬।

৪৮ অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'শিল্পশিক্ষা' (১৮৮২)।

৪৯ বাংলা সাময়িক-পত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৭৪।

ইংরেজী গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। ফটোগ্রাফী সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রাদির ইংরেজী নামই এখানে ব্যবহৃত। ফটোগ্রাফীর ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে শিক্ষার্থীর পক্ষে জ্ঞাতব্য ফটোগ্রাফীর মূল প্রসঙ্গগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আদীশ্বর ঘটকের বর্ণনাভঙ্গী নীরস ও প্রাণহীন।

আদীশ্বর ঘটকের সমসাময়িক যুগে বাংলা ভাষায় ফটোগ্রাফী বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করলেন মন্মথনাথ চক্রবর্তী ও আনন্দকিশোর ঘোষ। মন্মথনাথ চক্রবর্তীর প্রথম রচনা 'আলোকচিত্রণ বা ফটোগ্রাফি-শিক্ষা' ১৩০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মন্মথনাথ ছিলেন ভারতীয় শিল্পসমিতির সম্পাদক এবং ইণ্ডিয়ান্ আর্ট স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। আলোচ্য গ্রন্থে ফটোগ্রাফীর ইতিহাস আলোচনা ক'রে ফটোগ্রাফীর যন্ত্রাদি, উপাদান এবং কি ক'রে ফটো তুলতে হয়, তা' বর্ণনা করা হয়েছে। দু'এক যায়গায় অনুবাদের চেষ্টা থাকলেও আদীশ্বর ঘটকের ন্যায় মন্মথনাথও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফটোগ্রাফী সংক্রান্ত ইংরেজী নামই ব্যবহার করেছেন। তবে মন্মথনাথের ভাষা আদীশ্বর ঘটকের তুলনায় অনেক প্রাঞ্জল। মন্মথনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ছায়া-বিজ্ঞান' ১৩০২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে দৃষ্টিবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার পর ফটো তুলবার পদ্ধতি ও ফটোগ্রাফী সংক্রান্ত রসায়নবিজ্ঞান নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির আলোচনা করা হয়েছে।

ফটোগ্রাফী নিয়ে লেখা এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আনন্দকিশোর ঘোষের 'প্রভাচিত্র বা ফটোগ্রাফি শিক্ষা'য় (১৩০২) ফটো সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবে জ্ঞাতব্য প্রায় সকল বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। আদীশ্বর ঘটক ও মন্মথনাথ চক্রবর্তীর মতো এই লেখকও প্রায় সর্বত্রই ফটোগ্রাফী বিষয়ক ইংরেজী নামই ব্যবহার করেছেন।

বিংশ শতাব্দীতে লেখা ফটোগ্রাফী বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থেও ইংরেজী নামই ব্যবহৃত। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'সহজ ফটোগ্রাফী শিক্ষা'র (১৩১৯) নাম উল্লেখযোগ্য। ফটোগ্রাফী ছাড়াও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে গ্রন্থ-রচনার প্রচেষ্টা বিংশ শতাব্দীতে দেখা গেল। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর 'হাজার জিনিস' (১৩০৭) নামক গ্রন্থে এক হাজার প্রকার দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রণালী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণচন্দ্রের ভাষা যায়গায় যায়গায় শ্রুতিকটু।

১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকজন লেখক নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় এগিয়ে এলেন। লর্ড কার্জনের পরিকল্পিত বঙ্গবিভাগ রোধ করবার জন্যে এই সময়ে সমগ্র বাঙ্গালী সমাজ রুখে দাঁড়িয়েছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ জুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল তীব্র আন্দোলন। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করা ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করবার প্রয়াসে স্বদেশে ছোটখাট শিল্প গড়ে তুলবার জন্যে কেউ কেউ উদ্যোগী হলেন। তা' ছাড়া স্বদেশী জিনিসের প্রতিও অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোল। স্বদেশী শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে কোনো কোনো লেখক এই সময়ে শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করলেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেদারনাথ সরকার সম্পাদিত 'কার্পাস তুলার ইতিহাস ও শিল্প বিবরণী' (১৩১২) এবং বাবুরাম কয়ালের 'দিয়াশালাই প্রস্তুতপ্রণালী' (১৯০৬)।

নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং ছোটখাটো শিল্প নিয়ে লেখা অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিপদ চক্রবর্তীর 'শিল্পশিক্ষা' (১৯১০), ভুবনমোহন বসুর 'বৈজ্ঞানিক শিল্পতত্ত্ব বা অর্থকরী ব্যবহারিক বিদ্যা' (১৩২০) এবং অমরেশ কাঞ্জীলালের 'রং ও রঞ্জনবিদ্যা' (১৩২৮)।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকে প্রাধান্য দিয়ে কয়েকটি সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে এই শ্রেণীর পত্রিকা কদাচিৎ প্রকাশিত হতে দেখা গেল। মন্মথনাথ চক্রবর্তী ও সতীশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'শিল্প ও সাহিত্য' (বৈশাখ, ১৩০৭) নামক পত্রিকায় শিল্প-বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল বটে ; কিন্তু কিছুকাল চলবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে চুঁচুড়া থেকে ১৩২২ সালের আষাঢ় মাসে নবপর্যায় 'শিল্প ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। নব পর্যায় শিল্প ও সাহিত্যে শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার স্থান নগণ্য।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, চিকিৎসা ও কৃষির তুলনায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞানের দিক অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

নির্দেশিকা ও প্রমাণপঞ্জী

নির্দেশিকা

খ

ছ

জ

ঠ

ড

ঢ

ত

দ

প

ল

শ

স

প্রমাণ-পঞ্জী

Carey William—Oriental Christian Biography (3 Vols)
Clifford W. K.—The common sense of the exact Sciences. Edited by Karl Pearson (1945)
Darwin Charles Robert—On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for freedom (1859)
Dayal Bagwan—Development of Modern Indian Education (1955)
Dey Dr. S. K.—Bengali Literature in the nineteenth century (1919)
Geddes Petric--An Indian Pioneer of Science : The life and work of Sir Jagadish Ch. Bose (1920)
Huxley T. H.—Collected Essays (Vol. III) (1896)
Huxley T. H.—Man's place in Nature (1863)
Ivans Benjamin I for—Literature and Science (1954)
Jeans Sir James—Physics & Philosophy (1948)
Kelvin & Tait—Treatise on Natural Philosophy.
Long Rev. J.—A Descriptive Catalogue of Bengali works (1855)
Marshman J. C.—The story of Carey, Marshman and Ward (1864)
Mittra K. C.—Agriculture and Agricultural Exhibitions in Bengal (1865)
Morley John—Science and Literature (1911)
Mukhopadhaya Ashutosh—The History of the Indian Museum (Cal. 1914)
Randhawa Dr. M. S.—Agricultural Research in Indian Institutes and Organisation (1958)
Ray Dr. Prafulla Chandra—Essays and Discourses (1918)
Spencer Herbert—Essays Scientific and Speculative (1868-1872)
Spencer Herbert—First Principles (2 parts)
Yates William—Memoirs of Rev. W. H. Pearce

Agricultural and Horticultural Society of India, Journal with proceedings : 1869—1920.
Asiatic Society of Bengal—Journal & proceedings, 1832—
Bengal Obituary
Bethune Society Proceedings (1859-1861)
Calcutta Gazette
Calcutta Review, 1844—
Correspondence between the Government of India and the Asiatic Society of Bengal relative to the Establishment of a public Museum in Calcutta (1859).
Friend of India : 1818—
Indian Agricultural Gazette (April 1885—March 1888)
Indian Association of the Cultivation of Science Proceedings. 1920—
Proceedings of the Institute of Civil Engineers in India (1910-1916)
Report of the Agricultural and Horticultural Society of India for 1882
Report of the Calcutta School Book Society(1817-1875)
Rules for the Hindu College, Calcutta (1847)
Transactions of the First Indian Medical Congress (1895)
Transactions of the Medical and Physical Society of Calcutta : 1825—

Centenary of Medical College, Bengal : 1935 ; (1835 1934)
Engineering Education in the British Dominions
Hundred years of the University of Calcutta : (1957)
Royal Botanic Garden, Calcutta(The 150th Anniversary Vol.)
Presidency College, Calcutta : Centenary Vol. (1955)

হিন্দুমেলার কার্যবিবরণ (১৮৬৮)

অক্ষয়কুমার রায় প্রণীত—অক্ষয়কুমার দত্ত (১৯৬০—২য় সংস্করণ)

অনিলচন্দ্র ঘোষ—রাজর্ষি রামমোহন, জীবনী ও রচনা (১৯৩১)

অনিলচন্দ্র ঘোষ—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র (১৩৩৮)

অনুরূপা দেবী—ভূদেবচরিত—২য় ভাগ (১৩৩০)

অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর (১৯২৩)

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী—১ম খণ্ড (১৯২৭)

আশুতোষ বাজপেয়ী—রামেন্দ্রসুন্দর (১৩৩০)

কুমারদেব মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত—ভূদেব-চরিত, ১ম ভাগ (১৩২৪)

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সংকলিত—বংশ-পরিচয়

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও অমৃতলাল সরকার—ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা (১৯০৩)

দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বঙ্কিমচন্দ্র (২য় সংস্করণ, ১৩২৬)

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস—অক্ষয়চরিত

নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ভারতবর্ষে কৃষি-উন্নতি (১৩২৪)

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত (১২৮৭)

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর (১৩২৭)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-জীবনী, ৪র্থ খণ্ড (১৩৬৩)

বসন্তকুমার বসু—শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস (১৩২৪)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান সম্পাদক—সাহিত্য সাধক চরিতমালা

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িক-পত্র, ১ম খণ্ড (নূতন সংস্করণ, মাঘ, ১৩৫৪) ও ২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৫৯)

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—রসায়নাচার্য চুণীলাল (১৩৪১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবন-স্মৃতি (১৩৪৪ সংস্করণ)

রাজকুমার চক্রবর্তী—অক্ষয়কুমার দত্ত (১৯২৫)

রাজনারায়ণ বসু—হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত (১৭৯৭ শক)

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমজীবনী (৩য় সংস্করণ, ১৩৩৮)

শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ (১-৫ খণ্ড)

শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (৩য় সংস্করণ)

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী (৩য় সংস্করণ, ১৯২৭)

সন্তোষকুমার দে—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

ডাঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃতীয় সংস্করণ: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬)

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—বঙ্গভাষার লেখক